বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১লা ফাল্গুন ১৩৬৩

পঞ্চাশ টাকা

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকালিদাস রায়
ডঃ সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রী নির্মল মিত্র কর্তৃক দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাঃ লিঃ,
৯৩এ লেনিন সরণী, কলিকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

এই খণ্ডের চারখানি গ্রন্থ এক হিসাবে আট বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণের চতুর্থ গল্প-সংগ্রহ "জন্ম ও মৃত্যু" বাহির হয় ১৯৩৭ সালে এবং তাঁহার ত্রয়োদশ উপন্যাস "অশনি-সংকেত" "মাতৃভূমি" পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১৯৪৩-১৯৪৫ সালে। এই আট বৎসরের তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা এবং তাঁহার চতুর্থ উপন্যাস "আরণ্যক" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯-এ এবং তাঁহার চতুর্থ ডায়েরি-গ্রন্থ "বনে-পাহাড়ে" প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। সন তারিখ দিয়া আলোচনা আরম্ভ করিলাম ইহা ভাবিয়া যে তাঁহার প্রথম তিনখানি উপন্যাস "পথের পাঁচালী" (১৯২৯), "অপরাজিত" (১৯৩২), "দৃষ্টিপ্রদীপ" (১৯৩৫) এবং শেষ উপন্যাস "ইছামতী" (১৯৫০) বাদ দিলে এই আট বৎসরের রচনা তাঁহার প্রতিভার সার্থকতম পরিচয়। এই আট বৎসরেই তিনি তাঁহার মোট সাতখানি ডায়েরি-গ্রন্থের মধ্যে প্রথম পাঁচখানি প্রকাশ করেন। আর এই ডায়েরিগুলিই তাঁহার উপন্যাসের যথার্থ মুখবন্ধ। এক ইউরোপীয় দার্শনিক কহিয়াছেন আর্ট মাত্রেই লিরিক-ধর্মী। প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে এই লিরিক আবিষ্কার করিতে হইলে তত্ত্বকথায় জড়াইয়া পড়িতে হইবে। তবে বিভূতিভূষণের উপন্যাস, গল্প ও স্মৃতিকথার মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের কথা ছড়াইয়া আছে: সেই হৃদয়ের কথাই তাঁহার সকল রচনার অন্তর্বস্তু। আজ যে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে তাঁহার স্থান, বাঙ্গালীর মুখে মুখে তাহার নাম তাহার প্রধান কারণ তাঁহার হৃদয়ের কথা বলিবার সহজ শক্তি। বাঙ্গালী মস্তিষ্কে খাটো কেহ বলিবেন না, কারণ নব্যন্যায় বাঙ্গালীরই সৃষ্টি কিন্তু বাঙ্গালী যে কথা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে চায় তাহা হইল হৃদয়ের কথা, বৈষ্ণব কবির কথা, সীতা ও বেহুলার দুঃখের কথা, রামপ্রসাদের, রামকৃষ্ণের ভক্তির কথা, গীতাঞ্জলির ঈশ্বর-প্রেমের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী-লেখকের রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে উহা 'কান্নার জোলাপ'। কিন্তু যে লেখক হৃদয় স্পর্শ করিল না, তাহাকে বাঙ্গালী হৃদয়ে স্থান দিবেন না। "মেঘনাদবধ কাব্য" ও "সীতার বনবাস" দুইখানি ভিন্ন শ্রেণীর রচনা হইয়াও মূলত সমধর্মী। উভয়েরই ভাব কোমল ভাব। বাঙ্গালী রামমোহনের গদ্য পড়েন না কারণ উহাতে হৃদয়ের কথা নাই। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রকে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বুঝিয়াছেন, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের বঙ্কিমচন্দ্র বড় তত্ত্বজ্ঞ মানুষ নন।

বোধহয় হৃদয়ের উপর এত জোর দিয়া সেন্টিমেণ্টকে বড় বেশী প্রাধান্য দিলাম। আর একালে সাহিত্যের সঙ্গে সেন্টিমেণ্টের প্রায় অহি-নকুল সম্পর্ক। তবে বিভূতিভূষণ কখনও আধুনিক লেখক হইবার জন্য অস্থির হন নাই। তাঁহার রচনায় যে জগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে সে জগৎ চির-পুরাতন, চির-নবীন। মানুষের শাশ্বত-হৃদয়ের স্পন্দন তিনি কান পাতিয়া শুনিয়াছেন, অন্যকে শুনাইয়াছেন। সেই হৃদয় চিরিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন নূতন সত্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করেন নাই। উপন্যাসে বাস্তবতার আমদানি করিতে হইলে একটি ক্যামেরা ও একটি টেপ-রেকর্ডার থাকিলেই চলে: তাহাতে জীবনের সত্যকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া

তুলিতে হইলে প্রতিভার প্রয়োজন। বিভূতিভূষণের সেই প্রতিভা ছিল। কাহিনীর মধ্যে ঘোর বাস্তবতার মারিজুয়ানা আর অশ্লীলতার এল. এস. ডি. মিলাইয়া তাঁহাকে উপন্যাস বিকাইতে হয় নাই আর সাহিত্যের আদালতে সেই উপন্যাসের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য উকিলও লাগাইতে হয় নাই। আজ যদি বাঙ্গালী পাঠক নূতন করিয়া বিভূতিভূষণকে চিনিয়া লয় তাহা হইলে বুঝিব বিশ বৎসর পূর্বের সেই সাহিত্য-রুচি ফিরিয়া আসিয়াছে, আমরা ক্লাসিক-কে ক্লাসিক বলিয়া মানিতে শিখিয়াছি।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে এক ইউরোপীয় সমালোচক কহিয়াছিলেন: মহৎ গদ্য মহৎ মানুষের অন্তরের ভাষা। বোধহয় এই কথাটি মনে রাখিয়াই মিল্টন লিখিয়াছিলেন: মহৎ কবি নিজেই একখানি মহৎ কাব্য। বিভূতিভূষণের রচনা সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ ভাবে সত্য। তাঁহার স্মৃতিকথার সঙ্গে তাঁহার উপন্যাসের যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বলিয়াছি তাহার ভিত্তিও তাঁহার এই চারিত্রে। তাঁহার দেখা আর তাঁহার হওয়া একই সত্যের দুই দিক। তিনি যেমন দেখেন, তেমন ভাবেন, যেমন চিন্তা করেন, তেমন বলেন আর তাঁহার এই দেখা, ভাবা, চিন্তা করা, বলা সবই এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তাঁহাকে নানা স্থান হইতে নানা জিনিস কুড়াইয়া তাহাকে সাজাইয়া পাঠকের সামনে উপস্থিত করিতে হয় না। তাঁহার সব কথা স্বতই তাঁহার চিত্ত হইতে যেন উৎসারিত হইতেছে। যে সরলতা তাঁহার চরিত্রে, সেই সরলতা তাঁহার রচনায় এবং তাঁহার স্টাইলের ঋজুতা ও স্বচ্ছতাও মূলত তাঁহার অন্তরের সহজ rhetoric। তিনি ঘষিয়া মাজিয়া লিখিতেন না, চমক লাগাইবার জন্য শব্দ বাছিতেন না, বাহবার জন্য কথায় রং চড়াইতেন না। তাঁহার গদ্য পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে আজকাল আমাদের গদ্যের এমন দুর্দশার কারণ এই যে সকলেই খুব ভাল গদ্য লিখিতে ব্যস্ত। "আরণ্যক" পড়িয়া বুঝি যখন বলার কিছু থাকে তখন তাহা সুন্দর ভাবেই বলা হয়। পরম বিনয়ী মানুষ বিভূতিভূষণ যেন তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া আমাদের বুঝাইতেছেন ভাবের দৈন্য ভাষার চাকচিক্য দিয়া পুরিয়া দেওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন হইল, বিভূতিভূষণের ভাবের ঐশ্বর্য কোথায়? "আরণ্যক" এক মহৎ সৃষ্টি কোন্ অর্থে? রাজশেখর বসু বইখানি পড়িয়া বলিয়াছিলেন: 'পড়লে ঘরে বসেই হাওয়া বদলের কাজ হয়' ("কথাসাহিত্য", অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭)। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে ইহা 'এক অভিনব উপনিষদ' ("শনিবারের চিঠি," অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭)। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ইহাকে বলিলেন: 'অভিনব বস্তু' ("শনিবারের চিঠি", অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭)। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে' ("বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা")।

নিসর্গ-প্রীতি পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যেই চিরকালের বস্তু। আর বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের প্রকৃতির বিচিত্ররূপ রূপে বর্ণে গন্ধে প্রকাশিত হইয়া আছে। বিদ্যাপতির 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি / ভুবন ভরি বরসন্তিয়া' হইতে রবীন্দ্রনাথে 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব রভসে' বাংলা কাব্যে প্রকৃতির কথায় ভরা। আর আমাদের গদ্যে প্রকৃতির বর্ণনা নাই যাঁহারা

বঙ্কিমচন্দ্র পড়িয়াছেন তাঁহারা বলিবেন না। যে ভাষায় 'গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার' এই রকম একটি লাইনও লিখিত হইয়াছে সে ভাষার পদ্য আর গদ্য দুই যেন প্রকৃতি-বর্ণনায় পঞ্চমুখ। আর যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি গদ্যেই বলেন—'ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা', সে দেশে প্রকৃতি নিজেই ছন্দময়, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে আর ছন্দের প্রয়োজন হয় না।

তাহা হইলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রেমের মধ্যে নূতন কি পাইলাম। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতি-প্রেমিক, কিন্তু বিভূতিভূষণ কি বাংলা সাহিত্যের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ? মার্কিন লেখক Thoreau প্রকৃতি-পাগল হইয়া বন কাটিয়া বসতি করিলেন আর সেই ঝাড়-জঙ্গলে ফলিত জীবনের কথা লইয়া তাঁহার *Walden* (১৮৫৪) গ্রন্থখানি লিখিলেন। আর প্রকৃতির নিত্য-সান্নিধ্য তিনি কেন চাহিলেন সে বিষয়ে তাঁহার কথার সঙ্গে বিভূতিভূষণের কথার কিছু মিল দেখিতে পাই। **'I went to the wood because I wished to live delib rately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived."** কিন্তু তবু বলিতে হয় "আরণ্যক" আর *Walden* এক বস্তু নয়। শুনিয়াছি কেহ কেহ নাকি William Henry Hudson এর *Green Mansions* (১৯০৪) এর সঙ্গে বিভূতিভূষণের "আরণ্যকে"র তুলনা করিয়াছেন। Hudsonও প্রকৃতি-প্রেমিক, বিভূতিভূষণও প্রকৃতি-প্রেমিক, অতএব এই দুইএর রচনা সমধর্মী এমন যুক্তি সাহিত্যে অচল। *Green Mansions*-এ বর্ণিত ভেনেজুয়েলার অরণ্য Hudson কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই। আরণ্যকের অরণ্য বিভূতিভূষণের চোখে দেখা অরণ্য। তাঁহার নিসর্গ-প্রীতি তাঁহার নিজস্ব, তিনি কোন ইংরাজী বই হইতে উহা লাভ করেন নাই।

এই নিজের চোখে সব দেখাটাই বিভূতিভূষণের পুরুষার্থ। এই দেখা বড় সহজ কাজ নয়। আর দেখিয়া অপরকে দেখান প্রতিভার কর্ম। প্রাচীন মহাকাব্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহাতে সব কিছুই যেন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারা, মানুষ, পশুপক্ষী সব যেন সিনেমার ক্লোজ-আপের মত জ্বল জ্বল করিতে থাকে। ইহার বোধ হয় একটি কারণ এই যে প্রাচীন কালের মানুষ চারিদিকে তাকাইয়া সব কিছু দেখিয়া লইতে ভালবাসিত। আর সেই দেখাটা কোন ভাব বা চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন হইত না। **I cannot see what flowers are at my feet,** কোন প্রাচীন কবি লিখিবেন না। ইহাতে চোখের দৃষ্টিকে ভাবের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়াছে।

তবে কি বুঝিব বিভূতিভূষণের কাছে চোখের দেখাই সব, তাঁহার কাছে ভাব-দৃষ্টির কোন মূল্যই নাই। ভাব ছাড়া সাহিত্য নাই।. কথাটি সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের কোন সূত্র ধরিয়া বলিলাম না। কথাটি রাম শ্যাম যদু মধুর কথা। আর বিভূতিভূষণ বাঙালীর কাছে ভাবুক মানুষ হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু তাঁহার ভাবের কথা হীরকখণ্ডের দ্যুতির মত তাঁহার চোখের দেখা বস্তু হইতেই যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। যে বংশীধ্বনি কানে বাজিবার আগেই

মর্মে পৌঁছায় তাহা আধ্যাত্মিক জীবনের পরমবস্তু হইতে পারে, তাহাকে যথার্থ সঙ্গীত বলিতে পারি না। বিভূতিভূষণের অন্তর্জীবন তাঁহার নিসর্গ-দর্শনের ফল। সে দর্শনকে তিনি তৃতীয় নয়নের দর্শন বলিয়া দাবি করেন নাই।

বিভূতিভূষণের অন্তর্মুখিতা এবং তাঁহার অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস এই দুইটি ব্যাপারকে যদি আমরা তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলি তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে উপেক্ষা করা হইবে। অন্তর ও বাহিরের কোন অদ্বৈতে উপনীত হইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। আর তাঁহার এই সুন্দর ভুবনকে উপেক্ষা করিয়া কোন শাংকর কৈবল্যকেও তিনি শ্রেয় বলিয়া মনে করেন নাই। যাঁহারা বিভূতিভূষণের রচনায় Nature-mysticism আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহারা বিভূতিভূষণের নিসর্গ-প্রীতি উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিণত আধ্যাত্মিকতাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। Nature-mystic-এর অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে অতীন্দ্রিয়তা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকে ডুবাইয়া দেয়, প্রকৃতি অপসৃত হইয়া পরমতত্ত্বের জন্য স্থান করিয়া দেয়। এমন এক Narure-mystic হইলেন Blake এবং তাঁহার কথা এই যে 'rotten rags of sense and memory'-কে বর্জন করিয়া 'imagination uncorrupt' এর উপর নির্ভর না করিলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিবে না। A. G. B. Russell সম্পাদিত *The Letters of William Blake*, (১৯০৬, পৃ ১১১)। বিভূতিভূষণ sense and memory-কে rotten rags হিসাবে ফেলিয়া দিবেন না। তাঁহার imagination বা কল্পনা তাঁহার sense ও memoryতেই প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সত্য ও সৌন্দর্য দুইই এই স্মৃতি, কল্পনা ও বোধের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে এই স্মৃতি, কল্পনা ও বোধের সমন্বয়ে সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে পারে কিনা। অর্থাৎ 'আরণ্যক' কি প্রকৃতির উপন্যাস? বিভূতিভূষণ লিখিয়াছেন, আরণ্যক 'কল্পনা-লোকের বিবরণ'। অথচ তাঁহার মতে ইহা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে, উপন্যাস। ইহা উপন্যাস কেন, না ইহার 'পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়।' বিভূতিভূষণ এখানে তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কোন বস্তু কাল্পনিক না হইলেই তাহা উপন্যাসের বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রকৃতি বাস্তব পদার্থ, প্রকৃতির বর্ণনা উপন্যাস নয়। অপর পক্ষে *Gulliver's Travels* এক কাল্পনিক কাহিনী হইলেও ইহা উপন্যাস।

"আরণ্যক"-এর প্রস্তাবনায় বিভূতিভূষণ আরও দুই একটি কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই গ্রন্থের উপন্যাসত্ব কোথায় সে প্রশ্নের উত্তর সেখানেও পাইতেছি না। কিন্তু "আরণ্যক"-এর স্বরূপ বুঝিতে হইলে উহার প্রস্তাবনার এই উক্তির তাৎপর্য আগে বুঝিয়া লইতে হইবে:

"মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বন-প্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির ঝড়ে ঝাপ্‌সা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে। কত অতি দরিদ্র বালক বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক

কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। অন্ধকার প্রান্তরে খড়ের বাংলোয় বসিয়া বসিয়া বন্য শিকারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা-ঢাকা গর্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।

"ইহাদের কথা বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবন ধারার স্রোত আপন মনে উপল-বিকীর্ণ অজানা নদী খাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে. সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।

কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এ স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়। তাই এই কাহিনীর অবতারণা।"

এখানেও দেখিতেছি- আরণ্যকের সাহিত্য-রূপটি নির্দিষ্ট হইল না। বলা হইল আরণ্যক অরণ্যকথা, অরণ্যবাসী মানুষের কথা এবং এই সব কথাই স্মৃতিচারণার ফল। এই স্মৃতিচারণার প্রেরণা হইল নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিয়া অপরাধের ভার লঘু করা। কিন্তু 'আরণ্যক' পড়িয়া কেহ বলিবেন না যে ইহা Coleridge এর *Ancient Mariner*-এর মত পাপ ও পাপমোচনের কাহিনী। একজন অরণ্য-বিলাসী মানুষ গ্রহদোষে এক বিস্তৃত বনভূমির বনশোভা বিনষ্ট করিতে বাধ্য হইলেন ইহা দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু 'আরণ্যক' গ্রন্থখানির মূল বস্তু এক অনুতপ্ত হৃদয়ের বস্তু এমন কথা কেহ বলিবেন না। লেখক গ্রন্থশেষে অরণ্যানীর আদিম দেবতাদের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাহিনী এক অনিচ্ছাকৃত পাপকর্মের কাহিনী হিসাবে পরিকল্পিত হয় নাই। এই কাহিনী একধরণের স্মৃতি-কথা। এখন প্রশ্ন হইল এই স্মৃতি-কথা উপন্যাসের উপজীব্য হইতে পারে কিনা।

এই বিষয়ে বিভূতিভূষণের চিন্তা যেমন স্পষ্ট, তেমন তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলিবেন স্মৃতি কথা মানুষেরই কথা, তাহা প্রকৃতির কথা হইয়াও মানুষের কথা। কিন্তু মানুষের সকল কথাই কি সাহিত্যে বলা হইয়াছে? হোমারের ইলিয়াডে, রামায়ণ-মহাভারতে, ভার্জিলের ইনিডে দান্তের ডিভাইন কমেডিতে বা বাংলা মঙ্গলকাব্যে, স্কট্ বা বঙ্কিমের উপন্যাসে তো কত কথা বলা হইয়াছে, ব্যক্তি, সমাজ, জাতির ভাগ্যের কথা কত বিচিত্র কাণ্ড, কত বিচিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়া ইহাদের মধ্যে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বলিবেন, এই সকল কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হইলেও মানুষের সকল কথা হইয়া উঠে নাই। তিনি আরও বলিবেন, এই পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র বৃহৎ কথাই মহৎ কথা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যাহা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ তাহার মধ্যেও যে মহৎ কথার উপাদান থাকিতে পারে ইহা এখনও স্বীকৃত হয় নাই। কথাটি তিনি তাঁহার 'স্মৃতির রেখা' গ্রন্থে বুঝাইয়া বলিয়াছেন: "রাজা যযাতি কি সম্রাট মেণ্টু হোটেপ, জুলিয়াস সীজর, থিয়োডোসিয়াস এবং তাবৎ সম্রাট পরিবারের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প আমরা শৈশব থেকে মুখস্থ করে এসেছি। কিন্তু

গ্রীসের ও রোমের যব ও গমের ক্ষেতের ধারে ওলিভ বন্যদ্রাক্ষার ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে দৈনন্দিন জীবন হাজার হাজার বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে—তাদের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশার গল্প তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস আমি জানতে চাই। হোমার ভার্জিলের কবিতা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠত কিনা এদের তুচ্ছ কথায় আমি জানি না, কিন্তু উত্তর-পুরুষদের কৌতূহল, স্নেহ ও সম্মানের অধিকারী হ'ত তারা একথা ঠিক।

"কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের ফাঁকে সরে যায়, সারি বাঁধা বর্শার অরণ্যের ভিতর দিয়ে দূরের এক ভদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ী নজরে আসে, অজ্ঞাত কোন লেখকের জীবন কথা, কি কালের স্রোতে কূল-লাগা এক টুকরা পত্র, প্রাচীন ইজিপ্টের কোন কৃষক শস্য কাটবার জন্য তার পুত্রকে কি আয়োজন করবার কথা বলেছিল—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরো ভাঙ্গা ফাটা মাটির তলায় চাপাপড়া মৃন্ময় পাত্রের মত পুরাতত্ত্বের কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়ে।"

এই 'বুকের স্পন্দনের ইতিহাস' "আরণ্যক"-এর বস্তু। ইহা বিভূতিভূষণের সাহিত্য দৃষ্টিতে উপন্যাস-বস্তু। এইচ্. জি. ওয়েলস্, গর্কি, ব্রেট হার্ট, রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় তিনি এই 'বুকের স্পন্দনের ইতিহাস' পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা হইল এই যে 'আরও সূক্ষ্ম আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই, আজকার তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়।' এই সব তুচ্ছ কথা, মানুষের হৃদয়ের সংবাদ লইয়াই 'মানুষের মনের ইতিহাস', তার প্রাণের ইতিহাস। এ ইতিহাসকে বিভূতিভূষণ এক মহা-উপন্যাসরূপে কল্পনা করিয়াছেন। 'এই যুগ যুগ ব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাও নয়—এই বিশাল জীবজগৎ—কোন্ মহাঔপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরুনো উপন্যাস। অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করা আছে। মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্ বিস্মৃত যুগের আটলান্টিক জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোন অধ্যায়ের বিষয়ীভূত ঘটনা তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্য শৃগালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগ-শিশুর মৃত্যুতে যে বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হল তাও এর এক অধ্যায়ের কথা। ঐ যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে। ওর কথাও।' (স্মৃতির রেখা, বিভূতি-রচনাবলী, ১৩৯৪-৯৫)। স্মৃতির রেখা গ্রন্থের এই অংশ ১৯২৭ এর ৩০শে নভেম্বর লিখিত। অতএব পথের পাচালীর লেখকের উপন্যাসতত্ত্বকে এই কথাগুলির মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। এই তত্ত্ব উনি পাকা সমালোচকের ভাষায় উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তব্যে এই ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা নাই। সেই বক্তব্য এই যে 'তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস' প্রাণের ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারে এবং সেই ইতিহাস উপন্যাসের সামগ্রী। পৃথিবীর উপন্যাস-চিন্তার ইতিহাসে ইহা এক নূতন কথা।

উপন্যাস সম্বন্ধে এমন আর একটি নূতন কথা বলিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ ঔপন্যাসিক Henry Fielding। তিনিই প্রথম উপন্যাসকে আধুনিক সাহিত্যের এপিক বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং তাঁহার উপন্যাসকে Comic epic in prose বলিয়া বিশেষিত করেন। সমালোচকের ইতিহাসে এই কথাটি এক যুগান্তকারী কথা। সাহিত্যের বিভিন্নরূপ

সম্বন্ধে সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলিকে তিনি যেন এক কথায় উড়াইয়া দিলেন, এপিক বলিতে বুঝাইতে heroic poetry, কিন্তু Fielding বলিলেন এপিকএর বস্তু heroic না হইয়া Comic হইতে পারে এবং Comic epic যখন গদ্যে রচিত হয় তখন উহার নাম হয় উপন্যাস। অর্থাৎ প্রাচীন এপিক রাজা-রাজড়া, দেবদেবী যুদ্ধবিগ্রহের কথা, আর আধুনিক কালে ঐ এপিকের বিকল্প উপন্যাস সাধারণ মানুষের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের কথা। বিষয়ের মাহাত্ম্যে উভয় সমান। এমন একটি কথা বলিয়া Fielding সাহিত্যের বিষয় ও রূপ (form) সম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত মতগুলিকে যেন উলটাইয়া দিলেন। এপিক-এর বস্তু ও কমেডির বস্তুর মধ্যে আর কোন ভেদ রহিল না, কারণ দুইই এখন উপন্যাসের বস্তুর মধ্যে মিশিয়া গেল। অর্থাৎ সাহিত্যের প্রাচীন বর্ণভেদ উঠিয়া গেল এবং এই বর্ণসংকরের ফলে এক নূতন বর্ণের উদ্ভব হইল। এই নূতন বর্ণ এপিকের কুলমর্যাদা হারাইল না। ইলিয়াড বা রামায়ণের বিষয়ের তুলনায় Fielding-এর উপন্যাসের বিষয় তুচ্ছ বিষয়, Fielding বলিলেন এই তুচ্ছ বিষয় লইয়াও মহৎ সাহিত্য রচনা সম্ভব।

ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেই আর এক ইংরাজ লেখক কাব্যের বিষয় লইয়া আর একটি নূতন কথা বলিলেন। Wordsworth গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে কাব্যের বিষয় আবিষ্কার করিলেন। তিনি তাঁহার পাঠককে বলিলেন, 'O gentle reader, you will find / A tale in everything' অর্থাৎ তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছ কথা লইয়াও কত কাব্য-কাহিনী রচিত হইতে পারে। Simon the Huntsmanএর কথা, Lucyর কথা, Margaretএর কথা, Michaelএর কথা Wordsworthএর কাছে 'মানুষের বুকের কথা'।

"আরণ্যক" উপন্যাস কি নয়, আর উপন্যাস হইলে ইহা কি প্রকৃতির উপন্যাস তাহা বিচার করিবার পূর্বে বুঝিয়া লইতে হইবে যে সাহিত্য বিবর্তনশীল এবং এই বিবর্তনের পথে ইহার নূতন নূতন বস্তু নূতন নূতন রূপে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ সকল এপিকের বিষয় ও গঠন যেমন এক নয়, সকল উপন্যাসেরও বিষয় ও গঠন এক নয়। উপন্যাস যেমন বিচিত্র বিষয়ী তেমন বিচিত্র রূপী। অতএব আরণ্যক গ্রন্থখানিকে একটি নূতন ধরণের উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের সামান্য লক্ষণ "আরণ্যকে" আছে কিনা আগে দেখিয়া লইতে হয়।

বস্তুত Fielding উপন্যাসকে এপিকের সঙ্গে তুলনা করিয়া উপন্যাসের প্রধান লক্ষণটি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। একখানি এপিক পড়িয়া পাঠকের যে ভাব, একখানি উপন্যাস পড়িয়া পাঠকের সেই ভাব। ভাবটি হইল এই যে ইহার মধ্যে মানুষের সকল কথা শুনিলাম, ইহার বাহিরে আর অন্য কোন কথা নাই। 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে' কথাটি যে কোন এপিক বা উপন্যাস সম্বন্ধে প্রযোজ্য। নিশ্চয় একখানি উপন্যাসে একটা গোটা সভ্যতার সকল কথা স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু নানা চরিত্রের মধ্য দিয়া বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া যে কাহিনী গড়িয়া উঠে তাহাকে মানুষের একমাত্র কাহিনী বলিয়া গ্রহণ করি, অন্য কোন

কাহিনীর কথা তখন মনে হয় না। রাম-রাবণের কাহিনী শুনিতে শুনিতে কেহ ভাবেন না যে ইহা অর্জুন ও কর্ণের কাহিনী নয়। একখানি মহৎ উপন্যাস পড়িয়া মনে হইবে সমস্ত জগৎ সংসার যেন এক অখণ্ড দৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইবে এই আলোকেই সব আলোক, জীবনের এই চিত্রই যথার্থ চিত্র।

একখানি সার্থক উপন্যাসের কাহিনীর তিনটি বিশেষ গুণ—ব্যাপকতা, গভীরতা ও অখণ্ডতা। যে কাহিনীর মধ্যে জীবনের বিচিত্র ব্যাপার স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, সে কাহিনী উপন্যাসের বস্তু হইতে পারে না। যেখানে বিষয়ের অল্পতা সেখানে উপন্যাসের বিস্তার নাই। দ্বিতীয়ত যে কাহিনী জীবনের অন্তস্থলে প্রবেশ করে নাই সে কাহিনীকে সার্থক উপন্যাস বলি না। তৃতীয়ত, সার্থক উপন্যাসের কাহিনী এক অখণ্ড বস্তু, ইহাতে মানুষের ভাব, চিন্তা ও কর্মের বিচিত্রমুখিতা একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সুসম জগৎ পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। ইহার ছোট বড় ঘটনা ও চরিত্র, ইহার বিভিন্ন পরিবেশ, ক্রমশঃ মনুষ্যজীবনের একটি মহান সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। যে কাহিনীতে এই অখণ্ডতা নাই, সেই কাহিনীতে পরিণতিও নাই, অর্থাৎ সে কাহিনী অপরিণত। বস্তুত কাহিনীর অখণ্ডতা মূলত ঔপন্যাসিকের দৃষ্টির অখণ্ডতা। কাহিনীর গতি ও পরিণতি উভয়ই এই অখণ্ড দৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু "আরণ্যকে"র কাহিনী কোথায়? ইহার নায়ক কে? ইহা কাহার ভাগ্যের কথা? আরণ্যক বিশেষ একজনের কথা নয়—অনেকের কথা। সেই অনেক মানুষ লইয়াই এই উপন্যাসের 'অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত'। সেই স্রোতই এই উপন্যাসের কথাবস্তু। এই বিশিষ্ট কথাবস্তুর ব্যাপকতা, গভীরতা ও অখণ্ডতা *War and Peace* উপন্যাসের ঐ ঐ লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে গেলে গোল বাধিবে। অরণ্য ও অরণ্যের পরিবেশে লালিত জীবনের কথা *War and Peace*এর সে কাহিনীর আশ্রয় বলা যাইবে না। *War and Peace*এর জীবনধারা এক প্রবল ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই স্রোত আবার কখন কখন আবর্ত বা ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করিতেছে, কখনও বা তাহা স্ফীত হইয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিতেছে, ইহার গতি কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত—কখনও সরল কখনও বক্র এবং ইহার মধ্যেই ব্যক্তি ও জাতির ভাগ্য নির্দিষ্ট হইতেছে। এই স্রোত আরণ্যকের স্রোত নয়। কিন্তু 'আরণ্যকে' কোন জীবন-স্রোত বহিয়া যাইতেছে না কে বলিবে। এই স্রোতের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বলিয়াছেন যে ইহা 'আপন মনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে'। "আরণ্যক" প্রমাণ করিল যে এই জীবন-স্রোতও উপন্যাসের কথাবস্তু হইতে পারে। Fielding তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে এপিক ও কমেডির বস্তু মিশাইয়াছেন। বিভূতিভূষণ "আরণ্যক" উপন্যাসে লিরিকের সুর মিশাইয়া দিয়াছেন। সে সুর ইহার এপিক-সুলভ ব্যাপকতা নষ্ট করে নাই। প্রকৃতির বিচিত্ররূপ এবং মানুষের বিচিত্র ভাব এক স্নিগ্ধ স্মৃতির আলোকে উজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির কথার যেমন আদি মধ্য অন্ত নাই, মানুষের কথারও তেমন এখানে আদি মধ্য অন্ত নাই। অরণ্যের একটি গাছের

যেমন কোন আলাদা ও পূর্ণ ইতিহাস নাই, এখানে নানা মানুষের মধ্যে একটি মানুষের কোন আলাদা পূর্ণ ইতিহাস নাই। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষ লইয়া যে জগৎ, তাহার একটা পরিপূর্ণতা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের এই পরিপূর্ণতা উপন্যাসের এক বিশেষ লক্ষণ। "আরণ্যকে" এই বিষয়ের পরিপূর্ণতা লিরিক-সুলভ ভাবের পরিপূর্ণতায় বড় কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে। ইহাতে "আরণ্যকে"র উপন্যাসত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; ইহাকে এক লিরিক-ধর্মী উপন্যাসে পরিণত করিয়াছে। সাহিত্যের আইন সম্বন্ধে যাঁহারা সনাতন-পন্থী তাঁহারা হয়ত লিরিক-ধর্মী উপন্যাসকে সোনার পাথরবাটি বলিবেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি সাহিত্যের ইতিহাসে এমন সোনার পাথরবাটির বড় অভাব নাই। তুলসীদাসের ভক্তিরস রামায়ণের কাহিনীকে এক লিরিক-ধর্মী এপিকে পরিণত করিল। সংস্কৃত-গ্রীক্-ল্যাটিন-পড়া শ্রীঅরবিন্দ "রামচরিত মানস" সম্বন্ধে লিখিলেন যে এটি একটি 'lyric in an epic frame-work'। "আরণ্যক" সম্বন্ধে বলা চলে যে লেখকের নিসর্গপ্রীতি ইহাকে একটি lyric in the frame-work of a novel করিয়া তুলিয়াছে। ইহার লিরিক সুর উপন্যাসের উপর চড়ান হয় নাই। উপন্যাসখানিই যেন এই লিরিক সুর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। কাহিনীর সমস্ত রসের মূল লেখকের নিসর্গমুখিতা। এই নিসর্গমুখিতা যে তাহার মধ্যে কত বিচিত্রভাবের সৃষ্টি করে, তাহাকে কত মানুষের কত সুখ দুঃখের কথা মনে করাইয়া দেয় তাহা তিনি এই গ্রন্থেই কতবার বলিয়াছেন : 'জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটি নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশবিদেশের নরনারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি'।

"আরণ্যকে" অরণ্যের কথা আর মানুষের কথা এক হইয়া গিয়াছে। ইহা এক নূতন ধরণের উপন্যাসের কথা।

(২)

"অশনি-সংকেত" "মাতৃভূমি" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-১৯৪৫ সালে। বিভূতিভূষণ উপন্যাসখানি শেষ করেন নাই। বোধহয় ভাবিয়াছিলেন এখানি আরম্ভ করাই তাঁহার ভুল হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর নয় বৎসর পর "অশনি-সংকেত" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে ইহার বড় আদর হয় নাই। আজ বিভূতিভূষণের রচনা বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলেও ইহার সাহিত্যমূল্য নাই বলিলেই চলে। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় গ্রাম দেশের

মানুষের চরম দুর্দশাই এই উপন্যাসের কথাবস্তু। কিন্তু ইহার কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র যেন একমুখী হইয়া এক অখণ্ড জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বিভূতিভূষণ গ্রামের মানুষকে চিনিতেন, গ্রামবাসীর সুখদুঃখ বুঝিতেন, কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতা উপন্যাসের প্রাণবস্তু হইতে পারে না, সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীর সহানুভূতির মিশ্রণ হইলেও না। এমন কি একটি কাহিনী বানাইতে পারিলেও একখানি উপন্যাস সৃষ্টি করা যাইবে না। সুষ্ঠু সংলাপ উপন্যাসের এক বড় সম্পদ। কিন্তু শুধু সুষ্ঠু সংলাপ দিয়া একখানা উপন্যাস গড়িয়া তোলা যাইবে না। নাটকের বস্তু সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌ল্ সাহস করিয়া বলিয়াছেন: চরিত্র ছাড়া ট্র্যাজিডি হয়, ঘটনা ছাড়া হয় না। উপন্যাস সম্বন্ধেও বলা যায় যে একমাত্র চরিত্রচিত্রণের কৌশলের উপর একখানি উপন্যাস দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তাহা হইলে উপন্যাসের প্রাণবস্তু কোথায়? উপন্যাস-তত্ত্বের এই মূল জিজ্ঞাসা এড়াইয়া বলিতে পারি "অশনি-সংকেত" উপন্যাসের প্রাণবস্তু খুঁজিয়া লইতে হয়। দুর্দৈব দুর্দশার ছবি উপন্যাসে থাকিতে পারে, ঐ ছবি লইয়াই একখানা মহৎ উপন্যাস হইতে পারে না। উপন্যাস মানুষের কথা, ইহার অন্য কথা এই মানুষের কথাকেই স্পষ্ট করিয়া তোলে। "অশনি-সংকেত"এ দুর্ভিক্ষের কথা সার্থক উপন্যাসে পরিণত হয় নাই।

(৩)

"জন্ম ও মৃত্যু" গল্প-সংকলনের গল্পগুলির সার্থক ভূমিকা ঐ নামের গল্পটির প্রথম কথা কয়টি: 'জীবনের মাঝে মাঝে যেন চমৎকার ব্যাপার ঘটে। ভেবে দেখবার ও উপভোগ করবার জিনিস হিসেবে তার মূল্য বড় কম নয়।' জীবনের এই চমৎকার ব্যাপারগুলির মধ্যে তিনি বিচিত্র মানুষ দেখিয়াছেন, তাহাদের চিনিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এক একটি মানুষ যেন 'এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ।' অভিযাত্রিক গ্রন্থে তিনি মানুষকে প্রকৃতির মতই রহস্যময় বলিয়াছেন: 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সেই জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ।··· মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর-দক্ষিণ মেরু অভিযানের মতই কষ্ট-ও অধ্যবসায়-সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।' বিভূতিভূষণের অধিকাংশ ছোটগল্পই এই মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান। ইহাতে ধার-করা realism নাই, নূতন কথা বলিবার শখ নাই, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন বাণী প্রচার করার আকাঙ্ক্ষা নাই। লেখকের কথা যেন এই যে আমি নিজে 'যা দেখেছি, যা শুনেছি তুলনা তার নাই।' এবং তিনি যাহা দেখেন নাই, যাহা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন নাই, যাহা বাস্তব জগৎ হইতে তাহার অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়ের বস্তু হইয়া উঠে নাই সেই বিষয় লইয়া একছত্রও লেখেন নাই। বিষয়ের এই সত্যতাই তাঁহার

ছোটগল্পের মূল শক্তি। এবং এই দিক দিয়া তাঁহার উপন্যাস, ছোটগল্প ও ডায়েরি সমধর্মী।

ছোটগল্পের গড়ন লইয়া বিচার বিশ্লেষণ বড় কম হয় নাই। সেই সব আলোচনার সূত্র লইয়া এই গল্পগুলির মূল্যবিচার পাকা সমালোচকের কাজ। এখানে এই গল্পগুলি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের কথাটি কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে পারি। এই গল্পগুলি পড়িয়া পাঠক চমকিত হন না, রোমাঞ্চিত হন না। ইহা পড়িয়া তাঁহার যে ভাব তাহা একটা আবেগের ভাব, মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা শুনিয়া যে ভাব, স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় পাখীর কাকলী শুনিয়া যে ভাব, মহৎ সঙ্গীত শুনিয়া যে ভাব ইহা সেই ভাব। ইহার মধ্যে গল্পের কথাবস্তু, তাহার চরিত্র, ঘটনা সব কিছু মিলিয়া যেন একটি স্নিগ্ধ শান্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। সেই জগতের তুচ্ছমত জিনিসও মহৎ, তাহার সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, সকল কথা, সকল কর্ম, পথঘাট, বাড়ি-ঘর, গাছপালা, পশুপক্ষী যাহা কিছু আমরা আমাদের জীবনে নিত্য দেখি তাহা যেন এক নূতন অর্থ ও এক নূতন মহিমা লইয়া আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। পাঠকের তখন মনে হয় আমি তো এই পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছি কিন্তু আমি তো ইহা লক্ষ্য করি নাই, আমি তো এই মানুষটিকে দেখিয়াছি কিন্তু আমি তাহার হৃদয়ের এই সংবাদ পাই নাই। ইহার মধ্যে social realism বা socialist realism খুঁজিয়া লাভ হইবে না। মনুষ্য-চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হিসাবেও ইহার বড় মূল্য নাই। যাহা আমাদের চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, যাহা আমরা দেখিয়াও দেখি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই, এবং দেখি নাই ও বুঝি নাই বলিয়া যাহার অর্থ ও মহিমা আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই তাহাই এই গল্পগুলির উপজীব্য। ইহার মধ্যে যেন মানুষের জগৎ প্রকৃতির জগতের মতই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যদি ঘেঁটুফুল আর শেওড়া দেখিবার মত বস্তু হয় তাহা হইলে সংকীর্ণ গলির সামান্য মানুষও দেখিবার মত বস্তু হইতে পারে। বিভূতিভূষণের ছোট গল্পে তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছ ব্যাপার জীবনের কত রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেছে, আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর ঘটনা কত গভীর ভাবকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যাহা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন তাহা যেন এক পরিপূর্ণ দৃষ্টির আলোকে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। একটি চরিত্রের একটি কথার মধ্যে যেন কত মানুষের কত কথার প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। একটি জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা যেন কত অদৃশ্য ঘটনার সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছে। গল্পের মধ্যে বহুর আভাস পাইলাম, তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেও জীবনের মহত্ত্বের ও সৌন্দর্যের সন্ধান পাইলাম, ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে শাশ্বত মানুষের অন্তরের পরিচয় পাইলাম।

(৪)

বিভূতিভূষণের সাতখানি ডায়েরি-গ্রন্থের মধ্যে "বনে-পাহাড়ে" প্রকাশ-কালের দিক হইতে পঞ্চম। রচনার উৎকর্ষে বাকী ছয়খানির যে কোন একটি ইহা হইতে উৎকৃষ্ট। তবু বলি "বনে-পাহাড়ে" বড় অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-বস্তু নয়। এই জাতীয় রচনা সম্বন্ধে Andre Maurois-এর সতর্কবাণী উল্লেখযোগ্য: "The fault of the intimate diary as a

psychological pointer is that it tends to over-value its writer's feelings. The man who each evening sets down his impressions of the day just past must have material on which to exercise his skill. Hence the temptation to make mountains out of molehills. Furthermore, the diarist, when enclosing ephemeral moods in the fixity of words, tends to give to them a permanence and a profundity which they would not have for somebody not concerned to record his impressions. অর্থাৎ ডায়েরিকে সাহিত্য করিয়া তোলা বড় কঠিন কর্ম। ডায়েরির পাঠক লেখককে বলিতে পারেন, আর তোমার কথা কত শুনিব, তুমি বসিলে, তুমি উঠিলে, তুমি কাঁদিলে, তুমি হাসিলে, তুমি ইহা দেখিলে, উহার সঙ্গে কথা বলিলে, এই সব জানিয়া আমার কি লাভ? কিন্তু সার্থক ডায়েরি শুধু লেখকের কথা নয়, তাহা সকলের কথা। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের "কান্ত-কবি রজনীকান্ত" গ্রন্থে মুদ্রিত রজনীকান্তের দিনলিপি বা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের "ভূদেব-চরিতে" মুদ্রিত ভূদেবের দিনলিপি সাহিত্য নয়, উহা জীবনীগ্রন্থের উপাদান মাত্র। সার্থক ডায়েরী personal essayর সগোত্র। Charles Lambএর কাছে যখন তাঁহার প্রকাশক *Essays* of *Elia* গ্রন্থের জন্য একটি preface চাহিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার ess yগুলিই preface, অর্থাৎ পাঠকের কাছে যাহা বলার তাহা তিনি তাঁহার রচনার মধ্যেই বলিয়াছেন। Montaigneএর *Essays* পড়িয়া ফরাসীদেশের রাজা মুগ্ধ হইয়া লেখককে বলিয়াছিলেন: 'তোমার লেখা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।' Montaigne উত্তরে বলিলেন: 'মহাশয়, আমার লেখা যখন আপনার এত ভাল লাগিয়াছে তখন আপনার আমাকেও খুব ভাল লাগিবে, কারণ আমি আর আমার এই রচনা অভিন্ন।' শ্রেষ্ঠ ডায়েরি-গ্রন্থ একটি ব্যক্তিত্বের কথা। সেকথা যে একের কথা হইয়াও সকলের কথা হইয়া ওঠে তাহা ঐ ব্যক্তিত্বেরই মাহাত্ম্য। যে ডায়েরি বা স্মৃতিকথায় এই লিরিক বস্তু নাই তাহা নীরস ঘটনা-পঞ্জী মাত্র, সাহিত্যে তাহার স্থান নাই।

"বনে-পাহাড়ে" মূলত প্রকৃতির কথা। যে গ্রন্থের সব কথা প্রকৃতির কথা সে গ্রন্থ ক্ষুদ্র হইলেও বড় সুখপাঠ্য না হইতে পারে। কিন্তু "বনে-পাহাড়ে" পড়িতে ক্লান্তি হয় না, বরং ইহার প্রতি পৃষ্ঠায়ই যেন নূতন কথার অবতারণা। প্রকৃতির কবি প্রকৃতির রসেই মগ্ন। প্রকৃতির বিচিত্ররূপ, কবির মনের বিচিত্র অনুভূতি, সব লইয়া তাহার রচনায় এক বিচিত্র জগতের সৃষ্টি। ভক্ত সাধকের ঈশ্বর-প্রসঙ্গেও দেখি ভাবের যেন অনন্ত বৈচিত্র্য। শ্রীরামকৃষ্ণের "কথামৃত"-এর পাঁচখণ্ড তো শুধু মায়েরই কথা। কিন্তু ঠাকুর যেন প্রতি মুহূর্তেই একটি নূতন কথা বলিতেছেন। একখানি উৎকৃষ্ট ডায়েরি গ্রন্থের বিষয় এক হইলেও তাহার কথা বৈচিত্র্যময়। "বনে-পাহাড়ে" গ্রন্থে এই বৈচিত্র্যের অভাব নাই।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

আরণ্যক

মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিত-পক্ক জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী-তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, 'আরণ্যক' সেই কল্পনা-লোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।

প্রস্তাবনা

সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া ছিলাম।

নিকটেই একটা বাদাম-গাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদামগাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউখেলানো জমিটা দেখিয়া হঠাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি। পরক্ষণেই পলাশী গেটের পথে মোটর হর্ণের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।

অনেক দিনের কথা হইলেও কালকার বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা-শহরের হৈ-চৈ কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূ-ধূ বনঝাউ আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীল গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্রমধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙীন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন অবসর-দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।

শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরণের মানুষ দেখিয়াছিলাম।

কুন্তা···মুসম্মত কুন্তার কথা মনে হয়। এখনও যেন সুংঠিয়া বইহারের বিস্তীর্ণ বন্যকুলের জঙ্গলে সে দরিদ্র মেয়েটি তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বন্যকুল সংগ্রহ করিয়া তাহার দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

নয়ত জ্যোৎস্না-ভরা গভীর শীতের রাত্রে সে আমার পাতের ভাত লইবার আশায় আজমাবাদ কাছারির প্রাঙ্গণের এক কোণে, ইঁদারাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা···নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া!···

দক্ষিণ দেশে ধরমপুর পরগণার ফসল মারা যাওয়াতে ধাতুরিয়া নাচিয়া গাহিয়া পেটের ভাত জুটাইতে আসিয়াছিল, লবটুলিয়া অঞ্চলের জনবিরল বন্য গ্রামগুলিতে চীনা ঘাসের দানা ভাজা আর আখের গুড় খাইতে পাইয়া কি খুশীর হাসি দেখিয়াছিলাম তার মুখে! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, একটু মেয়েলি ধরণের ভাবভঙ্গী, বছর তের-চৌদ্দ বয়সের সুশ্রী ছেলেটি; সংসারে বাপ নাই, মা নাই, কেহ কোথাও নাই, তাই সেই অল্প বয়সেই তাহাকে নিজের চেষ্টা নিজেকেই দেখিতে হয়···সংসারের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল আবার। মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে। আমার খড়ের বাংলোর কোণটাতে বসিয়া সে বড় বড় সুপারি জাঁতি দিয়া কাটিতেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট কুঁড়েঘরের

ধারে বসিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে তিনটি মহিষ চরাইতেছে এবং আপন মনে গাহিতেছে—

দয়া হোই জী—

মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির ঝড়ে ঝাপসা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে। কত অতিদরিদ্র বালকবালিকা, নরনারী কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। অন্ধকার প্রান্তরে খড়ের বাংলোয় বসিয়া বসিয়া বন্য শিকারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা-ঢাকা গর্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।

ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপন মনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।

কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।

তাই এই কাহিনীর অবতারণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

পনের-ষোল বছর আগেকার কথা। বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরী মিলিল না।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে—ধুমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোন কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।

মেসের চাকর জগন্নাথ এমন সময় একটুকরা কাগজ হাতে দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম ম্যানেজারের লেখা তাগাদার চিঠি। আজ মেসে পূজা-উপলক্ষে ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমার কাছে দু-মাসের টাকা বাকী, আমি যেন চাকরের হাতে অন্তত দশটি টাকা দিই। অন্যথা কাল হইতে খাওয়ার জন্য আমাকে অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কথা খুব ন্যায্য বটে, কিন্তু আমার সম্বল মোটে দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। কোন জবাব না দিয়াই মেস হইতে বাহির হইলাম। পাড়ার নানা স্থানে পূজার বাজনা বাজিতেছে, ছেলেমেয়েরা গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে; অভয় ময়রার খাবারের দোকানে অনেক রকম নতুন খাবার থালায় সাজানো—বড়রাস্তার ওপারে কলেজ হোস্টেলের ফটকে নহবৎ বসিয়াছে। বাজার হইতে দলে দলে লোক ফুলের মালা ও পূজার উপকরণ কিনিয়া ফিরিতেছে।

ভাবিলাম কোথায় যাওয়া যায়। আজ এক বছরের উপর হইল জোড়াসাঁকো স্কুলের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি—অথবা বসিয়া ঠিক নাই, চাকুরীর খোঁজে হেন মার্চেন্ট আপিস নাই, হেন স্কুল নাই, হেন খবরের কাগজের আপিস নাই, হেন বড়লোকের বাড়ী নাই—যেখানে অন্তত দশ বার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, কিন্তু সকলেরই এক কথা, চাকুরী খালি নাই।

হঠাৎ পথে সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশের সঙ্গে হিন্দু হোস্টেলে একসঙ্গে থাকিতাম। বর্তমানে সে আলীপুরের উকীল, বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না, বালিগঞ্জের ওদিকে কোথায় একটা টিউশনি আছে, সেটাই সংসারসমুদ্রে বর্তমানে তাহার পক্ষে ভেলার কাজ করিতেছে। আমার ভেলা তো দূরের কথা, একখানা মাস্তুল-ভাঙা কাঠও নাই, যতদূর হাবুডুবু খাইবার তাহা খাইতেছি—সতীশকে দেখিয়া সে কথা আপাতত ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম তাহার আর একটা কারণ, সতীশ বলিল—এই যে, কোথায় চলেছ সত্যচরণ?

চল হিন্দু হোস্টেলের ঠাকুর দেখে আসি—আমাদের পুরনো জায়গাটা। আর ওবেলা বড় জলসা হবে—এসো। ওয়ার্ড সিক্সের সেই অবিনাশকে মনে আছে, সেই যে ময়মনসিংহের কোন্ জমিদারের ছেলে, সে যে আজকাল বড় গায়ক। সে গান গাইবে, আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে—তাদের এস্টেটের দু-একটা কাজকর্ম্ম মাঝে মাঝে করি কিনা। এসো, তোমায় দেখলে সে খুশী হবে।

কলেজে পড়িবার সময়, আজ পাঁচ-ছয় বছর আগে, আমোদ পাইলে আর কিছু চাহিতাম না—এখনও সে মনের ভাব কাটে নাই দেখিলাম। হিন্দু হোস্টেলে ঠাকুর দেখিতে গিয়া সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। কারণ আমাদের দেশের অনেক পরিচিত ছেলে এখানে থাকে, তাহারা কিছুতেই আসিতে দিতে চাহিল না। বলিলাম—বিকেলে জলসা হবে, তা এখন কি! মেস থেকে খেয়ে আসব এখন।

তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

কর্ণপাত করিলে আমাকে সরস্বতী-পূজার দিনটা উপবাসে কাটাইতে হইত। ম্যানেজারের অমন কড়া চিঠির পরে আমি গিয়া মেসের লুচি পায়েসের ভোজ খাইতে পারিতাম না—যখন একটা টাকাও দিই নাই। এ বেশ হইল—পেট ভরিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া বৈকালে জলসার আসরে গিয়া বসিলাম। আবার তিন বৎসর পূর্ব্বের ছাত্র-জীবনের উল্লাস ফিরিয়া আসিল—কে মনে রাখে যে চাকুরী পাইলাম কি না-পাইলাম, মেসের ম্যানেজার মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে কি না-আছে। ঠুংরি ও কীর্ত্তনের সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া ভুলিয়া গেলাম যে দেনা মিটাইতে না পারিলে কাল সকাল হইতে বায়ুভক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। জলসা যখন ভাঙিল তখন রাত এগারটা। অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল, হিন্দু হোস্টেলে থাকিবার সময় সে আর আমি ডিবেটিং ক্লাবের চাঁই ছিলাম—একবার স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করিয়াছিলাম। বিষয় ছিল, স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত। অবিনাশ প্রস্তাবকর্ত্তা আমি প্রতিবাদী পক্ষের নায়ক। উভয় পক্ষে তুমুল তর্কের পর সভাপতি আমাদের পক্ষে মত দিলেন। সেই হইতে অবিনাশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হইয়া যায়—যদিও কলেজ হইতে বাহির হইয়া এই প্রথম আবার তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ।

অবিনাশ বলিল—চল, আমার গাড়ী রয়েছে—তোমাকে পৌঁছে দিই। কোথায় থাক?

মেসের দরজায় নামাইয়া দিয়া বলিল—শোন, কাল হ্যারিংটন স্ট্রীটে আমার বাড়ীতে চা খাবে বিকেল চারটের সময়। ভুলো না যেন। তেত্রিশের দুই। লিখে রাখ তো নোট-বইয়ে।

পরদিন খুঁজিয়া হ্যারিংটন স্ট্রীট বাহির করিলাম, বন্ধুর বাড়ীও বাহির করিলাম। বাড়ী খুব বড় নয়, তবে সামনে পিছনে বাগান। গেটে উইস্টারিয়া লতা, নেপালী দারোয়ান, ও পিতলের প্লেট। লাল সুরকীর বাঁকা রাস্তা—রাস্তার এক ধারে সবুজ ঘাসের বন, অন্য ধারে বড় বড় মুচুকুন্দ চাঁপা ও আমগাছ। গাড়ীবারান্দায় বড় একখানা মোটর গাড়ী। বড়লোকের বাড়ী নয় বলিয়া ভুল করিবার কোন দিক হইতে কোন উপায় নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই বসিবার ঘর। অবিনাশ আসিয়া আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

পুরাতন দিনের কথাবার্ত্তায় আমরা দুজনেই মশগুল হইয়া গেলাম। অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের একজন বড় জমিদার, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার বাড়ীতে তাঁহারা কেহই নাই। অবিনাশের এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে গত অগ্রহায়ণ মাসে দেশে গিয়াছিলেন—এখনও কেহই আসেন নাই।

এ-কথা ও-কথার পর অবিনাশ বলিল—এখন কি করছ সত্য ?

বলিলাম—জোড়াসাঁকো স্কুলে মাস্টারী করতুম, সম্প্রতি বসেই আছি একরকম। ভাবছি, আর মাস্টারী করব না। দেখছি অন্য কোন দিকে যদি—দু-এক জায়গায় আশাও পেয়েছি।

আশা পাওয়ার কথা সত্য নয়, কিন্তু অবিনাশ বড়লোকের ছেলে, মস্তবড় এস্টেট ওদের। তাহার কাছে চাকুরীর উমেদারী করিতেছি এটা না-দেখায়, তাই কথাটা বলিলাম।

অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—তোমার মত একজন উপযুক্ত লোকের চাকুরী পেতে দেরী হবে না অবিশ্যি। আমার একটা কথা আছে, তুমি তো আইনও পড়েছিলে—না ?

বলিলাম—পাসও করেছি, কিন্তু ওকালতি করবার মতিগতি নেই।

অবিনাশ বলিল—আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে ?

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কি! যে চাকুরীর খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরীর প্রস্তাব আপনা হইতেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ?

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মত বলিলাম—ও! আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছ তো ?

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল—ভাবাভাবি রেখে দাও। আমি বাবাকে আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারীর ঘুণ কর্ম্মচারী আমরা চাই নে—কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নূতন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজী হয়ে যাও—আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।

২

কি করিয়া চাকুরী পাইলাম তাহা বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ গল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি—অবিনাশের বাড়ীর চায়ের নিমন্ত্রণ খাইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি একদিন নিজের জিনিসপত্র লইয়া বি. এন্. ডব্লিউ. রেলওয়ের একটা ছোট স্টেশনে নামিলাম।

শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণীর মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা জমিয়াছে। রেল-লাইনের দু-ধারে মটর-ক্ষেত, শীতল সান্ধ্য-বাতাসে তাজা মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে-জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জ্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জ্জন, যেমন নির্জ্জন এই উদাস প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।

গরুর গাড়ীতে প্রায় পনের-ষোল ক্রোশ চলিলাম সারারাত্রি ধরিয়া—ছইয়ের মধ্যে কলিকাতা হইতে আনীত কম্বল র‍্যাগ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল—কে জানিত এ-সব অঞ্চলে এত ভয়ানক শীত। সকালে রৌদ্র যখন উঠিয়াছে, তখনও পথ চলিতেছি। দেখিলাম, জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ক্ষেতখামার নাই, বস্তি লোকালয়ও বড়-একটা দেখা যায় না—কেবল ছোটবড় বন, কোথাও বন, কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই।

কাছারিতে পৌঁছিলাম বেলা দশটার সময়। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-পনের বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়া তৈরী—ঘরে শুক্‌নো ঘাস ও বন-ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা।

ঘরগুলি নতুন তৈরী, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাট্‌কা-কাটা খড়, আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আগে জঙ্গলের ওদিকে কোথায় কাছারি ছিল, কিন্তু শীতকালে সেখানে জলাভাব হওয়ায় এই ঘর নতুন বাঁধা হইয়াছে, কারণ পাশেই একটা ঝরণা থাকায় এখানে জলের কষ্ট নাই।

৩

জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ, লাইব্রেরী, থিয়েটার সিনেমা, গানের আড্ডা—এ-সব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরীর কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জ্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরের রঙে রাঙাইয়া সূর্য্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার-ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। কাজকর্ম্ম করিলে অনেক করা যায় বটে, কিন্তু আমি নিতান্ত নব আগন্তুক, এখনও ভাল করিয়া এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, কাজের কোন বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি না, নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়খানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোন রকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্ব্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভাল বুঝি তাহাদের কথা। প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে

কাটিল ! কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ-জীবন আমার জন্য নয়।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারির বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোষ্ঠবাবু এখানে আছেন অন্তত সতের-আঠার বছর। বর্দ্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনের কাছে কোন্ গ্রামে বাড়ী। বলিলাম, বসুন গোষ্ঠবাবু—

গোষ্ঠবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম নিরিবিলি, এখানকার কোনও মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলা দেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ—

—বাংলা দেশের মানুষও সবাই যে খুব ভাল, এমন নয় গোষ্ঠবাবু—

—সে-আর আমার জানতে বাকী নেই, ম্যানেজার বাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথম এখানে আসি। প্রথম এসে বড় কষ্ট হত, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত—আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দু-দিনের বেশী তিন দিন থাকতে পারি নে।

গোষ্ঠবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম—বলে কি।

জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকতে পারেন না কেন ? জঙ্গলের জন্য মন হাঁপায় নাকি ?

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক তাই, ম্যানেজার বাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ু উড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর দেখবেন।

—কি দেখব ?

—জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভাল লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোকদ্দমার কাজে—কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কোন্‌কালে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি !

গোষ্ঠবাবু বলিলেন, বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভাল নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা।

কৌতূহলের সহিত বললাম, বলেন কি ! কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল ?

—বেশী না। এই বছর আট-নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড় খারাপ। তা ছাড়া, এই ভয়ানক জঙ্গলে ডাকাতি করে মেরে নিলে দেখবেই বা কে ?

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

চাকুরী করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই! এ-সব বিপজ্জনক স্থান, আগে জানিলে কখনই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

৪

কাছারির অনতিদূরে একটা ছোট পাথরের টিলা, তার উপর প্রাচীন ও সুবৃহৎ একটা বটগাছ। এই বটগাছের নাম গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছ। কেন এই নাম হইল, তখন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। একদিন নিস্তব্ধ অপরাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতে টিলার উপরে উঠিলাম।

টিলার উপরকার বটতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত দূর পর্য্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম—কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদীঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানা—প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে গিয়া বসিয়া কলেজ স্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে মনে হইল তাহারা। মন হু-হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্যে-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরীর খাতিরে! মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—একটা কথা কহিবার মানুষ পর্য্যন্ত নাই। এদেশের এই সব মূর্খ, বর্ব্বর মানুষ, এরা একটা ভাল কথা বলিলে বুঝিতে পারে না—এদেরই সাহচর্য্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে? সেই দূরবিসর্পী দিগন্তব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন ভয়ও হইল। তখন সঙ্কল্প করিলাম, এ-মাসের আর সামান্য দিনই বাকী, সামনের মাসটা কোনরূপে চোখ বুজিয়া কাটাইব, তার পর অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

পূর্ব্বে কি জানিতাম মানুষের মধ্যে থাকিতে এত ভালবাসি! মানুষকে এত ভালবাসি! তাহাদের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য হয়ত সব সময় তাহা করিয়া উঠিতে পারি না—কিন্তু ভালবাসি তাহাদের নিশ্চয়ই। নতুবা এত কষ্ট পাইব কেন তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়া?

প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে বই বিক্রি করে সেই যে বৃদ্ধ মুসলমানটি, কতদিন তাহার দোকানে দাঁড়াইয়া পুরনো বই ও মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইয়াছি—কেনা উচিত ছিল

হয়ত, কিন্তু কেনা হয় নাই—সেও যেন পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হইল—তাহাকে আজ কতদিন দেখি নাই!

কাছারিতে ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছি, সিপাহী মুনেশ্বর সিং আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম—কি মুনেশ্বর?

ইতিমধ্যে দেহাতি হিন্দী কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলাম।

মুনেশ্বর বলিল—হুজুর, আমায় একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার হুকুম যদি দেন মুহুরী বাবুকে।

—কি হবে লোহার কড়া?

মুনেশ্বরের মুখ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিনীত স্বরে বলিল—একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরীব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এ ধরণের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত গরীব লোক পৃথিবীতে আছে যে ছ আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটিলে স্বর্গ হাতে পায়? শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইল।

পরদিন আমার সই করা চিরকুটের জোরে মুনেশ্বর সিং নউগচ্ছিয়ার বাজার হইতে একখানা পাঁচ নম্বরের কড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেজেতে নামাইয়া আমায় সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

—হো গৈল, হুজুরকী কৃপা-সে—কড়াইয়া হো গৈল! তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার এই একমাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলা। বড় কষ্ট তো এদের!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

কিছুতেই কিন্তু এখানকার এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে আমি খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। বাংলা দেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি, এই অরণ্যভূমির নির্জ্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

এক-একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যাই। কাছারির কাছে তবুও লোকজনের গলা শুনিতে পাওয়া যায়, রশি দুই-তিন গেলেই কাছারি-ঘরগুলা

যেমন দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশ জঙ্গলের আড়ালে পড়ে, তখন মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী। তার পর যত দূর যাওয়া যায়, চওড়া মাঠের দু-ধারে ঘন বনের সারি বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে, শুধু বন আর ঝোপ, গজারি গাছ, বাবলা, বন্য কাঁটা-বাঁশ, বেত ঝোপ। গাছের ও ঝোপের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য্য সিঁদুর ছড়াইয়া দিয়াছে—সন্ধ্যার বাতাসে বন্যপুষ্প ও তৃণগুল্মের সুঘ্রাণ, প্রতি ঝোপ পাখীর কাকলীতে মুখর, তার মধ্যে হিমালয়ের বনটিয়াও আছে। মুক্ত দূরপ্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর ও শ্যামল বনভূমির মেলা।

এই সময় মাঝে মাঝে মনে হইত যে, এখানে প্রকৃতির যে-রূপ দেখিতেছি, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। যত দূর চোখ যায়, এ সব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ, আমার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতে আসিবে না কেউ—মুক্ত আকাশতলে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দূর দিগন্তের সীমারেখা পর্য্যন্ত মনকে ও কল্পনাকে প্রসারিত করিয়া দিই।

কাছারি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা নাবাল জায়গা আছে, সেখানে ক্ষুদ্র কয়েকটি পাহাড়ী ঝরণা ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার দু-পারে জলজ লিলির বন, কলিকাতার বাগানে যাহাকে বলে স্পাইডার-লিলি। বন্য স্পাইডার লিলি কখনও দেখি নাই, জানিতামও না যে, এমন নিভৃতি ঝরণার উপল-বিছানো তীরে ফুটন্ত লিলি ফুলের এত শোভা হয় বা বাতাসে তাহারা এত মৃদু কোমল সুবাস বিস্তার করে। কতবার গিয়া এখানটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ, সন্ধ্যা ও নির্জ্জনতা উপভোগ করিয়াছি।

মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই। প্রথম প্রথম ভাল চড়িতে পারিতাম না, ক্রমে ভালোই শিখিলাম। শিখিয়াই বুঝিলাম জীবনে এত আনন্দ আর কিছুতেই নাই। যে কখনও এমন নির্জ্জন আকাশতলে দিগন্তব্যাপী বনপ্রান্তরে ইচ্ছামত ঘোড়া ছুটাইয়া না বেড়াইয়াছে, তাহাকে বোঝানো যাইবে না সে কি আনন্দ। কাছারি হইতে দশ পনের মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে সার্ভে পার্টি কাজ করিতেছে, প্রায়ই আজকাল সকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া ঘোড়ার পিঠে জিন কষিয়া সেই যে ঘোড়ায় উঠি, কোনদিন ফিরি বৈকালে, কোনদিন বা ফিরিবার পথে জঙ্গলের মাথার উপর নক্ষত্র উঠে, বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করে ; জ্যোৎস্নারাতে বনপুষ্পের সুবাস জ্যোৎস্নার সহিত মেশে, শৃগালের রব প্রহর ঘোষণা করে, জঙ্গলের ঝিঁ ঝিঁ পোকা দল বাঁধিয়া ডাকিতে থাকে।

২

যে কাজে এখানে আসা তার জন্য অনেক চেষ্টা করা যাইতেছে। এত হাজার বিঘা জমি, হঠাৎ বন্দোবস্ত হওয়াও সোজা কথা নয় অবশ্য। আর একটা ব্যাপার এখানে আসিয়া জানিয়াছি, এই জমি আজ ত্রিশ বছর পূর্ব্বে নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল—বিশ বছর হইল বাহির হইয়াছে—কিন্তু যাহারা পিতৃপিতামহের জমি গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এই সব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছেন

না। মোটা সেলামী ও বর্দ্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করিতে চান। অথচ যে-সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন অতিদরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহারা বার বার অনুরোধ-উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না।

আমার কাছেও অনেকে আসিয়াছিল। তাহাদের অবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়, কিন্তু জমিদারের হুকুম, কোনও পুরাতন প্রজাকে জমি দেওয়া হইবে না। কারণ একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন স্বত্ব তাহারা আইনত দাবী করিতে পারে। জমিদারের লাঠির জোর বেশী, প্রজারা আজ বিশ বৎসর ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায় দেশে দেশে মজুরী করিয়া খায়, কেহ সামান্য চাষবাস করে, অনেকে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের ছেলেপিলেরা নাবালক বা অসহায়—প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।

এদিকে নূতন প্রজা সংগ্রহ করা যায় কোথা হইতে? মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, ছাপরা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী জেলা হইতে লোক যাহারা আসে, দর শুনিয়া পিছাইয়া যায়। দু-পাঁচজন কিছু কিছু লইতেছেও। এইরূপ মৃদু গতিতে অগ্রসর হইলে দশহাজার বিঘা জঙ্গলী জমি প্রজাবিলি হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর লাগিয়া যাইবে।

আমাদের এক ডিহি কাছারি আছে—সেও ঘোর জঙ্গলময় মহাল—এখান থেকে উনিশ মাইল দূরে। জায়গাটার নাম লবটুলিয়া, কিন্তু এখানেও যেমন জঙ্গল, সেখানেও তেমনি, কেবল সেখানে কাছারি রাখার উদ্দেশ্য এই যে, সেই জঙ্গলটা প্রতি বছর গোয়ালাদের গরু-মহিষ চরাইবার জন্য খাজনা করিয়া দেওয়া হয়। এ বাদে সেখানে প্রায় দু'তিনশ' বিঘা জমিতে বন্যকুলের জঙ্গল আছে, লাক্ষা-কীট পুষিবার জন্য লোকে এই কুল-বন জমা লইয়া থাকে। এই টাকাটা আদায় করিবার জন্য সেখানে দশ টাকা মাহিনার একজন পাটোয়ারী ও তাহার একটা ছোট কাছারি আছে।

কুল-বন ইজারা দিবার সময় আসিতেছে, একদিন ঘোড়া করিয়া লবটুলিয়াতে রওনা হইলাম। আমার কাছারি ও লবটুলিয়ার মাঝখানে একটা উঁচু রাঙামাটির ডাঙা প্রায় সাত-আট মাইল লম্বা, এর নাম 'ফুলকিয়া বইহার'—কত ধরণের গাছপালা ও ঝোপজঙ্গলে পরিপূর্ণ। জায়গায় জায়গায় বন এত ঘন যে, ঘোড়ার গায়ে ডালপালা ঠেকে। ফুলকিয়া বইহার যেখানে নামিয়া গিয়া সমতল ভূমির সহিত মিশিল, চানন্ বলিয়া একটি পাহাড়ী নদী সেখানে উপলখণ্ডের উপর দিয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিতেছে, বর্ষাকালে সেখানে জল খুব গভীর—শীতকালে এখন তত জল নাই।

লবটুলিয়ায় এই প্রথম আসিলাম। অতি ক্ষুদ্র এক খড়ের ঘর, তার মেজে জমির সঙ্গে সমতল, ঘরের বেড়া পর্য্যন্ত শুকনো কাশের, বনঝাউয়ের ডালের পাতা দিয়া বাঁধা। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেখানে পৌছিলাম—এত শীত যেখানে থাকি সেখানে নাই, শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম বেলা না পড়িতেই।

সিপাহীরা বনের ডালপাতা জ্বালাইয়া আগুন করিল, সেই আগুনের ধারে ক্যাম্প-চেয়ারে

বসিলাম, অন্য সবাই গোল হইয়া আগুনের চারিধারে বসিল।

কোথা হইতে সের পাঁচেক একটা রুই মাছ পাটোয়ারী আনিয়াছিল, এখন কথা উঠিল, রান্না করিবে কে? আমি সঙ্গে পাচক আনি নাই। নিজেও রান্না করিতে জানি না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাত-আটজন লবটুলিয়াতে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহাদের মধ্যে কণ্টু মিশ্র নামে এক মৈথিল ব্রাহ্মণকে পাটোয়ারী রান্নার জন্য নিযুক্ত করিল।

পাটোয়ারীকে বলিলাম—এ-সব লোকেই কি ইজারা ডাকবে?

পাটোয়ারী বলিল—না হুজুর। ওরা খাবার লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ দু-দিন ধরে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের ওই রকম অভ্যেস। আরও অনেকে বোধ হয় কাল আসবে।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। বলিলাম—সে কি! আমি তো নিমন্ত্রণ করি নি এদের?

—হুজুর, এরা বড় গরীব, ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান বিবেচনা করে। আপনি আসছেন, ভাত খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে। দেখুন না আরও কত আসে।

বাংলা দেশের লোকে বড় বেশী সভ্য হইয়া গিয়াছে ইহাদের তুলনায়, মনে হইল। কেন জানি না, এই অন্নভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভাল লাগিল! আগুনের চারিধারে বসিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে গল্প করিতেছিল, আমি শুনিতেছিলাম। প্রথমে তাহারা আমার আগুনে বসিতে চাহে নাই আমার প্রতি সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য—আমি তাহাদের ডাকিয়া আনিলাম। কণ্টু মিশ্র কাছে বসিয়াই আসান কাঠের ডালপালা জ্বালাইয়া মাছ রাঁধিতেছে—ধুনা পুড়াইবার মত সুগন্ধ বাহির হইতেছে ধোঁয়া হইতে—আগুনের কুণ্ডের বাহিরে গেলে মনে হয়, যেন আকাশ হইতে বরফ পড়িতেছে—এত শীত।

খাওয়া-দাওয়া হইতে রাত হইয়া গেল অনেক; কাছারিতে যত লোক ছিল, সকলেই খাইল। তারপর আবার আগুনের ধারে গোল হইয়া বসা গেল। শীতে মনে হইতেছে শরীরের রক্ত পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবে। ফাঁকা বলিয়াই শীত বোধ হয় এত বেশী, কিংবা বোধ হয় হিমালয় বেশী দূর নয় বলিয়া।

আগুনের ধারে আমরা সাত আটজন লোক, সামনে ছোট ছোট দুখানি খড়ের ঘর। একখানিতে থাকিব আমি, আর একখানিতে বাকী এতগুলি লোক। আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া অন্ধকার বন ও প্রান্তর, মাথার উপরে নক্ষত্র-ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আমার বড় অদ্ভুত লাগিল, যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের লোক এ-দলের মধ্যে আমার মনোযোগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লোকটির নাম গনোরী তেওয়ারী; শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, মাথায় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর

কিছু নাই, এ-দেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল, তা পর্য্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, সে সকলের দিকে কেমন কুণ্ঠিতভাবে চাহিতেছিল, কারও কথায় কোনও প্রতিবাদ করিতেছিল না, অথচ কথা যে সে কম বলিতেছিল তা নয়।

আমার প্রতি কথার উত্তরে কেবল সে বলে—হুজুর।

এদেশের লোকে যখন কোন মান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথা মানিয়া লয়, তখন কেবল মাথা সামনের দিকে অল্প ঝাঁকাইয়া সসম্ভ্রমে বলে—হুজুর।

গনোরীকে বলিলাম—তুমি থাকো কোথায়, তেওয়ারীজি?

আমি যে তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিব, এতটা সম্মান যেন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, এভাবে সে আমার দিকে চাহিল। বলিল—ভীমদাসটোলা, হুজুর।

তার পর সে তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গেল, একটানা নয়, আমার প্রশ্নের উত্তরে টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে।

গনোরী তেওয়ারীর বয়স যখন বারো বছর, তার বাপ তখন মারা যায়। এক বৃদ্ধা পিসিমা তাহাকে মানুষ করে, সে পিসিমাও বাপের মৃত্যুর বছর-পাঁচ পরে যখন মারা গেলেন, গনোরী তখন জগতে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইল। কিন্তু তাহার জগৎ পূর্ব্বে পূর্ণিয়া শহর, পশ্চিমে ভাগলপুর জেলার সীমানা, দক্ষিণে এই নির্জ্জন অরণ্যময় ফুলকিয়া বইহার, উত্তরে কুশী নদী—ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহারই মধ্যে গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের দুয়ারে ফিরিয়া কখনও ঠাকুরপূজা করিয়া, কখনও গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করিয়া কায়ক্লেশে নিজের আহারের জন্য কলাইয়ের ছাতু ও চীনা ঘাসের দানার রুটির সংস্থান করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি মাস দুই চাকুরী নাই, পর্ব্বতা গ্রামের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে, ফুলকিয়া বইহারের দশ হাজার বিঘা অরণ্যময় অঞ্চলে লোকের বস্তি নাই—এখানে যে মহিষ-পালকের দল মহিষ চরাইতে আনে জঙ্গলে, তাহাদের বাথানে বাথানে ঘুরিয়া খাদ্যভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল—আজ আমার আসিবার খবর পাইয়া অনেকের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।

আসিয়াছে কেন, সে কথা আরও চমৎকার।

—এখানে এত লোক এসেছে কেন তেওয়ারীজি?

—হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম।

—ভাত এখানকার লোকে কি খেতে পায় না?

—কোথায় পাবে হুজুর। নউগচ্ছিয়ায় মাড়োয়ারীরা রোজ ভাত খায়, আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক, ভাত খাইয়েছিল। তার পর আর খাই নি।

যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারও গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়। শেষ-রাত্রে শীত যখন বেশী পড়ে, আর ঘুম হয় না শীতের চোটে—আগুনের খুব কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে ভোর পর্য্যন্ত।

কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল! ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে। দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ভীমদাস-টোলা ও পর্বতা হইতে ন' মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে—তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।

অনেক রাত্রে কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল—শীতে মুখ বাহির করাও যেন কষ্টকর, এমন যে শীত এখানে তা না-জানার দরুন উপযুক্ত গরম কাপড় ও লেপ-তোশক আনি নাই। কলিকাতায় যে-কম্বল গায়ে দিতাম সেখানাই আনিয়াছিলাম—শেষরাত্রে শীতে সে যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যায় প্রতিদিন। যে পাশে শুইয়া থাকি, শরীরের গরমে সে-দিকটা তবুও থাকে এক রকম, অন্য কাতে পাশ ফিরিতে গিয়া দেখি বিছানা কন্‌কন্ করিতেছে সে-পাশে—মনে হয় যেন ঠাণ্ডা পুকুরের জলে পৌষ মাসের রাত্রে ডুব দিলাম। পাশেই জঙ্গলের মধ্যে কিসের যেন সম্মিলিত পদশব্দ—কাহারা যেন দৌড়িতেছে—গাছপালা, শুকনো বন-ঝাউয়ের গাছ মট্ মট্ শব্দে ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতেছে।

কি ব্যাপারখানা, কিছু বুঝিতে না পারিয়া সিপাহী বিষ্ণুরাম পাঁড়ে ও স্কুলমাস্টার গনোরী তেওয়ারীকে ডাক দিলাম। তাহারা নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া বসিল—কাছারির মেঝেতে যে-আগুন জ্বালা হইয়াছিল, তাহারই শেষ দীপ্তিটুকুতে ওদের মুখে আলস্য সম্ভ্রম ও নিদ্রালুতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। গনোরী তেওয়ারী কান পাতিয়া একটু শুনিয়াই বলিল—কিছু না হুজুর, নীলগাইয়ের জেরা দৌড়চ্ছে জঙ্গলে—

কথা শেষ করিয়াই সে নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুইতে যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম—নীলগাইয়ের দল হঠাৎ এত রাত্রে অমন দৌড়ুবার কারণ কি?

বিষ্ণুরাম পাঁড়ে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—হয়তো কোনও জানোয়ারে তাড়া করে থাকবে হুজুর—এ ছাড়া আর কি।

—কি জানোয়ার?

—কি আর জানোয়ার হুজুর, জঙ্গলের জানোয়ার। শের হতে পারে—নয় তো ভালু—

যে-ঘরে শুইয়া আছি, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার কাশডাঁটায় বাঁধা আগড়ের দিকে নজর পড়িল। সে আগড়ও এত হালকা যে, বাহির হইতে একটি কুকুরে ঠেলা মারিলেও তাহা ঘরের মধ্যে উল্টাইয়া পড়ে—এমন অবস্থায় ঘরের সামনেই জঙ্গলে নিস্তব্ধ নিশীথরাত্রের বাঘ বা ভালুকে বন্য নীলগাইয়ের দল তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে—এ সংবাদটিতে যে বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম না তাহা বলাই বাহুল্য।

একটু পরেই ভোর হইয়া গেল।

৩

দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জ্জনতা ও অপরাহ্ণের সিঁদুর-ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না—আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না!

এ মনের ভাব একদিনে হয় নাই। কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল!—কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্ত্তিতে।

৪

একদিনের-কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। মনে আছে সেদিন দোল-পূর্ণিমা। কাছারীর সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচগানের বিরাম নাই দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত হেড আপিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছি। একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে-জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করিল তাহা পূর্ণিমা-নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না।

হয়তো যতদিন আসিয়াছি, শীতকাল বলিয়া গভীর রাত্রে কখনও বাহিরে আসি নাই কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ফুলকিয়া বইহারের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ প্রমোদের পরে ক্লান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথরাত্রি। সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাট বনঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চকচকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্দ্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্তভাব—মন হু হু করিয়া ওঠে, চারি-

ধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। এই সব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়, আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

তাহার পর ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নারাত্রি কতবার দেখিয়াছি—ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন দুধ্‌লি ফুল ফুটিয়া সমস্ত প্রান্তরে যেন রঙীন ফুলের গালিচা বিছাইয়া দেয়, তখন কত জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে বাতাসে দুধ্‌লি ফুলের মিষ্ট সুবাস প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিয়াছি—প্রত্যেক বারেই মনে হইয়াছে জ্যোৎস্না যে এত অপরূপ হইতে পারে, মনে এমন ভয়মিশ্রিত উদাস ভাব আনিতে পারে, বাংলা দেশে থাকিতে তাহা তো কোনদিন ভাবিও নাই! ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্য্যালোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না—করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জ্জনতা, অমন দিগ্‌দিগন্ত-বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্না-রাত্রি দেখা উচিত; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।

৫

একদিন ডিহি আজমাবাদের সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যার মুখে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। বনের ভূমি সর্ব্বত্র সমতল নয়, কোথাও উঁচু জঙ্গলাবৃত বালিয়াড়ি টিলা, তার পরই দুটি টিলার মধ্যবর্ত্তী ছোটখাট উপত্যকা। জঙ্গলের কিন্তু কোথাও কোন বিরাম নাই—টিলার মাথায় উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যদি কোন দিকে কাছারির মহাবীরের ধ্বজার আলো দেখা যায়—কোন দিকে আলোর চিহ্নও নাই—শুধু উঁচুনীচু টিলা ও ঝাউবন আর কাশবন—মাঝে মাঝে শাল ও আসান গাছের বনও আছে। দুই ঘণ্টা ঘুরিয়াও যখন জঙ্গলের কূলকিনারা পাইলাম না, তখন হঠাৎ মনে পড়িল নক্ষত্র দেখিয়া দিক ঠিক করি না কেন। গ্রীষ্মকাল, কালপুরুষ দেখি প্রায় মাথার উপর রহিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম না কোনদিক হইতে আসিয়া কালপুরুষ মাথার উপর উঠিয়াছে—সপ্তর্ষিমণ্ডল খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং নক্ষত্রের সাহায্যে দিক্‌-নিরূপণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোড়াকে ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিলাম। মাইল দুই গিয়া জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখা গেল। আলো লক্ষ্য করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জঙ্গলের মধ্যে কুড়ি বর্গহাত আন্দাজ পরিষ্কার স্থানে একটা খুব নীচু ঘাসের খুপরি। কুঁড়ের সামনে গ্রীষ্মের দিনেও আগুন জ্বালানো। আগুনের নিকট হইতে একটু দূরে একটা লোক বসিয়া কি করিতেছে।

আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া লোকটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কে? তার পরেই আমায় চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিল ও আমাকে খুব খাতির করিয়া ঘোড়া হইতে নামাইল।

পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, প্রায় ছ-ঘণ্টা আছি ঘোড়ার উপর, কারণ সার্ভে ক্যাম্পেও আমিনের পিছু পিছু ঘোড়ায় টো টো করিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়াছি। লোকটার প্রদত্ত একটা ঘাসের চেটাইয়ে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম কি? লোকটা বলিল—গনু মাহাতো, জাতি গাঙ্গোতা। এ অঞ্চলে গাঙ্গোতা জাতির উপজীবিকা চাষবাস ও পশুপালন, তাহা আমি এতদিনে জানিয়াছিলাম—কিন্তু এ লোকটা এই জনহীন গভীর বনের মধ্যে একা কি করে?

বলিলাম—তুমি এখানে কি কর? তোমার বাড়ী কোথায়?

—হুজুর, মহিষ চরাই। আমার ঘর এখান থেকে দশ ক্রোশ উত্তরে ধরমপুর, লছমনিয়া-টোলা।

—নিজের মহিষ? কতগুলো আছে?

লোকটা গর্ব্বের সুরে বলিল—পাঁচটা মহিষ আছে হুজুর।

পাঁচটা মহিষ। দস্তুরমত অবাক হইলাম। দশ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে পাঁচটা মাত্র মহিষ সম্বল করিয়া লোকটি এই বিজন বনের মধ্যে মহিষচরির খাজনা দিয়া একা খুপরি বাঁধিয়া মহিষ চরায়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এই ছোট্ট খুপরিটাতে কি করিয়া সময় কাটায় —কলিকাতা হইতে নূতন আসিযাছি, শহরের থিয়েটার-বায়োস্কোপে লালিত যুবক আমি—বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু এদেশের অভিজ্ঞতা আরও বেশী হইলে বুঝিয়াছিলাম কেন গনু মাহাতো ওভাবে থাকে। তাহার অন্য কোন কারণ নাই ইহা ছাড়া যে, গনু মাহাতোর জীবনের ধারণাই এই রূপ। যখন তাহার পাঁচটি মহিষ তখন তাহাদের চরাইতে হইবে, এবং যখন চরাইতে হইবে, তখন জঙ্গলে আছে, কুঁড়ে বাঁধিয়া একা থাকিতেই হইবে। এ অত্যন্ত সাধারণ কথা, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে!

গনু কাঁচা শালপাতায় একটা লম্বা পিকা বা চুরুট তৈরী করিয়া আমার হাতে সসম্ভ্রমে দিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিল। আগুনের আলোতে উহার মুখ দেখিলাম—বেশ চওড়া কপাল, উঁচু নাক, রং কালো—মুখশ্রী সরল, শান্ত চোখের দৃষ্টি। বয়স ষাটের উপর হইবে, মাথার চুল একটিও কালো নাই। কিন্তু শরীর এমন সুগঠিত যে, এই বয়সেও প্রত্যেকটি মাংসপেশী আলাদা করিয়া গুনিয়া লওয়া যায়।

গনু আগুনে আরও বেশী কাঠ ফেলিয়া দিয়া নিজেও একটি শালপাতার পিকা ধরাইল। আগুনের আভায় খুপরির মধ্যে এক-আধখানা পিতলের বাসন চক্ চক্ করিতেছে। আগুনের কুণ্ডের মণ্ডলীর বাহিরে ঘোরতর অন্ধকার ও ঘন বন। বলিলাম—গনু, একা এখানে থাক, জন্তু-জানোয়ারের ভয় করে না? গনু বলিল—ভয় ডর করলে আমাদের কি চলে হুজুর?

আমাদের যখন এই ব্যবসা! সেদিন তো রাত্রে আমার খুপরির পেছনে বাঘ এসেছিল। মহিষের দুটো বাচ্চা আছে, ওদের ওপর তাক্। শব্দ শুনে রাত্রে উঠে টিন বাজাই; মশাল জ্বালি, চীৎকার করি! রাত্রে আর ঘুম হল না হুজুর; শীতকালে তো সারারাত এই বনে ফেউ ডাকে।

—খাও কি এখানে? দোকান-টোকান তো নেই, জিনিসপত্র পাও কোথায়? চাল ডাল—

—হুজুর, দোকানে জিনিস কেনবার মত পয়সা কি আমাদের আছে, না আমরা বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে পাই? এই জঙ্গলের পেছনে আমার দু-বিঘে খেড়ী ক্ষেত আছে। খেড়ীর দানা সিদ্ধ, আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ, আর একটু নুন, এই খাই। ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, নুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে—লতানে গাছ, ছোট ছোট কাঁকুড়ের মত ফল হয়; সে সময় এক মাস এ-অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। দলে দলে ছেলেমেয়ে আসবে জঙ্গলের গুড়মী তুলতে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—রোজ রোজ খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর বাথুয়া শাক ভাল লাগে?

—কি করব হুজুর, আমরা গরীব লোক, বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে পাব কোথায়? ভাত এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল রাসবিহারী সিং আর নন্দলাল পাঁড়ে খায় দুবেলা। সারাদিন মহিষের পেছনে ভূতের মতন খাটি হুজুর, সন্ধ্যের সময় ফিরি যখন, তখন এত ক্ষিদে পায় যে, যা পাই খেতে তাই ভাল লাগে।

গনুকে বলিলাম—কলকাতা শহর দেখেছ গনু?

—না হুজুর। কানে শুনেছি। ভাগলপুর শহরে একবার গিয়েছি, বড় ভারী শহর। ওখানে হাওয়ার গাড়ী দেখেছি, বড় তাজ্জব চিজ হুজুর। ঘোড়া নেই, কিছু নেই, আপনা-আপনি রাস্তা দিয়া চলছে।

এই বয়সে উহার স্বাস্থ্য দেখিয়া অবাক হইলাম। সাহসও যে আছে ইহা মনে মনে স্বীকার করিতে হইল।

গনুর জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন মহিষ কয়টি। তাদের দুধ অবশ্য এ-জঙ্গলে কে কিনিবে, দুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘি করে ও দু-তিন মাসের ঘি একত্রে জমাইয়া ন-মাইল দূরবর্ত্তী ধরমপুরের বাজারে মাড়োয়ারীদের নিকট বিক্রয় করিয়া আসে। আর থাকিবার মধ্যে ওই দু-বিঘা খেড়ী অর্থাৎ শ্যামাঘাসের ক্ষেত, যার দানা সিদ্ধ এ-অঞ্চলের প্রায় সকল গরীব লোকেরই একটা প্রধান খাদ্য। গনু সে-রাত্রে আমাকে কাছারিতে পৌঁছাইয়া দিল, কিন্তু গনুকে আমার এত ভাল লাগিল যে, কত বার শান্ত বৈকালে তাহার খুপরির সামনে আগুন পোহাইতে পোহাইতে গল্প করিয়া কাটাইয়াছি। ওদেশের নানারূপ তথ্য গনুর কাছে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, অত কেউ দিতে পারে নাই।

গনুর মুখে কত অদ্ভুত কথা শুনিতাম। উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা, ইত্যাদি। ওই নির্জ্জন জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গনুর সে-সব গল্প অতি উপাদেয় ও অতি রহস্যময় লাগিত—আমি জানি কলকাতা শহরে বসিয়া

সে-সব গল্প শুনিলে তাহা আজগুবি ও মিথ্যা মনে হইতে বাধ্য। যেখানে-সেখানে যে-কোন গল্প শোনা চলে না, গল্প শুনিবার পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর উহার মাধুর্য্য যে কতখানি নির্ভর করে, তাহা গল্পপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। গনুর সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কথা।

কিন্তু, যেহেতু এই গল্পের একটি অদ্ভুত উপসংহার আছে—সেজন্য সে-কথা এখন না বলিয়া যথাস্থানে বলিব। এখানে বলিয়া রাখি, গনু আমাকে যে-সব গল্প বলিত—তাহা রূপকথা নহে, তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। গনু জীবনকে দেখিয়াছে তবে অন্যভাবে। অরণ্য-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আজীবন কাটাইয়া সে অরণ্য-প্রকৃতির সম্বন্ধে একজন রীতিমত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার কথা হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মিথ্যা বানাইয়া বলিবার মত কল্পনাশক্তিও গনুর আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

গ্রীষ্মকাল পড়িতে গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের মাথায় পীরপৈঁতি পাহাড়ের দিক হইতে একদল বক উড়িয়া আসিয়া বসিল, দূর হইতে মনে হয় যেন বটগাছের মাথা সাদা থোকা থোকা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

একদিন অর্দ্ধশুষ্ক কাশের বনের ধারে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া কাজ করিতেছি, মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটু পরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার সামনে আসিয়া সেলাম করিল ও আমার নির্দ্দেশ মত একটা টুলের উপর বসিল। বসিয়াই সে একটি পশমের থলে বাহির করিল। তাহার পর থলেটির ভিতর হইতে খুব ছোট একখানি জাঁতি ও দুইটি সুপারি বাহির করিয়া সুপারি কাটিতে আরম্ভ করিল। পরে কাটা সুপারি হাতে রাখিয়া দুই হাত একত্র করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল—সুপারি লিজিয়ে হুজুর।

সুপারি ও-ভাবে খাওয়া অভ্যাস না-থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে লইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা হতে আসা হচ্ছে, কি কাজ?

তাহার উত্তরে লোকটি বলিল, তাহার নাম নন্দলাল ওঝা, মৈথিল ব্রাহ্মণ। জঙ্গলের উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে কাছারি হইতে প্রায় এগার মাইল দূরে সুংঠিয়া-দিয়ারাতে তাহার বাড়ী। বাড়ীতে চাষবাস আছে, কিছু সুদের কারবারও আছে—সে আসিয়াছে তার বাড়ীতে আগামী পূর্ণিমার দিন আমায় নিমন্ত্রণ করিতে—আমি কি তাহার বাড়ীতে দয়া করিয়া পদধূলি দিতে রাজী আছি? এ সৌভাগ্য কি তাহার হইবে?

এগার মাইল দূরে এই রৌদ্রে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার লোভ আমার ছিল না—কিন্তু নন্দলাল ওঝা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করাতে অগত্যা রাজী হইলাম—তা ছাড়া এদেশের গৃহস্থ-সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ণিমার দিন দুপুরের পরে দীর্ঘ কাশের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া কাহাদের একটি হাতী আসিতেছে দেখা গেল। হাতী কাছারিতে আসিলে মাহুতের মুখে শুনিলাম হাতীটি নন্দলাল ওঝার নিজের—আমাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। হাতী পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না—কারণ আমার নিজের ঘোড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পৌঁছিতে পারিতাম।

যাহাই হউক, হাতীতে চড়িয়াই নন্দলালের বাড়ীতে রওনা হইলাম। সবুজ বনশীর্ষ আমার পায়ের তলায়, আকাশ যেন আমার মাথায় ঠেকিয়াছে—দূর, দূর-দিগন্তের নীল শৈলমালার রেখা বনভূমিতে ঘিরিয়া যেন মায়ালোক রচনা করিয়াছে—আমি সে-মায়ালোকের অধিবাসী—বহু দূর স্বর্গের দেবতা। কত মেঘের তলায় তলায় পৃথিবীর কত শ্যামল বনভূমির উপরকার নীল বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া যেন আমার অদৃশ্য যাতায়াত।

পথে চাম্‌টার বিল পড়িল, শীতের শেষেও সিল্লী আর লাল হাঁসের ঝাঁকে ভর্ত্তি। আর একটু গরম পড়িলেই উড়িয়া পলাইবে। মাঝে মাঝে নিতান্ত দরিদ্র পল্লী। ফণীমনসা-ঘেরা তামাকের ক্ষেত ও খোলায় ছাওয়া দীনকুটীর।

সুংঠিয়া গ্রামে হাতী ঢুকিলে দেখা গেল পথের দু-ধারে সারবন্দী লোক দাঁড়াইয়া আছে আমায় অভ্যর্থনা করিবার জন্য। গ্রামে ঢুকিয়া অল্প দূর পরেই নন্দলালের বাড়ী।

খোলায় ছাওয়া মাটির ঘর আট-দশখানা—সবই পৃথক্ পৃথক্, প্রকাণ্ড উঠানের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো। আমি বাড়ীতে ঢুকিতেই দুই বার হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল। চমকাইয়া গিয়াছি—এমন সময়ে সহাস্যমুখে নন্দলাল ওঝা আসিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া একটা বড় ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসাইল। চেয়ারখানি এদেশের শিশুকাঠের তৈয়ারী এবং এদেশের গ্রাম্য মিস্ত্রীর হাতেই গড়া। তাহার পর দশ-এগার বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল—থালায় গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মত ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর ; ইহা লইয়া কি করিতে হয় আমার জানা নাই—আমি আনাড়ির মত হাসিলাম ও বাটি হইতে আঙুলের আগায় একটু আতর তুলিয়া লইলাম মাত্র। মেয়েটিকে দু'একটি ভদ্রতাসূচক মিষ্টকথাও বলিলাম! মেয়েটি থালা আমার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল।

তার পর খাওয়ানোর ব্যবস্থা। নন্দলাল যে ঘটা করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা—সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতীর কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবার জিনিসের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনও দেখি নাই। আমায় দেখিবার জন্য উঠানে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে ও

আমার দিকে এমন ভাবে চাহিতেছে যে, আমি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব। শুনিলাম, ইহারা সকলেই নন্দলালের প্রজা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে উঠিয়া আসিবার সময় নন্দলাল একটি ছোট থলি আমার হাতে দিয়া বলিল—হুজুরের নজর। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। থলিতে অনেক টাকা, পঞ্চাশের কম নয়। এত টাকা কেহ কাহাকেও নজর দেয় না, তাছাড়া নন্দলাল আমার প্রজাও নয়। নজর প্রত্যাখ্যান করাও গৃহস্থের পক্ষে নাকি অপমানজনক—সুতরাং আমি থলি খুলিয়া একটা টাকা লইয়া থলিটা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—তোমার ছেলেপুলেদের পেঁড়া খাইতে দিও।

নন্দলাল কিছুতেই ছাড়িবে না—আমি সে-কথায় কান না-দিয়াই বাহিরে আসিয়া হাতীর পিঠে চড়িলাম।

পরদিনই নন্দলাল ওঝা আমার কাছারিতে গেল, সঙ্গে তাহার বড় ছেলে। আমি তাহাদিগকে সমাদর করিলাম—কিন্তু খাইবার প্রস্তাবে তাহারা রাজী হইল না। শুনিলাম মৈথিল ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের হস্তের প্রস্তুত কোন খাবারই খাইবে না। অনেক বাজে কথার পরে নন্দলাল একান্তে আমার নিকট কথা পাড়িল, তাহার বড় ছেলে ফুলকিয়া বইহারের তহশীলদারীর জন্য উমেদার—তাহাকে আমায় বহাল করিতে হইবে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কিন্তু ফুলকিয়ার তহশীলদার তো আছে—সে পোস্ট তো খালি নেই। তাহার উত্তরে নন্দলাল আমাকে চোখ ঠারিয়া ইশারা করিয়া বলিল, হুজুর, মালিক তো আপনি। আপনি মনে করলে কি না হয়?

আমি আরও অবাক্ হইয়া গেলাম। সে কি রকম কথা! ফুলকিয়ার তহশীলদার ভালই কাজ করিতেছে—তাহাকে ছাড়াইয়া দিব কোন্ অপরাধে?

নন্দলাল বলিল—কত রুপেয়া হুজুরকে পান খেতে দিতে হবে বলুন, আমি আজ সাঁজেই হুজুরকে পৌঁছে দেব। কিন্তু আমার ছেলেকে তহশীলদারী দিতে হবেই হুজুরের। বলুন কত, হুজুর। পাঁচ-শ'? এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম, নন্দলাল যে আমাকে কাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। এদেশের লোক যে এমন ধড়িবাজ, তাহা জানিলে কখনো ওখানে যাই? আচ্ছা বিপদে পড়িয়াছি বটে!

নন্দলালকে স্পষ্ট কথা বলিয়াই বিদায় করিলাম। বুঝিলাম নন্দলাল আশা ছাড়িল না। আর একদিন দেখি, ঘন বনের ধারে নন্দলাল আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

কি কুক্ষণেই উহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম—দুখানা পুরী খাওয়াইয়া সে যে আমার জীবন এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে—তাহা আগে জানিলে কি উহার ছায়া মাড়াই?

নন্দলাল আমাকে দেখিয়া মিষ্টি মোলায়েম হাসিয়া বলিল—নোমোস্কার হুজুর।

—হুঁ। তারপর, এখানে কি মনে করে?

—হুজুর সবই জানেন। আমি আপনাকে বারো-শ' টাকা নগদ দেব। আমার ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিন।

—তুমি পাগল নন্দলাল ? আমি বহাল করবার মালিক নই। যাদের জমিদারী তাদের কাছে দরখাস্ত করতে পারো। তাছাড়া বর্ত্তমানে যে রয়েছে—তাকে ছাড়ব কোন্ অপরাধে ?

বলিয়াই বেশী কথা না বাড়াইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ক্রমে আমার কড়া ব্যবহারে নন্দলালকে আমি আমার ও স্টেটের মহাশত্রু করিয়া তুলিলাম। তখনও বুঝি নাই, নন্দলাল কিরূপ ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ। ইহার ফল আমাকে ভাল করিয়াই ভুগিতে হইয়াছিল।

২

উনিশ মাইল দূরবর্ত্তী ডাকঘর হইতে ডাক আনা এখানকার এক অতি আবশ্যক ঘটনা। অতদূরে প্রতিদিন লোক পাঠানো চলে না বলিয়া সপ্তাহে দুবার মাত্র ডাকঘরে লোক যাইত। মধ্য-এশিয়ার জনহীন, দুস্তর ও ভীষণ টাক্‌লামাকান মরুভূমির তাঁবুতে বসিয়া বিখ্যাত পর্য্যটক সোয়েন হেডিনও বোধ হয় এমনি আগ্রহে ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন। আজ আট-নয় মাস এখানে আসিবার ফলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই জনহীন বন-প্রান্তরে সূর্য্যাস্ত, নক্ষত্ররাজি, চাঁদের উদয়, জ্যোৎস্না ও বনের মধ্যে নীলগাইয়ের দৌড় দেখিতে দেখিতে, যে-বহির্জ্জগতের সঙ্গে সকল যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি—ডাকের চিঠি কয়েকখানির মধ্য দিয়া আবার তাহার সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হইত।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জওয়াহিরলাল সিং ডাক আনিতে গিয়াছে—আজ দুপুরে সে আসিবে। আমি ও বাঙালী মুহুরী বাবুটি ঘন ঘন জঙ্গলের দিকে চাহিতেছি। কাছারি হইতে মাইল দেড় দূরে একটা উঁচু ঢিবির উপর দিয়া পথ। ওখানে আসিলে জওয়াহিরলাল সিংকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

বেলা দুপুর হইয়া গেল। জওয়াহিরলালের দেখা নেই। আমি ঘন ঘন ঘর-বাহির করিতেছি। এখানের আপিসের কাজের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিভিন্ন আমিনের রিপোর্ট দেখা, দৈনিক ক্যাশবই সই করা, সদরের চিঠি-পত্রের উত্তর লেখা, পাটোয়ারী ও তহশীলদারের আদায়ের হিসাব-পরীক্ষা, নানাবিধ দরখাস্তের ডিগ্রী-ডিস্‌মিস্ করা, পূর্ণিয়া মুঙ্গের ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে নানা আদালতে নানাপ্রকার মামলা ঝুলিতেছে—ঐ সকল স্থানের উকীল ও মামলা-তদ্বিরকারকদের রিপোর্ট পাঠ ও তার উত্তর দেওয়া—আরও নানা প্রকার বড় ও খুচরা কাজ প্রতিদিন নিয়ম-মত না করিলে দু-তিনদিনে এত জমিয়া যায় যে, তখন কাজ শেষ করিতে প্রাণান্ত হইয়া উঠে। ডাক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একরাশি কাজ আসিয়া পড়ে। শহরের নানা ধরণের চিঠি, নানা ধরণের আদেশ, অমুক জায়গায় যাও, অমুকের সঙ্গে অমুক মহালের বন্দোবস্ত কর, ইত্যাদি।

বেলা তিনটার সময় জওয়াহিরলালের সাদা পাগড়ী রৌদ্রে চক্‌চক্‌ করিতেছে দেখা গেল। বাঙালী মুহুরীবাবু হাঁকিলেন—ম্যানেজারবাবু, আসুন, ডাকপেয়াদা আসছে—ঐ যে—

আপিসের বাহিরে আসিলাম। ইতিমধ্যে জওয়াহিরলাল আবার টিবি হইতে নামিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমি অপেরাগ্লাস আনাইয়া দেখিলাম, দূরে জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ও বন-ঝাউয়ের মধ্যে সে আসিতেছে বটে। আর আপিসের কাজে মন বসিল না। সে কি আকুল প্রতীক্ষা! যে জিনিস যত দুষ্প্রাপ্য মানুষের মনের কাছে তাহার মূল্য তত বেশী। এ কথা খুবই সত্য যে, এই মূল্য মানুষের মন-গড়া একটি কৃত্রিম মূল্য, প্রার্থিত জিনিসের সত্যকার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু জগতের অধিকাংশ জিনিসের উপরই একটা কৃত্রিম মূল্য আরোপ করিয়াই তো আমরা তাকে বড় বা ছোট করি।

জওয়াহিরলালকে কাছারির সামনে একটা অপরিসর বালুময় নাবাল জমির ও-পারে দেখা গেল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। মুহুরীবাবু আগাইয়া গেলেন। জওয়াহিরলাল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট হইতে চিঠির তাড়া বাহির করিয়া মুহুরী বাবুর হাতে দিল।

আমারও খান-দুই পত্র আছে—অতি পরিচিত হাতের লেখা। চিঠি পড়িতে পড়িতে চারিপাশের জঙ্গলের দিকে চাহিয়া নিজেই অবাক্ হইয়া গেলাম। কোথায় আছি, কখনও ভাবি নাই আমি এখানে কোনদিন থাকিব, কলিকাতার আড্ডা ছাড়িয়া এমন জায়গায় দিনের পর দিন কাটাইব। একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের গ্রাহক হইয়াছি, আজ সেখানা আসিয়াছে। মোড়কের উপরে লেখা "উড়ো জাহাজের ডাকে"। জনাকীর্ণ কলিকাতা শহরের বুকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুখ কি বুঝা যাইবে? এখানে—এই নির্জ্জন বন-প্রদেশ—সকল বিষয়েই ভাবিবার ও অবাক্ হইবার অবকাশ আছে—এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে-অনুভূতি আনয়ন করে।

যদি সত্য কথা বলিতে হয়, জীবনে ভাবিয়া দেখিবার শিক্ষা এইখানে আসিয়াই পাইয়াছি। কত কথা মনে জাগে, কত পুরনো কথা মনে হয়—নিজের মনকে এমন করিয়া কখনও উপভোগ করি নাই। এখানে সহস্র প্রকার অসুবিধার মধ্যেও সেই আনন্দ আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিতেছে দিন দিন।

অথচ সত্যই আমি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কোনও জনহীন দ্বীপে একা পরিত্যক্ত হই নাই। বোধ হয় বত্রিশ মাইলের মধ্যে রেল স্টেশন। সেখানে ট্রেনে চড়িয়া এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণিয়া যাইতে পারি—তিন ঘণ্টার মধ্যে মুঙ্গের যাইতে পারি। কিন্তু প্রথম তো রেল-স্টেশনে যাইতেই বেজায় কষ্ট—সে-কষ্ট স্বীকার করিতে পারি, যদি পূর্ণিয়া বা মুঙ্গের শহরে গিয়া কিছু লাভ থাকে। এমনি দেখিতেছি কোনও লাভই নাই, না আমাকে সেখানে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি। কি হইবে গিয়া?

কলিকাতা হইতে আসিয়া বই আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প ও আলোচনার অভাব এত

বেশী অনুভব করি যে কতবার ভাবিয়াছি এ জীবন আমার পক্ষে অসহ্য। কলিকাতাতেই আমার সব, পূর্ণিয়া বা মুঙ্গেরে কে আছে যে সেখানে যাইব? কিন্তু সদর-আপিসের বিনা অনুমতিতে কলিকাতায় যাইতে পারি না—তাছাড়া অর্থব্যয়ও এত বেশী যে দু-পাঁচ দিনের জন্য যাওয়া পোষায় না।

৩

কয়েক মাস সুখে-দুঃখে কাটিবার পর চৈত্র মাসের শেষ হইতে এমন একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হইল, যাহা আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে কখনও ছিল না। পৌষ মাসে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়িয়াছিল, তার পর হইতে ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। মাঘ মাসে বৃষ্টি নাই, ফাল্গুনে না, চৈত্রে না, বৈশাখে না। সঙ্গে সঙ্গে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, তেমনি নিদারুণ জলকষ্ট।

সাদা কথায় গ্রীষ্ম বা জলকষ্ট বলিলে এ বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের স্বরূপ কিছুই বোঝানো যাইবে না। উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর—পূর্ব্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্য্যন্ত সারা জঙ্গল-মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল—সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না—যদি বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, ছোট এক বাল্‌তি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে। চারিধারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে একমাত্র কুশী নদী ভরসা—সে আমাদের মহালের পূর্ব্বতম প্রান্ত হইতে সাত আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের ওপারে। আমাদের জমিদারী ও মোহনপুরা অরণ্যের মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ী নদী নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে বহিয়া আসিতেছে—কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু শুষ্ক বালুময় খাতে তাহার উপলঢাকা চরণচিহ্ন বিদ্যমান। বালি খুঁড়িলে যে জলটুকু পাওয়া যায়, তাহারই লোভে কত দূরের গ্রাম হইতে মেয়েরা কলসী লইয়া আসে ও সারা দুপুর বালি-কাদা ছানিয়া আধ-কলসীটাক ঘোলা জল লইয়া বাড়ী ফিরে।

কিন্তু পাহাড়ী নদী—স্থানীয় নাম মিছি নদী—আমাদের কোনও কাজে আসে না—কারণ আমাদের মহাল হইতে বহু দূরে। কাছারিতেও কোনো বড় ইঁদারা নাই—ছোট যে বালির পাতকুয়াটি আছে, তাহা হইতে পানীয় জলের সংস্থান হওয়াই বিষম সমস্যার কথা দাঁড়াইল। তিন বালতি জল সংগ্রহ করিতে দুপুর ঘুরিয়া যায়।

দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্দ্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে—চারি ধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কার মত তপ্ত বাতাস সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সাইয়া বহিতেছে—সূর্য্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই। এক-এক দিন পশ্চিম দিক হইতে বালির ঝড় বয়—এ সব দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাস পশ্চিমে বাতাসের সময়—কাছারি হইতে এক-

শ' গজ দূরের জিনিস ঘন বালি ও ধূলিরাশির আড়ালে ঢাকিয়া যায়।

অর্দ্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায়—কুঁয়ামে পানি নেই ছে, হুজুর। কোন-কোন দিন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ছানিয়া ছানিয়া বালির ভিতর হইতে আধ বাল্তি তরল কর্দ্দম স্নানের জন্য আমার সামনে আনিয়া ধরে। সেই ভয়ানক গ্রীষ্মে তাহাই তখন অমূল্য।

একদিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে একটা হরীতকী গাছের তলায় স্বল্প ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চারিধারে চাহিয়া মনে হইল দুপুরের এমন চেহারা কখনও দেখি তো নাই-ই, এ জায়গা হইতে চালিয়া গেলে আর কোথাও দেখিবও না। আজন্ম বাংলা দেশের দুপুর দেখিয়াছি—জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রভরা দুপুর দেখিয়াছি কিন্তু এ-রুদ্রমূর্ত্তি তাহার নাই। এ ভীম-ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা বিরাট অগ্নি-কুণ্ড—ক্যাল্সিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে—জানা অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্নেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে—তারই ধূ-ধূ আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ঈথারের স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া প্রতি তৃণপত্রের শিরা উপশিরায় সব রসটুকু শুকাইয়া ঝামা করিয়া, দিগ্‌দিগন্ত ঝল্সাইয়া পুড়াইয়া শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডব লীলা। চাহিয়া দেখিলাম দূরে দূরে প্রান্তরের সর্ব্বত্র কম্পমান তাপ-তরঙ্গ ও তাহার ওধারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম-দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখীর দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের! খর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই হরীতকীতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম কতক্ষণ। সাহারা দেখি নাই, সোয়েন হেডিনের বিখ্যাত টাক্‌লা-মাকান্ মরুভূমি দেখি নাই, গোবি দেখি নাই—কিন্তু এখানে মধ্যাহ্নের এই রুদ্রভৈরব রূপের মধ্যে সে-সব স্থানের অস্পষ্ট আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কাছারি হইতে তিন মাইল দূরে একটি বনে-ঘেরা ক্ষুদ্র কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল ছিল, কুণ্ডীটাতে গত বর্ষার জলে খুব মাছ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম—খুব গভীর বলিয়া এই অনাবৃষ্টিতেও তাহার জল একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কিন্তু সে জলে কাহারও কোন কাজ হয় না—প্রথমত, তার কাছাকাছি অনেক দূর লইয়া কোন মানুষের বসতি নাই—দ্বিতীয়ত, জল ও তীরভূমির মধ্যে কাদা এত গভীর যে, কোমর পর্য্যন্ত বসিয়া যায়—কলসীতে জল পুরিয়া পুনরায় তীরে উত্তীর্ণ হবার আশা বড়ই কম। আর একটি কারণ এই যে, জলটা খুব ভাল নয়—স্নান বা পানের আদৌ উপযুক্ত নয়, জলের সঙ্গে কি জিনিস মিশানো আছে জানি না—কিন্তু কেমন একটা অপ্রীতিকর ধাতব গন্ধ।

একদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমে বাতাস ও উত্তাপ কম পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় বাহির হইয়া ঐ কুণ্ডীটার পাশের উঁচু বালিয়াড়ি ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গলের পথে উপস্থিত হইয়াছি। পিছনে গ্র্যাণ্ট সাহেবের সেই বড় বটগাছের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। কাছারির খানিকটা জল বাঁচাইবার জন্য ভাবিলাম, এখানে ঘোড়াটাকে একবার জল খাওয়াইয়া লই। যত কাদা

হোক, ঘোড়া ঠিক উঠিতে পারিবে। জঙ্গল পার হইয়া কুণ্ডীর ধারে গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। কুণ্ডীর চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট-বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটি প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে। সাপগুলি প্রত্যেকটি বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর, যাহা এদেশে সাধারণত দেখা যায়।

মহিষ দেখিয়া মনে হইল এ ধরণের মহিষ আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড একজোড়া শিং, গায়ে লম্বা লোম—বিপুল শরীর। কাছেও কোন লোকালয় বা মহিষের বাথান নাই—তবে এ মহিষ কোথা হইতে আসিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, চরির খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেহ লুকাইয়া হয়তো জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা বাথান করিয়া থাকিবে। কাছারির কাছাকাছি আসিয়াছি মুনেশ্বর সিং চাকলাদারের সহিত দেখা। তাহাকে কথাটা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল—আরে সর্ব্বনাশ! বলেন কি হুজুর! হনুমানজী খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আজ! ও পোষা ভঁইস নয়, ও হল আড়ন্, বুনো ভঁইস হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গল থেকে এসেছে জল খেতে। ও অঞ্চলে কোথাও জল নেই তো। জলকষ্টে পড়ে এসেছে।

কাছারিতে তখনই কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বলিল—উঃ, হুজুর খুব বেঁচে গিয়েছেন। বাঘের হাতে পড়লে বরং রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বুনো মহিষের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। আর এই সন্ধ্যাবেলা নির্জ্জন জায়গায় যদি একবার আপনাকে ওরা তাড়া করত, ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁচতে পারতেন না হুজুর।

তার পর হইতে জঙ্গলে-ঘেরা ওই ছোট কুণ্ডীটা বন্য জানোয়ারের জলপানের একটা প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। অনাবৃষ্টি যত হইতে লাগিল, রৌদ্রের ক্রমবর্দ্ধমান প্রখরতায় দিক্‌দিগন্তে দাবদাহ যত প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে লাগিল—খবর আসিতে লাগিল—সেই জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীতে লোকে বাঘকে জল খাইতে দেখিয়াছে, বন-মহিষকে জল খাইতে দেখিয়াছে, হরিণের পালকে জল খাইতে দেখিয়াছে, নীলগাই ও বুনো শূয়োর তো আছেই—কারণ শেষের দুই প্রকার জানোয়ার এ জঙ্গলে অত্যন্ত বেশী। আমি নিজে আর একদিন জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় করিয়া কুণ্ডীতে যাই শিকারের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে তিন-চার জন সিপাহী ছিল—দু-তিনটি বন্দুকও ছিল। সে যা দৃশ্য দেখিয়াছিলাম সে রাত্রে, জীবনে ভুলিবার নয়। তাহা বুঝিতে হইলে কল্পনায় ছবি আঁকিয়া লইতে হইবে এক জনহান জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ও বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের! আরও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে সারা বনভূমি ব্যাপিয়া এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার, অভিজ্ঞতা না থাকিলে যদিও সে নিস্তব্ধতা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব।

উষ্ণ বাতাস অর্দ্ধশুষ্ক কাশ-ডাঁটার গন্ধে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, লোকালয় হইতে বহু দূরে আসিয়াছি, দিগ্‌বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কুণ্ডীতে প্রায় নিঃশব্দে জল খাইতেছে এক দিকে দুটি নীলগাই, অন্য দিকে দুটি হায়েনা; নীলগাই দুটি একবার হায়েনাদের দিকে চাহিতেছে, হায়েনারা একবার নীলগাই দুটির দিকে চাহিতেছে—আর দু'দলের মাঝখানে দু-তিন মাস বয়সের এক ছোট নীলগাইয়ের বাচ্চা।

অমন করুণ দৃশ্য কখনও দেখি নাই—দেখিয়া পিপাসার্ত্ত বন্য জন্তুদের নিরীহ শরীরে অতর্কিতে গুলি মারিবার প্রবৃত্তি হইল না।

এদিকে বৈশাখও কাটিয়া গেল। কোথাও একফোঁটা জল নাই। এক বিপদ দেখা দিল। এই সুবিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের মাঝে মাঝে লোকে দিক হারাইয়া আগেও পথ ভুলিয়া যাইত—এখন এই সব পথহারা পথিকদের জলাভাবে প্রাণ হারাইবার সমূহ আশঙ্কা দাঁড়াইল, কারণ ফুলকিয়া বইহার হইতে গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছ পর্য্যন্ত বিশাল তৃণভূমির মধ্যে কোথাও একবিন্দু জল নাই। এক-আধটা শুষ্কপ্রায় কুণ্ড যেখানে আছে, অনভিজ্ঞ দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকদের পক্ষে সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। একদিনের ঘটনা বলি।

৪

সেদিন বেলা চারটার সময় অত্যন্ত গরমে কাজে মন বসাইতে না পারিয়া একখানা কি বই পড়িতেছি, এমন সময় রামবিরিজ সিং আসিয়া এত্তেলা করিল, কাছারির পশ্চিমদিকে উঁচু ডাঙার উপরে একজন কে অদ্ভুত ধরণের পাগলা লোক দেখা যাইতেছে—সে হাত-পা নাড়িয়া দূর হইতে কি যেন বলিতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম সত্যই দূরের ডাঙাটার উপরে কে একজন দাঁড়াইয়া—মনে হইল মাতালের মত টলিতে টলিতে এদিকেই আসিতেছে। কাছারি সুদ্ধ লোক জড় হইয়া সেদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া আমি দুজন সিপাহী পাঠাইয়া দিলাম লোকটাকে এখানে আনিতে।

লোকটাকে যখন আনা হইল, দেখিলাম তাহার গায়ে কোন জামা নাই—পরনে মাত্র একখানা ফর্সা ধুতি, চেহারা ভাল, রং গৌরবর্ণ। কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখদুটি জবাফুলের মত লাল, চোখে উন্মাদের মত দৃষ্টি। আমার ঘরের দাওয়ায় একটা বালতিতে জল ছিল—তাই দেখিয়া সে পাগলের মত ছুটিয়া বালতির দিকে গেল। মুনেশ্বর সিং চাকলাদার ব্যাপারটা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বালতি সরাইয়া লইল। তাহার পর তাহাকে বসাইয়া হাঁ করাইয়া দেখা গেল জিভ ফুলিয়া বীভৎস ব্যাপার হইয়াছে। অতি কষ্টে জিভটা মুখের এক পাশে সরাইয়া একটু একটু করিয়া তার মুখে জল দিতে দিতে আধ ঘণ্টা পরে লোকটা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কাছারিতে লেবু ছিল, লেবুর রস ও গরম জল এক গ্লাস তাহাকে খাইতে দিলাম। ক্রমে ঘণ্টাখানেক পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। শুনিলাম তার বাড়ী পাটনা। গালার চাষ করিবার উদ্দেশ্যে সে এ-অঞ্চলে কুলের জঙ্গলের অনুসন্ধান করিতে পূর্ণিয়া হইতে রওনা হইয়াছে আজ দুই দিন পূর্ব্বে। তার পর দুপুরের সময় আমাদের মহালে ঢুকিয়াছে, এবং একটু পরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এ রকম একঘেয়ে একই ধরণের গাছে-ভরা জঙ্গলে দিক্ ভুল করা খুব সোজা, বিশেষত বিদেশী লোকের পক্ষে। কালকার ভীষণ উত্তাপে ও গরম পশ্চিমে বাতাসের দমকার মধ্যে

সারা বৈকাল ঘুরিয়াছে—কোথাও একফোঁটা জল পায় নাই, একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় নাই--রাত্রে অবসন্ন অবস্থায় এক গাছের তলায় শুইয়া ছিল—আজ সকাল হইতে আবার ঘোরা শুরু করিয়াছে—মাথা ঠাণ্ডা রাখিলে সূর্য্য দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করা হয়তো তার পক্ষে খুব কঠিন হইত না—অন্তত পূর্ণিয়াও ফিরিয়া যাইতে পারিত—কিন্তু ভয়ে দিশাহারা হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে আজ সারা দুপুর, তাহার উপর খুব চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছে—কোথায় লোক ? ফুলকিয়া বইহারের কূলের জঙ্গল যেদিকে, সেদিক হইতে লবটুলিয়া পর্য্যন্ত দশ-বারো বর্গমাইল-ব্যাপী বনপ্রান্তর সম্পূর্ণ জনমানব-শূন্য, সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, তাহার চীৎকার কেহ শোনে নাই। আরও তাহার আতঙ্ক হইবার কারণ, সে ভাবিয়াছিল তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে জিনপরীতে পাইয়াছে—মারিয়া না ফেলিয়া ছাড়িবে না। তাহার গায়ে একটা জামা ছিল, কিন্তু আজ অসহ্য পিপাসায় দুপুরের পরে এমন গা-জ্বলুনি শুরু হইয়াছিল যে, জামাটা খুলিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় দৈবক্রমে আমাদের কাছারির হনুমানের ধ্বজার লাল নিশানটা দূর হইতে তাহার চোখে না পড়িলে লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।

একদিন এই ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে ঠিক দুপুর বেলা সংবাদ পাইলাম, নৈর্ঋত কোণে মাইল-খানেক দূরে জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সবাই মিলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম প্রচুর ধূমের সঙ্গে রাঙা অগ্নিশিখা লক্লক্ করিয়া বহুদূর আকাশে উঠিতেছে! সেদিন আবার দারুণ পশ্চিমে বাতাস, লম্বা লম্বা ঘাস ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গল সূর্য্যতাপে অৰ্দ্ধশুষ্ক হইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক-এক স্ফুলিঙ্গ পড়িবামাত্র গোটা ঝাড় জ্বলিয়া উঠিতেছে—সেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ঘন নীলবর্ণ ধূমরাশি ও অগ্নিশিখা—আর চটচট শব্দ। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব-দিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের কয়খানা খড়ের বাংলোর দিকেই। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, এখানে থাকিলে আপাতত তো বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল তো আসিয়া পড়িল।

ভাবিবার সময় নাই। কাছারির দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা, সরকারী দলিল ম্যাপ, সর্ব্বস্ব মজুত—এ বাদে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস যার যার তো আছেই। এ সব তো যায়! সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল—আগ তো আ গৈল, হুজুর! বলিলাম—সব জিনিস বার কর। সরকারী তহবিল ও কাগজপত্র আগে।

জনকতক লোক লাগিয়া গেল আগুন ও কাছারির মধ্যে যে জঙ্গল পড়ে তাহারই যতটা পারা যায় কাটিয়া পরিষ্কার করিতে। জঙ্গলের মধ্যে বাথান হইতে আগুন দেখিয়া বাথানওয়ালা চরির প্রজা দু-দশ জন ছুটিয়া আসিল কাছারি রক্ষা করিতে, কারণ পশ্চিমা-বাতাসের বেগ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে কাছারি ঘোর বিপন্ন।

কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে নীলগাইয়ের

দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোস দৌড়িতেছে, একদল বন্যশূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল—ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পলাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটাকতক সিল্লি। রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল—পানি কাঁহা নেই ছে···আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলগন ? গোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ বাপু রাখ্। এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়তে কি দরকার ?

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পরে দশ-পনের জন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ! জল কোথাও নাই—আধকাঁচা গাছের ডাল ও বালি এইমাত্র অস্ত্র। সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মত বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—এদিকে কাছারির সব জিনিসপত্র, বাক্স, খাট, দেরাজ, আলমারি তখনও টানাটানি করিয়া বাহির করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠানে ফেলা হইতেছে। কোথাকার জিনিস যে কোথায় গেল, কে তার ঠিকানা রাখে! মুহুরীবাবুকে বলিলাম—ক্যাশ আপনার জিম্মায় রাখুন, আর দলিলের বাক্সটা।

কাছারির উঠান ও পরিষ্কৃত স্থানে বাধা পাইয়া আগুনের স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ বাহিয়া নিমেষের মধ্যে পূর্ব্বমুখে ছুটিল—কাছারিটা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল এযাত্রা। জিনিসপত্র আবার ঘরে তোলা হইল, কিন্তু বহু দূরে পূর্ব্বাকাশ লাল করিয়া লোলজিহ্বা প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা সারা রাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সকালের দিকে মোহনপুরা রিজার্ভ-ফরেস্টের সীমানায় গিয়া পৌছিল।

দু-তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেল কারো ও কুশী নদীর তীরবর্ত্তী কর্দ্দমে আট-দশটা বন্য মহিষ, দুটি চিতা বাঘ, কয়েকটা নীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে। ইহারা আগুন দেখিয়া মোহনপুরা জঙ্গল হইতে প্রাণভয়ে নদীর ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাবড়ে পড়িয়া গিয়াছে—যদিও রিজার্ভ ফরেস্ট হইতে কুশী ও কারো নদী প্রায় আট-ন' মাইল দূরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটিয়া গিয়া আষাঢ় পড়িল। আষাঢ় মাসে প্রথমেই কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। এ জায়গায় মানুষের মুখ বড় একটা দেখিতে পাই না বলিয়া আমার একটা শখ ছিল কাছারির পুণ্যাহের দিনে অনেক লোক নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইব। নিকটে কোন গ্রাম না থাকায়

আমরা গনোরী তেওয়ারীকে পাঠাইয়া দূরে দূরের বস্তির লোকদের নিমন্ত্রণ করিলাম। পুণ্যাহের পূর্ব্বদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিয়াছিল, পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে দুপুর হইতে-না-হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌছিতে লাগিল, এমন মুশকিল যে, তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না। দলের মধ্যে অনেক মেয়ে ছেলেপুলে লইয়া খাইতে আসিয়াছে, কাছারির দপ্তরখানায় তাহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিলাম, পুরুষেরা যে যেখানে পারে আশ্রয় লইল।

এ-দেশে খাওয়ানোর কোন হাঙ্গামা নাই, এত গরীব দেশ যে থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। বাংলা দেশ যতই গরীব হোক্, এদের দেশের সাধারণ লোকদের তুলনায় বাংলা দেশের গরীব লোকেও অনেক বেশী অবস্থাপন্ন। ইহারা এই মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করিয়া খাইতে আসিয়াছে চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু। কারণ ইহাই এখানে সাধারণ ভোজের খাদ্য।

দশ-বারো বছরের একটি অচেনা ছোকরা সকাল হইতেই খুব খাটিতেছিল, গরীব লোকের ছেলে, নাম বিশুয়া, দূরের কোন বস্তি হইতে আসিয়া থাকিবে। বেলা দশটার সময় সে কিছু জলখাবার চাহিল। ভাঁড়ারের ভার ছিল লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর উপর, সে এক খুঁচি চীনার-দানা ও একটু নুন তাহাকে আনিয়া দিল।

আমি পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। ছেলেটি কালো কুচকুচে, সুশ্রী মুখটা, যেন পাথরের কৃষ্ণঠাকুর। সে যখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া মলিন মোটা মার্কিনী আট-হাতি থান কাপড়ের খুঁট পাতিয়া সেই তুচ্ছ জলখাবার লইল তখন তাহার মুখে সে কি খুশীর হাসি! আমি বলিতে পারি অতি গরীব অবস্থারও কোনও বাঙালী ছেলে চীনার দানা কখনও খাইবেই না, খুশী হওয়া তো দূরের কথা। কারণ, একবার শখ করিয়া চীনার দানা খাইয়া যে স্বাদ পাইয়াছি, তাহাতে মুখোরোচক সুখাদ্যের হিসাবে তাহাকে উল্লেখ কখনই করিতে পারিব না।

বৃষ্টির মধ্যে কোনও রকমে তো ব্রাহ্মণভোজন এক রকম চুকিয়া গেল। বৈকালের দিকে দেখি ঘোর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে তিনটি স্ত্রীলোক উঠানে পাতা পাতিয়া বসিয়া ভিজিয়া ঝুপসি হইতেছে—সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও। তাহাদের পাতে চীনার দানা আছে, কিন্তু দই বা ভেলি গুড় কেহ দিয়া যায় নাই, তাহারা হাঁ করিয়া কাছারিঘরের দিকে চাহিয়া আছে। পাটোয়ারীকে ডাকিয়া বলিলাম—এদের কে দিচ্ছে? এরা বসে আছে কেন? আর এদের এই বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বসিয়েছেই বা কে?

পাটোয়ারী বলিল—হুজুর, ওরা জাতে দোষাদ। ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলা যাবে, কোনও ব্রাহ্মণ ছত্রী কি গাঙ্গোতা সে জিনিস খাবে না। আর জায়গাই বা কোথায় আছে বলুন?

ওই গরীব দোষাদদের মেয়ে-কয়টির সামনে আমি গিয়া নিজে বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাঁড়াইতে লোকজনেরা ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরিবেষণ করিতে লাগিল। সামান্য চীনার দানা, গুড় ও

জলো টক দই এক একজন যে পরিমাণে খাইল, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিবার কথা নহে। এই ভোজ খাইবার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়া ঠিক করিলাম, দোবাদদের এই মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন খুব ভাল করিয়া সত্যকার সভ্য খাদ্য খাওয়াইব। সপ্তাহ-খানেক পরেই পাটোয়ারীকে দিয়া দোবাদপাড়ার মেয়েকয়টি ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করিলাম, সেদিন তাহারা যাহা খাইল—লুচি, মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই, পায়েস, চাট্‌নি—জীবনে কোনও দিন সে রকম ভোজ খাওয়ার কল্পনাও করে নাই। তাদের বিস্মিত ও আনন্দিত চোখ-মুখের সে হাসি কতদিন আমার মনে ছিল! সেই ভবঘুরে গাঙ্গোতা ছোকরা বিত্তয়াও সে দলে ছিল।

২

সার্ভে-ক্যাম্প থেকে একদিন ঘোড়া করিয়া ফিরিতেছি, বনের মধ্যে একটা লোক কাশঘাসের ঝোপের পাশে বসিয়া কলাইয়ের ছাতু মাখিয়া খাইতেছে। পাত্রের অভাবে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তেই ছাতুটা মাখিতেছে—এত বড় একটা তাল যে, একজন লোকে—হ'লই বা হিন্দুস্থানী, মানুষ তো বটে—কি করিয়া অত ছাতু খাইতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগোচর। আমায় দেখিয়া লোকটা সসম্ভ্রমে খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল—ম্যানেজার সাহেব! থোড়া জলখাই করতে হেঁ হুজুর, মাফ কিজিয়ে।

একজন ব্যক্তি নির্জনে বসিয়া, শান্ত ভাবে জলখাবার খাইতেছে, ইহার মধ্যে মাপ করিবার কি আছে খুঁজিয়া পাইলাম না। বলিলাম—খাও, খাও, তোমায় উঠতে হবে না। নাম কি তোমার?

লোকটা তখনও বসে নাই, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সসম্ভ্রমে বলিল—গরীব কা নাম ধাওতাল সাহু, হুজুর।

চাহিয়া দেখিয়া মনে হইল লোকটার বয়স ষাটের উপর হইবে। রোগা-লম্বা চেহারা, গায়ের রং কালো, পরনে অতি মলিন থান ও মেরজাই, পা খালি।

ধাওতাল সাহুর সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ।

কাছারিতে আসিয়া রামজোত পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ধাওতাল সাহুকে চেন?

রামজোত বলিল—জী হুজুর। ধাওতাল সাহুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? সে মস্ত বড় মহাজন, লক্ষপতি লোক, এদিকে সবাই তার খাতক। নওগছিয়ায় তার ঘর। পাটোয়ারীর কথা শুনিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। লক্ষপতি লোক বনের মধ্যে বসিয়া ময়লা উড়ানির প্রান্তে এক তাল নিরুপকরণ কলাইয়ের ছাতু খাইতেছে—এ দৃশ্য কোন বাঙালী লক্ষপতির সম্বন্ধে অন্তত কল্পনা করা অতীব কঠিন। ভাবিলাম পাটোয়ারী বাড়াইয়া বলিতেছে, কিন্তু কাছারিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই ঐ কথা বলে, ধাওতাল সাহু? তার টাকার লেখা-জোখা নেই।

ইহার পরে নিজের কাজে ধাওতাল সাহু অনেকবার কাছারিতে আমার সহিত দেখা করিয়াছে, প্রতিবার একটু একটু করিয়া তাহার সহিত আলাপ জমিয়া উঠিলে বুঝিলাম, একটি অতি অদ্ভুত লোকোত্তর চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এ ধরণের লোক যে আছে, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

ধাওতালের বয়স যাহা আন্দাজ করিয়াছিলাম, প্রায় তেষট্টি চৌষট্টি! কাছারির পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের প্রান্ত হইতে বারো-তেরো মাইল দূরে নওগছিয়া নামে গ্রামে তাহার বাড়ী। এ অঞ্চলে প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সকলেই ধাওতাল সাহুর খাতক। কিন্তু তাহার মজা এই যে, টাকা ধার দিয়া সে জোর করিয়া কখনও তাগাদা করিতে পারে না। কত লোকে যে কত টাকা তাহার ফাঁকি দিয়াছে! তাহার মত নিরীহ, ভালমানুষ লোকের মহাজন হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু লোকের উপরোধ সে এড়াইতে পারে না। বিশেষতঃ সে বলে, যখন সকলেই মোটা সুদ লিখিয়া দিয়াছে, তখন ব্যবসা হিসাবেও তো টাকা দেওয়া উচিত। একদিন ধাওতাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, উড়ানিতে বাঁধা এক বাণ্ডিল পুরনো দলিলপত্র। বলিল—হুজুর, মেহেরবানি করে একটু দেখবেন দলিলগুলো?

পরীক্ষা করিয়া দেখি প্রায় আট-দশ হাজার টাকার দলিল ঠিক সময়ে নালিশ না-করার দরুন তামাদি হইয়া গিয়াছে।

উড়ানির আর এক মুড়ো খুলিয়া সে আরও কতকগুলি জরাজীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া বলিল—এগুলো দেখুন দেখি হুজুর। ভাবি একবার জেলায় গিয়ে উকীলদের দেখাই, তা মামলা কখনো করিনি, করা পোষায় না। তাগাদা করি, দিচ্ছি দেব করে টাকা দেয় না অনেকে।

দেখিলাম, সবগুলিই তামাদি দলিল। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সেও চারপাঁচ হাজার টাকা। ভালমানুষকে সবাই ঠকায়। বলিলাম—সাহুজী, মহাজনী করা তোমার কাজ নয়। এ-অঞ্চলে মহাজনী করতে পারবে রাসবিহারী সিং রাজপুতের মত দুঁদে লোকরা, যাদের সাত-আটটা লাঠিয়াল আছে, খাতকের ক্ষেতে নিজে ঘোড়া করে গিয়ে লাঠিয়াল মোতায়েন করে আসে, ফসল ক্রোক করে টাকা আর সুদ আদায় করে। তোমার মত ভালমানুষ লোকের টাকা শোধ করবে না কেউ। দিও না কাউকে আর।

ধাওতালকে বুঝাইতে পারিলাম না, সে বলিল—সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর। এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে, মাথার উপর দীন-দুনিয়ার মালিক এখনও আছেন। টাকা কি বসিয়ে রাখলে চলে, সুদে না বাড়লে আমাদের চলে না হুজুর। এই আমাদের ব্যবসা।

তাহার এ-যুক্তি আমি বুঝিতে পারিলাম না, সুদের লোভে আসল টাকা নষ্ট হইতে দেওয়া কেমনতর ব্যবসা জানি না। ধাওতাল সাহু আমার সামনেই অম্লান বদনে পনের-ষোল হাজার টাকার তামাদি দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল—এমন ভাবে ছিঁড়িল যেন সেগুলো বাজে কাগজ—অবশ্য, বাজে কাগজের পর্য্যায়েই তাহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বটে। তাহার হাত কাঁপিল না, গলার সুর কাঁপিল না।

বলিল—রাঁইচি আর রেড়ির বীজ বিক্রী করে টাকা করেছিলাম হুজুর, নয়তো আমার পৈতৃক আমলের একটা ঘষা পয়সাও ছিল না। আমিই করেছি, আবার আমিই লোকসান দিচ্ছি। ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান আছেই হুজুর।

তা আছে স্বীকার করি, কিন্তু কয়জন লোক এত বড ক্ষতি এমন শান্তমুখে উদাসীনভাবে সহ্য করিতে পারে, সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার বড়মানুষী গর্ব্ব দেখিলাম মাত্র একটি ব্যাপারে ; একটা লাল কাপড়ের বাটুয়া হইতে সে মাঝে মাঝে ছোট্ট একখানা জাঁতি ও সুপারি বাহির করিয়া কাটিয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে একবার বলিয়াছিল—রোজ এক কনোয়া করে সুপুরি খাই বাবুজী। সুপুরির বড় খরচ আমার। বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করিবার ক্ষমতা যদি দার্শনিকতা হয়, তবে ধাওতাল সাহুর মত দার্শনিক আমি তো অন্ততঃ দেখি নাই।

৩

ফুলকিয়ার ভিতর দিয়া যাইবার সময় আমি প্রতিবারই জয়পাল কুমারের মকাইয়ের পাতা-ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানার সামনে দিয়া যাইতাম। কুমার অর্থে কুম্ভকার নয়, ভুঁইহার বামুন।

খুব বড় একটা প্রাচীন পাকুড় গাছের নীচেই জয়পালের ঘর। সংসারে সে সম্পূর্ণ একা, বয়সেও প্রাচীন, লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় লম্বা সাদা চুল। যখনই যাইতাম, তখনই দেখিতাম কুঁড়েঘরের দোরের গোড়ায় সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জয়পাল তামাক খাইত না, কখনও তাকে কোন কাজ করিতে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না, গান গাইতে শুনি নাই—সম্পূর্ণ কর্ম্মশূন্য অবস্থায় মানুষ কি ভাবে যে এমন ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, জানি না। জয়পালকে দেখিয়া বড় বিস্ময় ও কৌতূহল বোধ করিতাম। প্রতিবারই উহার ঘরের সামনে ঘোড়া থামাইয়া উহার সহিত দুটা কথা না বলিয়া যাইতে পারিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—জয়পাল, কি কর বসে?

—এই, বসে আছি হুজুর।

—বয়েস কত হল?

—তা হিসেব রাখিনি, তবে যেবার কুশীনদীর পুল হয়, তখন আমি মহিষ চরাতে পারি।

—বিয়ে করেছিলে? ছেলেপুলে ছিল?

—পরিবার মরে গিয়েছে আজ বিশ পঁচিশ বছর : দুটো মেয়ে ছিল, তারাও মারা গেল। সেও তের-চোদ্দ বছর আগে। এখন একাই আছি।

—আচ্ছা, এই যে একা এখানে থাক, কারো সঙ্গে কথা বলো না, কোথাও যাও না, কিছু করও না—এ ভাল লাগে? একঘেয়ে লাগে না?

জয়পাল অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিত—কেন খারাপ লাগবে হুজুর? বেশ থাকি। কিছু খারাপ লাগে না।

জয়পালের এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। আমি কলিকাতার কলেজে পড়িয়া মানুষ হইয়াছি, হয় কোন কাজ, নয়তো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, নয় বই, নয় সিনেমা, নয় বেড়ানো—এ ছাড়া মানুষ কি করিয়া থাকে বুঝি না। ভাবিয়া দেখিতাম, দুনিয়ার কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, গত বিশ-বৎসর জয়পাল কুমার ওর ঘরের দোরটাতে ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তার কতটুকু খবর রাখে? আমি যখন ছেলেবেলায় স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়িতাম, তখনও জয়পাল এমনি বসিয়া থাকিত, বি এ যখন পাস করিলাম তখনও জয়পাল এমনি করিয়া বসিয়া থাকে। আমার জীবনেরই নানা ছোট বড় ঘটনা যা আমার কাছে পরম বিস্ময়কর বস্তু, তারই সঙ্গে মিলাইয়া জয়পালের এই বৈচিত্র্যহীন নির্জ্জন জীবনের অতীত দিনগুলির কথা ভাবিতাম।

জয়পালের ঘরখানা গ্রামের একেবারে মাঝখানে হইলেও, কাছে অনেকটা পতিত জমি ও মকাই-ক্ষেত, কাজেই আশে-পাশে কোন বসতি নাই। ফুলকিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম, দশ-পনের ঘর লোকের বাস, সকলেই চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী জঙ্গলমহলে মহিষ চরাইয়া দিন গুজরান করে সারাদিন ভূতের মত খাটে আর সন্ধ্যার সময় কলাইয়ের ভূষির আগুন জ্বালাইয়া তার চারিপাশে পাড়াসুদ্ধ বসিয়া গল্পগুজব করে, খৈনি খায় কিংবা শালপাতার পিকার ধূম-পান করে। হুঁকায় তামাক খাওয়ার চলন এদেশে খুবই কম। কিন্তু কখনও কোন লোককে জয়পালের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখি নাই।

প্রাচীন পাকুড় গাছটার মগডালে বকেরা দল বাঁধিয়া বাস করে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, গাছের মাথায় থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটিয়াছে। স্থানটা ঘন ছায়াভরা, নির্জ্জন, আর সেখানটাতে দাঁড়াইয়া যে দিকেই চোখ পড়ে, সে দিকেই নীল নীল পাহাড় দূরদিগন্তে হাত ধরাধরি করিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের মত মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া। আমি পাকুড় গাছের ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া যখন জয়পালের সঙ্গে কথা বলিতাম, তখন আমার মনে এই সুবৃহৎ বৃক্ষতলের নিবিড় শান্তি ও গৃহস্বামীর অনুদ্বিগ্ন, নিস্পৃহ, ধীর জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে কেমন একটা প্রভাব বিস্তার করিত। ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশী-বটের, কেমন মন্থর যমুনাজল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের!

কিছু জয়পালের জীবনযাত্রার প্রভাব ও কিছু চারিধারের বাধা-বন্ধনশূন্য প্রকৃতি আমাকেও ক্রমে ক্রমে যেন ঐ জয়পাল কুমারের মত নির্ব্বিকার, উদাসীন ও নিস্পৃহ করিয়া তুলিতেছে। শুধু তাই নয়, আমার যে চোখ কখনও এর আগে ফুটে নাই সে চোখ যেন ফুটিয়াছে, যে-সব কথা কখনও ভাবি নাই তাহাই ভাবাইতেছে। ফলে এই মুক্ত প্রান্তর ও ঘনশ্যামা অরণ্য-প্রকৃতিকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি যে, একদিন পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের শহরে কার্য্য উপলক্ষে গেলে মন উড়ু উড়ু করে, মন টিকিতে চায় না। মনে হয়, কতক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া যাইব, কতক্ষণে আবার সেই ঘন নির্জ্জনতার মধ্যে, অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার মধ্যে, সূর্য্যাস্তের মধ্যে, দিগন্তব্যাপী কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে, তারাভরা নিদাঘ-নিশীথের মধ্যে ডুব দিব!

ফিরিবার সময় সভ্য লোকালয়কে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া, মুকুন্দি চাক্‌লাদারের হাতের বাবলাকাঠের খুঁটির পাশ কাটাইয়া যখন নিজের জঙ্গলের সীমানায় ঢুকি, তখন সুদূরবিসর্পী নিবিড়শ্যাম বনানী, প্রান্তর, শিলাস্তূপ, বনটিয়ার ঝাঁক, নীল গাইয়ের জেরা, সূর্য্যালোক, ধরণীর মুক্ত প্রসার আমায় একেবারে একমুহূর্ত্তে অভিভূত করিয়া দেয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

খুব জ্যোৎস্না, তেমনি হাড়কাঁপানো শীত। পৌষ মাসের শেষ। সদর কাছারি হইতে লবটুলিয়ার ডিহি কাছারিতে তদারক করিতে গিয়াছি। লবটুলিয়ার কাছারিতে রাত্রে রান্না শেষ হইয়া সকলের আহারাদি হইতে রাত এগারটা বাজিয়া যাইত। একদিন খাওয়া শেষ করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি, তত রাত্রে আর সেই কন্‌কনে হিমবর্ষী আকাশের তলায় কে একটি মেয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কাছারির কম্পাউণ্ডের সীমানায় দাঁড়াইয়া আছে। পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

পাটোয়ারী বলিল—ও কুন্তা। আপনার আসবার কথা শুনে আমায় কাল বলছিল—ম্যানেজারবাবু আসবেন, তাঁর পাতের ভাত আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। আমার ছেলেপুলের বড় কষ্ট। তাই বলেছিলাম—যাস্।

কথা বলিতেছি, এমন সময় কাছারির টহলদার বলোয়া আমার পাতের ডালমাখা ভাত, ভাঙা মাছের টুকরা, পাতের গোড়ায় ফেলা তরকারী ও ভাত, দুধের বাটির ভুক্তাবশিষ্ট দুধ-ভাত—সব লইয়া গিয়া মেয়েটির আনীত একটা পেতলের কানাউঁচু থালায় ঢালিয়া দিল। মেয়েটি চলিয়া গেল।

আট-দশ দিন সেবার লবটুলিয়ার কাছারিতে ছিলাম, প্রতিরাত্রে দেখিতাম ইঁদারার পাড়ে সেই মেয়েটি আমার পাতের ভাতের জন্য সেই গভীর রাত্রে আর সেই ভয়ানক শীতের মধ্যে বাহিরে শুধু আঁচল গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে একদিন কৌতূহলবশে পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা—যে রোজ ভাত নিয়ে যায়, ও কে, আর এই জঙ্গলে থাকেই বা কোথায়? দিনে তো কখনও দেখি নে ওকে?

পাটোয়ারী বলিল—বলছি হুজুর।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা হইতে কাঠের গুঁড়ি জ্বালাইয়া গন্‌গনে আগুন করা হইয়াছে—তারই ধারে চেয়ার পাতিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া কিস্তির আদায়ী হিসাব মিলাইতেছিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া মনে হইল একদিনের পক্ষে কাজ যথেষ্টই করিয়াছি। কাগজ-পত্র গুটাইয়া পাটোয়ারীর গল্প শুনিতে প্রস্তুত হইলাম।

—শুনুন হুজুর। বছর দশেক আগে এ অঞ্চলে দেবী সিং রাজপুতের বড় রবরবা ছিল।

তার ভয়ে যত গাঙ্গোতা আর চাষী ও চরির প্রজা জুজু হয়ে থাকত। দেবী সিং-এর ব্যবসা ছিল খুব চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া এই সব লোককে—আর তার পর লাঠিবাজি করে সুদ আসল টাকা আদায় করা। তার তাঁবে আট-ন' জন লাঠিয়াল পাইকই ছিল। এখন যেমন রাসবিহারী সিং রাজপুত এ-অঞ্চলের মহাজন, তখন ছিল দেবী সিং।

দেবী সিং জৌনপুর জেলা থেকে এসে পূর্ণিয়ায় বাস করে। তার পর টাকা ধার দিয়ে জোর-জবরদস্তি করে এ দেশের যত ভীতু গাঙ্গোতা প্রজাদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেললে। এখানে আসবার বছর কয়েক পরে সে কাশী যায় এবং সেখানে এক বাইজীর বাড়ী গান শুনতে গিয়ে তার চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ের সঙ্গে দেবী সিং-এর খুব ভাব হয়। তার পর তাকে নিয়ে দেবী সিং পালিয়ে এখানে আসে। দেবী সিং-এর বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। এখানে এসে দেবী সিং তাকে বিয়ে করে। কিন্তু বাইজীর মেয়ে বলে সবাই যখন জেনে ফেললে, তখন দেবী সিং-এর নিজের জাতভাই রাজপুতরা ওর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে ওকে একঘরে করলে। পয়সার জোরে দেবী সিং সে সব গ্রাহ্য করত না। তার পর বাবুগিরি আর অযথা ব্যয় করে এবং এই রাসবিহারী সিং-এর সঙ্গে মকদ্দমা করতে গিয়ে দেবী সিং সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল। আজ বছর চারেক হল সে মারা গিয়েছে।

ঐ কুন্তাই দেবী সিং রাজপুতের সেই বিধবা স্ত্রী। এক সময়ে ও লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী খেয়ে জল খেত—আজ ওর ওই দুর্দ্দশা! আরও মুশকিল এই যে বাইজীর মেয়ে সবাই জানে বলে ওর এখানে জাত নেই, তা কি ওর স্বামীর আত্মীয়-বন্ধু রাজপুতদের মধ্যে, কি দেশওয়ালী গাঙ্গোতাদের মধ্যে। ক্ষেত থেকে গম কাটা হয়ে গেলে যে গমের গুঁড়ো শীষ পড়ে থাকে, তাই টুকরি করে ক্ষেতে ক্ষেতে বেড়িয়ে কুড়িয়ে এনে বছরে দু-এক মাস ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আধপেটা খাইয়ে রাখে। কিন্তু কখনও হাত পেতে ভিক্ষে করতে ওকে দেখি নি হুজুর। আপনি এসেছেন জমিদারের ম্যানেজার, রাজার সমান, আপনার এখানে প্রসাদ পেলে ওর তাতে অপমান নেই।

বলিলাম—ওর মা, সেই বাইজী, ওর খোঁজ করে নি তার পর কখনও?

পাটোয়ারী বলিল—দেখি নি তো কখনও হুজুর। কুন্তাও কখনও মায়ের খোঁজ করে নি। ও-ই দুঃখ-ধান্দা করে ছেলেপুলেকে খাওয়াচ্ছে। এখন ওকে কি দেখছেন, ওর এক সময় যা রূপ ছিল, এ-অঞ্চলে সে রকম কখনও কেউ দেখে নি। এখন বয়েসও হয়েছে, আর বিধবা হওয়ার পরে দুঃখে-কষ্টে সে চেহারার কিছু নেই। বড় ভাল আর শান্ত মেয়ে কুন্তা। কিন্তু এদেশে ওকে কেউ দেখতে পারে না, সবাই নাক সিঁটকে থাকে, নীচু চোখে দেখে, বোধ হয় বাইজীর মেয়ে বলে।

বলিলাম—তা বুঝলাম, কিন্তু এই রাত বারোটার সময় এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও একা লবটুলিয়া বস্তিতে যাবে—সে ত এখান থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ?

—ওর কি ভয় করলে চলে হুজুর? এই জঙ্গলে হরবখ্‌ত্‌ ওকে একলা ফিরতে হয়।

নইলে কে আছে ওর, যে চালাবে?

তখন ছিল পৌষ মাস, পৌষ-কিস্তির তাগাদা শেষ করিয়াই চলিয়া আসিলাম। মাঘ মাসের মাঝামাঝি আর একবার একটা ক্ষুদ্র চরি মহাল ইজারা দিবার উদ্দেশ্যে লবটুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

তখনও শীত কিছুমাত্র কমে নাই, তার উপরে সারাদিন পশ্চিমা বাতাস বহিবার ফলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে শীত দ্বিগুণ বাড়িতে লাগিল। একদিন মহালের উত্তর সীমানায় বেড়াইতে বেড়াইতে কাছারি হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি—সেদিকটাতে বহুদূর পর্য্যন্ত শুধু কুলগাছের জঙ্গল। এই সব জঙ্গল জমা লইয়া ছাপরা ও মজঃফরপুর জেলার কালোয়ার-জাতীয় লোকে লাক্ষার চাষ করিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করে। কুলের জঙ্গলের মধ্যে প্রায় পথ ভুলিবার উপক্রম করিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠে আর্ত্তক্রন্দনের শব্দ, বালক-বালিকার গলার চীৎকার ও কান্না এবং কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠে গালিগালাজ শুনিতে পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটি মেয়েকে লাক্ষার ইজারাদারের চাকরেরা চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে। মেয়েটির পরনে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, সঙ্গে দু'তিনটি ছোট ছোট রোরুদ্যমান বালক-বালিকা, দুজন ছত্রি চাকরের মধ্যে একজনের হাতে একটা ছোট ঝুড়িতে আধঝুড়ি পাকা কুল। আমাকে দেখিয়া ছত্রি দুজন উৎসাহ পাইয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, তাহাদের ইজারাকরা জঙ্গলে এই গাঙ্গোতিন চুরি করিয়া কুল পাড়িতেছিল বলিয়া তাহাকে কাছারিতে পাটোয়ারীর বিচারার্থ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, হুজুর আসিয়া পড়িয়াছেন, ভালই হইয়াছে।

প্রথমেই ধমক দিয়া মেয়েটিকে তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইলাম। মেয়েটি তখন ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হইয়া একটি কুলঝোপের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া এত কষ্ট হইল!

ইজারাদারের লোকেরা কি সহজে ছাড়িতে চায়! তাহাদের বুঝাইলাম—বাপু, গরীব মেয়েমানুষ যদি ওর ছেলেপুলেকে খাওয়াইবার জন্য আধঝুড়ি টক কুল পাড়িয়াই থাকে, তাহাতে তোমাদের লাক্ষাচাষের বিশেষ কি ক্ষতিটা হইয়াছে। উহাকে বাড়ী যাইতে দাও।

একজন বলিল—জানেন না হুজুর, ওর নাম কুন্তা, এই লবটুলিয়াতে ওর বাড়ী, ওর অভ্যেস চুরি করে কুল পাড়া। আরও একবার আর-বছর হাতে হাতে ধরেছিলাম—ওকে এবার শিক্ষা না দিয়ে দিলে—

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম। কুন্তা! তাহাকে তো চিনি নাই? তাহার একটা কারণ, দিনের আলোতে কুন্তাকে তো দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি রাত্রে। ইজারাদারের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ শাসাইয়া কুন্তাকে মুক্ত করিলাম। সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া ছেলেপুলেদের লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুলের ধামাটি ও আঁকশিগাছটা সেখানেই ফেলিয়া গেল। বোধ হয় ভয়ে ও সঙ্কোচে। আমি উপস্থিত লোকগুলির মধ্যে একজনকে সেগুলি কাছারিতে লইয়া যাইতে বলাতে তাহারা খুব খুশী হইয়া ভাবিল ধামা ও আঁকশি সরকারে

নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত হইবে। কাছারিতে আসিয়া পাটোয়ারীকে বলিলাম—তোমাদের দেশের লোক এত নিষ্ঠুর কেন বনোয়ারীলাল? বনোয়ারী পাটোয়ারী খুব দুঃখিত হইল। বনোয়ারী লোকটা ভাল, এদেশের তুলনায় সত্যিই তার হৃদয়ে দয়ামায়া আছে। কুন্তার ধামা ও আঁকশি সে তখনই পাইক দিয়া লবটুলিয়াতে কুন্তার বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

সেই রাত্রি হইতে কুন্তা বোধ হয় লজ্জায় আর কাছারিতেও ভাত লইতে আসে নাই।

২

শীত শেষ হইয়া বসন্ত পড়িয়াছে।

আমাদের এ জঙ্গল-মহালের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমানা হইতে সাত-আট ক্রোশ দূরে অর্থাৎ সদর কাছারি হইতে প্রায় চৌদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে ফাল্গুন মাসে হোলির সময় একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম্য মেলা বসে, এবার সেখানে যাইব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। বহু লোকের সমাগম অনেক দিন দেখি নাই, এদেশের মেলা কি রকম জানিবার একটা কৌতূহলও ছিল। কিন্তু কাছারির লোকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, পথ দুর্গম ও পাহাড়-জঙ্গলে ভর্ত্তি, উপরন্তু গোটা পথটার প্রায় সর্ব্বত্রই বাঘের ও বন্যমহিষের ভয়, মাঝে মাঝে বস্তি আছে বটে, কিন্তু সে বড় দূরে দূরে, বিপদে পড়িলে তাহারা বিশেষ কোন উপকারে আসিবে না, ইত্যাদি।

জীবনে কখনও এতটুকু সাহসের কাজ করিবার অবকাশ পাই নাই, এই সময়ে এই সব জায়গায় যতদিন আছি যাহা করিয়া লইতে পারি, বাংলা দেশে ও কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে কোথায় পাইব পাহাড় জঙ্গল, কোথায় পাইব বাঘ ও বন্য-মহিষ? ভবিষ্যতের দিনে আমার মুখে গল্পশ্রবণনিরত পৌত্র-পৌত্রীদের মুখ ও উৎসুক তরুণ দৃষ্টি কল্পনা করিয়া মুনেশ্বর মাহাতো, পাটোয়ারী ও নবীনবাবু মুহুরীর সকল আপত্তি উড়াইয়া দিয়া মেলার দিন খুব সকালে ঘোড়া করিয়া রওনা হইলাম। আমাদের মহালের সীমানা ছাড়াইতেই ঘণ্টা-দুই লাগিয়া গেল, কারণ পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমানাতেই আমাদের মহালের জঙ্গল বেশী, পথ নাই বলিলেও চলে, ঘোড়া ভিন্ন অন্য কোন যান-বাহন সে পথে চলা অসম্ভব, যেখানে সেখানে ছোট-বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, শাল-জঙ্গল, দীর্ঘ কাশ ও বন-ঝাউ-এর বন, সমস্ত পথটা উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে উঁচু বালিয়াড়ি রাঙা মাটির ডাঙা, ছোট পাহাড়, পাহাড়ের উপর ঘন কাঁটা-গাছের জঙ্গল। আমি যদৃচ্ছাক্রমে কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে অশ্বচালনা করিতেছি, ঘোড়াকে কদম চালে ঠিক চালানো সম্ভব হইতেছে না—খারাপ রাস্তা ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের দরুন কিছুদূর অন্তর অন্তর ঘোড়ার চাল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কখনও গ্যালপ, কখনও দুলকি, কখনও বা পায়চারি করিবার মত মৃদু গতিতে শুধু হাঁটিয়া যাইতেছে।

আমি কিন্তু কাছারি ছাড়িয়া পর্য্যন্তই আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি, এখানে চাকুরি লইয়া আসার দিনটি হইতে এদেশের এই ধূ-ধূ মুক্ত প্রান্তর ও বনভূমি আমাকে ক্রমশ দেশ ভুলাইয়া দিতেছে, সভ্য জগতের শত প্রকারের আরামের উপকরণ ও অভ্যাসকে ভুলাইয়া দিতেছে, বন্ধু-

বান্ধব পর্য্যন্ত ভুলাইবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে। যাক্ না ঘোড়া আস্তে বা জোরে, শৈলসানুতে যতক্ষণ প্রথম বসন্তে প্রস্ফুটিত রাঙা পলাশ ফুলের মেলা বসিয়াছে, পাহাড়ের নীচে, উপরে মাঠের সর্ব্বত্র ঝুপ্‌সি গাছের ডাল ঝাড় ঝাড় ধাতুপফুলের ভারে অবনত, গোলগোলি ফুলের নিষ্পত্র দুগ্ধশুভ্র কাণ্ডে হলুদ রঙের বড় বড় সূর্য্যমুখী ফুলের মত ফুল মধ্যাহ্নের রৌদ্রকে মৃদু সুগন্ধে অলস করিয়া তুলিয়াছে—তখন কতটা পথ চলিল, কে রাখে তাহার হিসাব ?

কিন্তু হিসাব খানিকটা যে রাখিতেই হইবে, নতুবা দিগ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, আমাদের জঙ্গলের সীমানা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই এ সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিলাম। কিছুদূর তখন অন্যমনস্ক ভাবে গিয়াছি, হঠাৎ দেখি সম্মুখে বহুদূরে একটা খুব বড় অরণ্যানীর ধূম্রনীল শীর্ষদেশ রেখাকারে দিগ্‌বলয়ের সে-অংশে এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোথা হইতে আসিল এত বড় বন এখানে ? কাছারিতে কেহ তো একথা বলে নাই যে, মৈষণ্ডির মেলার কাছাকাছি কোথাও অমন বিশাল অরণ্য বর্ত্তমান ? পরক্ষণেই ঠাহর করিয়া বুঝিলাম, পথ হারাইয়াছি, সম্মুখের বনরেখা মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট না হইয়া যায় না— যাহা আমাদের কাছারি হইতে খাড়া উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এসব দিকে চলতি বাঁধা-পথ বলিয়া কোন জিনিস নাই, লোকজনও কেহ বড়-একটা হাঁটে না। তাহার উপর চারিদিকে দেখিতে ঠিক একই রকম, সেই এক ধরণের ডাঙা, এক ধরণের গোলগোলি ও ধাতুপফুলের বন, সঙ্গে সঙ্গে আছে চড়া রৌদ্রের কম্পমান তাপ-তরঙ্গ। দিক্ ভুল হইতে বেশীক্ষণ লাগে না আনাড়ি লোকের পক্ষে।

ঘোড়ার মুখ আবার ফিরাইলাম। হুঁশিয়ার হইয়া গন্তব্যস্থানের অবস্থান নির্ণয় করিয়া একটা দিক্‌চিহ্ন দূর হইতে আন্দাজ করিয়া বাছিয়া লইলাম। অকূল সমুদ্রে জাহাজ ঠিক পথে চালনা, অনন্ত আকাশে এরোপ্লেনের পাইলটের কাজ করা আর এই সব অজানা সুবিশাল পথহীন বনপ্রান্তরে অশ্বচালনা করিয়া তাহাকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়া প্রায় একই শ্রেণীর ব্যাপার। অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের এ কথার সত্যতা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

আবার রৌদ্রদগ্ধ নিষ্পত্র গুল্মরাজি, আবার বনকুসুমের মৃদুমধুর গন্ধ, আবার অনাবৃত শিলাস্তূপসদৃশ প্রতীয়মান গণ্ডশৈলমালা, আবার রক্তপলাশের শোভা। বেলা বেশ চড়িল ; জল খাইতে পাইলে ভাল হইত, ইহার মধ্যেই মনে হইল ; কারো নদী ছাড়া এ পথে কোথাও জল নাই, জানি ; এখনও আমাদের জঙ্গলেরই সীমা কতক্ষণে ছাড়াইব ঠিক নাই, কারো নদী তো বহুদূর—এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

মুকুন্দি চাক্‌লাদারকে বলিয়া দিয়াছিলাম আমাদের মহালের সীমানায় সীমানাজ্ঞাপক বাবলা কাঠের খুঁটি বা মহাবীরের ধ্বজার অনুরূপ যাহা হয় কিছু পুঁতিয়া রাখে। এ সীমানায় কখনও আসি নাই, দেখিয়া বুঝিলাম চাক্‌লাদার সে আদেশ পালন করে নাই। ভাবিয়াছে, এই জঙ্গল ঠেলিয়া কলিকাতার ম্যানেজারবাবু আর সীমানা পরিদর্শনে আসিয়াছেন, তুমিও যেমন ! কে খাটিয়া মরে ? যেমন আছে তেমনিই থাকুক।

পথের কিছুদূরে আমাদের সীমানা ছাড়াইয়া এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিয়া

সেখানে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে একদল লোক কাঠ পুড়াইয়া কয়লা করিতেছে—এই কয়লা তাহারা গ্রামে গ্রামে শীতকালে বেচিবে। এদেশের শীতে গরীব লোকে মালসায় কয়লার আগুন করিয়া শীত নিবারণ করে; কাঠকয়লা চার সের পয়সায় বিক্রী হয়, তাও কিনিবার পয়সা অনেকের জোটে না, আর এত পরিশ্রম করিয়া কাঠকয়লা পুড়াইয়া পয়সায় চার সের দরে বেচিয়া কয়লাওয়ালাদের মজুরিই বা কি ভাবে পোষায়, তাও বুঝি না। এদেশে পয়সা জিনিসটা বাংলা দেশের মত সস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত তা দেখিতেছি। শুক্‌নো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকীর বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে, আমি যখন গেলাম। লবণ ছাড়া অন্য কোন উপকরণই নাই। নিকটে বড় বড় গর্ত্তের মধ্যে ডাল-পালা পুড়িতেছে, একটা ছোকরা সেখানে বসিয়া কাঁচা শালের লম্বা ডাল দিয়া আগুনে ডালপালা উল্টাইয়া দিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ও গর্ত্তের মধ্যে, কি পুড়ছে?

তাহারা খাওয়া ছাড়িয়া সকলে একযোগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভীতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থতমত খাইয়া বলিল—লকৃড়ি কয়লা হুজুর।

আমার ঘোড়ায় চড়া মূর্ত্তি দেখিয়া লোকগুলা ভয় পাইয়াছে, বুঝিলাম আমাকে বন-বিভাগের লোক ভাবিয়াছে। এসব অঞ্চলের বন গভর্নমেণ্টের খাসমহলের অন্তর্ভূক্ত, বিনা অনুমতিতে বন কাটা কি কয়লা পোড়ানো বে-আইনী।

তাহাদের আশ্বস্ত করিলাম। আমি বন বিভাগের কর্ম্মচারী নই, কোন ভয় নাই তাদের, যত ইচ্ছা কয়লা করুক। একটু জল পাওয়া যায় এখানে? খাওয়া ফেলিয়া একজন ছুটিয়া গিয়া মাজা ঝকঝকে জামবাটিতে পরিষ্কার জল আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কাছেই বনের মধ্যে ঝরণা আছে, তার জল।

ঝরণা?—আমার কৌতূহল হইল। ঝরণা কোথায়? শুনি নাই তো এখানে ঝরণা আছে!

উহারা বলিল—ঝরণা নাই হুজুর, উহুই! পাথরের গর্ত্তে একটু একটু করে জল জমে, এক ঘণ্টায় আধ সের জল হয়, খুব সাফা পানি, ঠাণ্ডাও বহুৎ।

জায়গাটা দেখিতে গেলাম। কি সুন্দর ঠাণ্ডা বনবীথি! পাখীরা বোধ হয় এই নির্জ্জন অরণ্যে শিলাতলে শরৎ বসন্তের দিনে, কি গভীর নিশীথ রাত্রে জলকেলি করিতে নামে। বনের খুব ঘন অংশে বড় বড় পিয়াল ও কেঁদের ডালপালা দিয়া ঘেরা একটা নাবাল জায়গা, তলাটা কালো পাথরের, একখানা খুব বড় প্রস্তর-বেদী যেন কালে ক্ষয় পাইয়া ঢেঁকির গড়ের মত হইয়া গিয়াছে। যেন খুব একটা বড় প্রাকৃতিক পাথরের খোরা। তার উপর সপুষ্প পিয়াল শাখা ঝুপসি হইয়া পড়িয়া ঘন ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পিয়াল ও শাল মঞ্জরীর সুগন্ধ বনের ছায়ায় ভুরভুর করিতেছে। পাথরের খোলে বিন্দু বিন্দু জল জমিতেছে, এইমাত্র জল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, এখনও আধ ছটাক জলও জমে নাই।

উহারা বলিল—এ ঝরণার কথা অনেকে জানে না হুজুর, আমরা বনে জঙ্গলে হরবখ্‌ত্‌ বেড়াই, আমরা জানি।

আরও মাইল-পাঁচেক গিয়া কারো নদী পড়িল, খুব উঁচু বালির পাড় দু-ধারে, অনেকটা খাড়া নীচে নামিয়া গেলে তবে নদীর খাত, বর্ত্তমানে খুব সামান্যই জল আছে, দু-পারে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালুকাময় তীর ধূ-ধূ করিতেছে। যেন পাহাড় হইতে নামিতেছে মনে হইল; ঘোড়ায় জল পার হইয়া যাইতে যাইতে এক জায়গায় ঘোড়ার জিন পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিল, রেকাবদলসুদ্ধ পা মুড়িয়া অতি সন্তর্পণে পার হইলাম। ওপারে ফুটন্ত রক্তপলাশের বন, উঁচু-নীচু রাঙা-রাঙা শিলাখণ্ড, আর শুধুই পলাশ আর পলাশ, সর্ব্বত্র পলাশ ফুলের মেলা। একবার দূরে একটা বুনো মহিষকে ধাতুপফুলের বন হইতে বাহির হইতে দেখিলাম—সেটা পাথরের উপর দাঁড়াইয়া পায়ের খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। ঘোড়ার মুখের লাগাম কষিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম; ত্রিসীমানায় কোথাও জন-মানব নাই, যদি শিং পাতিয়া তাড়া করিয়া আসে? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সেটা আবার পথের পাশের বনের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নদী ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়া পথের দৃশ্য কি চমৎকার! তবুও তো ঠিক-দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অপরাহ্নের ছায়া নাই, রাত্রির জ্যোৎস্নালোক নাই—কিন্তু সেই নিস্তব্ধ খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে বাঁ-দিকে বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, দক্ষিণে লৌহপ্রস্তর ও পাইয়োরাইট ছড়ানো উঁচু-নীচু জমিতে শুধুই শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ ও রাঙা ধাতুপফুলের জঙ্গল। সেই জায়গাটা সত্যিই একেবারে অদ্ভুত; অমন রুক্ষ অথচ সুন্দর, পুষ্পাকীর্ণ অথচ উদ্দাম ও অতিমাত্রায় বন্য ভূমিশ্রী দেখিই নাই কখনও জীবনে। আর তার উপর ঠিক-দুপুরের খাঁ-খাঁ রৌদ্র। মাথার উপরের আকাশ কি ঘন নীল! আকাশে কোথাও একটা পাখী নাই, শূন্য—মাটিতে বন্য-প্রকৃতির বুকে কোথাও একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই—নিঃশব্দ, ভয়ানক নিরালা। চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই বিজন রূপলীলার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম—ভারতবর্ষে এমন জায়গা আছে জানিতাম না তো! এ যেন ফিল্‌মে দেখা দক্ষিণ-আমেরিকার আরিজোনা বা নাভাজো মরুভূমি কিংবা হড্‌সনের পুস্তকে বর্ণিত গিলা নদীর অববাহিকা-অঞ্চল।

মেলায় পৌছিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। প্রকাণ্ড মেলা, যে দীর্ঘ শৈলশ্রেণী পথের বাঁ-ধারে আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোশ-তিনেক ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তারই সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট একটা গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে চারিদিকে শাল পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে। মহিষারড়ি, কড়ারী, তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারূপ প্রভৃতি দূরের নিকটের নানা স্থান হইতে লোকজন, প্রধানত মেয়েরা আসিয়াছে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়াল ফুল কি রাঙা ধাতুপফুল গুঁজিয়া, কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুণী আটকানো, বেশ সুঠাম, সুললিত, লাবণ্যভরা দেহের গঠন প্রায় অনেক মেয়েরই—তারা আমোদ করিয়া খেলো পুঁতির দানার মালা, সস্তা জাপানী কি জার্ম্মানীর সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না, অতি বাজে এসেন্স কিনিতেছে, পুরুষেরা এক পয়সায়

দশটা কালী সিগারেট কিনিতেছে, ছেলে মেয়েরা তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলে-ভাজা খাজা কিনিয়া খাইতেছে।

হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্ত্ত কান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ী ডাঙায় যুবক-যুবতীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-খুশী গল্প-গুজব আদর-আপ্যায়নে মত্ত ছিল—কান্নাটা উঠিল সেখান হইতেই। ব্যাপার কি? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল? একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তা নয়, কোনও একটি বধূর সহিত তার পিত্রালয়ের গ্রামের কোনও মেয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে—এদেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ীর মানুষ দেখিয়া কাঁদে নাই—অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামিগৃহে বড় সুখেই আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা।

এক জায়গায় বইয়ের দোকানে চটের থলের উপর বই সাজাইয়া বসিয়াছে—হিন্দী গোলেবকাউলী, লয়লা-মজনু, বেতাল পচিশী, প্রেমসাগর ইত্যাদি। প্রবীণ লোকে কেহ কেহ বই উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছে—বুঝিলাম বুকস্টলে দণ্ডায়মান পাঠকের অবস্থা আনাতোঁল ফ্রাঁসের প্যারিসেও যেমন, এই বন্য দেশে কড়ারী তিনটাঙার হোলির মেলাতেও তাহাই। বিনা পয়সায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া লইতে পারিলে কেহ বড়-একটা বই কেনে না। দোকানীর ব্যবসাবুদ্ধি কিন্তু বেশ প্রখর, সে জনৈক তন্ময়চিত্ত পাঠককে জিজ্ঞাসা করিল—কেতাব কিনবে কি? না হয় তো রেখে দিয়ে অন্য কাজ দেখ। মেলার স্থান হইতে কিছুদূরে একটা শালবনের ছায়ায় অনেক লোক রাঁধিয়া খাইতেছে—ইহাদের জন্য মেলার এক অংশে তরিতরকারীর বাজার বসিয়াছে, কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় শুঁটকী কুচো চিংড়ী ও নাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম বিক্রয় হইতেছে। লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য। তা ছাড়া আছে কাঁচা পেঁপে, শুকনো কুল, কেঁদ-ফুল, পেয়ারা ও বুনো শিম।

হঠাৎ কাহার ডাক কানে গেল—ম্যানেজারবাবু,—

চাহিয়া দেখি ভিড় ঠেলিয়া লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর ভাই ব্রহ্মা মাহাতো আগাইয়া আসিতেছে।—হুজুর, আপনি কখন এলেন? সঙ্গে কে?

বলিলাম—ব্রহ্মা এখানে কি মেলা দেখতে?

—না হুজুর, আমি মেলার ইজারাদার। আসুন, আসুন, আমার তাঁবুতে চলুন একটু পায়ের ধুলো দেবেন।

মেলার একপাশে ইজারাদারের তাঁবু, সেখানে ব্রহ্মা খুব খাতির করিয়া আমায় লইয়া গিয়া একখানা পুরনো বেন্ট্‌উড চেয়ারে বসাইল। সেখানে একজন লোক দেখিলাম, অমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর দেখিব না। লোকটি কে জানি না, ব্রহ্মা মাহাতোর কোন

কর্ম্মচারী হইবে। বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছর, গা খালি, রং কালো, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো। তাহার হাতে একটা বড় থলিতে এক থলি পয়সা, বগলে একখানা খাতা, সম্ভবত মেলার খাজনা আদায় করিয়া বেড়াইতেছে, ব্রহ্মা মাহাতোকে হিসাব বুঝাইয়া দিবে।

মুগ্ধ হইলাম তাহার চোখের দৃষ্টির ও মুখের অসাধারণ দীন-নম্র ভাব দেখিয়া। যেন কিছু ভয়ের ভাবও মেশানো ছিল সে দৃষ্টিতে। ব্রহ্মা মাহাতো রাজা নয়, ম্যাজিস্ট্রেট নয়, কাহারও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নয়, গভর্নমেণ্টের খাসমহলের জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা মাত্র—লইয়াছেই না হয় মেলার ইজারা,—এত দীন ভাব কেন ও লোকটার তার কাছে? তারও পরে আমি যখন তাঁবুতে গেলাম, স্বয়ং ব্রহ্মা মাহাতো আমাকে অত খাতির করিতেছে দেখিয়া লোকটা আমার দিকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম ও দীনতার দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে এক-আধ বারের বেশী চাহিতে ভরসা পাইল না। ভাবিলাম লোকটার অত দীনহীন দৃষ্টি কেন? খুব কি গরীব? লোকটার মুখে কি যেন ছিল, বার-বার আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, **Blessed are the meek for theirs is the Kingdom of Heaven** এমনধারা সত্যিকার দীন-বিনম্র মুখ কখনও দেখি নাই।

ব্রহ্মা মাহাতোকে লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তার বাড়ী কড়ারী তিনটাঙা, যে গ্রামে ব্রহ্মা মাহাতোর বাড়ী; নাম গিরিধারীলাল, জাতি গাঙ্গোতা। উহার এক ছোট ছেলে ছাড়া আর সংসারে কেহই নাই। অবস্থা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম—অতি গরীব। সম্প্রতি ব্রহ্মা তাহাকে মেলায় দোকানের আদায়কারী কর্ম্মচারী বহাল করিয়াছে—দৈনিক চার আনা বেতন ও খাইতে দিবে।

গিরিধারীলালের সঙ্গে আমার আরও দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে শেষবারের সাক্ষাতের সময়কার অবস্থা বড় করুণ, পরে সে-সব কথা বলিব। অনেক ধরণের মানুষ দেখিয়াছি, কিন্তু গিরিধারীলালের মত সাচ্চা মানুষ কখনও দেখি নাই। কত কাল হইয়া গেল, কত লোককে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু যাহাদের কথা চিরকাল মনে আঁকা আছে ও থাকিবে, সেই অতি অল্প কয়েকজন লোকের মধ্যে গিরিধারীলাল একজন।

৩

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, এখনই রওনা হওয়া দরকার, ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো তো একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, তাঁবুতে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। অসম্ভব! এই ত্রিশ মাইল রাস্তা অবেলায় ফেরা! হুজুর কলিকাতার মানুষ, এ অঞ্চলের পথের খবর জানা নাই তাই একথা বলিতেছেন। দশ মাইল যাইতে সূর্য্য যাইবে ডুবিয়া, না হয় জ্যোৎস্নারাত্রিই হইল, ঘন পাহাড়-জঙ্গলের পথ, মানুষ-জন কোথাও নাই, বাঘ বাহির হইতে পারে, বুনো মহিষ

আছে, বিশেষত পাকা কুলের সময়, এখন ভালুক তো নিশ্চয়ই বাহির হইবে, কারো নদীর ওপারে মহালিখারূপের জঙ্গলে এই তো সেদিনেও এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে বাঘে লইয়াছে, বেচারী জঙ্গলের পথে একা আসিতেছিল। অসম্ভব, হুজুর। রাত্রে এখানে থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন গরীবের ডেরায়। কাল সকালে তখন ধীরে-সুস্থে গেলেই হইবে।

এ বাসন্তী পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে জনহীন পাহাড় জঙ্গলের পথ একা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার প্রলোভন আমার কাছে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। জীবনে আর কখনও হইবে না, এই হয়ত শেষ, আর যে অপূর্ব্ব বন-পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি পথে! জ্যোৎস্নারাত্রে—বিশেষত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাহাদের রূপ একবার দেখিব না যদি, তবে এতটা কষ্ট করিয়া আসিবার কি অর্থ হয়?

সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া রওনা হইলাম। ব্রহ্মা মাহাতো ঠিকই বলিয়াছিল, কারো নদীতে পৌছিবার কিছু পূর্ব্বেই টকটকে লাল সুবৃহৎ সূর্য্যটা পশ্চিম দিকচক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার পিছনে অস্ত গেল। কারো নদীর তীরের বালিয়াড়ির উপর যখন ঘোড়াসুদ্ধ উঠিয়াছি, এইবার এখান হইতে ঢালু বালির পথে নদীগর্ভে নামিব—হঠাৎ সেই সূর্য্যাস্তের দৃশ্য এবং ঠিক পূর্ব্বে বহু দূরে কৃষ্ণ রেখার মত পরিদৃশ্যমান মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাথায় নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্য—যুগপৎ এই অস্ত ও উদয়ের দৃশ্যে থমকিয়া ঘোড়াকে লাগাম কষিয়া দাঁড় করাইলাম। সেই নির্জ্জন অপরিচিত নদীতীরে সমস্তই যেন একটা অবাস্তব ব্যাপারের মত দেখাইতেছে—

পথে সর্ব্বত্র পাহাড়ের ঢালুতে ও ডাঙায় ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল, মাঝে মাঝে সরু পথটাকে যেন দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার কোথাও কিছুদূরে সরিয়া যাইতেছে। কি ভয়ঙ্কর নির্জ্জন চারিদিক, দিনমানে যা-হয় একরূপ ছিল, জ্যোৎস্না উঠিবার পর মনে হইতেছে যেন অজানা ও অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় পরীরাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ভয়ও হইল, মনে পড়িল মেলায় ব্রহ্মা মাহাতো এবং কাছারিতে প্রায়-সকলেই রাত্রে এপথে একা আসিতে বারবার নিষেধ করিয়াছিল, মনে পড়িল নন্দকিশোর গোসাঁই নামে আমাদের একজন বাথানদার প্রজা আজ মাস দুই-তিন আগে কাছারিতে বসিয়া গল্প করিয়াছিল এই মহালিখারূপের জঙ্গলে সেই সময় কাহাকে বাঘে খাওয়ার ব্যাপার। জঙ্গলের এখানে-ওখানে বড় বড় কুলগাছে কুল পাকিয়া ডাল নত হইয়া আছে—তলায় বিস্তর শুক্‌নো ও পাকা কুল ছড়ানো—সুতরাং ভালুক বাহির হইবারও সম্ভাবনা খুবই। বুনো মহিষ এ বনে না থাকিলেও মোহনপুরা জঙ্গল হইতে ওবেলার মত এক-আধটা ছিটকাইয়া আসিতে কতক্ষণ! সম্মুখে এখনও পনের মাইল নির্জ্জন বনপ্রান্তরের উপর দিয়া পথ।

ভয়ের অনুভূতি চারিপাশের সৌন্দর্য্যকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক এক স্থানে পথ দক্ষিণ হইতে খাড়া উত্তরে ও উত্তর হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া গিয়াছে, পথের খুব কাছে বাম দিকে সর্ব্বত্রই একটানা অনুচ্চ শৈলমালা, তাদের ঢালুতে গোলগোলি ও পলাশের জঙ্গল,

উপরের দিকে শাল ও বড় বড় ঘাস। জ্যোৎস্না এবার ফুটফুট করিতেছে, গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বন্য-ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রান্তর ভরপুর, অনেক দূরে পাহাড়ে-সাঁওতালেরা জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে, সে কি অভিনব দৃশ্য, মনে হইতেছে পাহাড়ে আলোর মালা কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে।

কখনও যদি এসব দিকে না আসিতাম, কেহ বলিলেও বিশ্বাস করিতাম না যে, বাংলা দেশের এত নিকটেই এরূপ সম্পূর্ণ জনহীন অরণ্যপ্রান্তর ও শৈলমালা আছে, যাহা সৌন্দর্য্যে আরিজোনার পাথুরে মরুদেশ বা রোডেসিয়ার বুশভেল্ডের. অপেক্ষা কম নয় কোন অংশে—বিপদের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এসব অঞ্চল নিতান্ত পুতুপুতু বলা চলে না, সন্ধ্যার পরেই যেখানে বাঘ-ভালুকের ভয়ে লোকে পথ হাঁটে না।

এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলাম, এ এক আলাদা জীবন, যারা ঘরের দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না, সংসার করা যাদের রক্তে নাই, সেই সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এমন জীবনই তো কাম্য। কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম আসিয়া এখানকার এই ভীষণ নির্জ্জনতা ও সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রা কি অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই ভাল, এই বর্ব্বর রুক্ষ বন্য প্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখণ্ড ও শালপলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশতলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু-হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোনও সম্পদ বিনিময় করিতে চাই না।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারি ধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাদের কখনও হাতছানি দিয়ে ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোন কালেই।

মহালিখারূপের জঙ্গল শেষ হইতেই মাইল চার গিয়া আমাদের সীমানা শুরু হইল। রাত প্রায় নটার সময়ে কাছারি পৌঁছিলাম।

৪

কাছারিতে ঢোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি একদল লোক কাছারির কম্পাউণ্ডে কোথা হইতে আসিয়া ঢোল বাজাইতেছে। ঢোলের শব্দে কাছারির সিপাহী কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও ডাকিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় জমাদার মুক্তিনাথ সিং দরজার কাছে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—একবার বাইরে আসবেন মেহেরবানি করে?

—কি জমাদার, কি ব্যাপার ?

—হুজুর, দক্ষিণ দেশে এবার ধান মরে যাওয়াতে অজন্মা হয়েছে, লোকে চালাতে না পেরে দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে বেরিয়েছে। ওরা কাছারিতে হুজুরের সামনে নাচবে বলে এসেছে, যদি হুকুম হয় তবে নাচ দেখায়।

নাচের দল আমার আপিস-ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুক্তিনাথ সিং জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ নাচ তাহারা দেখাইতে পারে। দলের মধ্যে একজন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীতভাবে বলিল—হুজুর, হো হো নাচ আর ছক্কর-বাজি নাচ।

দলটি দেখিয়া মনে হইল নাচের কিছু জানুক না-জানুক পেটে দুটি খাইবার আশায় সব ধরণের, সব বয়সের লোক ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা নাচিল ও গান গাহিল। বেলা পড়িবার সময় তাহারা আসিয়াছিল, ক্রমে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিল, তখনও তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত ধরিয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে। অদ্ভুত ধরণের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে এই দিগন্তপরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গানই চমৎকার খাপ খায়। একটি গানের অর্থ এইরূপ :—

'শিশুকালে বেশ ছিলাম।

আমাদের গ্রামের পিছনে যে পাহাড়, তার মাথায় কেঁদ বন, সেই বনে কুড়িয়ে বেড়াতাম পাকা ফল, গাঁথতাম পিয়াল ফুলের মালা।

দিন খুব সুখেই কাট্‌ত, ভালবাসা কাকে বলে, তা তখন জানতাম না।

পাচ-নহরী ঝরণার ধারে সেদিন কররা পাখী মারতে গিয়েছি।

হাতে আমার বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।

তুমি কুসুম-রঙে ছাপানো শাড়ী পরে এসেছিলে জল ভরতে।

দেখে বললে—ছিঃ, পুরুষমানুষে কি সাত-নলি দিয়ে বনের পাখী মারে !

আমি লজ্জায় ফেলে দিলাম বাঁশের নল, ফেলে দিলাম আঠা-কাঠির তাড়া।

বনের পাখী গেল উড়ে, কিন্তু আমার মন-পাখী তোমার প্রেমের ফাঁদে চিরদিনের মত যে ধরা পড়ে গেল !

আমায় সাত-নলি চেলে পাখী মারতে বারণ করে এ কি করলে তুমি আমার ! কাজটা কি ভাল হল সখি ?'

ওদের ভাষা কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না। গানগুলি সেই জন্যই বোধ হয় আমার কাছে আরও অদ্ভুত লাগিল। এই পাহাড় ও পিয়ালবনের সুরে বাঁধা এদের গান, এখানেই ভাল লাগিবে।

ইহাদের দক্ষিণা মাত্র চার আনা পয়সা। কাছারির আমলারা একবাক্যে বলিল—হুজুর, তা-ই অনেক জায়গায় পায় না, বেশী দিয়ে ওদের লোভ বাড়াবেন না, তা ছাড়া বাজার নষ্ট

হবে। যা রেট্ তার বেশী দিলে গরীব গেরস্তরা নিজেদের বাড়ীতে নাচ করাতে পারবে না হুজুর।

অবাক হইলাম—দু-তিন ঘণ্টা প্রাণপণে খাটিয়াছে, কম্‌সে কম সতের-আঠারজন লোক—চার আনায় ইহাদের জন-পিছু একটা করিয়া পয়সাও তো পড়িবে না। আমাদের কাছারিতে নাচ দেখাইতে এই জনহীন প্রান্তর ও বন পার হইয়া এতদূর আসিয়াছে। সমস্ত দিনের মধ্যে ইহাই রোজগার। কাছে আর কোনও গ্রাম নাই যেখানে আজ রাত্রে নাচ দেখাইবে।

রাত্রে কাছারিতে তাহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সকালে তাহাদের দলের সর্দ্দারকে ডাকাইয়া দুইটি টাকা দিতে লোকটা অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নাচ দেখিয়া খাইতে কেহই দেয় না, তাহার উপর আবার দু-টাকা দক্ষিণা!

তাহাদের দলে বার-তের বছরের একটি ছেলে আছে, ছেলেটির চেহারা যাত্রাদলের কৃষ্ণঠাকুরের মত। এক-মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ভারি শান্ত, সুন্দর চোখ-মুখ, কুচকুচে কালো গায়ের রং। দলের সামনে দাঁড়াইয়া সে-ই প্রথমে সুর ধরে ও পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে যখন—ঠোঁটের কোণে হাসি মিলাইয়া থাকে। সুন্দর ভঙ্গিতে হাত দুলাইয়া মিষ্ট সুরে গায়—

রাজা লিজিয়ে সেলাম ম্যায় পরদেশিঁয়া।

শুধু দুটি খাইবার জন্য ছেলেটি দলের সঙ্গে ঘুরিতেছে। পয়সার ভাগ সে বড়-একটা পায় না। তাও সে খাওয়া কি। চীনা ঘাসের দানা, আর নুন। বড়জোর তার সঙ্গে একটু তরকারি—আলুপটল নয়, জংলী গুড়মি ফল ভাজা, নয়ত বাথুয়া শাক সিদ্ধ, কিংবা ধুঁধুল ভাজা। এই খাইয়াই মুখে হাসি সর্ব্বদা লাগিয়া আছে। দিব্যি স্বাস্থ্য, অপূর্ব্ব লাবণ্য সারা অঙ্গে।

দলের অধিকারীকে বলিলাম, ধাতুরিয়াকে রেখে যাও এখানে। কাছারিতে কাজ করবে, আর থাকবে খাবে।

অধিকারী সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোকটি, সে-ও এক অদ্ভুত ধরণের লোক। এই বাষট্টি বছরেও সে একেবারে বালকের মত।

বলিল—ও থাকতে পারবে না হুজুর। গাঁয়ের সব লোকের সঙ্গে একসঙ্গে আছে, তাই ও আছে ভাল। একলা থাকলে মন কেমন করবে, ছেলেমানুষ কি থাকতে পারে? আবার আপনার সামনে ওকে নিয়ে আসব হুজুর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

জঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সার্ভে হইতেছিল। কাছারি হইতে তিন ক্রোশ দূরে বোমাইবুরুর জঙ্গলে আমাদের এক আমীন রামচন্দ্র সিং এই উপলক্ষে কিছুদিন ধরিয়া আছে। সকালে খবর পাওয়া গেল রামচন্দ্র সিং হঠাৎ আজ দিন দুই-তিন হইল পাগল হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া তখনই লোকজন লইয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। বোমাইবুরুর জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, খুব ফাঁকা উঁচু-নীচু প্রান্তরে মাঝে মাঝে বড বড় গাছ, ডাল হইতে সরু দড়ির মত লতা ঝুলিতেছে, যেন জাহাজের উঁচু মাস্তুলের সঙ্গে দড়াদড়ি বাঁধা। বোমাইবুরুর জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে লোকবসতি-শূন্য।

গাছপালার নিবিড়তা হইতে দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাশে ছাওয়া ছোট্ট দুখানা কুঁড়ে। একখানা একটু বড়, এখানাতে রামচন্দ্র আমীন থাকে, পাশের ছোটখানায় তার পেয়াদা আসরফি টিণ্ডেল থাকে। রামচন্দ্র নিজের কাঠের মাচার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। আমাদের দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রামচন্দ্র? কেমন আছ?

রামচন্দ্র হাতজোড করিয়া নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু আসরফি টিণ্ডেল সে কথার উত্তর দিল। বলিল—বাবু একটা বড় আশ্চর্য্য কথা। আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না। আমি নিজেই কাছারিতে গিয়ে খবর দিতাম, কিন্তু আমীনবাবুকে ফেলে যাই বা কি করে? ব্যাপারটা এই, আজ ক'দিন থেকে আমীনবাবু বলছেন একটা কুকুর এসে রাত্রে তাঁকে বড় বিরক্ত করে। আমি শুই এই ছোট ঘরে, আমীন-বাবু শুয়ে থাকেন এখানে। দু-তিনদিন এই রকম গেল। রোজই উনি বলেন—আরে কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর আসে রাত্রে। মাচার ওপর বিছানা পেতে শুই, কুকুরটা এসে মাচার নীচে কেঁউ কেঁউ করে, গায়ে ঘেঁষ দিতে আসে। শুনি, বড়-একটা গা করি নে। আজ চারদিন আগে উনি অনেক রাত্রে বললেন—আসরফি, শীগগির এসো বেরিয়ে, কুকুরটা এসেছে। আমি তার লেজ চেপে ধরে রেখেছি। লাঠি নিয়ে এস।

আমি ঘুম ভেঙে লাঠি-আলো নিয়ে ছুটে যেতে দেখি—বললে বিশ্বাস করবেন না হুজুর, কিন্তু হুজুরের সামনে মিথ্যে বলব এমন সাহস আমার নেই—একটি মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলাম। তার পর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি আমীনবাবু বিছানা হাতড়ে দেশলাই খুঁজছেন। উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে?

আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে তো বার হয়ে গেল।

উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেয়াদবি? মেয়েমানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে

দুপুর রাতে ? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নীচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। নেশা করতে শুরু করেছ বুঝি ? রিপোর্ট করে দেব সদরে।

পরদিন রাত্রে আমি সজাগ হয়ে ছিলাম অনেক রাত পর্য্যন্ত। যেই একটু ঘুমিয়েছি অমনি আমীনবাবু ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আমার ঘরের দোর পর্য্যন্ত গিয়েছি, এমন সময় দেখি একটি মেয়ে ওঁর ঘরের উত্তর দিকের বেড়ার গা বেয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। তখনই হুজুর আমি নিজে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। অতটুকু সময়ের মধ্যে লুকোবে কোথায়, যাবেই বা কত দূর ? বিশেষ করে আমরা জঙ্গল জরীপ করি, অন্ধি-সন্ধি সব আমাদের জানা। কত খুঁজলাম বাবু, কোথাও তার চিহ্নটি পাওয়া গেল না। শেষে আমার কেমন সন্দেহ হল, মাটিতে আলো ধরে দেখি কোথাও পায়ের দাগ নেই, আমার নাগরা জুতোর দাগ ছাড়া।

আমীনবাবুকে আমি একথা বললাম না আর সেদিন। একা দুটি প্রাণী থাকি এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে হুজুর। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আর বোমাইবুরু জঙ্গলের একটু দুর্নামও শোনা ছিল। ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, বোমাইবুরু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দূরে—একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় করে জঙ্গলের পথে ফিরছিলেন ; ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত-ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে বলে ওদের 'ডামাবাণু'—এক ধরণের জীনপরী, নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে থাকে। মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে।

হুজুর, পরদিন রাত্রে আমি নিজে আমীনবাবুর তাঁবুতে শুয়ে জেগে রইলাম সারারাত। সারারাত জেগে জরীপের থাকবন্দীর হিসেব কষতে লাগলাম। বোধ হয় শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসে থাকবে—হঠাৎ কাছেই একটা কিসের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলাম—দেখি আমীন সাহেব ঘুমুচ্ছেন ওঁর খাটে, আর খাটের নীচে কি-একটা ঢুকেছে। মাথা নীচু করে খাটের নীচে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আধ-আলো আধ-অন্ধকারে প্রথমটা মনে হল একটি মেয়ে যেন গুটি-সুটি মেরে খাটের তলায় বসে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে—স্পষ্ট দেখলাম হুজুর, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। এমন কি, তার মাথায় বেশ কালো চুলের গোছা পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখেছি। লণ্ঠনটা ছিল যেখানটাতে বসে হিসেব কষছিলাম সেখানে—হাত ছ সাত দূরে। আরও ভাল করে দেখব বলে লণ্ঠনটা যেমন আনতে গিয়েছি, কি একটা প্রাণী ছুটে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পালাতে গেল,—দোরের কাছে লণ্ঠনের আলোটা বাঁকা ভাবে পড়েছিল, সেই আলোতে দেখলাম একটা বড় কুকুর, কিন্তু তার আগাগোড়া সাদা, হুজুর, কালোর চিহ্ন কোথাও নেই তার গায়ে।

আমীন সাহেব জেগে বললেন—কি, কি ? বললাম—ও কিছু নয়, একটা শেয়াল কি কুকুর ঘরে ঢুকেছিল। আমীন সাহেব বললেন—কুকুর ? কি রকম কুকুর ? বললাম—সাদা কুকুর। আমীন সাহেব যেন একটা নিরাশার সুরে বললেন—সাদা ঠিক দেখেছ ? না কালো ? বললাম—না, সাদাই হুজুর।

আমি একটু বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়—সাদা না হয়ে কালো হলেই বা আমীনবাবুর কি সুবিধা হবে তাতে বুঝলাম না। উনি ঘুমিয়ে পড়লেন—কিন্তু আমার যে কেমন একটা ভয় ও অস্বস্তি বোধ হল কিছুতেই চোখের পাতা বোজাতে পারলাম না। খুব সকালে উঠে খাটের নীচেটা একবার কি মনে করে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে সেখানে একগাছা কালো চুল পেলাম। এই সে চুলও রেখেছি, হুজুর। মেয়েমানুষের মাথার চুল। কোথা থেকে এল এ চুল? দিব্যি কালো কুচকুচে নরম চুল। কুকুর—বিশেষতঃ সাদা কুকুরের গায়ে এত বড়, নরম কালো চুল হয় না। এ হল গত রবিবার অর্থাৎ আজ তিন দিনের কথা। এই তিন দিন থেকে আমীন সাহেব তো এক রকম উন্মাদ হয়েই উঠেছেন। আমার ভয় করছে হুজুর—এবার আমার পালা কিনা তাই ভাবছি।

গল্পটা বেশ আষাঢ়ে-গোছের বটে। সে চুলগাছি হাতে করিয়া দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মেয়েমানুষের মাথার চুল, সে-বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ রহিল না। আসরফি টিণ্ডেল ছোকরা মানুষ, সে যে নেশা-ভাঙ করে না, একথা সকলেই একবাক্যে বলিল।

জনমানবশূন্য প্রান্তর ও বনঝোপের মধ্যে একমাত্র তাঁবু এই আমীনের নিকটতম লোকালয় হইতেছে লবটুলিয়া—ছয় মাইল দূরে। মেয়েমানুষই বা কোথা হইতে আসিতে পারে অত গভীর রাত্রে—বিশেষ যখন এই সব নির্জ্জন বনপ্রান্তরে বাঘ ও বুনোশুয়োরের ভয়ে সন্ধ্যার পরে আর লোকে পথ চলে না?

যদি আসরফি টিণ্ডেলের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। অথবা এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে, এই জনহীন বনজঙ্গল ও ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে বিংশ শতাব্দী তো প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায়ই নাই—উনবিংশ শতাব্দীও পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতীত যুগের রহস্যময় অন্ধকারে এখনও এসব অঞ্চল আচ্ছন্ন—এখানে সবই সম্ভব।

সেখানকার তাঁবু উঠাইয়া রামচন্দ্র আমীন ও আসরফি টিণ্ডেলকে সদর কাছারিতে লইয়া আসিলাম। রামচন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, ক্রমশ সে ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। সারারাত্রি চীৎকার করে, বকে, গান গায়। ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে তাহার এক দাদা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

এই ঘটনার একটা উপসংহার আছে, যদিও তাহা ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান ঘটনার সাত-আট মাস পরে, তবুও এখানেই তাহা বলিয়া রাখি।

এ ঘটনার ছ-মাস পরে চৈত্র মাসের দিকে দুটি লোক কাছারিতে আমার সঙ্গে দেখা করিল। একজন বৃদ্ধ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়, অন্যটি তার ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের বাড়ী বালিয়া জেলায়, আমাদের এখানে আসিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে অর্থাৎ আমাদের জঙ্গলে খাজনা দিয়া তাহারা গরু-মহিষ চরাইবে।

অন্য সব চরি-মহাল তখন বিলি হইয়া গিয়াছে, বোমাইবুরুর জঙ্গলটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, সেইটাই বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাল দেখিয়াও

আসিল। খুব খুশী, বলিল, খুব বড় বড় ঘাস হুজুর, বহুৎ আচ্ছা জঙ্গল। হুজুরের মেহেরবানি না হলে অমন জঙ্গল মিলত না।

রামচন্দ্র ও আসরফি টিণ্ডেলের কথা তখন আমার মনে ছিল না, থাকিলেও বৃদ্ধের নিকট তাহা হয়ত বলিতাম না। কারণ, ভয় পাইয়া সে ভাগিয়া গেলে জমিদারের লোকসান। স্থানীয় লোকেরা কেহই ও জঙ্গল ইজারা লইতে ঘেঁষে না, রামচন্দ্র আমীনের সেই ব্যাপারের পরে।

মাসখানেক পরে বৈশাখের গোড়ায় একদিন বৃদ্ধ লোকটি কাছারিতে আসিয়া হাজির, মহা রাগত ভাব, তার পিছনে সেই ছেলেটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়াইয়া।

বলিলাম—কি ব্যাপার ?

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—এই বাঁদরটাকে নিয়ে এলাম হুজুরের কাছে দরবার করতে। ওকে আপনি পা থেকে খুলে পঁচিশ জুতো মারুন, ও জব্দ হয়ে যাক্।

—কি হয়েছে কি ?

—হুজুরের কাছে বলতে লজ্জা করে। এই বাঁদর, এখানে এসে পর্য্যন্ত বিগড়ে যাচ্ছে। আমি সাত-আট দিন প্রায়ই লক্ষ্য করছি—লজ্জা করে বলতে হুজুর—প্রায়ই মেয়েমানুষ ঘর থেকে বার হয়ে যায়। একটা মাত্র খুপরি হাত-আষ্টেক লম্বা, ঘাসে ছাওয়া, ও আর আমি দু-জনে শুই। আমার চোখে ধুলো দিতে পারাও সোজা কথা নয়। দু-দিন যখন দেখলাম তখন ওকে জিগ্যেস করলাম, ও একেবারে গাছ থেকে পড়ল হুজুর। বলে—কই, আমি তো কিছুই জানি নে! আরও দু-দিন যখন দেখলাম, তখন একদিন দিলাম আচ্ছা করে ওকে মার। চোখের সামনে বিগড়ে যাবে ছেলে ? কিন্তু তার পরেও যখন দেখলাম, এই পরশু রাত্রেই হুজুর—তখন ওকে আমি হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, হুজুর শাসন করে দিন।

হঠাৎ রামচন্দ্র আমীনের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কত রাত্রে দেখেছ ?

—প্রায়ই শেষরাত্রের দিকে হুজুর। এই রাতের দু-এক ঘড়ি বাকি থাকতে।

—ঠিক দেখেছ, মেয়েমানুষ ?

—হুজুর, আমার চোখের তেজ এখনও তত কম হয়নি। জরুর মেয়েমানুষ, বয়সেও কম, কোনদিন পরনে সাদা ধোয়া শাড়ী, কোনদিন বা লাল, কোনদিন কালো। একদিন মেয়েমানুষটা বেরিয়ে যেতেই আমি পেছন পেছন গেলাম। কাশের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল, টের পেলাম না। ফিরে এসে দেখি, ছেলে আমার যেন খুব ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে, ডাকতেই ধড়মড় করে ঠেলে উঠল, যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠল। এ রোগের ওষুধ কাছারি ভিন্ন হবে না বুঝলাম, তাই হুজুরের কাছে—

ছেলেটিকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ সব কি শুনছি তোমার নামে ?

ছেলেটি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। সমস্ত দিন জঙ্গলে মহিষ চরিয়ে বেড়াই—রাতে মড়ার মত ঘুমুই,

ভোর হলে তবে ঘুম ভাঙে। ঘরে আগুন লাগলেও আমার হুঁশ থাকে না।

বলিলাম—তুমি কোনদিন কিছু ঘরে ঢুকতে দেখনি ?

—না, হুজুর। আমার ঘুমুলে হুঁশ থাকে না।

এ-বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। বৃদ্ধ খুব খুশী হইল, ভাবিল আমি আড়ালে লইয়া গিয়া ছেলেকে খুব শাসন করিয়া দিয়াছি। দিন-পনের পরে একদিন ছেলেটি আমার কাছে আসিল। বলিল—হুজুর, একটা কথা আছে। সেবার যখন আমি বাবার সঙ্গে কাছারিতে এসেছিলাম, তখন আপনি ও-কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন যে আমি কোনও কিছু ঘরে ঢুকতে দেখেছি কি না ?

—কেন বল তো ?

—হুজুর, আমার ঘুম আজকাল খুব সজাগ হয়েছে—বাবা ওই রকম করেন বলে আমার মনে কেমন একটা ভয়ের দরুণই হোক বা যার দরুণই হোক। তাই ক-দিন থেকে দেখছি, রাত্রে একটা সাদা কুকুর কোথা থেকে আসে—অনেক রাত্রে আসে, ঘুম ভেঙে এক-একদিন দেখি সেটা বিছানার কাছেই কোথায় ছিল—আমি জেগে শব্দ করতেই পালিয়ে যায়—কোনও দিন জেগে উঠলেই পালায়। সে কেমন বুঝতে পারে যে, এইবার আমি জেগেছি। এ রকম তো ক-দিন দেখলাম—কিন্তু কাল রাতে হুজুর, একটা ব্যাপার ঘটেছে। বাপজী জানে না—আপনাকে চুপি চুপি বলতে এলাম। কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, কুকুরটা ঘরে কখন ঢুকেছিল দেখিনি—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। সেদিকের কাশের বেড়ায় জানলার মাপে কাটা ফাঁক। কুকুর বেরিয়ে যাওয়ার পরে—বোধ হয় পলক ফেলতে যতটা দেরি হয়, তার পরেই আমার সামনের জানলা দিয়ে দেখি একটি মেয়েমানুষ জানলার পাশ দিয়ে ঘরের পিছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি তখুনি বাইরে ছুটে গেলাম—কোথাও কিছু না। বাবাকেও জানাইনি, বুড়োমানুষ ঘুমুচ্ছে। ব্যাপারটা কি হুজুর বুঝতে পারছিনে।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম—ও কিছু নয়, চোখের ভুল। বলিলাম যদি তাহাদের ওখানে থাকিতে ভয় করে, তাহারা কাছারিতে আসিয়া শুইতে পারে। ছেলেটি নিজের সাহস-হীনতায় বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমার অস্বস্তি দূর হইল না, ভাবিলাম এইবার কিছু শুনিলে কাছারি হইতে দুইজন সিপাহী পাঠাইব রাত্রে ওদের কাছে শুইবার জন্য।

তখনও বুঝিতে পারি নাই জিনিসটা কত সঙ্গীন। দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল অতি অকস্মাৎ এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দিন-তিনেক পরে।

সকালে সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, খবর পাইলাম কাল রাত্রে বোমাইবুরু জঙ্গলে বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলেটি মারা গিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তখনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি তাহারা যে ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ-জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ

তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম, শেষ রাত্রির দিকে উঠিয়া ছেলেকে সে বিছানায় না দেখিয়া তখনই লণ্ঠন ধরিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে—কিন্তু ভোরের পূর্ব্বে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া কোন-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ, মৃতদেহের কাছেই একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়া ছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ, নরম বালিমাটির উপরে ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। মৃতদেহেও কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোমাইবুরু জঙ্গলের এই রহস্যময় ব্যাপারের কোন মীমাংসাই হয় নাই, পুলিস আসিয়া কিছু করিতে না-পারিয়া ফিরিয়া গেল, লোকজনের মনে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল ঘটনাটি যে, সন্ধ্যার বহু পূর্ব্ব হইতে ও অঞ্চলে আর কেহ যায় না। দিনকতক তো এমন হইল যে, কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরের ধপধপে সাদা, ছায়াহীন উদাস, নির্জ্জন জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত কলিকাতায় পালাই, এ সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশপ্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।

২

প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হইল, সেদিনটা আমার বেশ মনে হয় আজও। কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, কিন্তু তাহাকে বৃদ্ধ বলিলে ভুল করা হয়, কারণ তাহার মত সুগঠিত দেহ বাংলা দেশে অনেক যুবকেরও নাই। কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলিল, সে বহুদূর হইতে আসিতেছে, এখানে কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিতে চায়। অতি গরীব, জমির সেলামী দিবার ক্ষমতা তাহার নাই, আমি সামান্য কিছু জমি স্টেটের সঙ্গে আধা বখরায় বন্দোবস্ত দিতে পারি কি না?

এক ধরণের মানুষ আছে, নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে জানে না, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যে, সত্যই বড় দুঃখী। রাজু পাঁড়েকে দেখিয়া আমার মনে

হইল এ অনেক আশা করিয়া ধরমপুর পরগণা হইতে এতদূর আসিয়াছে জমির লোভে, জমি না পাইলে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বড়ই আশাভঙ্গ ও ভরসাহারা হইয়া ফিরিবে।

রাজুকে দু-বিঘা জমি লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন-জঙ্গলের মধ্যে বন্দোবস্ত দিলাম, এক রকম বিনামূল্যেই। বলিয়া দিলাম, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে আবাদ করুক, প্রথমে দু বৎসর কিছু লাগিবে না, তৃতীয় বৎসর হইতে চার আনা বিঘাপিছু খাজনা দিতে হইবে। তখনও বুঝি নাই কি অদ্ভুত ধরণের মানুষকে জমিদারীতে বসাইলাম।

রাজু আসিল ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে, জমি পাইয়া চলিয়াও গেল, তাহার কথা বহু কাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম। পর বৎসর শীতের শেষে হঠাৎ একদিন লবটুলিয়া কাছারি হইতে ফিরিতেছি, দেখি একটি গাছতলায় কে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া লোকটি বই মুড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চিনিলাম, সেই রাজু পাঁড়ে। কিন্তু আর-বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর লোকটা একবারও কাছারিমুখো হইল না, এর মানে কি? বলিলাম—কি রাজু পাঁড়ে, তুমি আছ এখানে? আমি ভেবেছি তুমি জমি ছেড়ে-ছুড়ে চলে গিয়েছ বোধ হয়। চাষ করনি?

দেখিলাম, ভয়ে রাজুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমতা আমতা করিয়া বলিল, হাঁা, হুজুর, —চাষ কিছু—এবার হুজুর—

আমার কেমন রাগ হইয়া গেল। এই সব লোকের মুখ বেশ মিষ্টি, লোক ঠকাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ আদায় করিতে বেশ পটু। বলিলাম—দেড় বছর তোমার চুলের টিকি তো দেখা যায় নি। দিব্যি স্টেটকে ঠকিয়ে ফসল ঘরে তুলছ—কাছারির ভাগ দেওয়ার যে কথা ছিল, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই?

রাজু এবার বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ফসল হুজুর? কিন্তু সে তো ভাগ দেবার কথা আমার মনেই ওঠে নি—সে চীনা ঘাসের দানা—

কথাটা বিশ্বাসই হইল না। বলিলাম—চীনার দানা খাচ্ছ এই ছ-মাস? অন্য ফসল নেই? কেন, মকাই করনি?

—না হুজুর, বড্ড গজার জঙ্গল। একা মানুষ, ভরসা করে উঠতে পারি নি। পনের কাঠা জমি অতিকষ্টে তৈরি করেছি। আসুন না হুজুর, একবার দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

রাজুর পিছনে পিছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে যে, ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল। খানিক দূর গিয়া জঙ্গলের মধ্যে গোলাকার পরিষ্কার জায়গা প্রায় বিঘাখানেক, মাঝখানে জংলী ঘাসেরই তৈরী ছোট নীচু দুখানা খুপরি। একখানাতে রাজু থাকে, আর একখানায় ক্ষেতের ফসল জমা আছে। থলে কি বস্তা নাই, মাটির নীচু মেঝেতে রাশীকৃত চীনা ঘাসের দানা স্তূপীকৃত করা। বলিলাম—রাজু, তুমি এত আলসে কুঁড়ে লোক তা তো জানতুম না, দেড় বছরের মধ্যে দু-বিঘের জঙ্গল কাটতে পারলে না?

রাজু ভয়ে ভয়ে বলিল—সময় হুজুর বড় কম যে!

—কেন, কি কর সারাদিন ?

রাজু লাজুক মুখে চুপ করিয়া রহিল। রাজুর বাসস্থান খুপরির মধ্যে জিনিসপত্রের বাহুল্য আদৌ নাই। একটা লোটা ছাড়া অন্য তৈজস চোখে পড়িল না। লোটাটা বড়গোছের, তাতেই ভাত রান্না হয়। ভাত নয়, চীনা ঘাসের বীজ। কাঁচা শালপাতায় ঢালিয়া সিদ্ধ চীনার বীজ খাইলে তৈজসপত্রে কি দরকার। জলের জন্য নিকটেই কুণ্ডী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। আর কি চাই।

কিন্তু খুপরির একধারে সিঁদুরমাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলাম, রাজু ভক্তমানুষ! ক্ষুদ্র পাথরের বেদী বনের ফুলে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বেদীর এক পাশে দু-একখানা পুঁথি ও বই। অর্থাৎ, তাহার সময় নাই মানে সে সারাদিন পূজা-আচ্চা লইয়াই বোধ হয় ব্যস্ত থাকে। চাষ করে কখন ?

এই রাজুকে প্রথম বুঝিলাম।

রাজু পাঁড়ে হিন্দী লেখাপড়া জানে, সংস্কৃতও সামান্য জানে। তাও সে সর্ব্বদা পড়ে না, মাঝে মাঝে অবসর সময়ে গাছতলায় কি-একখানা হিন্দী বই খুলিয়া একটু বসে—অধিকাংশ সময় দূরের আকাশ ও পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। একদিন দেখি, একটা ছোট খাতায় খাগের কলমে, বসিয়া কি লিখিতেছে। ব্যাপার কি ? পাঁড়ে কবিতাও লেখে নাকি ? কিন্তু সে এতই লাজুক, নীরব চাপা মানুষটি, তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লওয়া বড় কঠিন। নিজের সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে চায় না।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—পাঁড়েজী, তোমার বাড়ীতে আর কে আছে ?

—সবাই আছে হুজুর, আমার তিন ছেলে, দুই লেড়কী, বিধবা বহিন।

—তাদের চলে কিসে ?

রাজু আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল—ভগবান চালাচ্ছেন। তাদের দু-মুঠো খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব বলেই তো হুজুরের আশ্রয়ে এসে জমি নিয়েছি। জমিটা তৈরি করে ফেলতে পারলে—

—কিন্তু দু-বিঘে জমির ফসলে অতবড় একটা সংসার চলবে ? আর তাই বা তুমি উঠে পড়ে চেষ্টা করছ কই ?

রাজু কথার জবাব প্রথমটা দিল না। তার পর বলিল—জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর! জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বন-জঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে! সেখানে ওঁরা থাকেন না। কাজেই এখানে দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন—কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।

দেখিলাম, রাজু কবি বটে দার্শনিকও বটে।

বলিলাম—কিন্তু রাজু, দেবতারা এমন কথা বলেন না যে, বাড়ীতে খরচ পাঠিও না, ছেলেপুলে উপোস করুক। ওসব কথাই নয় রাজু, কাজে লাগো। নইলে জমি কেড়ে নেব।

আরও কয়েক মাস গেল। রাজুর ওখানে মাঝে মাঝে যাই। ওকে কি ভালই লাগে! সেই গভীর নির্জ্জনে লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলে একা ছোট একটা ঘাসের খুপরিতে সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন বাস করে, এ আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি না।

সত্যকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক রাজু। অন্য কোন ফসল জন্মাইতে পারে নাই, চীনা ঘাসের দানা ছাড়া। সাত আট মাস হাসিমুখে তাই খাইয়াই চালাইতেছে। কারও সঙ্গে দেখা হয় না, গল্পগুজবের লোক নাই, কিন্তু তাহাতে ওর কিছুই অসুবিধা হয় না, বেশ আছে। দুপুরে যখনই রাজুর জমির উপর দিয়া গিয়াছি, তখনই দুপুর রোদে ওকে জমিতে কাজ করিতে দেখিয়াছি। সন্ধ্যার দিকে ওকে প্রায়ই চুপ করিয়া হরিতকী গাছটার তলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি—কোনদিন হাতে খাতা থাকে, কোনদিন থাকে না।

একদিন বলিলাম—রাজু, আরও কিছু জমি তোমায় দিচ্ছি, বেশী করে চাষ কর, তোমার বাড়ীর লোক না-খেয়ে মরবে যে! রাজু অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, তাহাকে কোন কিছু বুঝাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। জমি সে লইল বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে জমি পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া তাহার পূজা ও গীতাপাঠ করিতে বেলা দশটা বাজে, তার পর কাজে বার হয়। ঘণ্টা-দুই কাজ করিবার পরে রান্না-খাওয়া করে, সারা দুপুরটা খাটে বিকাল পাচটা পর্য্যন্ত! তার পরই আপন মনে গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে। সন্ধ্যার পরে আবার পূজাপাঠ আছে।

সে-বছর রাজু কিছু মকাই করিল, নিজে না খাইয়া সেগুলি সব দেশে পাঠাইয়া দিল, বড় ছেলে আসিয়া লইয়া গেল। কাছারিতে ছেলেটা দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম—বুড়ো বাপকে এই জঙ্গলে একা ফেলে রেখে বাড়ীতে বসে দিব্যি ফুর্ত্তি করছ, লজ্জা করে না? নিজেরা রোজগারের চেষ্টা কর না কেন?

৩

সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল, কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্ব্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। একদিন শুনিলাম, রাজু পাড়ে সেখানে চিকিৎসা করিতে বাহির হইয়াছে। রাজু পাঁড়ে যে চিকিৎসক তাহা জানিতাম

না। তবে আমি কিছুদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম বটে, ভাবিলাম এই সব ডাক্তার-কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি। কাছারি হইতে আমার সঙ্গে আরও অনেকে গেল। গ্রামে পৌছিয়া রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটা বাটুয়াতে শিকড়-বাকড় জড়ি-বুটি লইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমায় নমস্কার করিয়া বলিল—হুজুর! আপনার বড্ড দয়া, আপনি এসেছেন, এবার লোকগুলো যদি বাঁচে। এমন ভাবটা দেখাইল যেন আমি জেলার সিবিল সার্জ্জন কিংবা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী। সে-ই আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে রোগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল।

রাজু ওষুধ দেয়, সবই দেখিলাম ধারে। সারিয়া উঠিলে দাম দিবে এই নাকি কড়ার হইয়াছে। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মূর্ত্তি কুটীরে কুটীরে। সবই খোলার কিংবা খড়ের বাড়ী, ছোট্ট ছোট্ট ঘর, জানালা নাই, আলো-বাতাস ঢোকে না কোনো ঘরে। প্রায় সব ঘরেই দু-একটি রোগী, ঘরের মেঝেতে ময়লা বিছানায় শুইয়া। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, পথ্য নাই। অবশ্য রাজু সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে, না-ডাকিলেও সব রোগীর কাছে গিয়া তাহার জড়ি-বুটির ওষুধ খাওয়াইয়াছে, একটা ছোট ছেলের রোগশয্যার পাশে বসিয়া কাল নাকি সারা রাত সেবাও করিয়াছে। কিন্তু মড়কের তাহাতে কিছুমাত্র উপশম দেখা যাইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রাজু আমায় ডাকিয়া একটা বাড়ীতে লইয়া গেল। একখানা মাত্র খড়ের ঘর, মেঝেতে রোগী তালপাতার চেটাইয়ে শুইয়া, বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। সতের-আঠারো বছরের একটি মেয়ে দোরের গোড়ায় বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। রাজু তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল—কাঁদিস নে বেটি, হুজুর এসেছেন, আর ভয় নেই, রোগ সেরে যাবে।

বড়ই লজ্জিত হইলাম নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—মেয়েটি বুঝি রোগীর মেয়ে?

রাজু বলিল—না হুজুর, ওর বৌ। কেউ নেই সংসারে মেয়েটার, বিধবা মা ছিল, বিয়ে দিয়ে মারা গিয়েছে। একে বাঁচান হুজুর, নইলে মেয়েটা পথে বসবে!

রাজুর কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছি এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়িল রোগীর শিয়রের দিকে দেওয়ালে মেঝে থেকে হাত তিনেক উঁচুতে একটা কাঠের তাকের প্রতি। দেখি তাকের উপর একটা আঢাকা পাথরের খোরায় দুটি পান্তা ভাত। ভাতের উপর দু-দশটা মাছি বসিয়া আছে। কি সর্বনাশ! ভীষণ এশিয়াটিক কলেরার রোগী ঘরে, আর রোগীর নিকট হইতে তিন হাতের মধ্যে ঢাকাবিহীন খোরায় ভাত!

সারাদিন রোগীর সেবা করার পরে দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত বালিকা হয়তো পাথরের খোরাটি পাড়িয়া পান্তা ভাত দুটি নুন লঙ্কা দিয়া আগ্রহের সহিত খাইতে বসিবে। বিষাক্ত অন্ন, যার প্রতি গ্রাসে নিষ্ঠুর মৃত্যুর বীজ! বালিকার সরল অশ্রুভরা চোখ দুটির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। রাজুকে বলিলাম—এ ভাত ফেলে দিতে বল ওকে। এ-ঘরে খাবার রাখে!

মেয়েটি ভাত ফেলিয়া দিবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিল। ভাত ফেলিয়া দিবে কেন? তবে সে খাইবে কি? ওঝাজীদের বাড়ী থেকে কাল রাতে ঐ ভাত দুটি তাহাকে খাইতে দিয়া গিয়াছিল।

আমার মনে পড়িল ভাত এ-দেশে সুখাদ্য বলিয়া গণ্য, আমাদের দেশে যেমন লুচি কি পোলাও। কিন্তু একটু কড়া সুরেই বলিলাম—উঠে এখুনি ভাত ফেলে দাও আগে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া খোরার ভাত ফেলিয়া দিল।

তাহার স্বামীকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মেয়েটির কি কান্না! রাজুও সেই সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল।

আর একটি বাড়ীতে রাজু আমায় লইয়া গেল। সেটা রাজুর এক দূরসম্পর্কীয় শালার বাড়ী। এখানে প্রথম আসিয়া এই বাড়ীতেই রাজু উঠিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করিত। এখানে মা ও ছেলের একসঙ্গে কলেরা, পাশাপাশি ঘরে দুই রোগী থাকে, এ উহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, ও ইহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সাত-আট বছরের ছোট ছেলে।

ছেলে প্রথমে মারা গেল। মাকে জানিতে দেওয়া হইল না। আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধে মায়ের অবস্থা ভাল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল ক্রমশঃ। মা কেবলই ছেলের খবর নেয়, ও-ঘরে ছেলের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কেমন আছে সে?

আমরা বলি—তাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে—ঘুমুচ্ছে।

চুপি চুপি ছেলের মৃতদেহ ঘর হইতে বাহির করা হইল।

গ্রামের লোক স্বাস্থ্যের নিয়ম একেবারে জানে না। একটি মাত্র পুকুর, সেই পুকুরেই কাপড় কাচে, সেখানেই স্নান করে। স্নান করা আর জল পান করা যে একই কথা ইহা কিছুতেই তাহাদের বুঝাইতে পারিলাম না। কত লোক কত লোককে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে। একটা ঘরের মধ্যে একটা রোগী দেখিলাম, সে বাড়ীতে আর লোক নাই। রোগগ্রস্ত লোকটি ঐ বাড়ীর ঘর-জামাই, স্ত্রী আর বছর মারা গিয়াছে। তত্রাচ লোকটার অবস্থা খারাপ বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, শ্বশুরবাড়ীর লোকে তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে। রাজু তাহাকে দিনরাত সেবা করিতে লাগিল। আমি ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। লোকটা শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া গেল। বুঝিলাম, শ্বশুরবাড়ীর অন্নদাস হিসাবে তাহার অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

রাজুকে থলি বাহির করিয়া চিকিৎসার মোট উপার্জ্জন গণনা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কত হল, রাজু?

রাজু গুনিয়া-গাঁথিয়া বলিল—এক টাকা তিন আনা।

ইহাতেই সে বেশ খুশী হইয়াছে। এদেশের লোক একটা পয়সার মুখ সহজে দেখিতে পায় না, এক টাকা তিন আনা উপার্জ্জন এখানে কম নহে। রাজুকে আজ পনের-ষোল দিন, ডাক্তারকে ডাক্তার, নার্সকে নার্স, কি খাটুনিটাই খাটিতে হইয়াছে।

অনেক রাত্রে গ্রামের মধ্যে কান্নাকাটির রব শোনা গেল। আবার একজন মরিল। রাত্রে ঘুম হইল না। গ্রামের অনেকেই ঘুমায় নাই, ঘরের সামনে বড় বড় কাঠ জ্বালাইয়া আগুন করিয়া গন্ধক পোড়াইতেছে ও আগুনের চারিধার ঘিরিয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে। রোগের গল্প, মৃত্যুর খবর ছাড়া ইহাদের মুখে অন্য কোন কথা নাই—সকলেরই মুখে একটা ভয়, আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। কাহার পালা আসে!

দুপুর রাত্রে সংবাদ পাইলাম, ওবেলার সেই সদ্য-বিধবা বালিকাটির কলেরা হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, তাহার স্বামীগৃহের পাশে এক বাড়ীর গোয়ালে সে শুইয়া আছে। ভয়ে নিজের ঘরে আসিয়া শুইতে পারে নাই, অথচ তাহাকে কেহ স্থান দেয় নাই সে কলেরার রোগী ছুঁইয়াছিল বলিয়া। গোয়ালের এক পাশে কয়েক আঁটি গমের বিচালির উপর পুরানো চট পাতা, তাতেই বালিকা শুইয়া ছটফট করিতেছে। আমি ও রাজু বহু চেষ্টা করিলাম হত-ভাগিনীকে বাঁচাইবার। একটি লণ্ঠন, একটু জল কোথাও পাওয়া যায় না। উঁকি মারিয়া কেহ দেখিতে পর্য্যন্ত আসিল না। আজকাল এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যে, কলেরা কাহারও হইলে তাহার ত্রিসীমানায় লোক ঘেঁষে না।

রাত ফরসা হইল।

রাজুর খুব নাড়ীজ্ঞান, হাত দেখিয়া বলিল—এ হুজুর সুবিধে নয় গতিক।

আমি আর কি করিব, নিজে ডাক্তার নই, স্যালাইন দিতে পারিলে হইত, এ অঞ্চলে তেমন ডাক্তার কোথাও নাই।

সকাল ন'টায় বালিকা মারা গেল।

আমরা না থাকিলে তাহার মৃতদেহ কেহ বাহির করিতে আসিত কি না সন্দেহ, আমাদের অনেক তদ্বির ও অনুরোধে জন দুই আহীর চাষী বাঁশ লইয়া আসিয়া মৃতদেহ বাঁশের সাহায্যে ঠেলিতে ঠেলিতে নদীর দিকে লইয়া গেল।

রাজু বলিল—বেঁচে গেল হুজুর। বিধবা বেওয়া অবস্থায়, তাতে ছেলেমানুষ, কি খেত, কে ওকে দেখত?

বলিলাম—তোমাদের দেশ বড় নিষ্ঠুর, রাজু।

আমার মনে কষ্ট রহিয়া গেল যে, আমি তাহাকে তাহার মুখের অত সাধের ভাত দুটি খাইতে দিই নাই।

৪

নিস্তব্ধ দুপুরে দূরে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব্ব রহস্যময় দেখাইত। কতবার ভাবিয়াছি একবার গিয়া পাহাড়টা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব, কিন্তু সময় হইয়া উঠে নাই। শুনিতাম মহালিখারূপের পাহাড় দুর্গম বনাকীর্ণ, শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা, বনমোরগ, দুষ্প্রাপ্য বন্য চন্দ্রমল্লিকা, বড় বড় ভাল্লুকঝোড়ে ভর্ত্তি। পাহাড়ের উপরে জল নাই বলিয়া, বিশেষত

ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে, এ অঞ্চলের কাঠুরিয়ারাও কখনও ওখানে যায় না।

দিক্‌চক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জ্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য্য, এর মানুষজন, পাখীর ডাক, বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই। তার উপরে বেশী করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা। কি রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, বৈকালে, জ্যোৎস্না-রাত্রে—কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে!

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। ন'মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বনঝোপের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্ব্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে, বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়, কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্ব্বত্র, ফুলের থই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে, বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জ্জুন ও পিয়াল, নানাজাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল—বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিশ্রিত হইয়া মৌমাছিদের মত মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

এতদিন এখানে আছি, এ সৌন্দর্য্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। মহালিখারূপের জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভাল্লুকের নাকি লেখাজোখা নাই—এ পর্য্যন্ত তো একটা ভালুক-ঝোড় কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে, ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দু-ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু-দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘন-সন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ, কোথাও বড় গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, বন আরও কৃষ্ণায়মান, সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া, তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যে-সব বন্যপাদপ, এত নীচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে যেন ছোট ছোট শেওড়া গাছের ঝোপ। অপূর্ব্ব, গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর উঠিলাম, আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়ালতলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখণ্ডে বসিলাম—উদ্দেশ্য, শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

সেই উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া হঠাৎ কখন বামদিকে গিয়া পড়িয়াছে; পার্ব্বত্য অঞ্চলের এই মজার ব্যাপার কতবার লক্ষ্য করিয়াছি, কোথা দিয়া কোনটা ঘুরিয়া গিয়া আধ রশি পথের ব্যবধানে

দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এই যাহাকে ভাবিতেছি খাড়া উত্তরে অবস্থিত, হঠাৎ দু-কদম যাইতে না যাইতে সেটা কখন দেখি পশ্চিমে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্ম্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্য্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই রকমই ছিল; বুদ্ধদেব নব-বিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে-রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত; তমসাতীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় মহালিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন; গ্রীক-রাজ হেলিওডোরাস্ গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংবর-সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তির গলায় মাল্যদান করেন; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্ত্তন করেন; যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখারূপে ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে, মহুয়াবীজ ভাঙিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু-খণ্ড কাঠের তৈরি একটা ঢেঁকির মত কি আছে, আর এক বুড়িকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স আশী-নব্বুই হইবে, শণের-নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল—ভারতচন্দ্রের জরতীবেশধারিণী অন্নপূর্ণার মত। এখানে বসিয়া সেই বুড়িটার কথা মনে পড়িল—এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীন বৃদ্ধা—পূর্ব্ব-পুরুষেরা এই বন-জঙ্গলে বহুসহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যীশুখ্রীষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায়, উহারা আজও সাতনলি ও আঠাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখী শিকার করিতেছে—ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। ঐ বুড়ির দৈনন্দিন চিন্তাধারা কি, জানিবার জন্য আমি আমার এক বছরের উপার্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি।

বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায় তত উন্নতি করে—আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে? বর্ব্বর আর্য্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য,

জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক-সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ভেনাস দ্য মিলোর মূর্ত্তি, পার্থেনন, তাজমহল, কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবারী কানাড়া ও ফিফ্‌থ্‌ সিম্‌ফোনির সৃষ্টি করিল—এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ী, বেতার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল—অথচ পাপুয়া, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা, আমাদের দেশের ওই মুণ্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর ?

অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্‌।

এই বালু-প্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরণের গাছপালাও ছিল না, যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে কোনো মিউজিয়ামে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙা হইয়া আসিয়াছে মহালিখারূপ পাহাড়ের মাথায়। শেফালিবনের গন্ধভরা বাতাসে হেমন্তের হিমের ঈষৎ আমেজ, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হইবে না, সম্মুখে কৃষ্ণা একাদশীর অন্ধকার রাত্রি, বনমধ্যে কোথায় একদল শেয়াল ডাকিয়া উঠিল। ভালুক বা বাঘ পথ না আটকায়।

ফিরিবার পথে এইদিন প্রথম বন্য ময়ূর দেখিলাম বনান্তস্থলীতে শিলাখণ্ডের উপর। এক-জোড়া ছিল, আমার ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়া ময়ূরটা উড়িয়া গেল, তাহার সঙ্গিনী কিন্তু নড়িল না। বাঘের ভয়ে আমার তখন দেখিবার অবকাশ ছিল না, তবু একবার সেটার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বন্য ময়ূর কখনও দেখি নাই, লোকে বলিত এ অঞ্চলে ময়ূর আছে আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ বিলম্ব করিতে ভরসা হইল না, কি জানি মহালিখারূপের বাঘের গুজবটাও যদি এ রকম সত্য হইয়া যায় !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

দেশের জন্য মন কেমন করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি। যারা চিরকাল এক জায়গায় কাটায়, স্বগ্রাম বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান ছাড়িয়া নড়ে না—তাহারা জানে না ইহার বৈচিত্র্য। দূরপ্রবাসে আত্মীয়-স্বজনশূন্য স্থানে দীর্ঘদিন যে বাস করিয়াছে, সে জানে বাংলা দেশের জন্য, বাঙালীর জন্য, নিজের গ্রামের জন্য, দেশের প্রিয় আত্মীয়স্বজনের জন্য মন কি রকম হু-হু করে,

অতি তুচ্ছ পুরাতন ঘটনাও তখন অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যাহা হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর তাহা হইবার নহে—পৃথিবী উদাস হইয়া যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক জিনিসটা অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ওঠে।

এখানে বছরের পর বছর কাটাইয়া আমারও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কতবার সদরে ছুটির জন্য চিঠি লিখিব ভাবিয়াছি, কিন্তু কাজ এত বেশী সব সময়েই হাতে আছে যে, ছুটি চাহিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। অথচ এই জনশূন্য পাহাড়-জঙ্গলে, বাঘ ভালুক, নীলগাইয়ের দেশে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা কাটানো যে কি কষ্ট! প্রায় হাঁপাইয়া উঠে এক-এক সময়। বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কতকাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই, দেবালয়ের ধুনাগুগ্‌গুলের সৌরভ পাই নাই, বৈশাখী প্রভাতে পাখীর কলকূজন উপভোগ করি নাই—বাংলার গৃহস্থালির যে শান্ত পূত ঘরকন্না জলচৌকিতে পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র, পিঁড়িতে আলপনা, কুলঙ্গীতে লক্ষ্মীর কড়ির চুপড়ি—সে সব যেন বিস্মৃত অতীত এক জীবন-স্বপ্ন।

শীত গিয়া যখন বসন্ত পড়িয়াছে, তখন আমার এই ভাবটা অত্যন্ত বেশী বাড়িল।

সেই অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িয়া সরস্বতী কুণ্ডীর ওদিকে বেড়াইতে গেলাম। একটা নীচু উপত্যকায় ঘোড়া হইতে নামিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। আমার চারিদিক ঘিরিয়া উঁচু মাটির পাড়, তাহার উপর দীর্ঘ কাশ ও বন-ঝাউয়ের ঘন জঙ্গল। ঠিক আমার মাথার উপরে খানিকটা নীল আকাশ। একটা কণ্টকময় গাছে বেগুনী রঙের ঝাড় ঝাড় ফুল ফুটিয়াছে, বিলাতী কর্ণফ্লাওয়ার ফুলের মত দেখিতে। একটা ফুলের বিশেষ কোন শোভা নাই, অজস্র ফুল একত্র দলবদ্ধ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া দেখাইতেছে ঠিক বেগুনী রঙের একখানি শাড়ীর মতন। বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন অর্দ্ধশুষ্ক কাশ-জঙ্গলের তলায় ইহারা খানিকটা স্থানে বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে—ইহাদের উপরে প্রবীণ বিরাট বনঝাউয়ের স্তব্ধ রুক্ষ অরণ্য এদের ছেলেমানুষিকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষার চোখে দেখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রবীণতার ধৈর্য্যে তাহা সহ্য করিতেছে। সেই বেগুনী রঙের জংলী ফুলগুলিই আমার কানে শুনাইয়া দিল বসন্তের আগমন বাণী। বাতাবী লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনীফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কি একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলী কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। কতক্ষণ সেখানে একমনে দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাংলা দেশের ছেলে আমি, কতকগুলি জংলী কাঁটার ফুল যে ডালি সাজাইয়া বসন্তের মান রাখিয়াছে এ দৃশ্য আমার কাছে নূতন। কিন্তু কি গম্ভীর শোভা উঁচু ডাঙ্গার উপরকার অরণ্যের! কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেশ তার, অথচ কি বিরাট! সেই অর্দ্ধশুষ্ক, পুষ্পপত্রহীন বনের নিস্পৃহ আত্মার সহিত ও নিম্নের এই বন্য, বর্ব্বর, তরুণদের বসন্তোৎসবের সকল নিরাড়ম্বর প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত আমার মন এক হইয়া গেল।

সে আমার জীবনের এক পরম বিচিত্র মুহূর্ত্ত। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, দু-একটা নক্ষত্র

উঠিল মাথার উপরকার সেই নীল আকাশের কালিটুকুতে, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দেখি, আমীন পূরণচাঁদ নাঢ়া বইহারের পশ্চিম সীমানায় জরীপের কাজ শেষ করিয়া কাছারি ফিরিতেছে। আমায় দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিল—হুজুর এখানে? তাহাকে বলিলাম, বেড়াইতে আসিয়াছি।

সে বলিল—একা এখানে থাকবেন না সন্ধ্যাবেলা, চলুন কাছারিতে। জায়গাটা ভাল নয়, আমার টিণ্ডেল স্বচক্ষে দেখেছে হুজুর। খুব বড় বাঘ, ওধারের ওই কাশের জঙ্গলে,—আসুন, হুজুর।

পিছনে অনেক দূরে পূরণচাঁদের টিণ্ডেল গান ধরিয়াছে :—

দয়া হোই জী—

সেই দিন হইতে ঐ কাঁটার ফুল দেখিলে আমার মন হু-হু করিয়া উঠিত বাংলা দেশের জন্য। আর ঠিক কি পূরণচাঁদের টিণ্ডেল ছট্টুলাল প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ঘরে রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে ঐ গানই গাহিবে—

দয়া হোই জী—

ভাবিতাম, আসন্ন ফাল্গুন-বেলায় আম্রবউলের গন্ধভরা ছায়ায় শিমুলফুলফোটা নদীচরের এপারে দাঁড়াইয়া কোকিলের কূজন শুনিবার সুযোগ এ জীবনে বুঝি আর মিলিবে না, এই বনেই বেঘোরে বাঘ বন্যমহিষের হাতে কোন্‌দিন প্রাণ হারাইতে হইবে।

বনঝাউ-বন তেমনই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, দূর বনলীন দিগ্বলয় তেমনই ধূসর, উদাসীন দেখাইত।

এমনি এক দেশের-জন্য-মন-কেমন-করা দিনে রাসবিহারী সিং-এর বাড়ী হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইলাম। রাসবিহারী সিং এ অঞ্চলে দুর্দ্দান্ত মহাজন, জাতিতে রাজপুত, কারো নদীর তীরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট খাসমহলের প্রজা। তাহার গ্রাম কাছারি হইতে বার-চৌদ্দ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের গায়ে।

নিমন্ত্রণ না রাখিলেও ভাল দেখায় না, কিন্তু রাসবিহারী সিং-এর বাড়ীতে যাইতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। এ-অঞ্চলের যত গরীব গাঙ্গোতা-জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরীবকে মারিয়া তাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার কড়া শাসন ও অত্যাচারে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার জো নাই। বেতন বা জমিভোগী লাঠিয়াল পাইকের দল লাঠিহাতে সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া হাজির করিবে। যদি কোন রকমে রাসবিহারীর মনে হইল অমুক বিষয়ে অমুক তাহাকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দেয় নাই বা তাহার প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহা হইলে সে হতভাগ্যের আর রক্ষা নাই। রাসবিহারী সিং ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে জব্দ করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিয়া ছাড়িবেই।

আমি আসিয়া দেখি রাসবিহারী সিং-ই এদেশের রাজা। তাহার কথায় গরীব গৃহস্থ প্রজা থরহরি কাঁপে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকও কিছু বলিতে সাহস করে না, কেননা রাস-বিহারীর লাঠিয়াল-দল বিশেষ দুর্দ্দান্ত, মারধর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা বিশেষ পটু। পুলিসও

নাকি রাসবিহারীর হাতে আছে। খাসমহলের সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার আসিয়া রাসবিহারী সিং-এর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় সে কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে এ জঙ্গলের মধ্যে ?

আমার প্রজার উপর রাসবিহারী সিং প্রভুত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করে—তাহাতে আমি বাধা দিই। আমি স্পষ্ট জানাইয়া দিই, তোমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে যা হয় করিও, কিন্তু আমার মহালের কোনও প্রজার কেশাগ্র স্পর্শ করিলে আমি তাহা সহ্য করিব না। গত বৎসর এই ব্যাপার লইয়া রাসবিহারী সিং-এর লাঠিয়াল-দলের সঙ্গে আমার কাছারির মুকুন্দি চাকলাদার ও গণপৎ তহশীলদারের সিপাহীদের একটা ক্ষুদ্র রকমের মারামারি হইয়া যায়। গত শ্রাবণ মাসেও আবার একটা গোলমাল বাধিয়াছিল। তাহাতে ব্যাপার পুলিস পর্য্যন্ত গড়ায়। পুলিসের দারোগা আসিয়া সেটা মিটাইয়া দেয়। তাহার পর কয়েক মাস যাবৎ রাসবিহারী সিং আমার মহালের প্রজাদের কিছু বলে না।

সেই রাসবিহারী সিং-এর নিকট হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইয়া বিস্মিত হইলাম।

গণপৎ তহশীলদারকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসি। গণপৎ বলিল—কি জানি হুজুর, ও-লোকটাকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে, কি মতলবে আপনাকে নিয়ে যেতে চায় কে জানে ? আমার মতে না যাওয়াই ভাল।

আমার কিন্তু এ-মত মনঃপূত হইল না। হোলির নিমন্ত্রণে না-গেলে রাসবিহারী অত্যন্ত অপমান বোধ করিবে। কারণ হোলির উৎসব রাজপুতদের একটি প্রধান উৎসব। হয়ত ভাবিতে পারে যে, ভয়ে আমি গেলাম না। তা যদি ভাবে, সে আমার পক্ষে ঘোর অপমানের বিষয়। না, যাইতেই হইবে, যা থাকে অদৃষ্টে।

কাছারির প্রায় সকলেই আমায় নানা-মতে বুঝাইল। বৃদ্ধ মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, যাচ্ছেন বটে, কিন্তু আপনি এ সব দেশের গতিক জানেন না। এখানে হট্ বলতে খুন করে বসে। জাহিল আদমির দেশ, লেখাপড়াজানা লোক তো নেই। তা ছাড়া রাসবিহারী অতি ভয়ানক মানুষ। কত খুন করেছে জীবনে তার লেখাজোখা আছে হুজুর ? ওর অসাধ্য কাজ নেই—খুন, ঘরজালানি, মিথ্যে মকদ্দমা খাড়া করা, ও সব-তাতেই মজবুত।

ও-সব কথা কানে না-তুলিয়াই খাসমহলে রাসবিহারীর বাড়ী গিয়া পৌছিলাম। খোলায় ছাওয়া ইটের দেওয়ালওয়ালা ঘর, যেমন এ-দেশে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী হইয়া থাকে। বাড়ীর সামনে বারান্দা, তাতে কাঠের খুঁটি আলকাতরা-মাখানো। দুখানা দড়ির চারপাই, তাতে জনদুই লোক বসিয়া ফর্সিতে তামাক খাইতেছে।

আমার ঘোড়া উঠানের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতেই কোথা হইতে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া দুই বন্দুকের আওয়াজ হইল। রাসবিহারী সিং-এর লোক আমায় চেনে, তাহারা স্থানীয় রীতি অনুসারে বন্দুকের আওয়াজ দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করিল, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু গৃহস্বামী কোথায় ? গৃহস্বামী না আসিয়া দাঁড়াইলে ঘোড়া হইতে নামিবার প্রথা নাই।

একটু পরে রাসবিহারী সিং-এর বড় ভাই রাসউল্লাস সিং আসিয়া বিনীত স্বরে দুই হাত

সামনে তুলিয়া বলিল—আইয়ে জনাব, গরীবখানামে তস্‌রিফ লেতে আইয়ে—। আমার মনের অস্বস্তি ঘুচিয়া গেল। রাজপুত জাতি অতিথি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করে না। কেহ আসিয়া অভ্যর্থনা না-করিলে ঘোড়া হইতে না-নামিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিতাম কাছারির দিকে।

উঠানে বহু লোক। ইহারা অধিকাংশই গাঙ্গোতা প্রজা। পরনের মলিন ছেঁড়া কাপড় আবীর ও রঙে ছোপানো, নিমন্ত্রণে বা বিনা-নিমন্ত্রণে মহাজনের বাড়ী হোলি খেলিতে আসিয়াছে।

আধ-ঘণ্টা পরে রাসবিহারী সিং আসিল এবং আমায় দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল। অর্থাৎ আমি যে তাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইব, ইহা যেন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা হউক, রাসবিহারী আমার যথেষ্ট খাতির-যত্ন করিল।

পাশের যে-ঘরে আমায় লইয়া গেল, সেটায় থাকিবার মধ্যে আছে খান-দুই-তিন সিসম কাঠের দেশী ছুতারের হাতে তৈরী খুব মোটা মোটা পায়া ও হাতলওয়ালা চেয়ার এবং একখানা কাঠের বেঞ্চি। দেওয়ালে সিন্দূর-চন্দন লিপ্ত একটি গণেশমূর্তি।

একটু পরে একটি বালক একখানা বড় থালা লইয়া আমার সামনে ধরিল। তাহাতে কিছু আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা, মিছরিখণ্ড, এক ছড়া ফুলের মালা। রাসবিহারী সিং আমার কপালে কিছু আবীর মাখাইয়া দিল, আমিও তাহার কপালে আবীর দিলাম, ফুলের মালাগাছি তুলিয়া লইলাম। আর কি করিতে হইবে না-বুঝিতে পারিয়া আনাড়ি ভাবে থালার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া রাসবিহারী সিং বলিল—আপনার নজর, হুজুর। ও আপনাকে নিতে হবে। আমি পকেট হইতে আর কিছু টাকা বাহির করিয়া থালার টাকার সঙ্গে মিশাইয়া বলিলাম—সকলকে মিষ্টিমুখ করাও এই দিয়ে।

রাসবিহারী সিং তার পর আমাকে তাহার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল। গোয়ালে প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টিটি গরু। সাত আটটি ঘোড়া আস্তাবলে—দুটি ঘোড়া নাকি অতি সুন্দর নাচিতে পারে, একদিন নাচ আমায় সে দেখাইবে। হাতী নাই কিন্তু শীঘ্র কিনিবার ইচ্ছা আছে। এ-দেশে হাতী না-থাকিলে সে সম্ভ্রান্ত লোক হয় না। আট-শ মণ গম চাষে উৎপন্ন হয়, দু-বেলায় আশী-পঁচাশীজন লোক খায়, সে নিজে সকালে নাকি দেড় সের দুধ ও এক সের বিকানীর মিছরি স্নানান্তে জলযোগ করে। বাজারের সাধারণ মিছরি সে কখনও খায় না, বিকানীর মিছরি ছাড়া। মিছরি খাইয়া জলযোগ যে করে, সে এ-দেশে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়—বড়লোকের উহা আর একটি লক্ষণ।

তার পর রাসবিহারী একটা ঘরে আমায় লইয়া গেল, সে ঘরের আড়া হইতে দু-হাজার আড়াই-হাজার ছড়া ভুট্টা ঝুলিতেছে। এগুলি ভুট্টার বীজ, আগামী বৎসরের চাষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। একখানা লোহার কড়া আমায় দেখাইল, লোহার চাদর গুল্ বসানো পেরেক দিয়া জুড়িয়া কড়াখানা তৈরি, তাতে দেড় মণ দুধ একসঙ্গে জ্বাল দেওয়া হয় প্রত্যহ। তাহার সংসারে প্রত্যহই ঐ পরিমাণ দুধ খরচ হয়। একটা ছোট ঘরে লাঠি, ঢাল,

সড়কি, বর্শা, টাঙি, তলোয়ার এত অগুন্তি যে সেটাকে রীতিমত অস্ত্রাগার বলিলেও চলে।

রাসবিহারী সিং-এর ছয়জন ছেলে—জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স ত্রিশের কম নয়। প্রথম চারটি ছেলে বাপের মতই দীর্ঘকায়, জোয়ান, গোঁফ ও গালপাট্টার বহর এরই মধ্যে বেশ। তাহার ছেলেদের ও তাহার অস্ত্রাগার দেখিয়া মনে হইল, দরিদ্র, অনাহারশীর্ণ গাঙ্গোতা প্রজাগণ যে ইহাদের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে ইহা আর বেশী কথা কি!

রাসবিহারী অত্যন্ত দাম্ভিক ও রাশভারী লোক। তাহার মানের জ্ঞানও বিলক্ষণ সজাগ। পান হইতে চুন খসিলেই রাসবিহারী সিং-এর মান যায়, সুতরাং তাহার সহিত ব্যবহার করিতে গেলে সর্ব্বদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। গাঙ্গোতা প্রজাগণ তো সর্ব্বদা তটস্থ অবস্থায় আছে, কি জানি কখন মনিবের মানের ত্রুটি ঘটে।

বর্ব্বর প্রাচুর্য্য বলিতে যা বুঝায়, তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিলাম রাসবিহারীর সংসারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট গম, যথেষ্ট ভুট্টা, যথেষ্ট বিকানীর মিছরি, যথেষ্ট মান, যথেষ্ট লাঠিসোঁটা। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? ঘরে একখানা ভাল ছবি নাই, ভাল বই নাই, ভাল কৌচ-কেদারা দূরের কথা, ভাল তাকিয়া-বালিস-সাজানো বিছানাও নাই। দেওয়ালে চুণের দাগ, পানের দাগ, বাড়ীর পিছনের নর্দ্দমা অতি কদর্য্য নোংরা জল ও আবর্জ্জনায় বোজানো, গৃহ-স্থাপত্য অতি কুশ্রী। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না, নিজেদের পরিচ্ছদ ও জুতা অত্যন্ত মোটা ও আধময়লা। গত বৎসর বসন্ত রোগে বাড়ীর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে এক মাসের মধ্যে মারা গিয়াছে। এ বর্ব্বর প্রাচুর্য্য তবে কোন্ কাজে লাগে? নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজা ঠেঙাইয়া এ প্রাচুর্য্য অর্জ্জন করার ফলে কাহার কি সুবিধা হইতেছে? অবশ্য রাসবিহারী সিং-এর মান বাড়িতেছে।

ভোজদ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া কিন্তু তাক্ লাগিল। এত কি একজনে খাইতে পারে? হাতীর কানের মত বৃহদাকার পুরী খান-পনের, খুরিতে নানা রকম তরকারি, দই, লাড্ডু, মালপো, চাটনি, পাঁপর। আমার তো এ চার বেলার খোরাক। রাসবিহারী সিং নাকি একা এর দ্বিগুণ আহার্য্য উদরস্থ করিয়া থাকে একবারে।

আহার শেষ করিয়া যখন বাহিরে আসিলাম, তখন বেলা আর নাই। গাঙ্গোতা প্রজার দল উঠানে পাতা পাতিয়া দই ও চীনা ঘাসের ভাজা দানা মহা আনন্দে খাইতে বসিয়াছে। সকলের কাপড় লাল রঙে রঞ্জিত, সকলের মুখে হাসি। রাসবিহারীর ভাই গাঙ্গোতাদের খাওয়ানোর তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। ভোজনের উপকরণ অতি সামান্য, তাতেই ওদের খুশী ধরে না।

অনেক দিন পরে এখানে সেই বালক নর্ত্তক ধাতুরিয়ার নাচ দেখিলাম। ধাতুরিয়া আর একটু বড় হইয়াছে, নাচেও আগের চেয়ে অনেক ভাল। হোলি উৎসবে এখানে নাচিবার জন্য তাহাকে বায়না করিয়া আনা হইয়াছে।

ধাতুরিয়াকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—চিনতে পার ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া হাসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—জী হুজুর। আপনি ম্যানেজারবাবু! ভাল আছেন হুজুর?

ভারি সুন্দর হাসি ওর মুখে। আর ওকে দেখিলেই মনে কেমন একটা অনুকম্পা ও করুণার উদ্রেক হয়। সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, এই বয়সে নাচিয়া গাহিয়া পরের মন জোগাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়, তাও রাসবিহারী সিং-এর মত ধনগর্ব্বিত অরসিকদের গৃহ-প্রাঙ্গণে।

জিজ্ঞাস করিলাম—এখানে তো অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত নাচতে গাইতে হবে, মজুরী কি পাবে?

ধাতুরিয়া বলিল—চার আনা পয়সা হুজুর, আর খেতে দেবে পেট ভরে।

—কি খেতে দেবে?

—মাঢ়া, দই, চিনি। লাড্ডুও দেবে বোধ হয়, আর বছর তো দিয়েছিল।

আসন্ন ভোজ খাইবার লোভে ধাতুরিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—সব জায়গায় কি এই মজুরী?

ধাতুরিয়া বলিল—না হুজুর, রাসবিহারী সিং বড়মানুষ, তাই চার আনা দেবে আর খেতেও দেবে। গাঙ্গোতাদের বাড়ী নাচলে দেয় দু-আনা, খেতে দেয় না, তবে আধ সের মকাইয়ের ছাতু দেয়।

—এতে চলে?

—বাবু, নাচে কিছু হয় না, আগে হত। এখন লোকের কষ্ট, নাচ দেখবে কে। যখন নাচের বায়না না থাকে, ক্ষেতখামারে কাজ করি। আর-বছর গম কেটেছিলাম। কি করি হুজুর, খেতে তো হবে। এত শখ করে ছক্করবাজি নাচ শিখেছিলাম গয়া থেকে—কেউ দেখতে চায় না, ছক্করবাজি নাচের মজুরী বেশী।

ধাতুরিয়াকে আমি কাছারিতে নাচ দেখাইবার নিমন্ত্রণ করিলাম। ধাতুরিয়া শিল্পী লোক —সত্যিকার শিল্পীর নিস্পৃহতা ওর মধ্যে আছে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না খুব ফুটিলে রাসবিহারী সিং-এর নিকট বিদায় লইলাম। রাসবিহারী সিং পুনরায় দুটি বন্দুকের আওয়াজ করিল, আমার ঘোড়া উহাদের উঠান পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আমার সম্মানের জন্য।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি। উদার, মুক্ত প্রন্তরের মধ্যে সাদা বালির রাস্তা জ্যোৎস্নাসম্পাতে চিক্‌চিক্ করিতেছে। দূরে একটা সিল্লী পাখী জ্যোৎস্নারাতে কোথায় ডাকিতেছে—যেন এই বিশাল, জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পথহারা কোন বিপন্ন নৈশ-পথিকের আকুল কণ্ঠস্বর।

পিছন হইতে কে ডাকিল—হুজুর, ম্যানেজারবাবু—

চাহিয়া দেখি ধাতুরিয়া আমার ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটিতেছে।

ঘোড়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া হাঁপাইতেছিল। একটুখানি দাঁড়াইয়া দম লইয়া, এইটু ইতস্তত করিয়া পরিশেষে লাজুক মুখে বলিল—একটা কথা বলছিলাম, হুজুর—

তাহাকে সাহস দিবার স্বরে বলিলাম—কি, বল না?

—হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন?

—কি করবে সেখানে গিয়ে ?

—কখনও কলকাতায় যাই নি, শুনেছি সেখানে গাওনা বাজনা নাচের বড় আদর। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলে যেতে বসেছি। উঃ, কি করেই ওই নাচটা শিখি! সে কথা শোনার জিনিস।

গ্রামটা ছাড়াইয়াছিলাম। ধূ ধূ জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ। ভাবে বোধ হইল ধাতুরিয়া লুকাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে চায়, রাসবিহারী সিং টের পাইলে শাসন করিবে এই ভয়ে। নিকটেই মাঠের মধ্যে একটা ফুলে-ভর্ত্তি শিমুল চারা। ধাতুরিয়ার কথা শুনিয়া শিমুল গাছটার তলায় ঘোড়া হইতে নামিয়া একখণ্ড পাথরের উপর বসিলাম। বলিলাম—বল তোমার গল্প।

—সবাই বলত গয়া জেলায় এক গ্রামে ভিটলদাস বলে একজন গুণীলোক আছে, সে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ। আমার ঝোঁক ছিল. ছক্করবাজি যে করে হোক শিখবই। গয়া জেলাতে চলে গেলাম, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি আর ভিটলদাসের খোঁজ করি। কেউ বলতে পারে না। শেষকালে একদিন সন্ধ্যার সময় একটা আহীরদের মহিষের বাথানে আশ্রয় নিয়েছি সেখানে শুনলাম ছক্করবাজি নাচ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। অনেক রাত তখন, শীতও খুব। আমি বিচালি পেতে বাথানের এক কোণে শুয়ে ছিলাম, যেমন ছক্করবাজির কথা কানে যাওয়া অমনি লাফিয়ে উঠেছি। ওদের কাছে এসে বসি। কি খুশীই যে হলাম বাবুজী সে আর কি বলব! যেন একটা কি তালুক পেয়ে গিয়েছি! ওদের কাছে ভিটলদাসের সন্ধান পেলাম। ওখান থেকে সতের ক্রোশ রাস্তা তিনটাঙা বলে গ্রামে তাঁর বাড়ী।

বেশ লাগিতেছিল একজন তরুণ শিল্পীর শিল্পশিক্ষার আকুল আগ্রহের গল্প। বলিলাম, তার পর ?

—হেঁটে সেখানে গেলাম। ভিটলদাস দেখি বুড়ো মানুষ। একমুখ সাদা দাড়ি। আমায় দেখে বললেন—কি চাই ? আমি বললাম—আমি ছক্করবাজি নাচ শিখতে এসেছি। তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আজকালকার ছেলেরা এ পছন্দ করে ? এ তো লোকে ভুলেই গিয়েছে। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললাম—আমায় শেখাতে হবে, বহুদূর থেকে আসছি আপনার নাম শুনে। তাঁর চোখ দিয়ে জল এল। বললেন—আমার বংশে সাতপুরুষ ধরে এই নাচের চর্চ্চা। কিন্তু আমার ছেলে নেই, বাইরের কেউ এসে শিখতেও চায় নি আমার এত বয়স হয়েছে, এর মধ্যে। আজ তুমি প্রথম এলে। আচ্ছা, তোমায় শেখাব। তা বুঝলেন হুজুর, এত কষ্ট করে শেখা জিনিস। এখানে গাঙ্গোতাদের দেখিয়ে কি করব ? কলকাতায় গুণের আদর আছে। সেখানে নিয়ে যাবেন, হুজুর ?

বলিলাম—আমার কাছারিতে একদিন এসো ধাতুরিয়া, এ-সম্বন্ধে কথা বলব।

ধাতুরিয়া আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আমার মনে হইল উহার এত কষ্ট করিয়া শেখা গ্রাম্য নাচ কলিকাতায় কে-ই বা দেখিবে আর ও বেচারী একা সেখানে কি-ই বা করিবে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিরাণীর—প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোন দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।

কিন্তু অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ব্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্য্যের বর, অপূর্ব্ব শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।

কয়েক বারের কথা বলি। সে অমূল্য অনুভূতিরাজির কথা বলিতে গেলে লিখিয়া পাতার পর পাতা ফুরাইয়া যায়, কিন্তু তবু বলা শেষ হয় না, যা বলিতে চাহিতেছি তাহার অনেকখানিই বাকি থাকিয়া যায়। এসব শুনিবার লোকও সংখ্যায় অত্যন্ত কম, ক'জন মনে-প্রাণে প্রকৃতিকে ভালবাসে?

অরণ্য-প্রান্তরে লবটুলিয়ার মাঠে মাঠে দুধলি ঘাসের ফুল ফুটাইয়া জানাইয়া দেয় যে বসন্ত পড়িয়াছে। সে ফুলও বড় সুন্দর, দেখিতে নক্ষত্রের মত আকৃতি, রং হলদে, লম্বা লম্বা সরু লতার মত ঘাসের ডাঁটাটা অনেকখানি জমি জুড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকে, নক্ষত্রাকৃতি হলদে ফুল ধরে তার গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ, পথের ধার সর্ব্বত্র আলো করিয়া ফুটিয়া থাকিত—কিন্তু সূর্য্যের তেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুল কুঁকড়াইয়া পুনরায় কুঁড়ির আকার ধারণ করিত—পরদিন সকালে আবার সেই কুঁড়িগুলিই দেখিতাম ফুটিয়া আছে।

রক্তপলাশের বাহার আছে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও আমাদের সীমানার বাহিরের জঙ্গলে কিংবা মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে। আমাদের মহাল হইতে সে-সব স্থান অনেক দূরে, ঘোড়ায় তিন-চার ঘণ্টা লাগে। সে-সব জায়গায় চৈত্রে শালমঞ্জরীর সুবাসে বাতাস মাতাইয়া রাখে, শিমুল বনে দিগন্তরেখা রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু কোকিল, দোয়েল, বৌ-কথাকও প্রভৃতি গায়কপাখীরা ডাকে না, এ-সব জনহীন অরণ্য-প্রান্তরের যে ছন্নছাড়া রূপ, বোধ হয় তাহারা তাহা পছন্দ করে না।

এক-এক দিন বাংলা দেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে

সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধানো পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলফোটা ঘেঁটুবন, বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘনছায়া-ভরা অপরাহ্ণ। দেশকে কী ভাল করিয়াই চিনিলাম বিদেশে গিয়া! দেশের জন্য এই মনোবেদনা দেশে থাকিতে কখনও অনুভব করি নাই, জীবনে এ একটা বড় অনুভূতি, যে ইহার আস্বাদ না পাইল, সে হতভাগ্য একটা শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সহিত অপরিচিত রহিয়া গেল।

কিন্তু যে-কথাটা বার-বার নানা ভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন বারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম্‌-ছম্‌-করানো সৌন্দর্য্যের দিকটা। না দেখিলে কি করিয়া বুঝাইব সে কী জিনিস।

জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনো আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।

সে-রূপ তাহার না-দেখাই ভাল যাহাকে ঘরদুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে। প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে হ্যারি জনস্টন, মার্কো পোলো, হাড্‌সন, শ্যাকলটন করিয়া তোলে—গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না—অসম্ভব তাহার পক্ষে ঘরকন্না করা একবার সে ডাক যে শুনিয়াছে, সে অনবগুণ্ঠিতা মোহিনীকে একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্য্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্ব্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন।

তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতিকে সে-রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। এমন বিজন বিশাল উন্মুক্ত অরণ্য-প্রান্তরে, শৈলমালা, বনঝাউ, আর কাশের বন কোথায় যেখানে-সেখানে? তার সঙ্গে যোগ চাই গভীর নিশীথিনীর নীরবতার ও তার অন্ধকার বা জ্যোৎস্নার—এত যোগাযোগ সুলভ হইলে পৃথিবীতে, কবি আর পাগলে দেশ ছাইয়া যাইত না?

একদিন প্রকৃতির সে-রূপ কি-ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সে-ঘটনা বলি। পূর্ণিয়া হইতে উকিলের 'তার' পাইলাম পরদিন সকালে দশটার মধ্যে আমায় সেখানে হাজির হইতে হইবে। অন্যথায় স্টেটের একটা বড় মোকদ্দমায় আমাদের হার সুনিশ্চিত।

আমাদের মহাল হইতে পূর্ণিয়া পঞ্চান্ন মাইল দূরে। রাত্রের ট্রেন মাত্র একখানি, যখন 'তার' হস্তগত হইল তখন সতের মাইল দূরবর্তী কাটারিয়া স্টেশনে গিয়া সে-ট্রেন ধরা অসম্ভব।

ঠিক হইল এখনই ঘোড়ায় রওনা হইতে হইবে।

কিন্তু পথ সুদীর্ঘ বটে, বিপদসঙ্কুলও বটে, বিশেষ করিয়া এই রাত্রিকালে, এই অরণ্য-অঞ্চলে। সুতরাং তহশীলদার সুজন সিং আমার সঙ্গে যাইবে ইহাও ঠিক হইল।

সন্ধ্যায় দুজনে ঘোড়া ছাড়িলাম। কাছারি ছাড়িয়া জঙ্গলে পড়িতেই কিছু পরে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ উঠিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বন-প্রান্তর আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। পাশাপাশি দু'জনে চলিয়াছি—আমি আর সুজন সিং। পথ কখনও উঁচু, কখনও নীচু, সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চকচক্ করিতেছে। ঝোপঝাপ মাঝে মাঝে, আর শুধু কাশ আর ঝাউবন চলিয়াছে, সুজন সিং গল্প করিতেছে। জ্যোৎস্না ক্রমেই ফুটিতেছে—বনজঙ্গল, বালুচর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতেছে। বহুদূর পর্য্যন্ত নীচু জঙ্গলের শীর্ষদেশ একটানা সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ-ধূ প্রান্তর একদিকে, অন্য দিকে জঙ্গল। বাঁ দিকে দূরে অনুচ্চ শৈলমালা। নির্জ্জন, নীরব, মানুষের বসতি কুত্রাপি নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন অন্য কোন অজানা গ্রহের মধ্যে নির্জ্জন বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা।

এক জায়গায় সুজন সিং ঘোড়া থামাইল। ব্যাপার কি? পাশের জঙ্গল হইতে একটি ধাড়ী বন্যশূকর একদল ছানাপোনা লইয়া আমাদের পথ পার হইয়া বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকিতেছে। সুজন সিং বলিল—তবুও ভাল হুজুর, ভেবেছিলাম বুনো মহিষ। মোহনপুরা জঙ্গলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, বুনো মহিষের ভয় এখানে খুব। সেদিনও একজন লোক মারিয়াছে মহিষে।

আরও কিছুদূর গিয়া জ্যোৎস্নায় দূর হইতে কালোমত সত্যই কি-একটা দেখা গেল।

সুজন বলিল—ঘোড়া ভয় পাবে হুজুর, ঘোড়া রুখুন।

শেষে দেখা গেল সেটা নড়েও না চড়েও না! একটু একটু করিয়া কাছে গিয়া দেখা গেল, সেটা একটা কাশের খুপরি। আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। মাঠ-ঘাট, বন, ধূ-ধূ জ্যোৎস্না-ভরা বিশ্ব—কি একটা সঙ্গীহারা পাখী আকাশের গায়ে কি বনের মধ্যে কোথায় ডাকিতেছে টি-টি-টি-টি—ঘোড়ার খুরে বড় বালি উঠিতেছে, ঘোড়া একমুহূর্ত্ত থামাইবার উপায় নাই—উড়াও, উড়াও—

অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া পিঠ টন্‌টন্ করিতেছে, জিনের বাসবার জায়গাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, ঘোড়া ছাড়তোক ভাঙিয়া দুলকি চাল ধরিয়াছে, আমার ঘোড়াটা আবার বড্ড ভয় পায়, এজন্য সতর্কতার সঙ্গে সামনের পথে অনেক দূর পর্য্যন্ত নজর রাখিয়া চলিয়াছি—হঠাৎ থমকিয়া ঘোড়া দাঁড়াইয়া গেলে ঘোড়া হইতে ছিটকাইয়া পড়া অনিবার্য্য।

কাশের মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তা বলিয়া কিছু নাই, সেই কাশের ঝুটি দেখিয়া এই গভীর জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া লইতে হয়। একবার সুজন সিং বলিল—হুজুর, এ-পথটা যেন নয়, পথ ভুলেছি আমরা।

আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়া ধ্রুবতারা ঠিক করিলাম—পূর্ণিয়া আমাদের মহাল হইতে খাড়া উত্তরে, তবে ঠিক আছি, সুজনকে বুঝাইয়া বলিলাম।

সুজন বলিল—না হুজুর, কুশীনদীর খেয়া পেরুতে হবে যে, খেয়া পার হয়ে তবে সোজা উত্তরে যেতে হবে। এখন উত্তর-পূর্ব্ব কোণ কেটে বেরুতে হবে।

অবশেষে পথ মিলিল।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে—সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জ্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা এমন উন্মুক্ত আকাশতলে—ছায়াহীন উদাসগম্ভীর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না—ক'জন দেখিয়াছে? উঃ সে কি ছুট! পাশাপাশি চলিতে চলিতে দুই ঘোড়াই হাঁপাইতেছে, শীতেও ঘাম দেখা দিয়াছে আমাদের গায়ে।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটা শিমুলগাছের তলায় আমরা ঘোড়া থামাইয়া একটু বিশ্রাম করি, সামান্য মিনিট-দশেক। একটা ছোট নদী বহিয়া গিয়া অদূরে কুশীনদীর সঙ্গে মিশিয়াছে, শিমুলগাছটাতে ফুল ফুটিয়াছে, বনটা সেখানে চারিধার হইতে আসিয়া আমাদের এমন ঘিরিয়াছে যে, পথের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ খাটো খাটো গাছপালার বন—শিমুল-গাছটাই সেখানে খুব উঁচু—বনের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুজনেরই জল-পিপাসা পাইয়াছে দারুণ।

জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসে। অন্ধকার বনপথ, পশ্চিম দিগন্তের দূর শৈলমালার পিছনে শেষরাত্রির চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছে। ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসিল, পাখী-পাখালীর শব্দ নাই কোন দিকে, শুধু ছায়া ছায়া, অন্ধকার মাঠ, অন্ধকার বন। শেষরাত্রির বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। ঘড়িতে রাত প্রায় চারটা। ভয় হয়, শেষ-রাত্রের অন্ধকারে বুনো হাতীর দল সামনে না আসে! মধুবনীর জঙ্গলে এক পাল বুনো হাতীও আছে।

এবার আশে-পাশে ছোট ছোট পাহাড়, তার মধ্য দিয়া পথ, পাহাড়ের মাথায় নিষ্পত্র শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ, কোথাও রক্তপলাশের বন। শেষ-রাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে বন-পাহাড় অদ্ভুত দেখায়। পূর্ব্ব দিকে ফর্সা হইয়া আসিল—ভোরের হাওয়া বহিতেছে, পাখীর ডাক কানে গেল। ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দর-দর-ধারে ঘাম ছুটিতেছে, ছুট্ ছুট্, খুব ভাল ঘোড়া তাই এই পথে সমানে এত ছুটিতে পারে। সন্ধ্যায় কাছারি ছাড়িয়াছি—আর ভোর হইয়া গেল। সম্মুখে এখনও যেন পথের শেষ নাই, সেই একঘেয়ে বন, পাহাড়।

সামনের পাহাড়ের পিছন থেকে টকটকে লাল সিঁদুরের গোলার মত সূর্য্য উঠিতেছে। পথের ধারে এক গ্রামে ঘোড়া থামাইয়া কিছু দুধ কিনিয়া দুজনে খাইলাম। পরে আরও ঘণ্টা-দুই চলিয়াই পূর্ণিয়া শহর।

পূর্ণিয়ার স্টেটের কাজ তো শেষ করিলাম, সে যেন নিতান্ত অন্যমনস্কতার সহিত, মন

পড়িয়া রহিল পথের দিকে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছা, কাজ শেষ করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে—আমি তাহাকে বাধা দিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে এতটা পথ অশ্বারোহণে যাইবার বিচিত্র সৌন্দর্য্যের পুনরাস্বাদনের লোভে।

গেলামও তাই। পরদিন চাঁদ একটু দেরিতে উঠিলেও ভোর পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না পাওয়া গেল। আর কি সে জ্যোৎস্না! কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না বনে-পাহাড়ে যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ, অথচ এক আশ্চর্য্যরূপে অপরিচিত স্বপ্নজগতের রচনা করিয়াছে—সেই খাটো খাটো কাশ-জঙ্গল, সেই পাহাড়ের সানুদেশে পীতবর্ণ গোলগোলি ফুল, সেই উঁচু-নীচু পথ—সব মিলিয়া যেন কোন্ বহুদূরের নক্ষত্রলোক—মৃত্যুর পরে অজানা কোন্ অদৃশ্য লোকে অশরীরী হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি—ভগবান বুদ্ধের সেই নির্ব্বাণ-লোকে, যেখানে চন্দ্রের উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও নাই।

অনেক দিন পরে যখন এই মুক্ত জীবন ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি, তখন কলিকাতা শহরে ক্ষুদ্র গলির বাসাবাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সেলাইয়ের কল চালনার শব্দ শুনিতে শুনিতে অবসর-দিনের দুপুরে কতবার এই রাত্রির কথা, এই অপূর্ব্ব আনন্দের কথা, এই জ্যোৎস্নামাখা রহস্যময় বনশ্রীর কথা, শেষরাত্রের চাঁদডোবা অন্ধকারে পাহাড়ের উপর শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি গাছের কথা, শুকনো কাশ-জঙ্গলের সোঁদা সোঁদা তাজা গন্ধের কথা ভাবিয়াছি—কতবার কল্পনায় আবার ঘোড়ায় চড়িয়া জ্যোৎস্নারাত্রে পূর্ণিয়া গিয়াছি।

২

চৈত্রমাসের মাঝামাঝি একদিন খবর পাইলাম সীতাপুর গ্রামে রাখালবাবু নামে একজন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন, তিনি কাল রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

ইঁহার নাম পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তিনি যে ওখানে ছিলেন, তাহা জানিতাম না। শুনিলাম আজ বিশ-বাইশ বৎসর তিনি সেখানে ছিলেন। ও-অঞ্চলে তাঁহার পসার ছিল, ঘর-বাড়ীও নাকি করিয়াছিলেন ঐ গ্রামেই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সেখানেই থাকে।

এই অবাঙালীর দেশে একজন বাঙালী ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন হঠাৎ, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের কি দশা হইতেছে, কে তাহাদের দেখাশুনা করিতেছে, তাঁহার সৎকার বা শ্রাদ্ধশান্তির কি ব্যবস্থা হইতেছে, এসব জানিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম আমার প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে সেখানে গিয়া সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের খোঁজ-খবর লওয়া।

খবর লইয়া জানিলাম গ্রামটি এখান হইতে মাইল-কুড়ি দূরে, কড়ারী খাসমহলের সীমানায়। বৈকালের দিকে সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখালবাবুর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দুখানা বড় বড় খোলার ঘর, খান-তিনেক ছোট ছোট ঘর। বাহিরে এদেশের ধরণে একখানা বসিবার ঘর, তার তিন দিকে দেওয়াল

নাই। বাঙালীর বাড়ী বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই, বসিবার ঘরে দড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমানধ্বজাটি পর্য্যন্ত সব এদেশী।

আমার ডাকে একটি বার-তের বছরের ছেলে বাহির হইয়া আসিল; আমায় দেখিয়া ঠেট্ হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে খুঁজছেন?

তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে, সে বাঙালীর ছেলে। মাথায় লম্বা টিকি, গলায় অবশ্য বর্ত্তমানে কাচা—সবই বুঝিলাম, কিন্তু মুখের ভাব পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বালকের মত কি করিয়া হয়?

আমার পরিচয় দিয়া বলিলাম—তোমাদের বাড়ীতে এখন বড় লোক কে আছেন তাঁকে ডাক।

ছেলেটি বলিল, সে-ই বড় ছেলে। তার আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক নাই।

বলিলাম—তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একবার কথা কইতে চাই। জিজ্ঞেস করে এস।

খানিকটা পরে ছেলেটি আসিয়া আমায় বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। রাখালবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইল বয়স অল্প, ত্রিশের মধ্যে, সদ্য-বিধবার বেশ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্র নিতান্ত দরিদ্রের গৃহস্থালির মত। এক দিকে একটা ছোট গোলা, ঘরে দাওয়ায় খান-দুই চারপাই, ছেঁড়া লেপ কাঁথা, এদেশী পিতলের ঘয়লা, একটা গুড়গুড়ি, পুরনো টিনের তোরঙ্গ। বলিলাম—আমি বাঙালী, আপনার প্রতিবেশী। আমার কানে গেল রাখালবাবুর কথা, তাই এলাম। আমার এখানে একটা কর্ত্তব্য আছ বলে, মনে করি। আমার কোন সাহায্য যদি দরকার হয়, নিঃসঙ্কোচে বলুন। রাখালবাবুর স্ত্রী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বুঝাইয়া শান্ত করিয়া পুনরায় আমার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী এবার আমার সামনে বাহির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আপনি আমার দাদার মত, আমাদের এই ঘোর বিপদের সময় ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন।

ক্রমে কথায় কথায় জানা গেল, এই বাঙালী পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় এই ঘোর বিদেশে। রাখালবাবু গত এক বৎসরের উপর শয্যাগত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা ও সংসার-খরচে সঞ্চিত অর্থ সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—এখন এমন উপায় নাই যে তাঁর শ্রাদ্ধের যোগাড় হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা রাখালবাবু তো অনেকদিন ধরে এ অঞ্চলে আছেন, কিছু করতে পারেন নি?

রাখালবাবুর স্ত্রীর সঙ্কোচ ও লজ্জা অনেকটা দূর হইয়াছিল। তিনি যেন এই প্রবাসে, এই দুর্দ্দিনে একজন বাঙালীর মুখ দেখিয়া অকূলে কূল পাইয়াছেন, মুখের ভাবে মনে হইল।

বলিলেন—আগে কি রোজগার করতেন জানি নে। আমার বিয়ে হয়েছে এই পনের বছর—আমার সতীন মারা যেতে আমায় বিয়ে করেন। আমি এসে পর্য্যন্ত দেখছি কোন

রকমে সংসার চলে। এখানে ভিজিটের টাকা বড় একটা কেউ দেয় না, গম দেয়, মকাই দেয়। গত বছর মাঘ মাসে উনি অসুখে পড়লেন, সেই থেকে আর একটি পয়সা ছিল না। তবে এদেশের লোক খারাপ নয়, যার কাছে যা পাওনা ছিল, বাড়ী বয়ে সে-সব গম মকাই কলাই দিয়ে গিয়েছে। তাই চলেছে, নয়ত না খেয়ে মরত সবাই।

—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়? সেখানে খবর দেওয়া হয়েছে?

রাখালবাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—খবর দেবার কিছু নেই। আমার বাপের বাড়ী কখনও দেখি নি। শুনেছিলুম, ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। ছেলেবেলা থেকে আমি সাহেবগঞ্জে ভগ্নীপতির বাড়ীতে মানুষ। মা-বাবা কেউ ছিলেন না। আমার সে-দিদি আমার বিয়ের পর মারা যায়। ভগ্নীপতি আবার বিয়ে করেছেন। তাঁর সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক কি?

—রাখালবাবুর কোন আত্মীয়স্বজন কোথাও নেই?

—দেশে জ্ঞাতি ভাইয়েরা আছে শুনতাম বটে, কিন্তু তারা কখনও সংবাদ নেয় নি, উনিও দেশে যাতায়াত করতেন না। তাদের সঙ্গে সদ্ভাবও নেই, তাদের খবর দেওয়া-না-দেওয়া সমান। এক মামাশ্বশুর আছেন আমার শুনতাম, কাশীতে। তা-ও তাঁর ঠিকানা জানি নে।

ভয়ানক অসহায় অবস্থা। আপনার জন কেহ নাই, এই বন্ধুহীন বিদেশে দুই তিনটি নাবালক ছেলে লইয়া সহায়সম্পদশূন্য বিধবা মহিলাটির দশা ভাবিয়া মন রীতিমত দমিয়া গেল। তখনকার মত যাহা করা উচিত করিয়া আমি কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম, সদরে লিখিয়া স্টেট্ হইতে আপাতত এক শত টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখালবাবুর শ্রাদ্ধও কোন রকমে শেষ করিয়া দিলাম।

ইহার পর আরও বারকয়েক রাখালবাবুর বাড়ী গিয়াছি। স্টেট্ হইতে মাসে দশটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করাইয়া লইয়া প্রথম বারের টাকাটা নিজেই দিতে গিয়াছিলাম। দিদি খুব যত্ন করিতেন, অনেক স্নেহ-আত্মীয়তার কথা বলিতেন। সেই বিদেশে তাঁর স্নেহ-যত্ন আমার বড় ভাল লাগিত। তারই লোভে অবসর পাইলেই সেখানে যাইতাম।

৩

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এ রকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের তিনদিকে নিবিড় বন। এ ধরণের বন আমাদের মহালে বা লবটুলিয়াতে নাই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্য-বশতই হোক বা যে-জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্যপুষ্পের ভিড়। এই

বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্ব্বদিকের বহুদূর-প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। সুতরাং পূর্ব্ব-পশ্চিম কোণের তীরের কোন-এক জায়গায় বসিয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে চাহিয়া দেখিলে সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বতা ঠিক বোঝা যায়। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে, দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটিতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কতদিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখীর ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখী নাই। নানা রকমের বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবতঃ উচ্চ বনস্পতিশিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

হ্রদের তীরের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের উপর লম্বা, গভীরতায় প্রায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়া বনের মধ্যে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় একটা সুঁড়ি পথ বনের শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছে—এই পথ ধরিয়া বেড়াইতাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার উপর উপুড়-হইয়া-পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তলীন শৈলশ্রেণী চোখে পড়িত। ঝির্‌ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বহিত, পাখী গান গাহিত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইত।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপরে বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুকরা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কত ধরণের কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। এক প্রকার অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তস্তল হইতে বাহিরের মনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এ আসে গভীর আনন্দের মূর্ত্তি ধরিয়া। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।

আমাদের যেখানে মহাল, সেখানে পাখীর এত বৈচিত্র্য নাই। সেখানটা যেন অন্য জগৎ, তার গাছপালা, জীবজন্তু অন্য ধরণের। পরিচিত জগতে বসন্ত যখন দেখা দিয়াছে, লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই। সে যেন রুক্ষ কর্কশ ভৈরবী মূর্ত্তি; সৌম্য, সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্য্যহীন—মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল বর্জ্জিত খাড়ব সুর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দ্দার ধার মাড়াইয়া চলে না—সুরের গম্ভীর উদাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌছাইয়া দেয়।

সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে। শুব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতে শুনিতে মন কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধি নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতাম।

নাঢ়া বইহার জরীপ হইতেছে প্রজাদের মধ্যে বিলির জন্য, আমীনদের কাজ দেখাইবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতে হয়। ফিরিবার পথে মাইল দুই পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাই, শুধু সরস্বতী কুণ্ডীর এই বনভূমিতে ঢুকিয়া বনের ছায়ায় খানিকটা বেড়াইবার লোভে।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্য্যন্ত গেলাম—প্রান্তরসীমা হইতে জলের কিনারা প্রায় দেড় মাইলের কম নয়, কোন কোন স্থানে আরও বেশী। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে, বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত-দুই উপরে গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি একপ্রকার বন্যলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে—একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের কাছে দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্দ্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন নিবিড় সুবাস সে-ফুলের! ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে! কত ধরণের, কত রং-বেরঙের পাখী—শ্যামা, শালিক, হরট্টিট্, বনটিয়া, ফেজাণ্ট-ক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখী, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখী—পাখীর কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাস-ভরা অবাক কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারি পাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ্-কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

পাখীদের এই অসঙ্কোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিত। উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না, একটু হয়ত উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

এখানেই একদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। জানিতাম বন্য হরিণ আমাদের মহালের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের

পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ-বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব!

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আবার একটু আগাইয়া আসিল। তার চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত সাগ্রহ কৌতুহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কি না জানি না, আমার ঘোড়াটা সে সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

তার পর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দূর শৈলমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত, আকাশ নীল, মেঘের লেশ নাই কোন দিকে—কুণ্ডীর জলচর পাখীর দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা শুরু করিয়াছে—একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মানিক-পাখী তীরবর্ত্তী এক উচ্চ বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া আছে দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।

রোদ ক্রমশঃ রাঙা হইয়া আসিল।

ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল।

পাখীর কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেঁজি খানিকদূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জ্জনতা। এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিন ঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখীর কাকলী ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখীদের পায়ে পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুক্‌রা পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোন দিকে।

নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন গড়ন বনস্পতিদের শীর্ষদেশের। এই সন্ধ্যার সময় রাঙা রোদ পড়িয়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভুত। তাদের কত গাছের মগডাল জড়াইয়া লতা উঠিয়াছে, এক ধরণের লতাকে এদেশে বলে ভিঁয়োরা লতা—আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোম্‌রা লতা—সে লতা যে গাছের মাথায় উঠিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এই সময় ভোম্‌রা লতায় ফুল ফোটে—ছোট ছোট বনজুঁইয়ের মত সাদা সাদা ফুলে কত বড় গাছের

মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি চমৎকার সুঘ্রাণ, অনেকটা যেন প্রস্ফুটিত সর্ষে ফুলের মত—তবে অতটা উগ্র নয়।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য্য এক এক জায়গায় এত বেশী, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর শরতের প্রথমে সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝড়িয়া পড়িয়া ছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে-পাশে—বড় বড় ময়না-কাঁটার গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়াছে—কাঁটা, ঘাস, শিলাখণ্ড সব তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র, ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম! লোকে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গলে বাঘ আছে, জ্যোৎস্না-রাত্রে সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদীস্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশীলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধূলা দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়া ডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

বাঘ দেখি নাই বটে, কিন্তু সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নারাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধার নীরব নিস্তব্ধ—পূর্ব্ব তীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল—দূরের শৈলমালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে—জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোম্‌রা লতার নৈশ-পুষ্পের মৃদু সুবাস···আমার সামনে বন ও পাহাড়ে বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্না···পরিপূর্ণ, ছায়াহীন, জলের উপর পড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না···ভোম্‌রা লতার সাদা-ফুলে-ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে···

আর এক ধরণের পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছিল—ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতই। দু-একটা পত্র পতনের শব্দ বা খস্ খস্ করিয়া শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া বন্য জন্তুর পলায়নের শব্দ···

বনদেবীরা আমরা থাকিতে তো আর আসে না! কত গভীর রাত্রে আসে কে জানে। আমি বেশী রাত পর্য্যন্ত হিম সহ্য করিতে পারি নাই। ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই ফিরি।

সরস্বতী কুণ্ডীর এই পরীদের প্রবাদ এখানেই শুনিয়াছিলাম।

শ্রাবণ মাসে একদিন আমাকে উত্তর সীমানার জরীপের ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করিতে হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমীন রঘুবর প্রসাদ। সে আগে গবর্নমেণ্টের চাকুরি করিয়াছে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও এ-অঞ্চলের বনের সঙ্গে তার পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পরিচয়।

তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে; জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐ সব পাথরের উপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্ম-ফুলের

মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তার পর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। হুজুর, ওখানে আপনি ও-রকম যাবেন না।

এই সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে একদিন দুপুরে এক অদ্ভুত লোকের সন্ধান পাইলাম।

সার্ভেক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কি যেন করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে। ভুঁই-কুমড়া লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চালকুমড়ার আকারের প্রকাণ্ড কন্দ জন্মায়—উপর হইতে বোঝা যায় না। কবিরাজী ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রয় হয়। কৌতুহলবশতঃ ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই-কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কিসের যেন বীজ পুঁতিয়া দিতেছে।

আমায় দেখিয়া সে থতমত খাইয়া অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইয়াছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলে, তার ভিতর হইতে ছোট একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্তত কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ানো।

বলিলাম—তুমি কে? এখানে কি করছ?

সে বলিল—হুজুর কি ম্যানেজারবাবু?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারী পাটোয়ারী একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল। উঠাইবার কারণ, আজমাবাদের সদর কাছারিতে—অর্থাৎ আমি যেখানে থাকি—সেখানে একজন মুহুরীর পদ খালি ছিল। বলিয়াছিলাম একটা ভাল লোক দেখিয়া দিতে। বনোয়ারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, লোক তো তাহার সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-ই ছিল, কিন্তু লোকটা অদ্ভুত মেজাজের, এক রকম খামখেয়ালী উদাসীন ধরণের। নইলে কায়েথী হিন্দীতে অমন হস্তাক্ষর, অমন পড়ালেখার এলেম্ এ-অঞ্চলের বেশী লোকের নাই।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন, সে কি করে?

বনোয়ারী বলিয়াছিল—তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে-সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ঐ এক ধরণের মানুষ।

এই তাহা হইলে বনোয়ারীলালের সেই চাচাতো ভাই?

কৌতুহল বাড়িল, বলিলাম—ও কি পুঁতছ ওখানে?

লোকটা বোধ হয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন সুরে বলিল—কিছু না, এই—একটা গাছের বীজ—

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কি গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কি-গাছের বীজ ছড়াইতেছে—তাহার সার্থকতাই বা কি? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল—অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারি চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল! তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতাফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনা-স্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা!

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। সে বলিল—আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে।

—তোমার কি এ কাজ খুব ভাল লাগে?

—লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারি চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি এখানকার বনে-ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব, এ আমার বহুদিনের শখ।

—কি ফুল নিয়ে আসতে?

—কি করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ী ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডীর ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশীনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ-পনেরো কোশ দূরে। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বনঝোপ কি লোকের বাড়ীর পেছনে পোড়ো জমিতে ভাণ্ডীর ফুলের একেবারে জঙ্গল। সেই থেকে আমার এই দিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল, গাছ লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারা-জীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও-কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু ফুল ও সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বলিলাম—তুমি এরিস্ট-লোকিয়া লতা চেন?

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংস-লতা? হাঁসের-মত-চেহারা ফুল হয় তো?

ও তো এ দেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্য্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরীব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।

আমায় বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর মত চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা! আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারে বড় কষ্ট, ইহা আমি জানিতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরীর চাকুরি দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে।

সেই বছরে আমি কলিকাতা হইতে সাটনের বিদেশী বন্য পুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য জুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে। কি আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের! আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম এ উৎসাহ ও আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে। তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না। পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্ব্বর, গাছপালাগুলিও যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। কেবল সাটনের বীজের প্যাকেট লইয়া গোলমাল বাধিয়াছিল। প্রত্যেক প্যাকেটের উপর তাহারা ফুলের নাম ও কোন কোন স্থলে এক লাইনে ফুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়াছিল। ভাল রং ও চেহারা বাছিয়া বাছিয়া যে বীজগুলি লাগাইলাম, তাহার মধ্যে 'হোয়াইট বিম' ও 'রেডক্যাম্পিয়ন্' এবং 'ষ্টিচওয়ার্ট' অসাধারণ উন্নতি দেখাইল। 'ফক্সগ্নাভ' ও 'উড-অ্যানিমোন্' মন্দ হইল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও 'ডগ রোজ' বা 'হনিসাক্ল্'-এর চারা বাঁচাইতে পারা গেল না।

হলদে ধুতুরা-জাতীয় এক প্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম। খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল। যুগলপ্রসাদ পূর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপের মাথা বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে। বয়ড়া লতার ফুল যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহার মৃদু সুবাস।

হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে।

যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল।

আমায় বলিল—লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু ওর ফুল ধরবে না। সব লতায় নাকি ফুল ধরে না। দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে।

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফ্‌ট' বলিয়া এক প্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুঁতিয়াছিলাম। সে গাছ হু হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে, যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহারা বেদখল করিয়া ফেলে।

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শহরের শৌখীন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলে-ভরা বোগেন-ভিলিয়ার ঝোপ উহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমার ধরণের। সেও বারণ করিল।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই। একদিন গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনিলাম, কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে এক প্রকার অদ্ভুত ধরণের বনপুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল। হলুদ গাছের মত পাতা, অত বড়ই গাছ—খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচুদিকে তিন-চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে—দেখিতে খুব ভাল তো বটেই, ভারি সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায় দেখিতে দেখিতে এত হু-হু করিয়া বংশ বৃদ্ধি হয় যে, দু-তিন বছরে রীতিমত জঙ্গল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্য্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ঐ ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না; গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সা-কড়ি দিয়া যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় যোগাড় করিয়া আনিল।

নবম পরিচ্ছেদ

১

প্রায় তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে—শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি। নির্জ্জনতার মোহ, নক্ষত্রভরা উদার আকাশের মোহ আমাকে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, মধ্যে একবার কয়েক দিনের জন্য পাটনায় গিয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিলাম কবে পিচ-ঢালা বাঁধা-ধরা রাস্তার গণ্ডি এড়াইয়া চলিয়া যাইব লবটুলিয়া বইহারে,—পেয়ালার মত উপুড়-করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, যেখানে তৈরী রাজপথ নাই, ইটের

ঘরবাড়ী নাই, মোটর-হর্ণের আওয়াজ নাই, ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর-ঘোষণা শোনা যায়, নয়তো ধাবমান নীল-গাইয়ের দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয়তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।

আমার উপরওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন, কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না। আমি জানি আমার তাহাই একটি প্রধান কাজ বটে, কিন্তু এখানে প্রজা বসাইয়া প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করিতে মন সরে না। যাহারা জমি ইজারা লইবে, তাহারা তো জমিতে গাছপালা বনঝোপ সাজাইয়া রাখিবার জন্য কিনিবে না—কিনিয়াই তাহারা জমি সাফ করিয়া ফেলিবে, ফসল রোপণ করিবে, ঘর-বাড়ী বাঁধিয়া বসবাস শুরু করিবে—এই নির্জ্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য, কুণ্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা উর্দ্ধশ্বাসে পলাইবেন—মানুষ ঢুকিয়া এই মায়া-কাননের মায়াও দূর করিবে, সৌন্দর্য্যও ঘুচাইয়া দিবে।

সে জনপদ আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই।—

পাটনা, পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের যাইতে তেমন জনপদ এদেশের সর্ব্বত্র। গায়ে গায়ে কুশ্রী খেটপ খোলার একতলা কি দোতলা মাঠকোঠা, চালে চালে বসতি ফনি-মনসার ঝাড়, গোবরস্তূপের আবর্জ্জনার মাঝখানে গরু-মহিষের গোয়াল—ইঁদারা হইতে রহট্ দ্বারা জল উঠানো হইতেছে, ময়লা কাপড় পরা নর-নারীর ভিড়, হনুমানজীর মন্দিরে ধ্বজা উড়িতেছে, রূপার হাঁসুলি গলায় উলঙ্গ বালক-বালিকার দল ধূলা মাখিয়া রাস্তার উপর খেলা করিতেছে।

কিসের বদলে কি পাওয়া যাইবে!

এমন বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম সৌন্দর্য্যময়ী অরণ্যভূমি দেশের একটা বড় সম্পদ—অন্য কোন দেশ হইলে আইন করিয়া এখানে ন্যাশনাল্ পার্ক করিয়া রাখিত। কর্ম্মক্লান্ত শহরের মানুষ মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্য্যে নিজেদের অবসন্ন মনকে তাজা করিয়া লইয়া ফিরিত। তাহা হইবার জো নাই, যাহার জমি সে প্রজাবিলি না করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিবে কেন।

আমি প্রজা বসাইবার ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম—এই অরণ্যপ্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্ব্বসুন্দরী বন্য নায়িকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। এখন আমি ক্রমশঃ সে-দিন পিছাইয়া দিতেছি। যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ছায়াগহন বৈকালে কিংবা মুক্তাশুভ্র জ্যোৎস্নারাত্রে একা বাহির হই, তখন চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবি, আমার হাতেই ইহা নষ্ট হইবে? জ্যোৎস্নালোকে উদাস আত্মহারা, শিলাস্তৃত ধূ ধূ নির্জ্জন বন্য প্রান্তর! কি করিয়াই আমার মন ভুলাইয়াছে চতুরা সুন্দরী।

কিন্তু কাজ যখন করিতে আসিয়াছি, করিতেই হইবে। মাঘমাসের শেষে পাটনা হইতে ছটু সিং নামে এক রাজপুত আসিয়া হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইতে চাহিয়া দরখাস্ত দিতেই আমি বিষম চিন্তায় পড়িলাম—হাজার বিঘা জমি দিলে ত অনেকটা জায়গাই নষ্ট হইয়া যাইবে—কত সুন্দর বনঝোপ, লতাবিতান নির্ম্মমভাবে কাটা পড়িবে যে!

ছটু সিং ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল—আমি তাহার দরখাস্ত সদরে পাঠাইয়া দিয়া ধ্বংস-লীলাকে কিছু বিলম্বিত করিবার চেষ্টা করিলাম।

২

একদিন লবটুলিয়া জঙ্গলের উত্তরে নাঢ়া বইহারের মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া দুপুরের পরে আসিতেছি—দেখিলাম, একখানা পাথরের উপর কে বসিয়া আছে পথের ধারে।

তাহার কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইলাম। লোকটির বয়স ষাটের কম নয়, পরনে ময়লা কাপড়, একটা ছেঁড়া চাদর গায়ে।

এ জনশূন্য প্রান্তরে লোকটা কি করিতেছে একা বসিয়া?

সে বলিল—আপনি কে বাবু?

বলিলাম—আমি এখানকার কাছারির কর্ম্মচারী।

—আপনি কি ম্যানেজারবাবু?

—কেন বল তো? তোমার কোন দরকার আছে? হ্যাঁ, আমিই ম্যানেজার।

লোকটা উঠিয়া আমার দিকে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিল। বলিল—হুজুর, আমার নাম মটুকনাথ পাড়ে, ব্রাহ্মণ, আপনার কাছেই যাচ্ছি।

—কেন?

—হুজুর, আমি বড় গরীব। অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি হুজুরের নাম শুনে। তিন দিন থেকে হাঁটছি পথে পথে। যদি আপনার কাছে চলাচলতির কোন একটা উপায় হয়—

আমার কৌতূহল হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম—ক'দিন জঙ্গলের পথে তুমি কি খেয়ে আছ?

মটুকনাথ তাহার মলিন চাদরের একপ্রান্তে বাঁধা পোয়াটাক কলাইয়ের ছাতু দেখাইয়া বলিল—সেরখানেক ছাতু ছিল এতে বাঁধা, এই নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। তাই ক'দিন খাচ্ছি। রোজগারের চেষ্টায় বেড়াচ্ছি হুজুর—আজ ছাতু ফুরিয়ে এসেছে, ভগবান জুটিয়ে দেবেন আবার।

আজমাবাদ ও নাঢ়া বইহারের এই জনশূন্য বনপ্রান্তরে উড়ানিব খুঁটে ছাতু বাঁধিয়া লোকটা কি রোজগারের প্রত্যাশায় আসিয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বড় বড় শহর ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, পাটনা, মুঙ্গের ছেড়ে এ জঙ্গলের মধ্যে এলে কেন পাঁড়েজী? এখানে কি হবে? লোক কোথায় এখানে? তোমাকে দেবে কে?

মটুকনাথ আমার মুখের দিকে নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—এখানে কিছু রোজগার হবে না বাবু? তবে আমি কোথায় যাব? ও-সব বড় শহরে আমি কাউকে চিনি নে, রাস্তাঘাট চিনি নে, আমার ভয় করে। তাই এখানে যাচ্ছিলাম—

লোকটাকে বড় অসহায়, দুঃখী ও ভালমানুষ বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে করিয়া কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

কয়েকদিন চলিয়া গেল। মটুকনাথকে কোন কাজ করিয়া দিতে পারিলাম না,—দেখিলাম সে কোন কাজ জানে না—কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাজ করিতে পারে। টোলে ছাত্র পড়াইত, আমার কাছে বসিয়া সময়ে অসময়ে উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বোধ হয় আমার অবসর-বিনোদনের চেষ্টা করে।

একদিন আমায় বলিল—আমায় কাছারির পাশে একটু জমি দিয়ে একটা টোল খুলিয়ে দিন হুজুর।

বলিলাম—কে পড়বে টোলে পণ্ডিতজী, বুনো মহিষ ও নীলগাইয়ের দল কি ভট্টি বা রঘুবংশ বুঝবে ?

মটুকনাথ নিপাট ভালমানুষ—বোধ হয় কিছু না ভাবিয়া দেখিয়াই টোল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। ভাবিলাম, বুঝিবা এবার সে নিরস্ত হইবে। কিন্তু দিন-কতক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে কথাটা পাড়িল।

বলিল—দিন দয়া করে একটা টোল আমায় খুলে। দেখি না চেষ্টা করে কি হয়। নয়ত আর যাব কোথায় হুজুর ?

ভাল বিপদে পড়িয়াছি, লোকটা কি পাগল! ওর মুখের দিকে চাহিলেও দয়া হয়, সংসারের ঘোরপেঁচ বোঝে না, নিতান্ত সরল, নির্ব্বোধ ধরণের মানুষ—অথচ একরাশ নির্ভর ও ভরসা লইয়া আসিয়াছে—কাহার উপর কে জানে ?

তাহাকে কত বুঝাইলাম, আমি জমি দিতে রাজী আছি, সে চাষবাস করুক, যেমন রাজু পাঁড়ে করিতেছে। মটুকনাথ মিনতি করিয়া বলিল, তাহারা বংশানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, চাষকাজের সে কিছুই জানে না, জমি লইয়া কি করিবে ?

তাহাকে বলিতে পারিতাম, শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত-মানুষ এখানে মরিতে আসিয়াছ কেন, কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে মন সরিল না। লোকটাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। অবশেষে তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে একটা ঘর বাঁধিয়া দিয়া বলিলাম, এই তোমার টোল, এখন ছাত্র যোগাড় হয় কি না দেখ।

মটুকনাথ পূজার্চ্চনা করিয়া দু-তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া টোল প্রতিষ্ঠা করিল। এ জঙ্গলে কিছুই মেলে না, সে নিজের হাতে মকাইয়ের আটার মোটা মোটা পুরী ভাজিল এবং জংলী ধুঁধুলের তরকারী। বাথান হইতে মহিষের দুধ আনাইয়া দই পাতিয়া রাখিয়াছিল। নিমন্ত্রিতের দলে অবশ্য আমিও ছিলাম।

টোল খুলিয়া কিছুদিন মটুকনাথ বড় মজা করিতে লাগিল।

পৃথিবীতে এমন মানুষও সব থাকে!

সকালে স্নানাহ্নিক সারিয়া সে টোলঘরে একখানা বন্য খেজুরপাতায় বোনা আসনের উপর গিয়া বসে এবং সম্মুখে মুগ্ধবোধ খুলিয়া সূত্র আবৃত্তি করে, ঠিক যেন কাহাকে পড়াইতেছে! এমন চেঁচাইয়া পড়ে যে, আমি আমার আপিসঘরে বসিয়া কাজ করিতে করিতে শুনিতে পাই।

তহশীলদার সজ্জন সিং বলে—পণ্ডিতজী লোকটা বদ্ধ পাগল। কি করছে দেখুন হুজুর!

মাস-দুই এইভাবে কাটে। শূন্য ঘরে মটুকনাথ সমান উৎসাহে টোল করিয়া চলিয়াছে। একবার সকালে, একবার বৈকালে। ইতিমধ্যে সরস্বতী পূজা আসিল। কাছারিতে দোয়াত-পূজার দ্বারা বাগ্দেবীর অর্চ্চনা নিষ্পন্ন করা হয় প্রতি বৎসর, এ জঙ্গলে প্রতিমা কোথায় গড়ানো হইবে? মটুকনাথ তার টোলে শুনিলাম আলাদা পূজা করিবে, নিজের হাতে নাকি প্রতিমা গড়িবে।

ষাট বছরের বৃদ্ধের কি ভরসা, কি উৎসাহ!

নিজের হাতে ছোট প্রতিমা গড়িল মটুকনাথ। টোলে আলাদা পূজা হইল।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিল—বাবুজী, এ আমাদের পৈতৃক পুজো। আমার বাবা চিরকাল তাঁর টোলে প্রতিমা গড়িয়ে পুজো করে এসেছেন, ছেলেবেলায় দেখেছি। এখন আবার আমার টোলে—

কিন্তু টোল কই?

মটুকনাথকে একথা বলি না অবশ্য।

৩

সরস্বতী পূজার দিন-দশবারো পরে মটুকনাথ পণ্ডিত আমাকে আসিয়া জানাইল, তাহার টোলে একজন ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছে। আজই সে নাকি কোথা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে।

মটুকনাথ ছাত্রটিকে আমার সামনে হাজির করাইল। চোদ্দ-পনেরো বছরের কালো শীর্ণকায় বালক, মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নিতান্ত গরীব, পরনের কাপড়খানি ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই।

মটুকনাথের উৎসাহ দেখে কে। নিজে খাইতে পায় না, সেই মুহূর্ত্তে সে ছাত্রটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়া বসিল। ইহাই তাহার কুলপ্রথা, টোলের ছাত্রের সকল প্রকার অভাব-অনটন এতদিন তাহাদের টোল হইতে নির্ব্বাহ হইয়া আসিয়াছে; বিদ্যা শিখিবার আশায় যে আসিয়াছে, তাহাকে সে ফিরাইতে পারিবে না।

মাস দুইয়ের মধ্যে দেখিলাম, আরও দু-তিনটি ছাত্র জুটিল টোলে। ইহারা এক বেলা খায়, এক বেলা খায় না। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া মকায়ের ছাতু, আটা, চীনার দানা দেয়, কাছারি হইতে আমিও কিছু সাহায্য করি। জঙ্গল হইতে বাথুয়া শাক তুলিয়া আনে ছাত্রেরা—তাহাই সিদ্ধ করিয়া হয়ত একবেলা কাটাইয়া দেয়। মটুকনাথেরও সেই অবস্থা।

রাত দশটা-এগারোটা পর্য্যন্ত মটুকনাথ শুনি ছাত্র পড়াইতেছে টোল ঘরের সামনে একটা হরীতকী গাছের তলায়। অন্ধকারেই অথবা জ্যোৎস্নালোকে—কারণ আলো জ্বালাইবার তেল জোটে না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। মটুকনাথ টোলঘরের জন্য জমি ও ঘর বাঁধিয়া দেওয়ার প্রার্থনা ছাড়া আমার কাছে কোন দিন কোন আর্থিক সাহায্য চায় নাই। কোন দিন বলে নাই, আমার চলে না, একটা উপায় করুন না। কাহাকেও সে কিছু জানায় না, সিপাহীরা নিজের ইচ্ছায় যা দেয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে মটুকনাথের টোলের ছাত্রসংখ্যা বেশ বাড়িল। দশ-বারোটি বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরীব বালক বিনা পয়সায় অন্ন আয়াসে খাইতে পাইবার লোভে নানা জায়গা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। কারণ এ সব দেশে কাকের মুখে একথা ছড়ায়। ছাত্রগুলিকে দেখিয়া মনে হইল ইহারা পূর্ব্বে মহিষ চরাইত; কারও মধ্যে এতটুকু বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নাই—ইহারা পড়িবে কাব্য-ব্যাকরণ? মটুকনাথকে নিরীহ মানুষ পাইয়া পড়িবার ছুতায় তাহার ঘাড়ে বসিয়া খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু মটুকনাথের এসব দিকে খেয়াল নাই, সে ছাত্র পাইয়া মহা খুশী।

একদিন শুনিলাম, টোলের ছাত্রগণ কিছু খাইতে না পাইয়া উপবাস করিয়া আছে। সেই সঙ্গে মটুকনাথও।

মটুকনাথকে ডাকাইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলাম।

কথাটা ঠিকই। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া যে আটা ও ছাতু দিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়াছে, কয়েক দিন রাত্রে শুধু বাথুয়া শাক সিদ্ধ আহার করিয়া চলিতেছিল, আজ তাহাও পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া উহা খাইয়া অনেকের অসুখ হওয়াতে কেহ খাইতে চাহিতেছে না।

—তা এখন কি করবে পণ্ডিতজী?

—কিছু তো ভেবে পাচ্ছিনে হুজুর। ছোট ছোট ছেলেগুলো না খেয়ে থাকবে—

আমি ইহাদের সকলের জন্য সিধা বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। দু-তিন দিনের উপযুক্ত চাল, ডাল, ঘি, আটা। বলিলাম—টোল কি করে চালাবে, পণ্ডিতজী? ও উঠিয়ে দাও। খাবে কি, খাওয়াবে কি?

দেখিলাম আমার কথায় সে আঘাত পাইয়াছে। বলিল—তাও কি হয় হুজুর? তৈরী টোল কি ছাড়তে পারি? ঐ আমার পৈতৃক ব্যবসায়।

মটুকনাথ সদানন্দ লোক। তাহাকে এ-সব বুঝাইয়া ফল নাই। সে ছাত্র কয়টি লইয়া বেশ মনের সুখেই আছে দেখিলাম।

আমার এই বনভূমির একপ্রান্ত যেন সেকালের ঋষিদের আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে মটুকনাথের কৃপায়। টোলের ছাত্ররা কলরব করিয়া পড়াশুনা করে, মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায়, কাছারির লাউ-কুমড়ার মাচা হইতে ফল চুরি করে, ফুলগাছের ডাল-পাতা ভাঙিয়া ফুল লইয়া যায়, এমন কি মাঝে মাঝে কাছারির লোকজনের জিনিসপত্রও চুরি যাইতে লাগিল—সিপাহীরা বলাবলি করিতে লাগিল, টোলের ছাত্রদের কাজ।

একদিন নায়েবের ক্যাশবাক্স খোলা অবস্থায় তাহার ঘরে পড়িয়া ছিল। কে তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি টাকা ও নায়েবের একটি ঘষা-সোনার আংটি চুরি করিল। তাহা লইয়া

খুব হৈ হৈ করিল সিপাহীরা। মটুকনাথের এক ছাত্রের কাছে কয়েকদিন পরে আংটিটা পাওয়া গেল। সে কোমরের ঘুন্‌সিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কে দেখিতে পাইয়া কাছারিতে আসিয়া বলিয়া দিল। ছাত্র বামালসুদ্ধ ধরা পড়িল।

আমি মটুকনাথকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে সত্যই নিরীহ লোক, তাহার ভালমানুষির সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত ছাত্রেরা যাহা খুশি করিতেছে। টোল ভাঙিবার দরকার নাই, অন্ততঃ কয়েকজন ছাত্রকে তাড়াইতেই হইবে। বাকি যাহারা থাকিতে চায়, আমি জমি দিতেছি, উহারা নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমিতে কিছু কিছু মকাই, চীনাঘাস ও তরকারির চাষ করুক। খাদ্য শস্য যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই উহাদের চলিবে।

মটুকনাথ এ-প্রস্তাব ছাত্রদের কাছে করিল। বারোজন ছাত্রের মধ্যে আটজন শুনিবামাত্র পলাইল। চারজন রহিয়া গেল, তাও আমার মনে হয় বিদ্যানুরাগের জন্য নয়, নিতান্ত কোথাও কোন উপায় নাই বলিয়া। পূর্ব্বে মহিষ চরাইত, এখন না-হয় চাষ করিবে। সেই হইতে মটুকনাথের টোল চলিতেছে মন্দ নয়।

৪

ছটু সিং ও অন্যান্য প্রজাদের জমি বিলি হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসুদ্ধ প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি। নাঢ়া বইহারের জমি অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া ঐ অংশেই দেড় হাজার বিঘা জমি একসঙ্গে উহাদের দিতে হইয়াছে। সেখানকার প্রান্তরসীমার বনানী অতি শোভাময়ী, কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় আসিবার সময় সে বন দেখিয়া মনে হইয়াছে, জগতের মধ্যে নাঢ়া বইহারের এই বন একটা বিউটি স্পট—গেল সে বিউটি স্পট!

দূর হইতে দেখিতাম বনে আগুন দিয়াছে, খানিকটা পোড়াইয়া না ফেলিলে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাটা যায় না। কিন্তু সব জায়গায় তো বন নাই, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ধারে ধারে নিবিড় বন, হয়ত প্রান্তরের মাঝে মাঝে বন-ঝোপ, কত কি লতা, কত কি বনকুসুম।···

চট্ চট্ শব্দ করিয়া বন পুড়িতেছে, দূর হইতে শুনি—কত শোভাময় লতাবিতান ধ্বংস হইয়া গেল, বসিয়া বসিয়া ভাবি। কেমন একটা কষ্ট হয় বলিয়া ওদিকে যাই না। দেশের একটা এত বড় সম্পদ, মানুষের মনে যাহা চিরদিন শান্তি ও আনন্দ পরিবেশণ করিতে পারিত—একমুষ্টি গমের বিনিময়ে তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইল!

কার্ত্তিক মাসের প্রথমে একদিন জায়গাটা দেখিতে গেলাম। সমস্ত মাঠটাতে সরিষা বপন করা হইয়াছে—মাঝে মাঝে লোকজনেরা ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ইহার মধ্যেই গরু-মহিষ, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া গ্রাম বসাইয়া ফেলিয়াছে।

শীতকালের মাঝামাঝি যখন সর্ষেক্ষেত হলুদ ফুলে আলো করিয়াছে তখন যে দৃশ্য চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তাহার তুলনা নাই। দেড় হাজার বিঘা ব্যাপী একটা বিরাট প্রান্তর দূর

দিগ্বলয়সীমা পর্য্যন্ত হলুদ রঙের গালিচায় ঢাকা—এর মধ্যে ছেদ নাই, বিরাম নাই—উপরে নীল আকাশ, ইন্দ্রনীলমণির মত নীল—তার তলায় হলুদ—হলুদ রঙের ধরণী, যতদূর দৃষ্টি যায়। ভাবিলাম, এও একরকম মন্দ নয়।

একদিন নূতন গ্রামগুলি পরিদর্শন করিতে গেলাম। ছট্টু সিং বাদে সকলেই গরীব প্রজা। তাহাদের জন্য একটি নৈশ স্কুল করিয়া দিব ভাবিলাম—অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে সর্ষেক্ষেতের ধারে ধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে দেখিয়া আমার নৈশ স্কুলের কথা আগে মনে পড়িল।

কিন্তু শীঘ্রই নূতন প্রজারা ভয়ানক গোলমাল বাধাইল। দেখিলাম ইহারা মোটেই শান্তিপ্রিয় নয়। একদিন কাছারিতে বসিয়া আছি, খবর আসিল নাঢ়া বইহারের প্রজারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা শুরু করিয়াছে, যাহার পাঁচ-বিঘা জমি সে দশ-বিঘা জমির ফসল দখল করিতে বসিয়াছে। আরও শুনিলাম সর্ষে পাকিবার কিছুদিন আগে ছট্টু সিং নিজের দেশ হইতে বহু রাজপুত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা গোপনে আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আসল উদ্দেশ্য এখন বোঝা যাইতেছে। নিজের তিন-চার শ বিঘা আবাদী জমির ফসল বাদে সে লাঠির জোরে সমস্ত নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা (বা যতটা পারে) জমির ফসল দখল করিতে চায়।

কাছারির আমলারা বলিল—এ-দেশের এই নিয়ম হুজুর। লাঠি যার ফসল তার।

যাহাদের লাঠির জোর নাই, তাহারা কাছারিতে আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। তাহারা নিরীহ গরীব গাঙ্গোতা প্রজা—সামান্য দু-দশ বিঘা জমি জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিয়াছিল, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া জমির ধারেই ঘর-বাড়ী করিয়া বাস করিতেছিল—এখন সারা বছরের পরিশ্রমের ও আশার সামগ্রী প্রবলের অত্যাচারে যাইতে বসিয়াছে!

কাছারির দুইজন সিপাহীকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়াছিলাম ব্যাপার কি দেখিতে। তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল—ভীমদাস টোলার উত্তর সীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়াছে।

তখনই তহশীলদার সজ্জন সিং ও কাছারির সমস্ত সিপাহীদের লইয়া ঘোড়ায় করিয়া ঘটনাস্থলে রওনা হইলাম। দূর হইতে একটা হৈ হৈ গোলমাল কানে আসিল। নাঢ়া বইহারের মাঝখান দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী বহিয়া গিয়াছে—গোলমালটা যেন সেদিকেই বেশী।

নদীর ধারে গিয়া দেখি নদীর দুইপারেই লোক জড় হইয়াছে—প্রায় ষাট-সত্তর জন এপারে, ওপারে ত্রিশ-চল্লিশ জন ছট্টু সিং-এর রাজপুত লাঠিয়াল। ওপারের লোক এপারে আসিতে চায়, এপারের লোকেরা বাধা দিতে দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে জন দুই লোক জখমও হইয়াছে —তাহারা এপারের দলের। জখম হইয়া নদীর জলে পড়িয়াছিল, সেই সময় ছট্টু সিং-এর লোকেরা টাঙি দিয়া একজনের মাথা কাটিতে চেষ্টা করে—এ-পক্ষ ছিনাইয়া নদী হইতে উঠাইয়া আনিতেছে।- নদীতে অবশ্য পা ডোবে না এমনি জল, পাহাড়ী নদী, তার উপর শীতের শেষ।

কাছারির লোকজন দেখিয়া উভয় পক্ষ দাঙ্গা থামাইয়া আমার কাছে আসিল। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের যুধিষ্ঠির এবং অপর পক্ষকে তুর্য্যোধন বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। সে হৈ-হৈ কলরবের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। উভয় পক্ষকে কাছারিতে আসিতে বলিলাম। আহত লোক দুটির সামান্য লাঠির চোট লাগিয়াছিল, এমন গুরুতর জখম কিছু নয়। তাহাদেরও কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

ছটু সিং-এর লোকেরা বলিল, দুপুরের পরে তাহারা কাছারিতে আসিয়া দেখা করিবে। ভাবিলাম, সব মিটিয়া গেল। কিন্তু তখনও আমি এদেশের লোক চিনি নাই। দুপুরের অল্প পরেই আবার খবর আসিল নাঢ়া বইহারে ঘোর দাঙ্গা বাধিয়াছে। আমি পুনরায় লোকজন লইয়া ছুটিলাম। একজন ঘোড়সওয়ার পনের মাইল দূরবর্ত্তী নওগছিয়া থানায় রওনা করিয়া দিলাম। গিয়া দেখি ঠিক ও-বেলার মতই ব্যাপার। ছটু সিং এবেলা আরও অনেক লোক জড় করিয়া আনিয়াছে। শুনিলাম রাসবিহারী সিং রাজপুত ও নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা ছটু সিংকে সাহায্য করিতেছে। ছটু সিং ঘটনাস্থলে ছিল না, তাহার ভাই গজার সিং ঘোড়ায় চাপিয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়া ছিল—আমায় আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। এবার দেখিলাম রাজপুতদলের দুজনের হাতে বন্দুক রহিয়াছে।

ওপার হইতে রাজপুতেরা হাঁকিয়া বলিল—হুজুর, সরে যান আপনি, আমরা একবার এই বাঁদীর বাচ্চা গাঙ্গোতাদের দেখে নিই।

আমার দলবল গিয়া আমার হুকুমে উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়াইল। আমি তাঁহাদিগকে জানাইলাম নওগছিয়া থানায় খবর গিয়াছে, এতক্ষণ পুলিস অর্দ্ধেক রাস্তা আসিয়া পড়িল। ওসব বন্দুক কার নামে? বন্দুকের আওয়াজ করিলে তার জেল অনিবার্য্য। আইন ভয়ানক কড়া।

বন্দুকধারী লোক দুজন একটু পিছাইয়া পড়িল।

আমি এপারের গাঙ্গোতা প্রজাদের ডাকিয়া বলিলাম—তাহাদের দাঙ্গা করিবার কোন দরকার নাই। তাহারা যে যার জায়গায় চলিয়া যাক্। আমি এখানে আছি। আমার সমস্ত আমলা ও সিপাহীরা আছে। ফসল লুঠ হয় আমি দায়ী।

গাঙ্গোতা-দলের সর্দ্দার আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া নিজের লোকজন হটাইয়া কিছুদূরে একটা বকাইন গাছের তলায় দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—ওখানেও না। একেবারে সোজা বাড়ী গিয়ে ওঠো। পুলিস আসছে।

রাজপুতেরা অত সহজে দমিবার পাত্রই নয়। তাহারা ওপারে দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। তহশীলদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার সজ্জন সিং? আমাদের উপর চড়াও হবে না কি?

তহশীলদার বলিল, হুজুর, ওই যে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা জুটছে, ওকেই ভয় হয়! ও বদমাসটা আস্ত ডাকাত।

—তাহলে তৈরী হয়ে থাকো। নদী পার কাউকে হতে দেবে না। ঘণ্টা দুই সামলে রাখো, তার পরেই পুলিস এসে পড়বে।

রাতপুতেরা পরামর্শ করিয়া কি ঠিক করিল জানি না, একদল আগাইয়া আসিয়া বলিল—হুজুর, আমরা ওপারে যাব।

বলিলাম, কেন?

—আমাদের কি ওপারে জমি নেই?

—পুলিসের সামনে সে কথা বোলো। পুলিস তো এসে পড়ল। আমি তোমাদের এপারে আসতে দিতে পারিনে।

—কাছারিতে একরাশ টাকা সেলামী দিয়ে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছি কি ফসল লোকসান করবার জন্যে? এ আপনার অন্যায় জুলুম।

—সে কথাও পুলিসের সামনে বোলো।

—আমাদের ওপারে যেতে দেবেন না?

—না, পুলিস আসবার আগে নয়। আমার মহলে আমি দাঙ্গা হতে দেবো না।

ইতিমধ্যে কাছারির আরও লোকজন আসিয়া পড়িল। ইহারা আসিয়া রব উঠাইয়া দিল পুলিস আসিতেছে। ছটু সিং-এর দল ক্রমশ দু-একজন করিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। তখনকার মত দাঙ্গা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মারপিট, পুলিস-হাঙ্গামা, খুন-জখমের সেই যে সূত্রপাত হইল, দিন দিন তাহা বাড়িয়া চলিতে লাগিল বই কমিল না। আমি দেখিলাম ছটু সিং-এর মত দুর্দান্ত রাজপুতকে একসঙ্গে অতটা জমি বিলি করিবার ফলেই যত গোলমালের সৃষ্টি। ছটু সিংকে একদিন ডাকাইলাম। সে বলিল, এসবের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। সে অধিকাংশ সময় ছাপরায় থাকে। তার লোকেরা কি করে না-করে তার জন্য সে কি করিয়া দায়ী।

বুঝিলাম লোকটা পাকা ঘুঘু। সোজা কথায় এখানে কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাকে জব্দ করিতে হইলে অন্য পথ দেখিতে হইবে।

সেই হইতে আমি গাঙ্গোতা প্রজা ভিন্ন অন্য কোন লোককে জমি দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু যে-ভুল আগেই হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার আর হইল না। নাঢ়া বইহারের শান্তি চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া গেল।

৫

আমাদের বারো মাইল দীর্ঘ জংলী-মহালের উত্তর অংশে প্রায় পাঁচ-ছ'শ' একর জমিতে প্রজা বসিয়া গিয়াছে। পৌষ মাসের শেষে একদিন সেদিকে যাইবার দরকার হইয়াছিল—গিয়া দেখি এরা এ অঞ্চলের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে।

ফুলকিয়ার জঙ্গল হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া চোখে পড়িল সামনে দিগন্তবিস্তীর্ণ ফুল-ফোটা সর্ষেক্ষেত—যতদূর চোখ যায়, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, একটানা হলুদে-ফুল-তোলা একখানা

সুবিশাল গালিচা কে যেন পাতিয়া গিয়াছে—এর কোথাও বাধা নাই, ছেদ নাই, জঙ্গলের সীমা হইতে একেবারে বহু, বহু দূরের চক্রবাল-রেখায় নীল ও শৈলমালার কোলে মিশিয়াছে। মাথার উপরে শীতকালের নির্মেঘ নীল আকাশ। এই অপরূপ শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রজাদের কাশের খুপরি। স্ত্রী-পুত্র লইয়া এই দুরন্ত শীতে কি করিয়া তাহারা যে এই কাশ-ডাঁটার বেড়া-ঘেরা কুটিরে এই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে বাস করে!

ফসল পাকিবার সময়ের আর বেশী দেরি নাই। ইহার মধ্যে কাটুনী মজুরের দল নানাদিক হইতে আসিতে শুরু করিয়াছে। ইহাদের জীবন বড় অদ্ভুত,—পূর্ণিয়া, তরাই ও জয়ন্তীর পাহাড়-অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর হইতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল পাকিবার সময় ইহারা আসিয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে ও জমির ফসল কাটে—ফসলের একটা অংশ মজুরীস্বরূপ পায়। আবার ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে কুঁড়েঘর ফেলিয়া রাখিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া চলিয়া যায়। আবার আর বছর আসিবে। ইহাদের মধ্যে নানা জাতি আছে—বেশীর ভাগই গাঙ্গোতা কিন্তু ছত্রী, ভূমিহার ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত আছে।

এ-অঞ্চলের নিয়ম, ফসল কাটিবার সময় ক্ষেতে বসিয়া খাজনা আদায় করিতে হয়—নয়ত এত গরীব প্রজা, ফসল খেত হইতে উঠিয়া গেলে আর খাজনা দিতে পারে না। খাজনা আদায় তদারক করিবার জন্য দিনকতক আমাকে ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে থাকিবার দরকার হইল।

তহশীলদার বলিল—ওখানে তাহলে ছোট তাঁবুটা খাটিয়ে দেব?

—একদিনের মধ্যেই ছোট একটি কাশের খুপরি করে দাও না?

—এই শীতে তাতে কি থাকতে পারবেন হুজুর?

—খুব। তুমি তাই কর।

তাহাই হইল। পাশাপাশি তিন-চারটা ছোট ছোট কাশের কুটির, একটা আমার শয়নঘর, একটা রান্নাঘর, একটাতে দুজন সিপাহী ও পাটোয়ারী থাকিবে। এ-ধরনের ঘরকে এদেশে বলে 'খুপরি'—দরজা-জানালার বদলে কাশের বেড়ার খানিকটা করিয়া কাটা—বন্ধ করিবার উপায় নাই—হু-হু হিম আসে রাত্রে। এত নীচু যে হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। মেঝেতে খুব পুরু করিয়া শুকনো কাশ ও বন-ঝাউয়ের সুঁটি বিছানো—তাহার উপর শতরঞ্চি, তাহার উপর তোশক-চাদর পাতিয়া ফরাস করা। আমার খুপরিটি দৈর্ঘ্যে সাত হাত, প্রস্থে তিন হাত। সোজা হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব ঘরের মধ্যে, কারণ উচ্চতায় মাত্র তিন হাত।

কিন্তু বেশ লাগে এই খুপরি। এত আরাম ও আনন্দ কলিকাতায় তিনচারতলা বাড়ীতে থাকিয়াও পাই নাই। তবে বোধ হয় আমি দীর্ঘদিন এখানে থাকিবার ফলে বন্য হইয়া যাইতেছিলাম, আমার রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাল-মন্দ লাগা সবেরই উপর এই মুক্ত অরণ্য-প্রকৃতির অল্প-বিস্তর প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই এমন হইতেছে কি না কে জানে।

খুপরিতে ঢুকিয়া প্রথমেই আমার ভাল লাগিল সদ্য-কাটা কাশ-ডাঁটার তাজা সুগন্ধটা, যাহা দিয়া খুপরির বেড়া বাঁধা। তাহার পর ভাল লাগিল আমার মাথার কাছেই এক বর্গহাত

পরিমিত ঘুলঘুলিপথে দৃশ্যমান, অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আমার দুটি চোখে দৃষ্টির প্রায় সমতলে অবস্থিত ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ সর্ষেক্ষেতের হলদে ফুলরাশি। এ-দৃশ্যটা একেবারে অভিনব, আমি যেন একটা পৃথিবীজোড়া হলদে কার্পেটের উপরে শুইয়া আছি। হু-হু হাওয়ায় তীব্র ঝাঁঝালো সর্ষেফুলের গন্ধ।

শীতও যা পড়িতে হয় পড়িয়াছিল। পশ্চিমে হাওয়ার একদিনও কামাই ছিল না, অমন কড়া রৌদ্র যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যাইত কন্‌কনে পশ্চিমা হাওয়ার প্রাবল্যে। বইহারের বিস্তৃত কুল-জঙ্গলের পাশ দিয়া ঘোড়ায় করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতাম দূরে তিরাশী-চৌকার অনুচ্চ নীল পাহাড়-শ্রেণীর ওপারে শীতের সূর্য্যাস্ত। সারা পশ্চিম আকাশ অগ্নিকোণ হইতে নৈঋর্ত কোণ পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া যায়, তরল আগুনের সমুদ্র, হু-হু করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের মত বড় সূর্যটা নামিয়া পড়ে—মনে হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, বিশাল ভূপৃষ্ঠ যেন পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া আসিতেছে; অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইত, সত্যই মনে হইত যেন পশ্চিম দিক্‌চক্রবাল-প্রান্তের ভূপৃষ্ঠ আমার অবস্থিতি-বিন্দুর দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে।

রোদটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজায় শীত পড়িত, আমরাও সারাদিনের গুরুতর পরিশ্রম ও ঘোড়ায় ইতস্তত ছুটাছুটির পর সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিন আমার খুপড়ির সামনে আগুন জ্বালিয়া বসিতাম।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাবৃত বনপ্রান্তরের ঊর্দ্ধাকাশে অগণ্য নক্ষত্রালোক কত দূরের বিশ্বরাজির জ্যোতির দূতরূপে পৃথিবীর মানুষের চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিত। আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলিত যেন জ্বল্‌জ্বলে বৈদ্যুতিক বাতির মত—বাংলা দেশে অমন কৃত্তিকা, অমন সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনো দেখি নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। নীচে ঘন অন্ধকার বনানী, নির্জ্জনতা, রহস্যময়ী রাত্রি, মাথার উপরে নিত্যসঙ্গী অগণ্য জ্যোতির্লোক। এক-একদিন এক ফালি অবাস্তব চাঁদ অন্ধকারের সমুদ্রে সুদূর বাতিঘরের আলোর মত দেখাইত। আর সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে আগুনের তীক্ষ্ণ তীর দিয়া সোজা কাটিয়া এদিকে ওদিকে উল্কা খসিয়া পড়িতেছে। দক্ষিণে, উত্তরে, ঈশানে, নৈঋর্তে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, সবদিকে। এই একটা, ওই একটা, ওই দুটো, এই আবার একটা—মিনিটে মিনিটে, সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে।

এক-একদিন গনোরী তেওয়ারী ও আরও অনেকে তাঁবুতে আসিয়া জোটে। নানা রকম গল্প হয়। এইখানেই একদিন একটা অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। কথায় কথায় সেদিন শিকারের গল্প হইতেছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের বন্য-মহিষের কথা উঠিল। দশরথ সিং ঝাণ্ডাওয়ালা নামে এক রাজপুত সেদিন লবটুলিয়া কাছারিতে চরির ইজারা ডাকিতে উপস্থিত ছিল। লোকটা এক সময়ে খুব বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়াছে, দুঁদে শিকারী বলিয়া তার নাম আছে। দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালা বলিল—হুজুর, ওই মোহনপুরা জঙ্গলে বুনো মহিষ শিকার করতে আমি একবার টাঁড়বারো দেখি।

মনে পড়িল গনু মাহাতো একবার এই টাঁড়বারোর কথা বলিয়াছিল বটে। বলিলাম—

ব্যাপারটা কি ?

—হুজুর, সে অনেক দিনের কথা। কুশী নদীর পুল তখন তৈরী হয় নি। কাটারিয়ায় জোড়া খেয়া ছিল, গাড়ীর প্যাসেঞ্জার খেয়ায় মালসুদ্ধ পারাপার হত। আমরা তখন ঘোড়ার নাচ নিয়ে খুব উন্মত্ত, আমি আর ছাপ্‌রার ছটু সিং। ছটু সিং হরিহরছত্র মেলা থেকে ঘোড়া নিয়ে আসত, আমরা দুজন সেই সব ঘোড়াকে নাচ শেখাতাম, তারপর বেশী দামে বিক্রী করতাম। ঘোড়ার নাচ দু-রকম, জমৈতি আর ফনৈতি। জমৈতিতে যে-সব ঘোড়ার তালিম বেশী, তারা বেশী দামে বিক্রী হয়। ছটু সিং ছিল জমৈতি নাচ শেখাবার ওস্তাদ। দুজনে তিন-চার বছরে অনেক টাকা করেছিলাম।

একবার ছটু সিং পরামর্শ দিলে ঢোলবাজ্যা জঙ্গলে লাইসেন্স নিয়ে বুনো মহিষ ধরে ব্যবসা করতে। সব ঠিকঠাক হল, ঢোলবাজ্যা দ্বারভাঙ্গা মহারাজের রিজার্ভ ফরেস্ট্‌। আমরা কিছু টাকা খাইয়ে বনের আমলাদের কাছ থেকে পোরমিট্‌ আনালাম। তার পর ক'দিন ধরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বুনো মহিষের যাতায়াতের পথের সন্ধান করে বেড়াই। অত বড় বন হুজুর, একটা বুনো মহিষের দেখা যদি কোন দিন মেলে! শেষে এক বুনো সাঁওতাল লাগালাম। সে একটা বাঁশবনের তলা দেখিয়ে বললে, গভীর রাত্রে এই পথ দিয়ে বুনো মহিষের জেরা (দল) জল খেতে যাবে। সেই পথের মধ্যে গভীর খানা কেটে তার ওপর বাঁশ ও মাটি বিছিয়ে ফাঁদ তৈরী করলাম। রাত্রে মহিষের জেরা যেতে গিয়ে গর্ত্তের মধ্যে পড়বে।

সাঁওতালটা দেখে শুনে বললে—কিন্তু সব করছিস বটে তোরা, একটা কথা আছে। ঢোলবাজ্যা জঙ্গলের বুনো মহিষ তোরা মারতে পারবি নে। এখানে টাঁড়বারো আছে।

আমরা তো অবাক্‌। টাঁড়বারো কি ?

সাঁওতাল বুড়ো বললে—টাঁড়বারো হল বুনো মহিষের দলের দেবতা। সে একটাও বুনো মহিষের ক্ষতি করতে দেবে না।

ছটু সিং বললে—ওসব ঝুট্‌ কথা। আমরা মানি নে। আমরা রাজপুত, সাঁওতাল নই।

তার পর কি হল শুনলে অবাক হয়ে যাবেন হুজুর। এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্ত্তের ধারে, গর্ত্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্ত্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।

তার পর আরও দু-একজন শিকারীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি, তারা আমাদের বললে, ও-জঙ্গলে বুনো মহিষ ধরবার আশা ছাড। টাঁড়বারো একটা মহিষও মারতে ধরতে দেবে না। আমাদের টাকা দিয়ে পোরমিট আনানো সার হল, একটা বুনো মহিষও সেবার

ফাঁদে পড়ল না।

দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালার গল্প শেষ হইলে লবটুলিয়ার পাটোয়ারীও বলিল—আমরাও ছেলেবেলা থেকে টাঁড়বারোর গল্প শুনে আসছি। টাঁড়বারো বুনো মহিষের দেবতা—বুনো মহিষের দল বেঘোরে পড়ে প্রাণ না হারায়, সে দিকে তাঁর সর্ব্বদা দৃষ্টি।

গল্প সত্য কি মিথ্যা আমার সে-সব দেখিবার আবশ্যক ছিল না, আমি গল্প শুনিতে শুনিতে অন্ধকার আকাশে জ্যোতির্ম্ময় খড়্গধারী কালপুরুষের দিকে চাহিতাম, নিস্তব্ধ ঘন বনানীর উপর অন্ধকার আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দূরে কোথায় বনের মধ্যে বন্য কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল ; অন্ধকার ও নিঃশব্দ আকাশ, অন্ধকার ও নিঃশব্দ পৃথিবী শীতের রাত্রে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া কি যেন কানাকানি করিতেছে—অনেক দূরে মোহনপুরা অরণ্যের কালো সীমারেখার দিকে চাহিয়া এই অশ্রুতপূর্ব্ব বনদেবতার কথা মনে হইয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিত। এই সব গল্প শুনিতে ভাল লাগে, এই রকম নির্জ্জন অরণ্যের মাঝখানে ঘন শীতের রাত্রে এই রকম আগুনের ধারে বসিয়াই।

দশম পরিচ্ছেদ

১

পনের দিন এখানে একেবারে বন্য-জীবন যাপন করিলাম, যেমন থাকে গাঙ্গোতারা কি গরীব ভুঁইহার বামুনরা। ইচ্ছা করিয়া নয়, অনেকটা বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল এ ভাবে। এ জঙ্গলে কোথা হইতে কি আনাইব? খাই ভাত ও বনধুঁধুলের তরকারি, বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু তুলিয়া আনে সিপাহীরা, তাই ভাজা বা সিদ্ধ। মাছ দুধ ঘি—কিছু নাই।

অবশ্য. বনে সিল্লি ও ময়ূরের অভাব ছিল না, কিন্তু পাখী মারিতে তেমন যেন মন সরে না বলিয়া বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিরামিষই খাইতে হইত।

ফুলকিয়া বইহারে বাঘের ভয় আছে। একদিনের ঘটনা বলি।

হাড়ভাঙা শীত সেদিন। রাত দশটার পরে কাজকর্ম্ম মিটাইয়া সকাল সকাল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ কত রাত্রে জানি না, লোকজনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিল। জঙ্গলের ধারের কোন্ জায়গায় অনেকগুলি লোক জড় হইয়া চীৎকার করিতেছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। আমার সিপাহীরা পাশের খুপড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল। সবাই মিলিয়া ভাবিতেছি ব্যাপারটা কি, এমন সময়ে একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—ম্যানেজারবাবু, বন্দুকটা নিয়ে শীগগির চলুন—বাঘে একটা ছোট ছেলে নিয়ে গিয়েছে খুপড়ি থেকে।

জঙ্গলের ধার হইতে মাত্র দু-শ' হাত দূরে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ডোমন বলিয়া একজন

গাঙ্গোতা প্রজার একখানা খুপড়ি। তাহার স্ত্রী ছ-মাসের শিশু লইয়া খুপড়ির মধ্যে শুইয়া ছিল।—অসম্ভব শীতের দরুন খুপড়ির মধ্যেই আগুন জ্বালানো ছিল, এবং ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য দরজার ঝাঁপটা একটু ফাঁক ছিল। সেই পথে বাঘ ঢুকিয়া ছেলেটিকে লইয়া পলাইয়াছে।

কি করিয়া জানা গেল বাঘ? শিয়ালও তো হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌছিয়া আর কোন সন্দেহ রহিল না, ফসলের ক্ষেতের নরম মাটিতে স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ।

আমার পাটোয়ারী ও সিপাহীরা মহালে অপবাদ রটিতে দিতে চায় না, তাহারা জোর গলায় বলিতে লাগিল—এ আমাদের বাঘ নয় হুজুর, এ মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের বাঘ। দেখুন না কত বড় থাবা!

যাহাদেরই বাঘ হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বলিলাম, সব লোক জড় কর, মশাল তৈরি কর—চল জঙ্গলের মধ্যে দেখি। সেই রাত্রে অত বড় বাঘের পায়ের সদ্য থাবা দেখিয়া ততক্ষণ সকলেই ভয়ে কাঁপিতে শুরু করিয়াছে—জঙ্গলের মধ্যে কেহ যাইতে রাজী নয়। ধমক ও গালমন্দ দিয়া জন-দশেক লোক জুটাইয়া মশাল হাতে টিন পিটাইতে পিটাইতে সবাই মিলিয়া জঙ্গলের নানা স্থানে বৃথা অনুসন্ধান করা গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় মাইল-দুই দূরে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় আসান-গাছের তলায় শিশুটির রক্তাক্ত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইল।

কৃষ্ণপক্ষের কি ভীষণ অন্ধকার রাত্রিগুলিই নামিল তাহার পরে!

সদর কাছারি হইতে বাঁকে সিং জমাদারকে আনাইলাম। বাঁকে সিং শিকারী, বাঘের গতিবিধির অভ্যাস তার ভালই জানা। সে বলিল, হুজুর, মানুষখেকো বাঘ বড় ধূর্ত্ত হয়। আর ক'টা লোক মরবে। সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ঠিক তিনদিন পরেই বনের ধারে সন্ধ্যার সময় একটা রাখালকে বাঘে লইয়া গেল। ইহার পরে লোকে ঘুম বন্ধ করিয়া দিল। রাত্রে এক অপরূপ ব্যাপার! বিস্তীর্ণ বইহারের বিভিন্ন খুপড়ি হইতে সারা রাত টিনের ক্যানেস্তা পিটাইতেছে, মাঝে মাঝে কাশের ডাঁটার আঁটি জ্বালাইয়া আগুন করিয়াছে, আমি বাঁকে সিং প্রহরে প্রহরে বন্দুকের আওড় করিতেছি। আর শুধুই কি বাঘ? ইহার মধ্যে একদিন মোহনপুরা ফরেস্ট হইতে বন্য-মহিষের দল বাহির হইয়া অনেকখানি ক্ষেতের ফসল তচনচ করিয়া দিল।

আমার কাশের খুপড়ির দরজার কাছেই সিপাহীরা খুব আগুন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে উঠিয়া তাহাতে কাঠ ফেলিয়া দিই। পাশের খুপড়িতে সিপাহীরা কথাবার্ত্তা বলিতেছে—খুপড়ির মেঝেতেই শুইয়া আছি, মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়া দেখা যাইতেছে ঘন অন্ধকারে-ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে ক্ষীণ তারার আলোয় পরিদৃশ্যমান জঙ্গলের আবছায়া সীমারেখা। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল, যেন মৃত নক্ষত্রলোক হইতে তুষারবর্ষী হিমবাতাস তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর দিকে—লেপ তোশক হিমে ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে, আগুন নিবিয়া আসিতেছে, কি দুরন্ত শীত! আর সেই সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরের

অবাধ হু-হু তুষারশীতল নৈশ হাওয়া !

কিন্তু কি করিয়া থাকে এখানকার লোকেরা এই শীতে, এই আকাশের তলায় সামান্য কাশের খুপড়ির ঠাণ্ডা মেঝের উপর, কি করিয়া রাত্রি কাটায় ? তাহার উপর ফসল চৌকি দিবার এই কষ্ট, বন্য-মহিষের উপদ্রব, বন্য-শূকরের উপদ্রব কম নয়—বাঘও আছে। আমাদের বাংলা দেশের চাষীরা কি এত কষ্ট করিতে পারে ? অত উর্ব্বর জমিতে, অত নিরুপদ্রব গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ফসল করিয়াও তাহাদের দুঃখ ঘোচে না।

আমার ঘরের দু-তিন-শ' হাত দূরে দক্ষিণ ভাগলপুর হইতে আগত জনকতক কাটুনী মজুর স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল কাটিতে আসিয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় তাহাদের খুপড়ির কাছ দিয়া আসিবার সময় দেখি কুঁড়ের সামনে বসিয়া সবাই আগুন পোহাইতেছে।

এদের জগৎ আমার কাছে অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত। ভাবিলাম, সেটা দেখি না কেমন !

গিয়া বলিলাম—বাবাজী, কি করা হচ্ছে ?

একজন বৃদ্ধ ছিল দলে, তাহাকেই এই সম্বোধন। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় সেলাম করিল, বসিয়া আগুন পোহাইতে অনুরোধ করিল। ইহা এদেশের প্রথা। শীতকালে আগুন পোহাইতে আহ্বান করা ভদ্রতার পরিচয়।

গিয়া বসিলাম। খুপরির মধ্যে উঁকি দিয়া দেখি বিছানা বা আসবাবপত্র বলিতে ইহাদের কিছু নাই। কুঁড়েঘরের মেঝেতে মাত্র কিছু শুকনো ঘাস বিছানো। বাসনকোসনের মধ্যে খুব বড় একটা কাঁসার জামবাটি আর একটা লোটা ! কাপড় যার যা পরনে আছে—আর এক টুকরা বস্ত্রও বাড়তি নাই। কিন্তু তাহা তো হইল, এই নিদারুণ শীতে ইহাদের লেপ-কাঁথা কই ? রাত্রে গায়ে দেয় কি ?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধের নাম নক্‌ছেদী ভকত। জাতি গাঙ্গোতা। সে বলিল—কেন, খুপড়ির কোণে ঐ যে কলাইয়ের ভুষি দেখছেন না রয়েছে টাল করা ?

বুঝিতে পারিলাম না। কলাইয়ের ভুষির আগুন করা হয় রাত্রে ?

নক্‌ছেদী আমার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল।

—তা নয় বাবুজী। কলাইয়ের ভুষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে আমরাও কলাইয়ের ভুষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্তত পাঁচমণ ভুষি মজুত রয়েছে। ভারী ওম্ কলাইয়ের ভুষিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্ হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না ?

বলিতে বলিতে একটা ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা খুপড়ির কোণের ভুষির গাদার মধ্যে তাহার পা হইতে গলা পর্য্যন্ত ঢুকাইয়া কেবলমাত্র মুখখানা বাহির করিয়া শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম, মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু ? কখনও কি জানিতাম এসব কথা ? আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।

অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে বসিয়া একটি মেয়ে কি রাঁধিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি রান্না হচ্ছে ?

নক্‌ছেদী বলিল—ঘাটো।

—ঘাটো কি জিনিস ?

এবার বোধ হয় রন্ধনরতা মেয়েটি ভাবিল, এ বাংগালীবাবু সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। এ দেখিতেছি নিতান্ত বাতুল। কিছুই খোঁজ রাখে না দুনিয়ার। সে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ঘাটো জান না বাবুজী ? মকাই-সেদ্ধ। যেমন চাল সেদ্ধ হলে বলে ভাত, মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।

মেয়েটি আমার অজ্ঞতার প্রতি কৃপাবশতঃ কাঠের খুন্তির আগায় উক্ত দ্রব্য একটুখানি হাঁড়ি হইতে তুলিয়া দেখাইল।

—কি দিয়ে খায় ?

এবার হইতে যত কথাবার্ত্তা মেয়েটিই বলিল। হাসি-হাসি মুখে বলিল—নুন দিয়ে, শাক দিয়ে—আবার কি দিয়ে খাবে বল না !

—শাক রান্না হয়েছে ?

—ঘাটো নামিয়ে শাক চড়াব। মটরশাক তুলে এনেছি।

মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ। জিজ্ঞাসা করিল—কলকাতায় থাক বাবুজী ?

—হ্যাঁ।

—কি রকম জায়গা ? আচ্ছা, কলকাতায় নাকি গাছ নাই ? ওখানকার সব গাছপালা কেটে ফেলেছে ?

—কে বললে তোমায় ?

—একজন ওখানে কাজ করে আমাদের দেশের। সে একবার বলেছিল। কি রকম জায়গা দেখতে বাবুজী ?

এই সরলা বন্য মেয়েটিকে যতদূর সম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম আধুনিক যুগের একটা বড় শহরের ব্যাপারখানা কি ? কতদূর বুঝিল জানি না, বলিল—কলকাত্তা শহর দেখতে ইচ্ছে হয়—কে দেখাবে ?

তাহার পর আরও অনেক কথা বলিলাম তাহার সঙ্গে। রাত বাড়িয়া গিয়াছে, অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল। উহাদের রান্না শেষ হইয়া গেল। খুপড়ির ভিতর হইতে সেই বড় জামবাটিটা আনিয়া তাহাতে ফেন-ভাতের মত জিনিসটা ঢালিল। উপর উপর একটু নুন ছড়াইয়া বাটিটা মাঝখানে রাখিয়া ছেলেমেয়েরা সবাই মিলিয়া চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

আমি বলিলাম—তোমরা এখান থেকে বুঝি দেশে ফিরবে ?

নক্‌ছেদী বলিল—দেশে এখন ফিরতে অনেক দেরি। এখান থেকে ধরমপুর অঞ্চলে ধান কাটতে যাব—ধান তো এদেশে হয় না—ওখানে হয়। ধান কাটার কাজ শেষ হলে আবার যাব গম কাটতে মুঙ্গের জেলায়। গমের কাজ শেষ হতে জ্যৈষ্ঠ মাস এসে পড়বে।

তখন আবার খেড়ী কাটা শুরু হবে আপনাদেরই এখানে। তার পর কিছুদিন ছুটি। শ্রাবণ-ভাদ্রে আবার মকাই ফসলের সময় আসবে। মকাই শেষ হলেই কলাই এবং ধরমপুর-পূর্ণিয়া অঞ্চলে কার্ত্তিকশাল ধান। আমরা সারা বছর এই রকম দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই। যেখানে যে সময়ে যে ফসল, সেখানে যাই। নইলে খাব কি?

—বাড়ী-ঘর বলে তোমাদের কিছু নেই?

এবার মেয়েটি কথা বলিল। মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, খুব স্বাস্থ্যবতী, বার্ণিশ-করা কালো রং, নিটোল গড়ন। কথাবার্ত্তা বেশ বলিতে পারে, আর গলার সুরটা দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী হিন্দীতে বড় চমৎকার শোনায়।

বলিল—কেন থাকবে না বাবুজী? সবই আছে। কিন্তু সেখানে থাকলে আমাদের তো চলে না। সেখানে যাব গরম কালের শেষে, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত থাকব। তার পর আবার বেরুতে হবে বিদেশে—বিদেশেই যখন আমাদের চাকরি। তা ছাড়া বিদেশে কত কি মজা দেখা যায়—এই দেখবেন ফসল কাটা হয়ে গেলে আপনাদের এখানেই কত দেশ থেকে কত লোক আসবে। কত বাজিয়ে, গাইয়ে, নাচনেওয়ালী, কত বহুরূপী সং—আপনি বোধ হয় দেখেন নি এসব? কি করে দেখবেন, আপনাদের এ অঞ্চলে তো ঘোর জঙ্গল হয়ে পড়ে ছিল—সবে এইবার চাষ হয়েছে। এই দেখুন না আসে আর পনের দিনের মধ্যেই। এই তো সবারই রোজগারের সময় আসছে।

চারিদিক নির্জ্জন। দূরে বস্তিতে কারা টিন পিটাইতেছে অন্ধকারের মধ্যে। মনে ভাবিলাম, এই অর্গলহীন কাশডাঁটার বেড়ার আগড়-দেওয়া কুঁড়েতে ইহারা রাত কাটাইবে এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের ধারে, ছেলেপুলে লইয়া—সাহসও আছে বলিতে হইবে। এই তো মাত্র দিন কয়েক আগে এদেরই মত আর একটা খুপড়ি হইতে ছেলে লইয়া গিয়াছে মায়ের কোল হইতে—এদেরই বা ভরসা কিসের? অথচ একটা ব্যাপার দেখিলাম, ইহারা যেন ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। তত সন্ত্রস্ত ভাবও নাই। এই তো এত রাত পর্য্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসিয়া গল্পগুজব, রান্নাবান্না করিল। বলিলাম—তোমরা একটু সাবধানে থাকবে। মানুষখেকো বাঘ বেরিয়েছে জান তো? মানুষ-খেকো বাঘ বড় ভয়ানক জানোয়ার, আর বড় ধূর্ত্ত। আগুন রাখো খুপড়ির সামনে, আর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়। ওই তো কাছেই বন, রাত-বেরাতের ব্যাপার—

মেয়েটি বলিল—বাবুজী, আমাদের সয়ে গিয়েছে। পূর্ণিয়া জেলায় যেখানে ফি-বছর ধান কাটতে যাই, সেখানে পাহাড় থেকে বুনো হাতী নামে। সে জঙ্গল আরও ভয়ানক। ধানের সময় বিশেষ করে বুনো হাতীর দল এসে উপদ্রব করে।

মেয়েটি আগুনের মধ্যে আর কিছু শুকনো বনঝাউয়ের ডাল ফেলিয়া দিয়া সামনের দিকে সরিয়া আসিয়া বসিল।

বলিল—সেবার আমরা অখিলকুচা পাহাড়ের নীচে ছিলাম। একদিন রাত্রে এক খুপড়ির বাইরে রান্না করছি, চেয়ে দেখি পঞ্চাশ হাত দূরে চার-পাঁচটা বুনো হাতী—কালো কালো

পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে অন্ধকারে—যেন আমাদের খুপ্‌ড়ির দিকেই আসছে। আমি ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়ে বড় মেয়েটার হাত ধরে রান্না ফেলে খুপড়ির মধ্যে তাদের রেখে এলাম। কাছে আর কোনো লোকজন নেই, বাইরে এসে দেখি তখন হাতী ক'টা একটু থমকে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আমার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছে। হাতীতে খুব দেখতে পায় না তাই রক্ষে—ওরা বাতাসে গন্ধ পেয়ে দূরের মানুষ বুঝতে পারে। তখন বোধ হয় বাতাস অন্য দিকে বইছিল, যাই হোক্, তারা অন্য দিকে চলে গেল। ওঃ, সেখানেও এমনি বাবুজী সারা রাত টিন পেটায় আর আলো জ্বালিয়ে রাখে হাতীর ভয়ে। এখানে বুনো মহিষ, সেখানে বুনো হাতী। ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

রাত বেশী হওয়াতে নিজের বাসায় ফিরলাম।

দিন পনেরোর মধ্যে ফুলকিয়া বইহারের চেহারা বদলাইয়া গেল। সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ছাপরা প্রভৃতি স্থান হইতে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা দাঁড়িপাল্লা ও বস্তা লইয়া আসিল মাল কিনিতে। তাহাদের সঙ্গে কুলির ও গাড়োয়ানের কাজ করিতে আসিল এক দল লোক। হালুইকররা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর তুলিয়া মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া সতেজে পুরী, কচৌরি, লাড্ডু, কালাকন্দ্ বিক্রয় করিতে লাগিল। ফিরিওয়ালারা নানা রকম সস্তা ও খেলো মনোহারী জিনিস, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট্, ছিটের কাপড়, সাবান ইত্যাদি লইয়া আসিল।

এ বাদে আসিল রং-তামাসা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিতে কত ধরনের লোক। নাচ দেখাইতে, রামসীতা সাজিয়া ভক্তের পূজা পাইতে, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্ত্তি-হাতে পাণ্ডাঠাকুর আসিল প্রণামী কুড়াইতে। এ সময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।

আর-বছরও যে জনশূন্য ফুলকিয়া বইহারের প্রান্তর ও জঙ্গল দিয়া, বেলা পড়িয়া গেলে, ঘোড়ায় যাইতেও ভয় করিত—এ-বছর তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চারিদিকে বালক-বালিকার হাস্যধ্বনি, কলরব, সস্তা টিনের ভেঁপুর পিঁপিঁ বাজনা, ঝুমঝুমির আওয়াজ, নাচিয়েদের ঘুঙুরের ধ্বনি—সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে।

লোকসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত বেশী। কত নূতন খুপড়ি, কাশের লম্বা চালাঘর চারিদিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল, শুকনো কাশের ডাঁটার গোলা পাকাইয়া এদেশে একরকম ভারি শক্ত রশি তৈরি করে, আর আছে ওদের নিজেদের শারীরিক পরিশ্রম।

ফুলকিয়ার তহশীলদার আসিয়া জানাইল, এই সব বাহিরের লোক, যাহারা এখানে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছে, ইহাদের কাছে জমিদারের খাজনা আদায় করিতে হইবে।

বলিল—আপনি রীতিমত কাছারি করুন হুজুর, আমি সব লোক একে একে আপনার

কাছে হাজির করাই—আপনি ওদের মাথাপিছু একটা খাজনা ধার্য্য করে দিন।

কত রকমের' লোক দেখিবার সুযোগ পাইলাম এই ব্যাপারে!

সকাল হইতে দশটা পর্য্যন্ত কাছারি করিতাম, বৈকালে আবার তিনটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

তহশীলদার বলিল—এরা বেশী দিন এখানে থাকবে না, ফসল মাড়াই ও বেচাকেনা শেষ হয়ে গেলেই সব পালাবে। এর আগে এদের পাওনা আদায় করে নিতে হবে।

একদিন দেখিলাম একটি খামারে মারোয়াড়ী মহাজনেরা মাল মাপিতেছে। আমার মনে হইল ইহারা ওজনে নিরীহ প্রজাদের ঠকাইতেছে। আমার পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের বলিলাম সমস্ত ব্যবসায়ীর কাঁটা ও দাঁড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে। দু-চারজন মহাজনকে ধরিয়া মাঝে মাঝে আমার সামনে আনিতে লাগিল—তাহারা ওজনে ঠকাইয়াছে, কাহারও দাঁড়ির মধ্যে জুয়াচুরি আছে। সে-সব লোককে মহাল হইতে বাহির করিয়া দিলাম। প্রজাদের এত কষ্টের ফসল আমার মহালে অন্তত কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে পারিবে না।

দেখিলাম, শুধু মহাজন নয়, নানা শ্রেণীর লোকে ইহাদের অর্থের ভার লাঘব করিবার চেষ্টায় ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে!

এখানে নগদ পয়সার কারবার খুব বেশী নাই। ফিরিওয়ালাদের কাছে কোন জিনিস কিনিলে ইহারা পয়সার বদলে সরিষা দেয়, জিনিসের দামের অনুপাতে অনেক বেশী সরিষা দিয়া দেয়—বিশেষতঃ মেয়েরা। তাহারা নিতান্ত নিরীহ ও সরল, যা তা বুঝাইয়া তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্যমূল্যের চতুর্গুণ ফসল আদায় করা খুবই সহজ।

পুরুষেরাও বিশেষ বৈষয়িক নয়।

তাহারা বিলাতী সিগারেট কেনে, জুতা-জামা কেনে। ফসলের টাকা ঘরে আসিলে ইহাদের ও বাড়ীর মেয়েদের মাথা ঘুরিয়া যায়—মেয়েরা ফরমাস করে রঙীন কাপড়ের, কাচের ও এনামেলের বাসনের, হালুইকরের দোকান হইতে ঠোঙা ঠোঙা লাড্ডু-কচোরী আসে, নাচ দেখিয়া গান শুনিয়াই কত পয়সা উড়াইয়া দেয়। ইহার উপর রামজী, হনুমানজীর প্রণামী ও পূজা তো আছেই। তাহার উপরেও আছে জমিদার ও মহাজনের পাইক-পেয়াদারা। দুর্দ্দান্ত শীতে রাত জাগিয়া বন্য-শূকর ও বন্য-মহিষের উপদ্রব হইতে কত কষ্টে ফসল বাঁচাইয়া, বাঘের মুখে, সাপের মুখে নিজেদের ফেলিতে দ্বিধা না করিয়া সারা বছরের ইহাদের যাহা উপার্জ্জন,—এই পনের দিনের মধ্যে খুশীর সহিত তাহা উড়াইয়া দিতে ইহাদের বাধে না দেখিলাম।

কেবল একটা ভালর দিকে দেখা গেল, ইহারা কেহ মদ বা তাড়ি খায় না। গাঙ্গোতা বা ভুঁইহার ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ-সব নেশার রেওয়াজ নাই—সিদ্ধিটা অনেকে খায়, তাও কিনিতে হয় না, বনসিদ্ধির জঙ্গল হইয়া আছে লবটুলিয়া ও ফুলকিয়ার প্রান্তরে, পাতা ছিঁড়িয়া আনিলেই হইল—কে দেখিতেছে।

একদিন মুনেশ্বর সিং আসিয়া জানাইল একজন লোক জমিদারের খাজনা ফাঁকি দিবার

উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে—হুকুম হয় তো ধরিয়া আনে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—পালাচ্ছে কি রকম? দৌড়ে পালাচ্ছে?

—ঘোড়ার মত দৌড়ুচ্ছে হুজুর, এতক্ষণে বড় কুণ্ডী পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে পৌঁছল।

দুর্ব্বৃত্তকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচজন সিপাহী পলাতক আসামীকে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

লোকটাকে দেখিয়া আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার বয়স ষাটের কম কোনমতেই হইবে বলিয়া আমার তো মনে হইল না—মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।

শুনিলাম সে নাকি 'ননীচোর নাটুয়া' সাজিয়া আজ কয়দিনে বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছে, গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের তলায় একটা খুপড়িতে থাকিত, আজ কয়দিন ধরিয়া সিপাহীরা তাহার কাছে খাজনার তাগাদা করিতেছে কারণ এদিকে ফসলের সময়ও ফুরাইয়া আসিল। আজ তাহার খাজনা মিটাইবার কথা ছিল। হঠাৎ দুপুরের পরে সিপাহীরা খবর পায় সে লোকটা তল্পিতল্পা বাঁধিয়া রওয়ানা হইয়াছে। মুনেশ্বর সিং ব্যাপার কি জানিতে গিয়া দেখে যে আসামী বইহার ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে পূর্ণিয়া অভিমুখে—মুনেশ্বরের হাঁক শুনিয়া সে নাকি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার পরই এই অবস্থা।

সিপাহীদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কিন্তু আমার সন্দেহ জন্মিল। প্রথমতঃ 'ননীচোর নাটুয়া' মানে যদি বালক শ্রীকৃষ্ণ হয়, তবে ইহার সে সাজিবার বয়স আর আছে কি? দ্বিতীয়তঃ, এ লোকটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছিল, এ কথাই বা কি করিয়া সম্ভব!

কিন্তু উপস্থিত সকলেই হলফ করিয়া বলিল—উভয় কথাই সত্য।

তাহাকে কড়া সুরে বলিলাম—তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হল, জমিদারের খাজনা দিতে হয় জান না। তোমার নাম কি?

লোকটা ভয়ে বাতাসের মুখে তালপাতার মত কাঁপিতেছিল। আমার সিপাহীরা একে চায় তো আরে পায়, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। তাহারা যে এই বৃদ্ধ নটের প্রতি খুব সদয় ও মোলায়েম ব্যবহার করে নাই ইহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে দেরি হইল না।

লোকটা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, তাহার নাম দশরথ।

—কি জাত? বাড়ী কোথায়?

—আমরা ভুঁইহার বাভন হুজুর। বাড়ী মুঙ্গের জেলা—সাহেবপুর কামাল।

—পালাচ্ছিলে কেন?

—কই, না, পালাব কেন, হুজুর?

—বেশ, খাজনা দাও।

—কিছুই পাই নি, খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্বে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি। হনুমানজীর কিরিয়া।

সিপাহীরা বলিল—সব মিথ্যে কথা। শুনবেন না হুজুর। ও অনেক টাকা রোজগার করেছে। ওর কাছেই আছে। হুকুম করেন তো ওর কাপড়চোপড় সন্ধান করি।

লোকটা ভয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমি বলছি আমার কাছে কত আছে। পরে কোমর হইতে একটা গেঁজে বাহির করিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া বলিল—এই দেখুন হুজুর, তের আনা পয়সা আছে। আমার কেউ নেই, এই বুড়ো বয়সে কে-ই বা আমায় দেবে? আমি নাচ দেখিয়ে এই ফসলের সময় খামারে খামারে বেড়িয়ে যা রোজগার করি। আবার সেই গমের সময় পর্য্যন্ত এতেই চালাব। তার এখনও তিন মাস দেরি। যা পাই পেটে দুটো খাই, এই পর্য্যন্ত। সিপাহীরা বলেছে, আমায় নাকি আট আনা খাজনা দিতে হবে—তা হলে আমার আর রইল মোট পাঁচ আনা। পাঁচ আনায় তিন মাস কি খাব?

বলিলাম—তোমার হাতে ও পোঁটলাতে কি আছে? বার কর।

লোকটা পোঁটলা খুলিয়া দেখাইল তাহাতে আছে ছোট্ট একখানা টিনমোড়া আর্সি, একটা রাঙতার মুকুট—ময়ূরপাখা সমেত, গালে মাখিবার রং, গলায় পরিবার পুঁতির মালা ইত্যাদি—কৃষ্ণঠাকুর সাজিবার উপকরণ।

বলিল—দেখুন, তবুও বাঁশী নেই হুজুর। একটা টিনের বড় বাঁশী আট আনার কম হবে না। এখানে নলখাগড়ার বাঁশীতে কাজ চালিয়েছি। এরা গাঙ্গোতা জাত, এদের ভুলানো সহজ। কিন্তু আমাদের মুঙ্গের জেলার লোক সব বড় এলেমদার। বাঁশী না হলে হাসবে। কেউ পয়সা দেবে না।

আমি বলিলাম—বেশ, তুমি খাজনা দিতে না পার, নাচ দেখিয়ে যাও, খাজনার বদলে।

বৃদ্ধ হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছে এমন ভাব দেখাইল। তাহার পর গালেমুখে রং মাখিয়া ময়ূরপাখা মাথায় ঐ বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—তখন হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার সিপাহীরা তো মুখে কাপড় দিয়া বিদ্রূপের হাসি চাপিতে প্রাণপণ করিতেছে। তাহাদের চক্ষে 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ এক মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হইল। বেচারীরা ম্যানেজারবাবুর সামনে না পারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, না পারে দুর্দ্দমনীয় হাসির বেগ সামলাইতে।

সে রকম অদ্ভুত নাচ কখনও দেখি নাই, ষাট বছরের বৃদ্ধ কখনও বালকের মত অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কাল্পনিক জননী যশোদার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিতেছে, কখনও একগাল হাসিয়া সঙ্গী রাখাল বালকগণের মধ্যে চোরা-ননী বিতরণ করিতেছে, যশোদা হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কখনও জোড়-হাতে চোখের জল মুছিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বালকের স্বরে কাঁদিতেছে। সমস্ত জিনিস দেখিলে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়।

দেখিবার মত বটে।

নাচ শেষ হইল। আমি হাততালি দিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

বলিলাম—এমন নাচ কখনও দেখি নি, দশরথ। বড় চমৎকার নাচো। আচ্ছা তোমার খাজনা মাপ করে দিলাম—আমার নিজ থেকে এই দুটাকা বখশিশ দিলাম খুশী হয়ে। ভারি চমৎকার নাচ।

আর দিন-দশবারোর মধ্যে ফসল কেনাবেচা শেষ হইয়া গেল, বাড়তি লোক সব যে যার দেশে চলিয়া গেল। রহিল মাত্র যাহারা এখানে জমি চষিয়া বাস করিতেছে, তাহারাই। দোকান-পসার উঠিয়া গেল, নাচওয়ালা, ফিরিওয়ালা অন্যত্র রোজগারের চেষ্টায় গেল। কাটুনি জনমজুরের দল এখনও পর্য্যন্ত ছিল শুধু এই সময়ের আমোদ তামাশা দেখিবার জন্য—এইবার তাহারাও বাসা উঠাইবার যোগাড় করিতে লাগিল।

২

একদিন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় আমি আমার পরিচিত সেই নক্‌ছেদী ভকতের খুপড়িতে দেখা করিতে গেলাম।

সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই, দিগন্তব্যাপী ফুলকিয়া বইহারের পশ্চিম প্রান্তে একেবারে সবুজ বনরেখার মধ্যে ডুবিয়া টক্‌টকে রাঙা প্রকাণ্ড বড় সূর্য্যটা অস্ত যাইতেছে। এখানকার এই সূর্য্যাস্তগুলি—বিশেষতঃ এই শীতকালে—এত অদ্ভুত সুন্দর যে এই সময়ে মাঝে মাঝে আমি মহালিখারূপের পাহাড়ে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে উঠিয়া বিস্ময়জনক দৃশ্যের প্রতীক্ষা করি।

নক্‌ছেদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপালে হাত দিয়া আমায় সেলাম করিল। বলিল—ও মঞ্চী, বাবুজীকে বসবার একটা কিছু পেতে দে।

নক্‌ছেদীর খুপড়িতে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আছে, সে যে নক্‌ছেদীর স্ত্রী তাহা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। কিন্তু সে প্রায়ই বাহিরের কাজকর্ম্ম অর্থাৎ কাঠভাঙা, কাঠকাটা, দূরবর্ত্তী ভীমদাসটোলার পাতকূয়া হইতে জল আনা ইত্যাদি লইয়া থাকে। মঞ্চী সেই মেয়েটি, যে আমাকে বুনো হাতীর গল্প বলিয়াছিল। সে আসিয়া শুষ্ক কাশের ডাঁটায় বোনা একখানা চেটাই পাতিয়া দিল।

তার সেই দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর টানের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন দেখলেন বাবুজী বইহারের মেলা। বলেছিলাম না, কত নাচ-তামাশা আমোদ হবে, কত জিনিস আসবে, দেখলেন তো? অনেক দিন আসেন নি বাবুজী, বসুন। আমরা যে শীগগির চলে যাচ্ছি।

ওদের খুপড়ির দোরের কাছে লম্বা আধশুকনো ঘাসের উপর চেটাই পাতিয়া বসিলাম, যাহাতে সূর্য্যাস্তটা ঠিক সামনাসামনি দেখিতে পাই। চারিদিকের জঙ্গলের গায়ে একটা মৃদু-

রাঙা আভা পড়িয়াছে, একটা অবর্ণনীয় শান্তি ও নীরবতা বিশাল বইহার জুড়িয়া।

মঞ্চীর কথার উত্তর দিতে বোধ হয় একটু দেরি হইল। সে আবার কি একটা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ওর 'ছিকাছিকি' বুলি আমি খুব ভাল বুঝি না, কি বলিল না বুঝিতে পারিয়া অন্য একটা প্রশ্ন দ্বারা সেটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—তোমরা কালই যাবে?

—হ্যাঁ, বাবুজী।

—কোথায় যাবে?

—পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ অঞ্চলে যাব।

পরে বলিল—নাচ-তামাশা কেমন দেখলেন বাবু? বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন বালুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজী!

দেখিলাম মঞ্চী নিতান্ত বালিকার মতই নাচ-তামাশায় আমোদ পায়। এবার কত রকম কি দেখিয়াছে, মহা উৎসাহ ও খুশির সুরে তাহারই বর্ণনা করিতে বসিয়া গেল।

নক্ছেদী বলিল—নে নে, বাবুজী কলকাতায় থাকেন, তোর চেয়ে অনেক কিছু দেখেছেন। ও এ-সব বড় ভালবাসে বাবুজী, ওরই জন্যে আমরা এতদিন এখানে রয়ে গেলাম। ও বল্লে—না, দাঁড়াও, থামারের নাচ-তামাশা, লোকজন দেখে তবে যাব। বড্ড ছেলেমানুষ এখনও!

মঞ্চী যে নক্ছেদীর কে হয় তাহা এতদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, যদিও ভাবিতাম বৃদ্ধের মেয়েই হইবে। আজ ওর কথায় আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

বলিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কোথায়?

নক্ছেদী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমার মেয়ে! কোথায় আমার মেয়ে হুজুর?

—কেন, এই মঞ্চী তোমার মেয়ে নয়?

আমার কথায় সকলের আগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল মঞ্চী। নক্ছেদীর প্রৌঢ়া স্ত্রীও মুখে আঁচল চাপা দিয়া খুপড়ির ভিতর ঢুকিল।

নক্ছেদী অপমানিত হওয়ার সুরে বলিল—মেয়ে কি হুজুর! ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

বলিলাম—ও!

অতঃপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি তো এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম যে, কথা খুঁজিয়া পাই না।

মঞ্চী বলিল—আগুন করে দিই, বড্ড শীত।

শীত সত্যই বড় বেশী। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন হিমালয় পাহাড় নামিয়া আসে। পূর্ব্ব-আকাশের নীচের দিকটা সূর্য্যাস্তের আভায় রাঙা, উপরটা কৃষ্ণাভ নীল।

খুপড়ি হইতে কিছু দূরে একটা শুকনো কাশ-ঝাড়ে মঞ্চী আগুন লাগাইয়া দিতে দশ-বারো ফুট দীর্ঘ ঘাস দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা জ্বলন্ত কাশঝোপের কাছে গিয়া বসিলাম।

নকৃছেদী বলিল—বাবুজী, এখনও ও ছেলেমানুষ আছে, ওর জিনিসপত্র কেনার দিকে বেজায় ঝোঁক। ধরুন এবার প্রায় আট-দশ মণ সর্ষে মজুরী পাওয়া গিয়েছিল—তার মধ্যে তিন মণ ও খরচ করে ফেলেছে সখের জিনিসপত্র কেনবার জন্য। আমি বললাম, গতর-খাটানো মজুরীর মাল দিয়ে তুই ওসব কেন কিনিস্? তা মেয়েমানুষ শোনে না। কাঁদে, চোখের জল ফেলে। বলি, তবে কেন্?

মনে ভাবিলাম, তরুণী স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামী, না বলিয়াই বা আর কি উপায় ছিল?

মঞ্চী বলিল—কেন, তোমায় তো বলেছি, গম-কাটানোর সময় যখন মেলা হবে, তখন আর কিছু কিনব না। ভাল জিনিসগুলো সস্তায় পাওয়া গেল—

নকৃছেদী রাগিয়া বলিল—সস্তা? বোকা মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে কেঁয়ে দোকানদার আর ফিরিওয়ালা।—সস্তা! পাঁচ সের সর্ষে নিয়ে একখানা চিরুণী দিয়েছে, বাবুজী। আর-বছর তিরাশি রতনগঞ্জের গমের থামারে—

মঞ্চী বলিল—আচ্ছা বাবুজী, নিয়ে আসছি, জিনিসগুলো, আপনিই বিচার করে বলুন সস্তা কি না—

কথা শেষ করিয়াই মঞ্চী খুপড়ির দিকে ছুটিল এবং কাশড াঁটায়-বোনা ডালা-আঁটা একটা ঝাঁপি হাতে করিয়া ফিরিল। তার পর সে ডালা তুলিয়া ঝাঁপির ভিতর হইতে জিনিসগুলি একে একে বাহির করিয়া আমার সামনে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

—এই দেখুন কত বড় কাঁকই, পাঁচ সের সর্ষের কমে এমনিতরো কাঁকই হয়? দেখেছেন কেমন চমৎকার রং! সৌখীন জিনিস না? আর এই দেখুন একখান সাবান, দেখুন কেমন গন্ধ, এও নিয়েছে পাঁচ সের সর্ষে। সস্তা কি না বলুন বাবুজী?

সস্তা মনে করিতে পারিলাম কই? এখন একখানা বাজে সাবানের দাম কলিকাতার বাজারে এক আনার বেশী নয়, পাঁচ সের সর্ষের দাম নয়ালির মুখেও অন্তত সাড়ে-সাত আনা। এই সরলা বন্য মেয়েরা জিনিসপত্রের দাম জানে না, খুবই সহজ এদের ঠকানো।

মঞ্চী আরও অনেক জিনিস দেখাইল। আহ্লাদের সহিত একবার এটা দেখায়, একবার ওটা দেখায়। মাথার কাঁটা, পাথরের আংটি, চীনা মাটির পুতুল, এনামেলের ছোট ডিশ, খানিকটা চওড়া লাল ফিতে—এই সব জিনিস। দেখিলাম মেয়েদের প্রিয় জিনিসের তালিকা সব দেশেই সব সমাজেই অনেকটা এক। বন্য মেয়ে মঞ্চী ও তাহার শিক্ষিতা ভগ্নীর মধ্যে বেশী তফাৎ নাই। জিনিসপত্র সংগ্রহ ও অধিকার করার প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রকৃতিদত্ত। বুড়ো নকৃছেদী রাগিলে কি হইবে।

কিন্তু সব চেয়ে ভাল জিনিসটি মঞ্চী সর্ব্বশেষে দেখাইবে বলিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাহা কি তখন জানি!

এইবার সে গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দের ও আগ্রহের সহিত সেটা বাহির করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিল।

এক ছড়া নীল ও হলদে হিংলাজের মালা।

সত্যি, কি খুশী ও গর্ব্বের হাসি দেখিলাম ওর মুখে! ওর সভ্য বোনেদের মত ও মনের ভাব গোপন করিতে তো শেখে নাই, একটি অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা ওর এই সব সামান্ত জিনিসের অধিকারের উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নারী-মনের এমন স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিবার সুযোগ আমাদের সভ্য-সমাজে বড়-একটা ঘটে না।

—বলুন দিকি কেমন জিনিস?

—চমৎকার!

—কত দাম হতে পারে এর বাবুজী? কলকাতায় আপনারা পরেন তো?

কলিকাতায় আমি হিংলাজের মালা পরি না, আমরা কেহই পরি না তবুও আমার মনে হইল ইহার দাম খুব বেশী হইলেও ছ-আনার বেশী নয়। বলিলাম—কত নিয়েছে বল না?

—সতের সের সর্ষে নিয়েছে। জিতি নি?

বলিয়া লাভ কি যে, সে ভীষণ ঠকিয়াছে। এ-সব জায়গায় এ রকম হইবেই! কেন মিথ্যা আমি নক্‌ছেদীর কাছে বকুনি খাওয়াইয়া ওর মনের এ অপূর্ব্ব আহ্লাদ নষ্ট করিতে যাইব।

আমারই অনভিজ্ঞতার ফলে এ বছর এমন হইতে পারিয়াছে। আমার উচিত ছিল ফিরিওয়ালাদের জিনিসপত্রের দরের উপরে কড়া নজর রাখা। কিন্তু আমি নতুন লোক এখানে, কি করিয়া জানিব এদেশের ব্যাপার? ফসল মাড়িবার সময় মেলা হয় তাহাই তো জানিতাম না। আগামী বৎসর যাহাতে এমনধারা না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরদিন সকালে নক্‌ছেদী তাহার দুই স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা লইয়া এখান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে আমার খুপড়িতে নক্‌ছেদী খাজনা দিতে আসিল, সঙ্গে আসিল মঞ্চী। দেখি মঞ্চী গলায় সেই হিংলাজের মালাছড়াটি পরিয়া আসিয়াছে। হাসিমুখে বলিল—আবার আসব ভাদ্র মাসে মকাই কাটতে। তখন থাকবেন তো বাবুজী? আমরা জংলী হর্ত্তুকির আচার করি শ্রাবণ মাসে—আপনার জন্যে আনব!

মঞ্চীকে বড় ভাল লাগিয়াছিল, চলিয়া গেলে দুঃখিত হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনের-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল সেবার কালেক্টরীর নীলামে ডাক হইবে খবর পাওয়া গেল। আমাদের হেড আপিসে তাড়াতাড়ি একটা খবর দিতে, তারযোগে আদেশ পাইলাম, বিড়ির পাতার জঙ্গল যেন আমি ডাকিয়া লই।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জঙ্গলটা একবার আমার নিজের চোখে দেখা আবশ্যক। কি আছে না-আছে না জানিয়া নীলাম ডাকিতে আমি প্রস্তুত নই। এদিকে নীলামের দিনও নিকটবর্ত্তী, 'তার' পাওয়ার পরদিনই সকালে রওনা হইলাম।

আমার সঙ্গের লোকজন খুব ভোরে বাক্স-বিছানা ও জিনিসপত্র মাথায় রওনা হইয়াছিল, মোহনপুরা ফরেস্টের সীমানায় কারো নদী পার হইবার সময় তাহাদের সহিত দেখা হইল। সঙ্গে ছিল আমাদের পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল।

কারো ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী—হাঁটুখানেক জল ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া উপলরাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। আমরা দুজনে ঘোড়া হইতে নামিলাম, নয়ত পিছল পাথরের নুড়িতে ঘোড়া পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। দু-পারে কটা বালির চড়া। সেখানেও ঘোড়ায় চাপা যায় না, হাঁটু পর্য্যন্ত বালিতে এমনিই ডুবিয়া যায়। অপর পারের কডারী জমিতে যখন পৌছিলাম, তখন বেলা এগারটা। বনোয়ারী পাটোয়ারী বলিল—এখানে রান্নাবান্না করে নিলে হয় হুজুর, এর পরে জল পাওয়া যায় কি না ঠিক নেই!

নদীর দু-পারেই জনহীন আরণ্যভূমি, তবে বড় জঙ্গল নয়, ছোটখাট কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল—খুব ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, লোকজনের চিহ্ন কোন দিকে নাই।

আহারাদির কাজ খুব সংক্ষেপে সারিলেও সেখান হইতে রওনা হইতে একটা বাজিয়া গেল।

বেলা যখন যায়-যায়, তখনও জঙ্গলের কূলকিনারা নাই, আমার মনে হইল আর বেশী দূর অগ্রসর না হইয়া একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া ভাল। অবশ্য বনের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে দুইটি বন্য গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছি—একটার নাম কুলপাল, একটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটার সময়। তখন যদি জানা থাকিত যে, সন্ধ্যার সময়ও জঙ্গল শেষ হইবে না, তাহা হইলে সেখানেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইত।

বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে জঙ্গল বড় ঘন হইয়া আসিল। আগে ছিল ফাঁকা জঙ্গল, এখন যেন ক্রমেই চারিদিক হইতে বড় বড় বনস্পতির দল ভিড় করিয়া সরু সুঁড়ি পথটা চাপিয়া ধরিতেছে—এখন যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখানটাতে তো চারিদিকেই বড় বড় গাছ, আকাশ দেখা যায় না, নৈশ অন্ধকার ইতিমধ্যেই ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এক এক জায়গায় ফাঁকা জঙ্গলের দিকে বনের কি অনুপম শোভা! কি এক ধরনের থোকা থোকা সাদা ফুল সারা বনের মাথা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ছায়াগহন অপরাহ্নের নীল আকাশের তলে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এত সৌন্দর্য্য কার জন্য যে সাজানো! বনোয়ারী বলিল—ও বুনো তেউড়ির ফুল, এই সময় জঙ্গলে ফোটে, হুজুর। এক রকমের লতা।

যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ শুভ্র বুনো তেউড়ির ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে—ঠিক যেন রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ কাপাস তুলা কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে বনের গাছের মাথায় সর্ব্বত্র। ঘোড়া থামাইয়া মাঝে মাঝে কতক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছি—এক এক জায়গার শোভা এমনই অদ্ভুত যে, সেদিকে চাহিয়া যেন একটা ছন্নছাড়া মনের ভাব হইয়া যায়—যেন মনে হয়, কত দূরে কোথায় আছি, সভ্য জগৎ হইতে বহু দূরে এক জনহীন অজ্ঞাত জগতের উদাস, অপরূপ বন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে—যে জগতের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, প্রবেশের অধিকারও নাই, শুধু বন্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতার জগৎ।

বোধ হয় আরও দেরি হইয়া গিয়াছিল আমার এই বার বার জঙ্গলের দৃশ্য হাঁ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার ফলে। বেচারী বনোয়ারী পাটোয়ারী আমার তাঁবে কাজ করে, সে জোর করিয়া আমায় কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে নিশ্চয় ভাবিতেছে—এ বাঙালী বাবুটির মাথার নিশ্চয় দোষ আছে। এঁকে দিয়া জমিদারীর কাজ আর কত দিনে চলিবে? একটি বড় আসান-গাছের তলায় সবাই মিলিয়া আশ্রয় লওয়া গেল। আমরা আছি সবসুদ্ধ আট-দশজন লোক। বনোয়ারী বলিল—বড় একটা আগুন কর, আর সবাই কাছাকছি ঘেঁষে থাকো। ছড়িয়ে থেকো না, নানা রকম বিপদ এ জঙ্গলে রাত্রিকালে।

গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, মাথার উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা আকাশ, এখনও অন্ধকার নামে নাই, দূরে নিকটে জঙ্গলের মাথায় বুনো তেউড়ির সাদা ফুল ফুটিয়া আছে রাশি রাশি, অজস্র! আমার ক্যাম্পচেয়ারের পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস আধ-শুকনো, সোনালী রঙের। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধ, শুকনো ঘাসের গন্ধ, কি একটা বন-ফুলের গন্ধ, যেন দুর্গাপ্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মত। মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত, বন্য জীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি—যাহা কোথাও কখনও আসে না এই রকম বিরাট নির্জ্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া। অভিজ্ঞতা না থাকিলে বলিয়া বোঝানো বড়ই কঠিন সে মুক্ত জীবনের উল্লাস।

এমন সময় আমাদের এক কুলি আসিয়া পাটোয়ারীর কাছে বলিল একটু দূরে জঙ্গলের শুক ডালপালা কুড়াইতে গিয়া সে একটা জিনিস দেখিয়াছে। জায়গাটা ভাল নয়, ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে না তাঁবু ফেলিলেই হইত।

পাটোয়ারী বলিল—চলুন হুজুর, দেখে আসি কি জিনিসটা।

কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাইয়া কুলিটা বলিল—ঐখানে নিকটে গিয়ে দেখুন হুজুর। আর কাছে যাব না।

বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপ হইতে মাথা উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই-করা, সন্ধ্যাবেলা দেখিলে ভয় পাইবার কথা বটে।

মানুষের হাতের তৈরী এ-বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এ জনহীন জঙ্গলের মধ্যে এ স্তম্ভ কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। জিনিসটা কত দিনের প্রাচীন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া বেলা ন-টার মধ্যে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া গেলাম।

সেখানে পৌছিয়া জঙ্গলের বর্ত্তমান মালিকের জনৈক কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। সে আমায় জঙ্গল দেখাইয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শুষ্ক নালার ওপারে ঘন বনের মধ্যে দেখি একটা প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ জাগিয়া আছে—ঠিক কাল সন্ধ্যাবেলার সেই স্তম্ভটার মত। সেই রকমের বিকট মুখ খোদাই করা।

আমার সঙ্গে বনোয়ারী পাটোয়ারী ছিল, তাহাকেও দেখাইলাম। মালিকের কর্ম্মচারী স্থানীয় লোক, সে বলিল—ও আরও তিন-চারটা আছে এ-অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এ দেশে আগে অসভ্য বুনো জাতির রাজ্য ছিল, ও তাদেরই হাতের তৈরী। ওগুলো সীমানার নিশানদিহি থাম্বা।

বলিলাম—থাম্বা কি করে জানলে ?

সে বলিল—চিরকাল শুনে আসছি বাবুজী, তা ছাড়া সেই রাজার বংশধর এখনও বর্ত্তমান।

বড় কৌতূহল হইল।

—কোথায় ?

লোকটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা ছোট বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ-অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড়, আর দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্ব্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্ব্বপুরুষ।

মনে পড়িল, পূর্ব্বেও আমার কাছারিতে একবার গনোরী তেওয়ারী স্কুলমাস্টার গল্প করিয়াছিল বটে যে, এ-অঞ্চলের আদিম-জাতীয় রাজার বংশধর এখনও আছে। এ-দিকের যত পাহাড়ী জাতি—তাহাকে এখনও রাজা বলিয়া মানে। এখন সে কথা মনে পড়িল। জঙ্গলের মালিকের সেই কর্ম্মচারীর নাম বুদ্ধু সিং, বেশ বুদ্ধিমান, এখানে অনেক কাল চাকুরি করিতেছে, এই সব বনপাহাড অঞ্চলের অনেক ইতিহাস সে জানে দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—মুঘল বাদশাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে—এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা যখন বাংলা দেশে যেত—এরা উপদ্রব করত তীর-ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা,

এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২ সালের সাঁওতাল-বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বর্ত্তমান রাজা। নাম দোবরু পান্না বীরবর্দ্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরীব। কিন্তু এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

রাজসন্দর্শনে যাইতে হইলে কিছু নজর লইয়া যাওয়া উচিত। যার যা প্রাপ্য সম্মান, তাকে তা না-দিলে কর্ত্তব্যের হানি ঘটে।

কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগী—বেলা একটার মধ্যে নিকটবর্ত্তী বস্তি হইতে কিনিয়া আনিলাম। এ-দিকের কাজ শেষ করিয়া বেলা দুইটার পরে বুদ্ধু সিংকে বলিলাম—চল, রাজার সঙ্গে দেখা করে আসি।

বুদ্ধু সিং তেমন উৎসাহ দেখাইল না। বলিল—আপনি সেখানে কী যাবেন! আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত নয়। পাহাড়ী অসভ্য জাতের রাজা, তাই বলে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী? সে তেমন কিছু নয়।

তাহার কথা না শুনিয়াই আমি ও বনোয়ারীলাল রাজধানীর দিকে গেলাম। তাহাকেও সঙ্গে লইলাম।

রাজধানীটা খুব ছোট, কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস।

ছোট ছোট মাটির ঘর, খাপরার চাল। পরিষ্কার করিয়া লেপা-পোঁছা। দেওয়ালের গায়ে মাটির সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিতেছে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সুঠাম গড়ন ও নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে কেমন সুন্দর একটা লাবণ্য প্রত্যেকেরই। সকলেই আমাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বুদ্ধু সিং একজন স্ত্রীলোককে বলিল—রাজা ছে রে?

স্ত্রীলোকটি বলিল, সে দেখে নাই। তবে কোথায় আর যাইবে, বাড়ীতেই আছে।

২

আমরা গ্রামে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বুদ্ধু সিং-এর ভাবে মনে হইল এইবার রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে নীত হইয়াছি। অন্য ঘরগুলির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এই মাত্র লক্ষ্য করিলাম যে, ইহার চারিপাশ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড, সেখান হইতেই পাথর আনা হইয়াছে। রাজবাড়ীতে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি—কতকগুলি খুব ছোট। তাদের গলায় পুঁতির মালা ও নীল ফলের বীজের মালা। দু-একটি ছেলে-মেয়ে দেখিতে বেশ সুশ্রী! ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে বুদ্ধু সিং-এর ডাকে ছুটিয়া বাহিরে

আসিয়াই আমাদের দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হইল কিছু ভয়ও পাইয়াছে।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজা কোথায় ?

মেয়েটি কে ?—বুদ্ধু সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বুদ্ধু সিং বলিল—রাজার নাতির মেয়ে। রাজা বহুদিন জীবিত থাকিয়া নিশ্চয়ই বহু যুবক ও প্রৌঢ়কে রাজসিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল—আমার সঙ্গে এস। জ্যাঠামশায় পাহাড়ের নীচে পাথরে বসে আছেন।

মানি বা না-ই মানি, মনে মনে ভাবিলাম যে-মেয়েটি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা এই আরণ্য-ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল—সেই বংশের সে মেয়ে।

বলিলাম—মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস কর।

বুদ্ধু সিং বলিল—ওর নাম ভানুমতী।

বাঃ বেশ সুন্দর—ভানুমতী! রাজকন্যা ভানুমতী!

ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী—তবে পরনের কাপড়, সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা। দূর হইতে একটা বড় বকাইন্ গাছ দেখাইয়া দিয়া ভানুমতী বলিল—তোমরা যাও, জ্যাঠামশায় ওই গাছতলায় বসে গরু চরাচ্ছেন।

গরু চরাইতেছেন কি রকম! প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম বোধ হয়। এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দ্দী গরু চরাইতেছেন!

কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে মেয়েটি চলিয়া গেল এবং আমরা আর কিছু অগ্রসর হইয়া বকাইন্ গাছের তলায় এক বৃদ্ধকে কাঁচা শালপাতায় তামাক জড়াইয়া ধূমপানরত দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—সেলাম, রাজাসাহেব।

রাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে খুব ভাল দেখিতে পান বলিয়া মনে হইল না।

বলিল—কে ? বুদ্ধু সিং ? সঙ্গে কে ?

বুদ্ধু বলিল—একজন বাঙালী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি কিছু নজর এনেছেন—আপনাকে নিতে হবে।

আমি নিজে গিয়া বৃদ্ধের সামনে মুরগী ও জিনিস কয়টি নামাইয়া রাখিলাম।

বলিলাম—আপনি দেশের রাজা, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বহুৎ দূর থেকে এসেছি।

বৃদ্ধের দীর্ঘায়ত চেহারার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল যৌবনে রাজা দোবরু পান্না খুব সুপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। মুখশ্রীতে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ খুব খুশী হইলেন। আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—কোথায় ঘর ?

বলিলাম—কলকাতা।

—উঃ অনেক দূর। বড় ভারী জায়গা শুনেছি কলকাতা।

—আপনি কখনও যান নি?

—না, আমরা কি শহরে যেতে পারি। এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল। বোসো। ভানুমতী কোথায় গেল, ও ভানুমতী?

মেয়েটি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—কি জ্যাঠামশায়?

—এই বাঙালী বাবু ও তাঁর সঙ্গের লোকজন আজ আমার এখানে থাকবেন ও খাওয়া-দাওয়া করবেন।

আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—না, না, সে কি! আমরা এখুনি চলে যাব, আপনার সঙ্গে দেখা করেই—আমাদের থাকার বিষয়ে—

কিন্তু দোবরু পান্না বলিলেন—না, তা হতে পারে না। ভানুমতী, এই জিনিসগুলো নিয়ে যা এখান থেকে।

আমার ইঙ্গিতে বনোয়ারীলাল পাটোয়ারী নিজে জিনিসগুলি বহিয়া অদূরবর্তী রাজার বাড়ীতে লইয়া গেল ভানুমতীর পিছু পিছু। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমার সম্ভ্রমে মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত-বংশীয় বীর দোবরু পান্না (হইলই বা আদিম জাতি) আমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন—এ অনুরোধ আদেশেরই সামিল।

রাজা দোবরু পান্না অত্যন্ত দরিদ্র, দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরু পান্নার অপেক্ষা অনেক বড় রাজা অবস্থাবৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা নিজের হাতে শালপাতার একটা চুরট গড়িয়া আমার হাতে দিলেন। দেশলাই নাই—গাছের তলায় আগুন করাই আছে—তাহা হইতে একটা পাতা জ্বালাইয়া সম্মুখে ধরিলেন।

বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে।

দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে? আমাদের বংশ সূর্য্যবংশ। এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তার পর আর কিছু নেই।

এই আরণ্য ভূভাগের বহিঃস্থিত অন্য কোনও পৃথিবীর খবর দোবরু পান্না রাখেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার কথার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

রাজা দোবরু বলিলেন—আমার ছোট নাতি, জগরু পান্না। ওর বাবা এখানে নেই, লছমীপুরের রাণী-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ওরে জগরু, বাবুজীর জন্যে খাওয়ার যোগাড় কর্

যুবক যেন নবীন শালতরু, পেশীবহুল সবল নধর দেহ। সে বলিল—বাবুজী, শজারুর মাংস খান ?

পরে তাহার পিতামহের দিকে চাহিয়া বলিল—পাহাড়ের ওপারের বনে ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম, কাল রাত্রে দুটো সজারু পড়েছে।

শুনিলাম রাজার তিনটি ছেলে, তাহাদের আট-দশটি ছেলেমেয়ে। এই বৃহৎ রাজ-পরিবারের সকলেই এই গ্রামে একত্র থাকে। শিকার ও গোচারণ প্রধান উপজীবিকা। এ বাদে বনের পাহাড়ী জাতিদের বিবাদ-বিসংবাদে রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিলে কিছু কিছু ভেট্ ও নজরানা দিতে হয়—দুধ, মুরগী, ছাগল পাখীর মাংস বা ফলমূল।

বলিলাম—আপনার চাষবাস আছে ?

দোবরু পান্না গর্ব্বের সুরে বলিলেন—ওসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়, তাও এক সময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সবচেয়ে গৌরবের। তীর-ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না, ও বীরের কাজ নয়। তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের থেকে একটা বন্দুক কিনে এনেছে ; আমি কখনও ছুঁই নি। বর্শা ধরে শিকার আসল শিকার।

ভানুমতী আবার আসিয়া একটা পাথরের ভাঁড় আমাদের কাছে রাখিয়া গেল।

রাজা বলিলেন—তেল মাখুন। কাছেই চমৎকার ঝরণা—স্নান করে আসুন সকলে।

আমরা স্নান করিয়া আসিলে রাজা আমাদের রাজবাড়ীর একটা ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল। জগরু শজারু ছাড়াইয়া মাংস আনিয়া রাখিল কাঁচা শালপাতার পাত্রে। ভানুমতী আর একবার গিয়া দুধ ও মধু আনিল। আমার সঙ্গে ঠাকুর ছিল না, বনোয়ারী মেটে আলু ছাড়াইতে বসিল, আমি রাঁধিবার চেষ্টায় উনুন ধরাইতে গেলাম। কিন্তু শুধু বড় বড় কাঠের সাহায্যে উনুন ধরানো কষ্টকর। দু-একবার চেষ্টা করিয়া পারিলাম না, তখন ভানুমতী তাড়াতাড়ি একটা পাখীর শুক্‌নো বাসা আনিয়া উনুনের মধ্যে পুরিয়া দিতে আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিল। দিয়াই দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ, সরল মর্য্যাদাজ্ঞান।

রাজা দোবরু পান্না সব সময় রান্নাঘরের দুয়ারটির কাছে বসিয়া রহিলেন। আতিথ্যের এতটুকু ত্রুটি না ঘটে। আহারাদির পর বলিলেন—আমার তেমন বেশী ঘরদোরও নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হল। এই বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে আমার বংশের রাজাদের প্রকাণ্ড বাড়ীর চিহ্ন এখনও আছে। আমি বাপ-ঠাকুর্দ্দার কাছে শুনেছি বহু প্রাচীনকালে ওখানে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করতেন। সে দিন কি আর এখন আছে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবতা এখনও সেখানে আছেন।

আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম—যদি আমরা একবার দেখতে যাই তাতে কি

কোনও আপত্তি আছে, রাজাসাহেব ?

—এর আবার আপত্তি কি। তবে দেখবার এখন বিশেষ কিছু নেই। আচ্ছা, চলুন আমি যাব। জগরু আমাদের সঙ্গে এস।

আমি আপত্তি করিলাম—বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধকে আর পাহাড়ে উঠাইবার কষ্ট দিতে মন সরিল না। সে আপত্তি টিকিল না, রাজাসাহেব হাসিয়া বলিলেন—ও পাহাড়ে আমায় তো প্রায়ই উঠতে হয়, ওর গায়েই আমার বংশের সমাধিস্থান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমায় সেখানে যেতে হয়। চলুন, সে-জায়গাও দেখাব।

উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে অনুচ্চ শৈলমালা (স্থানীয় নাম ধন্‌ঝরি) এক স্থানে আসিয়া যেন হঠাৎ ঘুরিয়া পূর্ব্বমুখী হওয়ার দরুণ একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে, এই খাঁজের নীচে একটা উপত্যকা, শৈলসানুর অরণ্য সারা উপত্যকা ব্যাপিয়া যেন সবুজের ঢেউয়ের মত নামিয়া আসিয়াছে, যেমন ঝরণা নামে পাহাড়ের গা বাহিয়া। অরণ্য এখানে ঘন নয়, ফাঁকা ফাঁকা—বনের গাছের মাথায় মাথায় সুদূর চক্রবালরেখায় নীল শৈলমালা, বোধহয় গয়া কি রামগড়ের দিকের—যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই বনের শীর্ষ, কোথাও উঁচু, বড় বড় বনস্পতিসঙ্কুল, কোথাও নীচু, চারা শাল ও চারা পলাশ। জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম।

এক জায়গায় খুব বড় পাথরের চাঁই আড়ভাবে পোঁতা, ঠিক যেন একখানা পাথরের কড়ি বা ঢেঁকির আকারের। তার নীচে কুম্ভকারদের হাঁড়ি-কলসী পোড়ানো পণ-এর গর্ত্তের মত কিংবা মাঠের মধ্যে খেঁকশিয়ালী যেমন গর্ত্ত কাটে—এই ধরনের প্রকাণ্ড একটা বড় গর্ত্তের মুখ। গর্ত্তের মুখে চারা শালের বন।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে। কোন ভয় নেই। জগরু আগে যাও।

প্রাণ হাতে করিয়া গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিলাম। বাঘ ভালুক তো থাকিতেই পারে, না থাকে সাপ তো আছেই।

গর্ত্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া খানিকদূর গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়ানো যায়। ভয়ানক অন্ধকার ভিতরে প্রথমটা মনে হয়, কিন্তু চোখ অন্ধকারে কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তত অসুবিধা হয় না ; জায়গাটা প্রকাণ্ড একটা গুহা, কুড়ি-বাইশ হাত লম্বা, হাত পনের চওড়া—উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে আবার একটা খেঁকশিয়ালীর মত গর্ত্ত দিয়া খানিক দূর গেলে দেওয়ালের ওপারে ঠিক এই রকম নাকি আর একটা গুহা আছে—কিন্তু সেটাতে আমরা ঢুকিবার আগ্রহ দেখাইলাম না। গুহার ছাদ বেশী উঁচু নয়, একটা মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত উঁচু করিলে ছাদ ছুঁইতে পারে। চাম্‌সে ধরনের গন্ধ গুহার মধ্যে—বাদুড়ের আড্ডা—এ ছাড়া ভাম, শৃগাল, বনবিড়াল প্রভৃতি থাকে শোনা গেল। বনোয়ারী পাটোয়ারী চুপি চুপি বলিল—হুজুর, চলুন বাইরে, এখানে আর বেশী দেরি করবেন না।

ইহাই নাকি দোবরু পান্নার পূর্ব্বপুরুষদের দুর্গ প্রাসাদ।

আসলে ইহা একটি বড় প্রাকৃতিক গুহা—প্রাচীন কালে পাহাড়ের উপর দিকের মুখওয়ালা এ গুহার আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করা যাইত।

রাজা বলিলেন—এর আর একটা গুপ্ত মুখ আছে—সে কাউকে বলা নিয়ম নয়। সে কেবল আমার বংশের লোক ছাড়া কেউ জানে না। যদিও এখন এখানে কেউ বাস করে না, তবুও এই নিয়ম চলে আসছে বংশে।

গুহাটা হইতে বাহির হইয়া ধড়ে প্রাণ আসিল।

তার পর আরও খানিকটা উঠিয়া এক জায়গায় প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া বড় বড় সরু মোটা ঝুরি নামাইয়া, পাহাড়ের মাথার অনেকখানি ব্যাপিয়া এক বিশাল বটগাছ।

রাজা দোবরু পান্না বলিলেন—জুতো খুলে চলুন মেহেরবানি করে।

বটগাছতলায় যেন চারিধারে বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের আকারের পাথর ছড়ানো।

রাজা বলিলেন—ইহাই তাঁহার বংশের সমাধিস্থান। এক-একখানা পাথরের তলায় এক-একটা রাজবংশীয় লোকের সমাধি! বিশাল বটতলার সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই রকম বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো—কোন কোন সমাধি খুবই প্রাচীন, দু'দিক হইতে ঝুরি নামিয়া যেন সেগুলিকে সাঁড়াশির মত আটকাইয়া ধরিয়াছে, সে সব ঝুরি আবার গাছের গুঁড়ির মত মোটা হইয়া গিয়াছে—কোন কোন শিলাখণ্ড ঝুরির তলায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সেগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। একটি ছোট বট চারা ক্রমে বেড়ে অন্য অন্য গাছ মেরে ফেলে দিয়েছে। এই বটগাছটা এত প্রাচীন যে, এর আসল গুঁড়ি নেই। ঝুরি নেমে যে গুঁড়ি হয়েছে, তারাই এখন রয়েছে। গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলায় কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা।

সত্যই বটগাছতলায় দাঁড়াইয়া আমার মনে এমন একটা ভাব হইল, যাহা এতক্ষণ কোথাও হয় নাই, রাজাকে দেখিয়াও না (রাজাকে তো মনে হইয়াছে জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতাল কুলীর মত), রাজকন্যাকে দেখিয়াও নয় (একজন স্বাস্থ্যবতী হো কিংবা মুণ্ডা তরুণীর সহিত রাজকন্যার কোন প্রভেদ দেখি নাই), রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তো নয়ই (সেটাকে একটা সাপখোপের ও ভূতের আড্ডা বলিয়া মনে হইয়াছে)। কিন্তু পাহাড়ের উপরে এই সুবিশাল, প্রাচীন বটতরুতলে কতকালের এই সমাধিস্থল আমার মনে এক অননুভূত, অপরূপ অনুভূতি জাগাইল।

স্থানটির গাম্ভীর্য্য, রহস্য ও প্রাচীনত্বের ভাব অবর্ণনীয়। তখন বেলা প্রায় হেলিয়া পড়িয়াছে, হলদে রোদ পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুরির অরণ্যে ধন্‌ঝরির অন্য চূড়ায়, দূর বনের মাথায়। অপরাহ্নের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজ সমাধিকে যেন আরও গম্ভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য্য দান করিল।

মিশরের প্রাচীন সম্রাটের সমাধিস্থল থিব্‌স্ নগরের অদূরবর্ত্তী 'ভ্যালি অব্ দি কিংস' আজ

পৃথিবীর টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড় বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজ গিজ করে—'ভ্যালি অব্ দি কিংস' অতীত কালের কুয়াসায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল, তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামী সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়···কিন্তু তার চেয়ে কোন অংশে রহস্যে ও স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্ত্তির মত—কারণ এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশু-মানবের মন লইয়া ইহারা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্ণের ছায়ায় পাহাড়ের উপর সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্ব্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছন দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্ত্তমানের পর্য্যায়ে পড়িয়া যায়।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য্য-আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন···ভারতের পরবর্ত্তী যা কিছু ইতিহাস—এই আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থি-কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্য্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্য্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি ; বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদ-দলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—সভ্যতার গর্ব্বে উন্নতনাসিক আর্য্যকান্তির গর্ব্বে আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুণ্ডা কুলী-রমণী ভাবিতেছি—তাদের কত আগ্রহের ও গর্ব্বের সহিত প্রদর্শিত রাজপ্রাসাদকে অনার্য্যসুলভ আলো-বাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্রাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল—সে নাটকের কুশীলবগণ এক দিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না—এক দিকে আমি, আর, পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজসমাধি ও বটতরুতল আবৃত হইবার পূর্ব্বেই আমরা সেদিন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

নামিবার পথে একস্থানে জঙ্গলের মধ্যে একখানা খাড়া সিঁদুরমাখা পাথর। আশে-পাশে

মানুষের হস্তরোপিত গাঁদাফুলের ও সন্ধ্যামণি-ফুলের গাছ। সামনে আর একখানা বড় পাথর, তাতেও সিঁদুর মাখা। বহুকাল হইতে নাকি এই দেবস্থান এখানে প্রতিষ্ঠিত, রাজবংশের ইনি কুলদেবতা। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত—সম্মুখের বড পাথরখানিই যূপ-রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন পায়রা ও মুরগী বলি প্রদত্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ঠাকুর ইনি?

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

মনে পড়িল গত শীতকালে গনু মাহাতোর মুখে শোনা সেই গল্প।

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্ব্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে।

এই অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউই মানে না, জানেও না—কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, এবং এই দেবতা যে সত্যই আছেন—তাহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল সেই বিজন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য ও পর্ব্বত অঞ্চলের নিবিড় সৌন্দর্য্য ও রহস্যের মধ্যে বসিয়া।

অনেক দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া একবার দেখিয়াছিলাম বড়বাজারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ গরমের দিনে, এক পশ্চিমা গাড়োয়ান বিপুল বোঝাই গাড়ীর মহিষ দুটাকে প্রাণপণে চামড়ার পাঁচন দিয়া নির্ম্মম ভাবে মারিতেছে—সেই দিন মনে হইয়াছিল, হায় দেব টাঁড়বারো, এ তো ছোটনাগপুর কি মধ্যপ্রদেশের অরণ্যভূমি নয়, এখানে তোমার দয়ালু হস্ত এই নির্য্যাতিত পশুকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? এ বিংশ শতাব্দীর আর্য্যসভ্যতাদৃপ্ত কলিকাতা। এখানে বিজিত আদিম রাজা দোবরু পান্নার মতই তুমি অসহায়।

আমি নওয়াদা হইতে মোটর বাস ধরিয়া গয়ায় আসিব বলিয়া সন্ধ্যার পরেই রওনা হইলাম। বনোয়ারী আমাদের ঘোড়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিল। আসিবার সময় আর একবার রাজকুমারী ভানুমতীর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এক বাটি মহিষের দুধ লইয়া আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ছিল রাজবাড়ীর দ্বারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

একদিন রাজু পাড়ে কাছারিতে খবর পাঠাইল যে বুনো শূওরের দল তাহার চীনা ফসলের ক্ষেতে প্রতি রাত্রে উপদ্রব করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দাঁতওয়ালা ধাড়ী শূওরের ভয়ে সে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ছাড়া অন্য কিছু করিতে পারে না—কাছারি হইতে ইহার প্রতিকার না করিলে তাহার সমুদয় ফসল নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

শুনিয়া নিজেই বৈকালের দিকে বন্দুক লইয়া গেলাম। রাজুর কুটীর ও জমি নাঢ়া-বইহারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেদিকে এখনও লোকের বসবাস হয় নাই, ফসলের ক্ষেতের পত্তনও খুব কম হইয়াছে, কাজেই বন্য জন্তুর উপদ্রব বেশী।

দেখি রাজু নিজের ক্ষেতে বসিয়া কাজ করিতেছে। আমায় দেখিয়া কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। আমার হাত হইতে ঘোড়ার লাগাম লইয়া নিকটের একটা হরিতকী গাছে ঘোড়া বাঁধিল।

বলিলাম—কই রাজু, তোমায় যে আর দেখি নে, কাছারির দিকে যাও না কেন?

রাজুর খুপড়ির চারিদিকে দীর্ঘ কাশের জঙ্গল, মাঝে মাঝে কেঁদ ও হরীতকী গাছ। কি করিয়া যে এই জনশূন্য বনে সে একা থাকে! এ জঙ্গলে কাহারও সহিত দিনান্তে একটি কথা বলিবার উপায় নাই—অদ্ভুত লোক বটে!

রাজু বলিল—সময় পাই কই যে কোথাও যাব হুজুর, ক্ষেতের ফসল চৌকি দিতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল। তার ওপর মহিষ আছে।

তিনটি মহিষ চরাইতে ও দেড়-বিঘা জমির চাষ করিতে এত কি ব্যস্ত থাকে যে সে লোকালয়ে যাইবার সময় পায় না, একথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু রাজু আপনা হইতেই তাহার দৈনন্দিন কার্য্যের যে তালিকা দিল, তাহাতে দেখিলাম তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ না থাকার কথা। ক্ষেতখামারের কাজ, মহিষ চরানো, দোয়া, মাখনতোলা, পূজা-অর্চ্চনা, রামায়ণ-পাঠ, রান্না-খাওয়া—শুনিয়া যেন আমারই হাঁপ লাগিল। কাজের লোক বটে রাজু! ইহার উপর নাকি সারা-রাত জাগিয়া ক্যানেস্ত্রা পিটাইতে হয়।

বলিলাম—শূওর কখন বেরোয়?

—তার তো কিছু ঠিক নেই হুজুর। তবে রাত হলেই বেরোয় বটে। একটু বসুন, দেখবেন কত আসে।

কিন্তু আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয়—রাজু একা এই জনশূন্য স্থানে কি করিয়া বাস করে। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

রাজু বলিল—অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, বাবুজী। বহু দিন এমনি ভাবেই আছি—কষ্ট তো হয়ই না, বরং আপন মনে বেশ আনন্দে থাকি। সারাদিন খাটি, সন্ধ্যাবেলা ভজন গাই, ভগবানের নাম নিই, বেশ দিন কেটে যায়।

রাজু, কি গনু মাহাতো, কি জয়পাল—এ ধরনের মানুষ আরও অনেক আছে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে—ইহাদের মধ্যে একটি নূতন জগৎ দেখিলাম যে জগৎ আমার পরিচিত নয়।

আমি জানি রাজুর একটি সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি আছে, সে চা খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। অথচ এই জঙ্গলের মধ্যে চায়ের উপকরণ সে কোথায় পায়, এই ভাবিয়া আমি নিজে চা ও চিনি লইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—রাজু, একটু চা করো তো। আমার কাছে সব আছে।

রাজু মহা আনন্দে একটি তিন-সেরী লোটাতে জল চড়াইয়া দিল। চা প্রস্তুত হইল, কিন্তু একটি মাত্র ছোট কাঁসার বাটি ব্যতীত অন্য পাত্র নাই। তাহাতেই আমায় চা দিয়া সে নিজে বড় লোটাটি লইয়া চা খাইতে বসিল।

রাজু হিন্দী লেখাপড়া জানে বটে, কিন্তু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই। কলিকাতা নামটা শুনিয়াছে, কোন্ দিকে জানে না। বোম্বাই বা দিল্লীর বিষয়ে তার ধারণা চন্দ্রলোকের ধারণার মত—সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কুয়াসাচ্ছন্ন। শহরের মধ্যে সে দেখিয়াছে পূর্ণিয়া, তাও অনেক বছর আগে এবং মাত্র কয়েক দিনের জন্য সেখানে গিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মোটর গাড়ী দেখেছ রাজু?

—না হুজুর, শুনেছি বিনা গরুতে বা ঘোড়ায় চলে, খুব ধোঁয়া বেরোয়, আজকাল পূর্ণিয়া শহরে অনেক নাকি এসেছে। আমার তো সেখানে অনেক কাল যাওয়া নেই, আমরা গরীব লোক, শহরে গেলেই তো পয়সা চাই।

রাজুকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কলিকাতা যাইতে চায় কি না। যদি চায়, আমি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া আনিব, পয়সা লাগিবে না।

রাজু বলিল—শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা শুনেছি। সেখানে গেলে শুনেছি যে জাত থাকে না। সব লোক সেখানকার বদ্‌মাইস। আমার এ-দেশের একজন লোক কোন্ শহরের হাসপাতালে গিয়েছিল, তার পায়ে কি হয়েছিল সেই জন্যে। ডাক্তার ছুরি দিয়ে পা কাটে আর বলে, তুমি আমাকে কত টাকা দেবে? বললে দশ টাকা দেব। তখন ডাক্তার আরও কাটে! আবার বললে—এখনও বল কত টাকা দেবে? সে বললে—আরও পাঁচ টাকা দেব, ডাক্তারসাহেব আর কেটো না। ডাক্তার বললে—ওতে হবে না—বলে আবার পা কাটতে লাগল। সে গরীব লোক, যত কাঁদে, ডাক্তার ততই ছুরি দিয়ে কাটে—কাটতে কাটতে গোটা পা-খানাই কেটে ফেললে। উঃ, কি কাণ্ড ভাবুন তো হুজুর!

রাজুর কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা দায় হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এই রাজুই একবার আকাশে রামধনু উঠিতে দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিল—রামধনু যে দেখেছেন বাবুজী, ও ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রাজুর খুপড়ির সামনের উঠানে একটি বড় খুব উঁচু আসান গাছ আছে, তারই তলায় বসিয়া আমরা চা খাইতেছিলাম—যেদিকে চাই, সেদিকেই ঘন বন—কেঁদ, আমলকী, পুষ্পিত

বহেড়া লতার ঝোপ ; বহেড়া ফুলের একটি মৃদু সুগন্ধ সান্ধ্য বাতাসকে মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনে হইল এসব স্থানে বসিয়া এমন ভাবে চা খাওয়া জীবনের একটা সৌন্দর্য্যময় অভিজ্ঞতা। কোথায় এমন অরণ্যপ্রান্তর, কোথায় এমন জঙ্গলে-ঘেরা কাশের কুটীর, রাজুর মত মানুষই বা কোথায় ? এ অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্র, তেমনই দুষ্প্রাপ্য।

বলিলাম—আচ্ছা রাজু, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস না কেন ? তোমার আর তা হলে কষ্ট করে রেঁধে খেতে হয় না।

রাজু বলিল—সে বেঁচে নেই। আজ সতের-আঠারো বছর মারা গিয়াছে, তার পর থেকে বাড়ীতে মন বসাতে পারি নে আর !

রাজুর জীবনে রোমান্স ঘটিয়াছিল, এ ভাবিতে পারাও কঠিন বটে, কিন্তু অতঃপর রাজু যে গল্প করিল, তাহাকে ও-ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করা চলে না।

রাজুর স্ত্রীর নাম ছিল সর্জ্জু (অর্থাৎ সরযূ), রাজুর বয়স যখন আঠারো ও সরযূর চৌদ্দ—তখন উত্তর-ধরমপুর, শ্যামলালটোলাতে সরযূর বাপের টোলে রাজু দিনকতক ব্যাকরণ পড়িতে যায়।

রাজুকে বলিলাম—কতদিন পড়েছিলে ?

কিছু না বাবুজী ; বছরখানেক ছিলাম, কিন্তু পরীক্ষা দিই নি। সেখানে আমাদের প্রথম দেখাশুনো এবং ক্রমে ক্রমে—

আমাকে সমীহ করিয়া রাজু অল্প কাশিয়া চুপ করিল।

আমি উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—তার পর বলে যাও—

—কিন্তু, হুজুর, ওর বাবা আমার অধ্যাপক। আমি কি করে তাঁকে এ-কথা বলি ? এক দিন কার্ত্তিক মাসে ছট্ পরবের দিন সরযূ ছোপানো হল্‌দে শাড়ী পরে কুশী নদীতে একদল মেয়ের সঙ্গে নাইতে যাচ্ছে, আমি—

রাজু কাশিয়া আবার চুপ করিল।

পুনরায় উৎসাহ দিয়া বলিলাম—বল, বল, তাতে কি ?

—ওকে দেখবার জন্যে আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। এর কারণ এই যে ইদানীং ওর সঙ্গে আমার আর তত দেখাশুনো হত না—এক জায়গায় ওর বিয়ের কথাবার্ত্তাও চলছিল। যখন দলটি গাইতে গাইতে—আপনি তো জানেন ছট্ পরবের সময় মেয়েরা গান করতে করতে নদীতে ছট্ ভাসাতে যায় !—তার পর যখন ওরা গাইতে গাইতে আমার সামনে এল, ও আমায় দেখতে পেয়েছে গাছের আড়ালে। ও-ও হাসলে, আমিও হাসলাম। আমি হাত নেড়ে ইশারা করলাম, একটু পিছিয়ে পড়—ও হাত নেড়ে বললে—এখন নয়, ফেরবার সময়ে।

রাজুর বাহান্ন-বছর বয়সের মুখমণ্ডলে বিংশবর্ষীয় তরুণ প্রেমিকের লাজুকতা ও চোখে একটি স্বপ্নভরা সুন্দর দৃষ্টি ফুটিল এ-কথা বলিবার সময়—যেন জীবনের বহু পিছনে প্রথম যৌবনের পুণ্য দিনগুলিতে যে কল্যাণী তরুণী ছিল চতুর্দ্দশ-বর্ষদেশে—তাহাকেই খুঁজিতে বাহির

হইয়াছে ওর সঙ্গীহারা প্রৌঢ় প্রাণ। এই ঘন জঙ্গলে একা বাস করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যাহার কথা ভাবিতে তাহার ভাল লাগে, যাহার সাহচর্য্যের জন্ম তার মন উন্মুখ—সে হইল বহু কালের সেই বালিকা সরযূ, পৃথিবীতে যে কোথাও আর নাই।

বেশ লাগিতেছিল ওর গল্প। অগ্রহের সঙ্গে বলিলাম—তার পর ?

—তার পর ফেরবার পথে দেখা হল। ও একটু পিছিয়ে পড়ল দলের থেকে।

আমি বললাম—সরযূ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে দেখাশোনাও বন্ধ, আমার লেখাপড়া হবে না। জানি, কেন মিছে কষ্ট পাই, ভাবছি টোল ছেড়ে চলে যাব এ মাসের শেষেই। সরযূ কেঁদে ফেললে। বললে—বাবাকে বলো না কেন ? সরযূর কান্না দেখে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। এমনি হয়ত যে কথা কখনও আমার অধ্যাপককে বলতে পারতাম না, তাই বলে ফেললাম একদিন।

বিয়ে হওয়ার কোন বাধা ছিল না, স্বজাতি, স্বঘর। বিয়ে হয়েও গেল।

খুব সহজ ও সাধারণ রোমান্স হয়ত—হয়ত শহরের কোলাহলে বসিয়া শুনিলে এটাকে নিতান্ত ঘরোয়া গ্রাম্য বৈবাহিক ব্যাপার, সামান্য একটু পুতুপুতু ধরনের পূর্ব্বরাগ বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। ওখানে ইহার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইল। দুইটি নরনারী কি করিয়া পরস্পরকে লাভ করিয়াছিল তাহাদের জীবনে, এ-ইতিহাস যে কতখানি রহস্যময়, তাহা বুঝিয়াছিলাম সেদিন।

চা-পান শেষ করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না ফুটিল। ষষ্ঠী, কি সপ্তমী তিথি।

আমি বন্দুক লইয়া বলিলাম—চল রাজু, দেখি তোমার ক্ষেতে কোথায় শূওর।

একটা বড় তুঁতগাছ ক্ষেতের এক পাশে। রাজু বলিল—এই গাছের ওপর উঠতে হবে হুজুর। আজ সকালে একটা মাচা বেঁধেছি, ওর একটা দো-ডালায়।

আমি দেখিলাম, বিষম মুশকিল। গাছে ওঠা অনেক দিন অভ্যাস নাই। তার উপর এই রাত্রিকালে। কিন্তু রাজু উৎসাহ দিয়া বলিল—কোন কষ্ট নেই হুজুর। বাঁশ দেওয়া আছে, নীচেই ডালপালা, খুব সহজ ওঠা।

রাজুর হাতে বন্দুক দিয়া ডালে উঠিয়া মাচায় বসিলাম। রাজু অবলীলাক্রমে আমার পিছু পিছু উঠিল। দুজনে জমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মাচার উপর বসিয়া রহিলাম পাশাপাশি।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিল। তুঁতগাছের দো-ডালা হইতে জ্যোৎস্নালোকে কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট জঙ্গলে শীর্ষদেশ ভারী অদ্ভুত ভাব মনে আনিতেছিল। ইহাও জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা বটে।

একটু পরে চারিপাশের জঙ্গলে শিয়ালের পাল ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো-মত কি জানোয়ার দক্ষিণ দিকের ঘন জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজুর ক্ষেতে ঢুকিল।

রাজু বলিল—ঐ দেখুন হুজুর—

আমি বন্দুক বাগাইয়া ধরিলাম, কিন্তু আরও কাছে আসিলে জ্যোৎস্নালোকে দেখা গেল

সেটা শূকর নয়, একটা নীলগাই।

নীলগাই মারিবার প্রবৃত্তি হইল না, রাজু মুখে 'দূর দূর' বলিতে সেটা ক্ষিপ্রপদে জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। আমি একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলাম।

ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল। দক্ষিণ দিকের সে জঙ্গলটার মধ্যে বনমোরগ ডাকিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিলাম দাঁতওয়ালা ধাড়ী শূওরটা মারিব, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র শূকর-শাবকেরও টিকি দেখা গেল না। নীলগাইয়ের পিছনে ফাঁকা আওয়াজ করা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে।

রাজু বলিল—নেমে চলুন হুজুর, আপনার আবার ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বলিলাম—কিসের ভোজন? আমি কাছারিতে যাব—রাত এখনও দশটা বাজে নি—থাকবার জো নেই। সকালে কাল সার্ভে ক্যাম্পে কাজ দেখতে বেরুতে হবে।

—খেয়ে যান হুজুর।

—এর পর আর নাঢ়া-বইহারের জঙ্গল দিয়ে একা যাওয়া ঠিক হবে না, এখনই যাই। তুমি কিছু মনে করো না।

ঘোড়ায় উঠিবার সময় বলিলাম—মাঝে মাঝে তোমার এখানে চা খেতে যদি আসি বিরক্ত হবে না তো?

রাজু বলিল—কি যে বলেন! এই জঙ্গলে একা থাকি, গরীব মানুষ, আমায় ভালবাসেন তাই চা চিনি এনে তৈরি করিয়ে একসঙ্গে খান। ও কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না বাবুজী।

সে সময়ে রাজুকে দেখিয়া মনে হইল রাজু এই বয়সেই বেশ দেখিতে, যৌবনে সে যে খুবই সুপুরুষ ছিল, অধ্যাপক-কন্যা সরযূ পিতার তরুণ সুন্দর ছাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিজের সুরুচির পরিচয় দিয়াছিল।

রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বাহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোন দিকে আলো দেখা যায় না, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোন অজানা গ্রহলোকে নির্ব্বাসিত হইয়াছি—দিগন্তরেখায় জলজ্বলে বৃশ্চিকরাশি উদিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক, নিম্নে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে পাতলা অন্ধকারে বনঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে—দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল—আরও দূরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে—অন্য কোন শব্দ নাই কেবল এক ধরনের পতঙ্গের একঘেয়ে একটানা কি-র্-র্-র্ শব্দ ছাড়া; কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিলে ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও দু-তিনটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ! সকলের উপর কি একটা অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো—কি সে রহস্য জানি না—কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর কখনও সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।

যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জ্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে

কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্য্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। শুধু যে-আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জ্ঞানের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্মজন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র তুচ্ছ বর্ত্তমানের দুঃখ-শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে···সে-ই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ···

এভারেস্ট শিখরে উঠিয়া যাহারা তুষারপ্রবাহে ও ঝঞ্ঝায় প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা বিশ্বদেবতার এই বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে···কিংবা কলম্বাস যখন আজোরেস্ দ্বীপের উপকূলে দিনের পর দিন সমুদ্রবাহিত কাষ্ঠখণ্ডে মহাসমুদ্রপারের অজানা মহাদেশের বার্ত্তা জানিতে চাহিয়াছিলেন—তখন বিশ্বের এই লীলাশক্তি তাঁর কাছে ধরা দিয়াছিল—ঘরে বসিয়া তামাক টানিয়া প্রতিবেশীর কন্যার বিবাহ ও ধোপা-নাপিত করিয়া যাহারা আসিতেছে—তাহাদের কর্ম্ম নয় ইহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা।

২

মিছি নদীর উত্তর পাড়ে জঙ্গলের ও পাহাড়ের মধ্যে সার্ভে হইতেছিল। এখানে আজ আট দশ দিন তাঁবু ফেলিয়া আছি। এখনও দশ-বারো দিন হয়ত থাকিতে হইবে।

স্থানটা আমাদের মহাল হইতে অনেক দূরে, রাজা দোবরু পান্নার রাজত্বের কাছাকাছি। রাজত্ব বলিলাম বটে, কিন্তু রাজা দোবরু তো রাজ্যহীন রাজা—তাহার আবাসস্থলের খানিকটা নিকটে পর্য্যন্ত বলা যায়।

বড় চমৎকার জায়গা। একটা উপত্যকা, মুখের দিকটা বিস্তৃত, পিছনের দিক সংকীর্ণ—পূর্ব্বে পশ্চিমে পাহাড়শ্রেণী—মধ্যে এই অশ্বক্ষুরাকৃতি উপত্যকা—বন্ধুর ও জঙ্গলাকীর্ণ, ছোট বড় পাথর ছড়ানো সর্ব্বত্র, কাঁটা-বাঁশের বন, আরও নানা গাছপালার জঙ্গল। অনেকগুলি পাহাড়ী ঝরনা উত্তর দিক হইতে নামিয়া উপত্যকার মুক্ত প্রান্ত দিয়া বাহিরের দিকে চলিয়াছে। এই সব ঝরনার দু-ধারে বন বড় বেশী ঘন, এবং এত দিনের বসবাসের অভিজ্ঞতা হইতে জানি এই সব জায়গাতেই বাঘের ভয়। হরিণ আছে, বন্য মোরগ ডাকিতে শুনিয়াছি দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে। ফেউয়ের ডাক শুনিয়াছি বটে, তবে বাঘ দেখি নাই বা আওয়াজ পাই নাই।

পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড গুহা। গুহার মুখের প্রাচীন ঝাঁপালো বটগাছ—দিনরাত শন্‌শন্ করে। দুপুর রোদে নীল আকাশের তলায় এই জনহীন বন্য উপত্যকা ও গুহা বহু প্রাচীন যুগের ছবি মনে আনে, যে-যুগে আদিম জাতির রাজাদের হয়ত রাজপ্রাসাদ ছিল এই গুহাটা, যেমন রাজা দোবরু পান্নার পূর্ব্বপুরুষের আবাস-গুহা। গুহার দেওয়ালে একস্থানে কতকগুলো কি খোদাই করা ছিল, সম্ভবত কোন ছবি—এখন বড়ই

অস্পষ্ট, ভাল বোঝা যায় না। কত বন্য আদিম নরনারীর হাস্যকলধ্বনি, কত সুখদুঃখ—বর্ব্বর সমাজের অত্যাচারের কত নয়নজলের অলিখিত ইতিহাস এই গুহার মাটিতে, বাতাসে, পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে লেখা আছে—ভাবিতে বেশ লাগে।

গুহামুখ হইতে রশি-দুই দূরে ঝরনার ধারে বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় একটি গোঁড়-পরিবার বাস করে। দুখানা খুপড়ি, একখানা ছোট, একখানা একটু বড়, বনের ডালপালায় বেড়া, পাতার ছাউনি। শিলাখণ্ড কুড়াইয়া তাহা দিয়া উনুন তৈয়ারী করিয়াছে আবরণহীন ফাঁকা জায়গায় খুপড়ির সামনে। বড় একটা বুনো বাদামগাছের ছায়ায় এদের কুটির। বাদামের পাকা পাতা ঝরিয়া পড়িয়া উঠান প্রায় ছাইয়া রাখিয়াছে।

গোঁড়-পরিবারের দুটি মেয়ে আছে, তাদের একটির ষোল-সতের বছর বয়স, অন্যটির বছর চোদ্দ। রং কালো কুচকুচে বটে, কিন্তু মুখশ্রীতে বেশ একটা সরল সৌন্দর্য্য মাখানো—নিটোল স্বাস্থ্য। মেয়ে দুটি রোজ সকালে দেখি দু-তিনটি মহিষ লইয়া পাহাড়ে চরাইতে যায় আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে। আমি তাঁবুতে ফিরিয়া যখন চা খাই, তখন দেখি মেয়ে দুটি আমার তাঁবুর সামনে দিয়া মহিষ লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

একদিন বড় মেয়েটি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া তার ছোট বোনকে আমার তাঁবুতে পাঠাইয়া দিল। সে আসিয়া বলিল—বাবুজী, সেলাম। বিড়ি আছে? দিদি চাইছে।

—তোমরা বিড়ি খাও?

—আমি খাই নে, দিদি খায়। দাও না বাবুজী একটা, আছে?

—আমার কাছে বিড়ি নেই। চুরুট আছে—কিন্তু সে তোমাদের দেব না। বড় কড়া, খেতে পারবে না।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

আমি একটু পরে ওদের বাড়ী গেলাম। আমাকে দেখিয়া গৃহকর্ত্তা খুব বিস্মিত হইল—খাতির করিয়া বসাইল। মেয়ে দুটি শালপাতায় 'ঘাটো' অর্থাৎ মকাই-সিদ্ধ ঢালিয়া নুন দিয়া খাইতে বসিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে নিরুপকরণ মকাই-সিদ্ধ। তাদের মা কি-একটা জাল দিতেছে উনুনে। দুটি ছোট ছোট বালক-বালিকা খেলা করিতেছে।

গৃহকর্ত্তার বয়স পঞ্চাশের উপর। সুস্থ, সবল চেহারা। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল তাদের বাড়ী সিউনী জেলাতে। এখানে এই পাহাড়ে মহিষ চরাইবার ঘাস ও পানীয় জল প্রচুর আছে বলিয়া আজ বছর-খানেক হইতে এখানে আছে। তা ছাড়া এখানকার জঙ্গলের কাঁটা-বাঁশে ধামা চুপড়ি ও মাথায় দিবার টোকা তৈরি করিবার খুব সুবিধা। শিবরাত্রির সময় অখিলকুচার মেলায় বিক্রী করিয়া দু'পয়সা হয়!

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে কতদিন থাকবে?

—যতদিন মন যায়, বাবুজী! তবে এ-জায়গাটা বড় ভাল লেগেছে, নইলে এক বছর আমরা কোথাও একটানা থাকি না। এখানে একটা বড় সুবিধা আছে, পাহাড়ের ওপর জঙ্গলে এত আতা ফলে—দু-ঝুড়ি করে গাছ-পাকা আতা আশ্বিন মাসে আমার মেয়েরা মহিষ

চরাতে গিয়ে পেড়ে আনতো—শুধু আতা খেয়ে আমরা মাস-দুই কাটিয়েছি : আতার লোভেই এখানে থাকা। জিগ্যেস করুন না ওদের ?

বড় মেয়েটি খাইতে খাইতে উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ একটা জায়গা আছে, ওই পূবদিকের পাহাড়ের কোণের দিকে, কত যে বুনো আতা গাছ, ফল পেকে ফেটে কত মাটিতে পড়ে থাকে, কেউ খায় না। আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি তুলে আনতাম।

এমন সময় কে একজন ঘন-বনের দিক হইতে আসিয়া খুপড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—সীতারাম, সীতারাম—জয় সীতারাম—একটু আগুন দিতে পার ?

গৃহকর্ত্তা বলিল—আসুন—বাবাজী, বসুন।

দেখিলাম, জটাজুটধারী একজন বৃদ্ধ সাধু। সাধু ইতিমধ্যে আমায় দেখিতে পাইয়া একটু বিস্ময়ের ও বোধ হয় কথঞ্চিৎ ভয়ের সঙ্গে, সঙ্কুচিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

আমি বলিলাম—প্রণাম, সাধু বাবাজী—

সাধু আশীর্ব্বাদ করিল বটে, কিন্তু তখনও যেন তাহার ভয় যায় নাই।

তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম—কোথায় থাকা হয় বাবাজীর ?

আমার কথার উত্তর দিল গৃহস্বামী। বলিল—বড্ড গজার জঙ্গলের মধ্যে উনি থাকেন, ওই দুই পাহাড় যেখানে মিশেছে, ওই কোণে। অনেক দিন আছেন এখানে।

বৃদ্ধ সাধু ইতিমধ্যে বসিয়া পড়িয়াছে। আমি সাধুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—কতদিন এখানে আছেন ?

এবার সাধুর ভয় ভাঙিয়াছে, বলিল—আজ পনের-যোল বছর, বাবুসাহেব।

—একা থাকা হয় তো ? বাঘ আছে শুনেছি এখানে, ভয় করে না ?

—আর কে থাকবে বাবুসাহেব ? পরমাত্মার নাম নিই—ভয়ডর করলে চলবে কেন ? আমার বয়স কত বল তো বাবুসাহেব ?

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—সত্তর হবে।

সাধু হাসিয়া বলিল—না বাবুসাহেব, নব্বইয়ের উপর হয়েছে। গয়ার কাছে এক জঙ্গলে ছিলাম দশ বছর। তার পর ইজারাদার জঙ্গলের গাছ কাটতে লাগল, ক্রমে সেখানে লোকের বাস হয়ে পড়ল। সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। লোকালয়ে থাকতে পারি নে।

—সাধু বাবাজী, এখানে একটা গুহা আছে, তুমি সেখানে থাক না কেন ?

—একটা কেন বাবুসাহেব, কত গুহা আছে, এ-পাহাড়ে। আমি ওদিকে যেখানে থাকি সেটাও ঠিক গুহা না হলেও গুহার মত বটে। মানে তার মাথায় ছাদ ও দু-দিকে দেয়াল আছে—সামনেটা কেবল খোলা।

—কি খাও ? ভিক্ষা কর ?

—কোথাও বেরুই নে বাবুসাহেব। পরমাত্মা আহার জুটিয়ে দেন। বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে এক রকম কন্দ হয় তা ভারি মিষ্টি, লাল আলুর মত খেতে, তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ-জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। আমলকী খুব খাই, রোজ আমলকী খেলে

মানুষ হঠাৎ বুড়ো হয় না, যৌবন ধরে রাখা যায় বহুদিন। গাঁয়ের লোক মাঝে মাঝে দর্শন করতে এসে দুধ, ছাতু, ভুরা দিয়ে যায়। চলে যাচ্ছে এই সবে এক রকম করে।

—বাঘ ভালুকের সামনে পড়েছ কখনও?

—কখনও না। তবে ভয়ানক এক জাতের অজগর সাপ দেখেছি এই জঙ্গলে—এক জায়গায় অসাড় হয়ে পড়ে ছিল—তালগাছের মত মোটা, মিশ্‌-কালো, সবুজ রাঙা আঁজি কাটা গায়ে। চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে। এখনও সেটা এই জঙ্গলেই আছে। তখন সেটা জলের ধারে পড়ে ছিল, বোধ হয় হরিণ ধরবার লোভে। এখনও কোনও গুহা-গহ্বরে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা যাই বাবুসাহেব, রাত হয়ে গেল।

সাধু আগুন লইয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম মাঝে মাঝে সাধুটি এদের এখানে আগুন লইতে আসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিয়া যায়।

অন্ধকার পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এখন একটু মেটে মেটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে উপত্যকার বনানী অদ্ভুত নীরবতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেবল পার্শ্বস্থ পাহাড়ী ঝরনার কুলু কুলু স্রোতের ধ্বনি ও ক্বচিৎ দু-একটা বন্য মোরগের ডাক ছাড়া কোন শব্দ কানে আসে নাই!

তাঁবুতে ফিরিলাম। পথে বড় একটা শিমূলগাছে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি জ্বলিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে, উপর হইতে নীচু দিকে, নীচু হইতে উপরের দিকে—নানারূপ জ্যামিতির ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া আলো-আঁধারের পটভূমিতে।

৩

এইখানে একদিন আসিল কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। লম্বা, রোগা চেহারা, কালো সার্জের কোট গায়ে, আধময়লা ধুতি পরনে, মাথার চুল রুক্ষ ও এলোমেলো, বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে।

ভাবিলাম চাকুরীর উমেদার। বলিলাম—কি চাই?

সে বলিল—বাবুজীর (হুজুর বলিয়া সম্বোধন করিল না) দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আমার নাম বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। বাড়ী বিহার শরীফ, পাটনা জিলা। এখানে চকমকিটোলায় থাকি, তিন মাইল দূর এখান থেকে!

—ও, তা এখানে কি জন্যে?

—বাবুজী যদি দয়া করে অনুমতি করেন, তবে বলি। আপনার সময় নষ্ট করছি নে?

তখন আমি ভাবিতেছি লোকটা চাকুরীর জন্যই আসিয়াছে। কিন্তু 'হুজুর' না-বলাতে সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। বলিলাম—বসুন, অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছেন এই গরমে।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম—লোকটির হিন্দী খুব মার্জ্জিত। সে-রকম হিন্দীতে আমি কথা বলিতে পারি না। সিপাহী পিয়াদা ও গ্রাম্য প্রজা লইয়া আমার কারবার,

আমার হিন্দী তাহাদের মুখে শেখা দেহাতী বুলির সহিত বাংলা ইডিয়ম মিশ্রিত একটা জগাখিচুড়ী ব্যাপার। এ-ধরনের ভদ্র ও পরিমার্জ্জিত, ভব্য হিন্দী কখনও শুনি নাই, তা বলিব কিরূপে? সুতরাং একটু সাবধানের সহিত বলিলাম—কি আপনার আসার উদ্দেশ্য বলুন।

সে বলিল—আমি আপনাকে কয়েকটি কবিতা শুনাতে এসেছি।

দস্তুরমত বিস্মিত হইলাম। এই জঙ্গলে আমাকে কবিতা শোনাইতে আসিবার এমন কি গরজ পড়িয়াছে লোকটির, হইলই বা কবি?

বলিলাম—আপনি একজন কবি? খুব খুশী হলাম। আপনার কবিতা খুব আনন্দের সঙ্গে শুনব। কিন্তু আপনি কি করে আমার সন্ধান পেলেন?

—এই মাইল-তিন দূরে আমার বাড়ী। পাহাড়ের ঠিক ওপারেই। আমাদের গ্রামে সবাই বলছিল কলকাতা থেকে এক বাঙালী বাবু এসেছেন। আপনাদের কাছে বিদ্যার বড় আদর, কারণ আপনারা নিজে বিদ্বান্। কবি বলছেন—

বিদ্বৎসু সৎকবির্বাচা লভতে প্রকাশং

ছাত্রেষু কুট্‌মলসমং তৃণবজ্জড়েষু।

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় কবিতা শোনাইল। কোন-একটা রেললাইনের টিকিট চেকার, বুকিং ক্লার্ক, স্টেশন-মাস্টার, গার্ড প্রভৃতির নামের সঙ্গে জড়াইয়া এক সুদীর্ঘ কবিতা। কবিতা খুব উঁচুদরের বলিয়া মনে হইল না। তবে আমি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের প্রতি অবিচার করিতে চাই না। তাহার ভাষা আমি ভাল বুঝি নাই—সত্য কথা বলিতে গেলে, বিশেষ কিছুই বুঝি নাই। তবুও মাঝে মাঝে উৎসাহ ও সমর্থন-সূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া গেলাম।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ কবিতাপাঠ থামায় না, উঠিবার নাম করা তো দূরের কথা।

ঘণ্টা দুই পরে সে একটু চুপ করিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল—কি রকম লাগলো বাবুজীর?

বলিলাম—চমৎকার। এমন কবিতা খুব কমই শুনেছি। আপনি কোন পত্রিকায় আপনার কবিতা পাঠান না কেন?

বেঙ্কটেশ্বর দুঃখের সহিত বলিল—বাবুজী, এদেশে আমাকে সবাই পাগল বলে। কবিতা বুঝবার মানুষ এ-সব জায়গায় কি আছে ভেবেছেন? আপনাকে শুনিয়ে আমার আজ তৃপ্তি হল। সমঝদারকে এ-সব শোনাতে হয়। তাই আপনার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম একদিন সময়-মত এসে আপনাকে ধরতে হবে।

সেদিন সে বিদায় লইল কিন্তু পরদিন বৈকালে আসিয়া আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তাহাদের গ্রামে তাহাদের বাড়িতে আমায় একবার যাইতে। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার সহিত পায়ে হাঁটিয়া চকমকিটোলা রওনা হইলাম।

বেলা পড়িয়াছে। সম্মুখে গম যবের ক্ষেত্রে বহুদূর জুড়িয়া উত্তর দিকের পাহাড়ের ছায়া পড়িয়াছে। কেমন একটা শান্তি চারিধারে, সিল্লী পাখীর ঝাঁক কাঁটা-বাঁশঝাড়ের উপর উড়িয়া আসিয়া বসিতেছে, গ্রাম্য বালকবালিকারা এক জায়গায় ঝরনার জলে ছোট ছোট

কি মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে ঠাসাঠাসি বসতি। চালে চালে বাড়ী, অনেক বাড়ীতেই উঠান বলিয়া জিনিস নাই। মাঝারিগোছের একখানা খোলা-ছাওয়া বাড়ীতে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় লইয়া গিয়া তুলিল। রাস্তার ধারেই তাঁর বাড়ীর বাইরের ঘর, সেখানে একখানা কাঠের চৌকিতে বসিলাম। একটু পরে কবি-গৃহিণীকেও দেখিলাম—তিনি স্বহস্তে দইবড়া ও মকাইভাজা আমার জন্য লইয়া যে চৌকিতে বসিয়াছিলাম তাহারই একপ্রান্তে স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু কথা কহিলেন না, যদিও তিনি অবগুণ্ঠনবতীও ছিলেন না। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হইবে, রং তত ফর্সা না হইলেও মন্দ নয়, মুখশ্রী বেশ শান্ত, সুন্দরী বলা না গেলেও কবিপত্নী কুরূপা নহেন। ধরনধারনের মধ্যে একটি সরল, অনায়াসশিষ্টতা ও শ্রী।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—কবিগৃহিণীর স্বাস্থ্য। কি জানি কেন এদেশে যেখানে গিয়াছি, মেয়েদের স্বাস্থ্য সর্ব্বত্র বাংলা দেশের মেয়েদের চেয়ে বহুগুণে ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে। মোটা নয়, অথচ বেশ লম্বা, নিটোল, আঁটসাট গড়নের মেয়ে এদেশে যত বেশী, বাংলা দেশে তত দেখি নাই। কবি-গৃহিণীও ওই ধরনের মেয়েটি।

একটু পরে তিনি এক বাটি মহিষের দুধের দই খাটিয়ার একপাশে রাখিয়া সরিয়া দরজার কবাটের আড়ালে দাঁড়াইলেন। শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়া বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ উঠিয়া স্ত্রীর নিকটে গেল এবং তখনই হাসিমুখে আসিয়া বলিল—আমার স্ত্রী বলছে আপনি আমাদের বন্ধু হয়েছেন, বন্ধুকে একটু ঠাণ্ডা করতে হয় কিনা তাই দইয়ের সঙ্গে বেশী করে পিপুল শুঁট ও লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো রয়েছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা যদি হয় তবে আমার একা কেন সকলের চোখ দিয়ে যাতে জল বের হয় তার জন্যে আমি প্রস্তাব করছি এই দই তিন জনেই খাব। আসুন—। কবিপত্নী দরজার আড়াল হইতে হাসিলেন। আমি ছাড়িবার পাত্র নই, দই তাঁহাকেও খাওয়াইয়া ছাড়িলাম।

একটু পরে কবিপত্নী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং একটা থালা হাতে আবার আসিয়া খাটিয়ার প্রান্তে থালাটি রাখিলেন , এবার আমার সামনেই চাপা, কৌতুকমিশ্রিত সুরে আমাকে শুনাইয়া বলিলেন—বাবুজীকে বল এইবার ঘরের তৈরী প্যাড়া খেয়ে গালের জলুনি থামান।

কি সুন্দর মিষ্টি মেয়েলি ঠেঁট হিন্দী বুলি !

বড় ভাল লাগে এ-অঞ্চলের মেয়েদের মুখে এই হিন্দীর টানটি। নিজে ভাল হিন্দী বলিতে পারি না বলিয়া আমার কথ্য হিন্দীর প্রতি বেজায় আকর্ষণ। বইয়ের হিন্দী নয়—এই সব পল্লীপ্রান্তে, পাহাড়তলীতে, বনদেশের মধ্যে, বিস্তীর্ণ শ্যামল যব গম ক্ষেতের পাশে, চলনশীল চামড়ার রহট্ যেখানে মহিষের দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া ক্ষেতে ক্ষেতে জল সেচন করিতেছে, অস্তসূর্য্যের ছায়াভরা অপরাহ্ণে দূরের নীলাভ শৈলশ্রেণীর দিকে উড়ন্ত বালিহাঁস বা সিল্লী বা বকের দল যেখানে একটা দূরবিসর্পী ভূপৃষ্ঠের আভাস বহন করিয়া আনে—সেখানকার

সে হঠাৎ-শেষ-হইয়া-যাওয়া, কেমন যেন আধ-আধ, ভাঙা-ভাঙা ক্রিয়াপদযুক্ত এক ধরনের ভাষা, যাহা বিশেষ করিয়া মেয়েদের মুখে সাধারণত শোনা যায়—তাহার প্রতি আমার টান খুব বেশী।

হঠাৎ আমি কবিকে বলিলাম—দয়া করে দুএকটা কবিতা পড়ুন না আপনার ?

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল দেখাইল। একটি গ্রাম্য প্রেম-কাহিনী লইয়া কবিতা লিখিয়াছে, সেটি পড়িয়া শুনাইল। ছোট্ট একটি খালের এ-পারের মাঠে এক তরুণ যুবক বসিয়া ভুট্টার ক্ষেত পাহারা দিত, খালের ওপারের ঘাটে একটি মেয়ে আসিত নিত্য কলসী-কাঁখে জল ভরিতে। ছেলেটি ভাবিত মেয়েটি বড় সুন্দর। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস দিয়া গান করিত, ছাগল গরু তাড়াইত, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিত। কত সময়ে দুজনের চোখাচোখি হইয়া গিয়াছে। অমনি লজ্জায় লাল হইয়া কিশোরী চোখ নামাইয়া লইত। ছেলেটি রোজ ভাবিত, কাল সে মেয়েটিকে ডাকিয়া কথা কহিবে। বাড়ী ফিরিয়া সে মেয়েটির কথা ভাবিত। কত কাল কাটিয়া গেল, কত 'কাল' আসিল, কত চলিয়া গেল—মনের কথা আর বলা হইল না। তার পর একদিন মেয়েটি আসিল না, পরদিনও আসিল না ; দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গেল, কোথায় সে প্রতিদিনের সুপরিচিতা কিশোরী ? ছেলেটি হতাশ হইয়া রোজ রোজ ফিরিয়া আসে মাঠ হইতে—ভীরু-প্রেমিক সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না—ক্রমে ছেলেটিকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরী লইতে হইল। বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেটি সেই নদীর ঘাটের রূপসী বালিকাকে আজও ভুলিতে পারে নাই।

দূরের নীল শৈলমালা ও দিগন্তবিস্তারী শস্যক্ষেত্রের দিকে চোখ রাখিয়া প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় এই কবিতাটি শুনিতে শুনিতে কত বার মনে হইল, এ কি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদেরই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ? কবি-প্রিয়ার নাম রুকুমা, কারণ ঐ নামে কবি একটি কবিতা লিখিয়াছে, পূর্ব্বে আমাকে তাহা শুনাইয়াছিল। ভাবিলাম এমন গুণবতী, সুরূপা রুকুমাকে পাইয়াও কি কবির বাল্যের সে দুঃখ আজও দূর হয় নাই ?

আমাকে তাঁবুতে পৌছিয়া দিবার সময়ে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ একটি বড় বটগাছ দেখাইয়া বলিল—ঐ যে দেখছেন বাবুজী, ওর তলায় সেবার সভা হয়েছিল, অনেক কবি মিলে কবিতা পড়েছিল। এদেশে বলে মুসায়েরা। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমার কবিতা শুনে পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে—চেনেন ঈশ্বরীপ্রসাদকে ?—ভারী এলেমদার লোক, 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক—নিজেও একজন ভাল কবি—আমায় খুব খাতির করেছিলেন।

কথা শুনিয়া মনে হইল বেঙ্কটেশ্বর জীবনে এই একবারই সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া নিজের কবিতা আবৃত্তি করিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল এবং সে দিনটি তাহার জীবনের একটা খুব বড় ও স্মরণীয় দিন গিয়াছে। এতবড় সম্মান আর কখনও সে পায় নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

প্রায় তিন মাস পরে নিজের মহালে ফিরিব। সার্ভের কাজ এতদিনে শেষ হইল।

এগারো ক্রোশ রাস্তা। এই পথেই সে-বার সেই পৌষসংক্রান্তির মেলায় আসিয়াছিলাম—সেই শাল-পলাশের বন, শিলাখণ্ড-ছড়ানো মুক্তপ্রান্তর, উঁচুনীচু শৈলমালা। ঘণ্টা-দুই চলিয়া আসিবার পরে দূরে দিগ্বলয়ের কোলে একটি ধূসর রেখা দেখা গেল—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট।

এই পরিচিত দিক্-জ্ঞাপক দৃশ্যটি আজ তিন মাস দেখি নাই। এতদিন এখানে আসিয়া আমাদের লবটুলিয়া ও নাঢ়া-বইহারের উপর এমন একটা টান জন্মিয়া গিয়াছে যেন ইহাদের ছাড়িয়া বেশী দিন কোথাও থাকিলে কষ্ট হয়, মনে হয়, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আছি। আজ তিন মাস পরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা দেখিয়া প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ অনুভব করিলাম, যদিচ এখনও লবটুলিয়ার সীমানা এখান হইতে সাত-আট মাইল দূরে হইবে।

ছোট একটা পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় অনেকখানি জুড়িয়া জঙ্গল কাটিয়া কুসুম-ফুলের আবাদ করিয়াছিল—এখন পাকিবার সময়, কাটুনি জনেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে।

আমি ক্ষেতের পাশের রাস্তা দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ ক্ষেতের দিক্ হইতে কে আমায় ডাকিল—বাবুজী, ও বাবুজী—বাবুজী—

চাহিয়া দেখি, আর-বছরের সেই মঞ্চী!

বিস্মিত হইলাম, আনন্দিতও হইলাম। ঘোড়া থামাইতেই মঞ্চী হাসি-মুখে কাস্তে-হাতে ছুটিয়া ঘোড়ার পাশে দাঁড়াইল। বলিল—আমি দূর থেকেই ঘোড়া দেখে মালুম করেছি। কোথায় গিয়েছিলেন বাবুজী?

মঞ্চী ঠিক তেমনই আছে দেখিতে—বরং আরও একটু স্বাস্থ্যবতী হইয়াছে। কুসুম-ফুলের পাপড়ির গুঁড়া লাগিয়া তাহার হাতখানা ও পরনের শাড়ীর সামনের দিক্‌টা রাঙা।

বলিলাম—বহরাবুরু পাহাড়ের নীচে কাজ পড়েছিল, সেখানে তিন মাস ছিলাম। সেখান থেকে ফিরছি। তোমরা এখানে কি করছ?

—কুসুম-ফুল কাটছি, বাবুজী। বেলা হয়ে গিয়েছে, এবেলা নামুন এখানে। ঐ তো কাছেই খুপড়ি।

আমার কোন আপত্তি টিকিল না। মঞ্চী কাজ ফেলিয়া আমাকে তাহাদের খুপড়িতে লইয়া চলিল। মঞ্চীর স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎ আমার আসার সংবাদ শুনিয়া ক্ষেত হইতে আসিল।

নক্‌ছেদী ভকতের প্রথম-পক্ষের স্ত্রী খুপড়ির মধ্যে রান্নার কাজ করিতেছিল, সেও আমাকে দেখিয়া খুশী হইল।

তবে মঞ্চী সকল কাজে অগ্রণী। সে আমার জন্য গমের-খড় পাতিয়া পুরু করিয়া বসিবার আসন করিল। একটি ছোট বাটিতে মহুয়ার তৈল আনিয়া আমাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিল।

বলিল—চলুন, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি—ঐ টোলার দক্ষিণে একটা ছোট্ট কুণ্ডী আছে। বেশ জল।

বলিলাম—সে জলে আমি নাইব না মঞ্চী। টোলসুদ্ধ লোক সেই জলে কাপড় কাচে, মুখ ধোয়, স্নান করে, বাসনও মাজে। সে জল বড় খারাপ হবে, তোমরা কি এখানে সেই জলই খাচ্ছ? তা হলে আমি উঠি। ও জল আমি খাব না।

মঞ্চী ভাবনায় পড়িয়া গেল। বোঝা গেল ইহারাও সেই জল ছাড়া অন্য জল পাইবে কোথায় যে খাইবে না। না খাইয়া উপায় কি?

মঞ্চীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট হইল। এই দূষিত জল ইহারা মনের আনন্দে পান করিয়া আসিতেছে, কখনও ভাবে নাই এ-জলে আবার কি থাকিতে পারে, আজ আমি যদি জলের অজুহাতে ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাই, সরলপ্রাণ মেয়েটি মনে বড় আঘাত পাইবে।

মঞ্চীকে বলিলাম—বেশ, ঐ জল খুব করে ফুটিয়ে নাও—তবে খাব। স্নান করা থাক গে।

মঞ্চী বলিল—কেন বাবুজী, আমি আপনাকে এক টিন জল ফুটিয়ে দিচ্ছি তাতেই আপনি স্নান করুন। এখনও তেমন বেলা হয়নি। আমি জল নিয়ে আসছি, বসুন।

মঞ্চী জল আনিয়া রান্নার যোগাড় করিয়া দিল। বলিল—আমার হাতে তো খাবেন না বাবুজী, আপনি নিজেই রাঁধুন তবে?

—কেন খাব না, তুমি যা পার তাই রাঁধ।

—তা হবে না বাবুজী, আপনিই রাঁধুন! একদিনের জন্যে আপনার জাত কেন মারব? আমার পাপ হবে।

—কিছু হবে না। আমি তোমাকে বলছি, এতে কোন দোষ হবে না।

অগত্যা মঞ্চী রাঁধিতে বসিল। রাঁধিবার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়—খানকতক মোটা মোটা হাতে-গড়া রুটি ও বুনো ধুঁধুলের তরকারি। নক্‌ছেদী কোথা হইতে এক ভাঁড় মহিষের দুধ যোগাড করিয়া আনিল।

রাঁধিতে বসিয়া মঞ্চী এতদিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়াছে, সে গল্প করিতে লাগিল। পাহাড়ের অঞ্চলে কলাই কাটিতে গিয়া একটা রামছাগলের বাচ্চা পুষিয়াছিল, সেটা কি করিয়া হারাইয়া গেল সে-গল্পও আমাকে ঠায় বসিয়া শুনিতে হইল।

আমায় বলিল—বাবুজী, কাঁকোয়াড়া-রাজের জমিদারীতে যে গরম জলের কুণ্ড আছে জানেন? আপনি তো কাছাকাছি গিয়েছিলেন, সেখানে যান নি?

আমি বলিলাম, কুণ্ডের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সেখানে যাওয়া আমার ঘটে নাই।

মঞ্চী বলিল—জানেন বাবুজী, আমি সেখানে নাইতে গিয়ে মার খেয়েছিলাম। আমাকে নাইতে দেয় নি।

মঞ্চীর স্বামী বলিল—হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড বাবুজী। ভারী বদমাইস্ সেখানকার পাণ্ডার দল।

বলিলাম—ব্যাপারখানা কি ?

মঞ্চী স্বামীকে বলিল—তুমি বল না বাবুজীকে। বাবুজী কলকাতায় থাকেন, উনি লিখে দেবেন। তখন বদমাইস গুণ্ডারা মজা টের পাবে।

নক্ছেদী বলিল—বাবুজী, ওর মধ্যে সুরয-কুণ্ড খুব ভাল জায়গা। যাত্রীরা সেখানে স্নান করে। আমরা আমলাতলীর পাহাড়ের নীচে কলাই কাটছিলাম, পূর্ণিমার যোগ পড়লো কিনা ? মঞ্চী নাইতে গেল ক্ষেতের কাজ বন্ধ রেখে। আমার সেদিন জ্বর, আমি নাইবো না। বড় বৌ তুলসীও গেল না, ওর তত ধর্ম্মের বাতিক নেই। মঞ্চী সুরয-কুণ্ডে নামতে যাচ্ছে, পাণ্ডারা বলেছে—এই ওখানে কেন নামছিস ? ও বলেছে—জলে নাইবো। তারা বলেছে—তুই কি জাত ? ও বলেছে—গাঙ্গোতা। তখন তারা বলেছে—গাঙ্গোতীনকে আমরা নাইতে দিই নে কুণ্ডের জলে, চলে যা ! ও তো জানেন তেজী মেয়ে। ও বলেছে—এ তো পাহাড়ী ঝরনা, যে-সে নাইতে পারে। ঐ তো কত লোক নাইছে। ওরা কি সকলে ব্রাহ্মণ আর ছত্রী ? বলে যেমন নামতে গিয়েছে, দুজন ছুটে এসে ওকে টেনে হিঁচড়ে মারতে মারতে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। ও কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

—তার পর কি হল ?

—কি হবে বাবুজী ? আমরা গরীব গাঙ্গোতা কাটুনি মজুর। আমাদের ফরিয়াদ কে শুনবে। আমি বলি, কাঁদিস্ নে, তোকে আমি মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে নাইয়ে আনবো।

মঞ্চী বলিল—বাবুজী, আপনি একটু লিখে দেবেন তো কথাটা। আপনাদের বাঙালী বাবুদের—কলমের খুব জোর। পাজীগুলো জব্দ হয়ে যাবে।

উৎসাহের সহিত বলিলাম—নিশ্চয়ই লিখবো।

তাহার পর মঞ্চী পরম যত্নে আমায় খাওয়াইল। বড় ভাল লাগিল তাহার আগ্রহ ও সেবাযত্ন।

বিদায় লইবার সময় তাহাকে বার-বার বলিলাম—সামনের বৈশাখ মাসে যব গম কাটুনির সময় তারা যেন নিশ্চয়ই আমাদের লবটুলিয়া-বইহারে যায়।

মঞ্চী বলিল—ঠিক যাব বাবুজী। সে কি আপনাকে বলতে হবে !

মঞ্চীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় মনে হইল, আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি যেন সে। এই বনভূমির সে যেন বনলক্ষ্মী, পরিপূর্ণযৌবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকাস্বভাবা।

বাঙালীর কলমের উপর অসীম নির্ভরশীলা এই বন্য মেয়েটির নিকট সেদিন যে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহা পালন করিলাম—জানি না ইহাতে এতকাল পরে তাহার কি উপকার হইবে। এতদিন সে কোথায়, কি ভাবে আছে, বাঁচিয়া আছে কি না তাহাই বা কে জানে !

২

শ্রাবণ মাস। নবীন মেঘে ঢল নামিয়াছে অনেক দিন, নাঢ়া ও লবটুলিয়া-বইহারে কিংবা গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটতলায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাও, শুধুই দেখ সবুজের সমুদ্রের মত নবীন কচি কাশবন।

একদিন রাজা দোবরু পান্নার চিঠি পাইয়া শ্রাবণ-পূর্ণিমায় তাঁর ওখানে ঝুলনোৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলাম। রাজু ও মটুকনাথ ছাড়িল না, আমার সঙ্গে তাহারাও চলিল। হাঁটিয়া যাইবে বলিয়া উহারা রওনা হইল আমার আগেই।

বেলা দেড়টার সময় ডোঙায় মিছি নদী পার হইলাম। দলের সকলের পার হইতে আড়াইটা বাজিয়া গেল। দলটিকে পিছনে ফেলিয়া তখন ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ঘন মেঘ করিয়া আসিল পশ্চিমে। তার পরেই নামিল ঝম্ ঝম্ বর্ষা।

কি অপূর্ব্ব বর্ষার দৃশ্য দেখিলাম সেই অরণ্য-প্রান্তরে! মেঘে মেঘে দিগন্তের শৈলমালা নীল, থম্‌কানো কালো বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে, কচিৎ পথের পাশের শাল কি কেঁদ শাখায় ময়ূর পেখম মেলিয়া নৃত্যপরায়ণ, পাহাড়ী ঝরনার জলে গ্রাম্য বালক-বালিকা মহা উৎসাহে শাল-কাটির ও বন্য বাঁশের ঘুনি পাতিয়া কুচো মাছ ধরিতেছে, ধূসর শিলাখণ্ড ভিজিয়া কালো দেখাইতেছে, তাহার উপর মহিষের রাখাল কাঁচা শালপাতার লম্বা বিড়ি টানিতেছে। শান্তস্তব্ধ দেশ—অরণ্যের পর অরণ্য, প্রান্তরের পর প্রান্তর, শুধুই ঝরনা, পাহাড়ী গ্রাম, মরুম-ছড়ানো রাঙা মাটির জমি, কচিৎ কোথাও পুষ্পিত কদম্ব বা পিয়াল বৃক্ষ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি রাজা দোবরু পান্নার রাজধানীতে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেবারকার সেই খড়ের ঘরখানা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য চমৎকার করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া রাখা হইয়াছে। দেওয়ালে গিরিমাটির রং, পদ্ম গাছ ও ময়ূর আঁকা, শাল কাঠের খুঁটির গায়ে লতা ও ফুল জড়ানো। আমার বিছানা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, আমি ঘোড়ায় আগেই পৌঁছিয়াছিলাম—কিন্তু তাহাতে কোন অসুবিধা হইল না। ঘরে নূতন মাদুর পাতাই ছিল, গোটা দুই ফর্সা তাকিয়াও দিয়া গেল।

একটু পরে ভানুমতী একখানা বড় পিতলের সরাতে ফলমূল-কাটা ও একবাটি জ্বাল-দেওয়া দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার পিছু পিছু আসিল একখানা কাঁচা শালপাতায় গোটা পান, গোটা সুপারি ও অন্যান্য পানের মসলা সাজাইয়া লইয়া আর একটি তাহার বয়সী মেয়ে।

ভানুমতীর পরনে একখানা জাম-রঙের খাটো শাড়ী হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, গলায় সবুজ ও লাল হিংলাজের মালা, খোঁপায় জলজ স্পাইডার লিলি গোঁজা। আরও স্বাস্থ্যবতী ও লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে ভানুমতী—তাহার নিটোল দেহে যৌবনের উচ্ছলিত লাবণ্যের বান ডাকিয়াছে, চোখের ভাবে কিন্তু যে সরলা বালিকা দেখিয়াছিলাম, সেই সরলা বালিকাই আছে।

বলিলাম—কি ভানুমতী, ভাল আছ?

ভানুমতী নমস্কার করিতে জানে না—আমার কথার উত্তরে সরল হাসি হাসিয়া বলিল—

আপনি, বাবুজী ?

—আমি ভাল আছি।

—কিছু খান। সারাদিন ঘোড়ায় এসে খিদে পেয়েছে খুব।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আমার সামনে মাটির মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল ও পিতলের থালাখানা হইতে দু-খানা পেঁপের টুকরা আমার হাতে তুলিয়া দিল।

আমার ভাল লাগিল—ইহার নিঃসঙ্কোচ বন্ধুত্ব। বাংলা দেশের মানুষের কাছে ইহা কি অদ্ভুত ধরনের, অপ্রত্যাশিত ধরনের নূতন, সুন্দর, মধুর। কোনো বাঙালী কুমারী অনাত্মীয়া ষোড়শী এমন ব্যবহার করিত ? মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের মন কোথায় যেন গুটাইয়া পাকাইয়া জড়সড় হইয়া আছে সর্ব্বদা। তাহাদের সম্বন্ধে না-পারি প্রাণ খুলিয়া ভাবিতে, না-পারি তাহাদের সঙ্গে মন খুলিয়া মিশিতে।

আরও দেখিয়াছি, এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালবাসাও বড়।

কিন্তু ভানুমতীর কাছে বসিয়া হাতে তুলিয়া দিয়া খাওয়ানোর তুলনা হয় না! জীবনে সেদিন সর্ব্বপ্রথম আমি অনুভব করিলাম নারীর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের মাধুর্য্য। সে যখন স্নেহ করে, তখন সে কি স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেয় পৃথিবীতে!

ভানুমতীর মধ্যে যে আদিম নারী আছে, সভ্য সমাজে সে-নারীর আত্মা সংস্কারের ও বন্ধনের চাপে মূর্চ্ছিত।

সে-বার যে রকম ব্যবহার পাইয়াছিলাম, এবারকার ব্যবহার তার চেয়েও আপন, ভানুমতী বুঝিতে পারিয়াছে এ বাঙালী বাবু তাদের পরিবারের বন্ধু, তাদেরই শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার লোকদের মধ্যে গণ্য—সুতরাং যে ব্যবহার তাহার নিকট পাইলাম তাহা নিজের স্নেহময়ী ভগ্নীর মতই।

অনেককাল হইয়া গিয়াছে—কিন্তু ভানুমতীর এই সুন্দর প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা আমার স্মৃতিপটে তেমনি সমুজ্জ্বল—বন্য অসভ্যতার এই দানের নিকট সভ্য সমাজের বহু সম্পদ্ আমার মনে নিষ্প্রভ হইয়া আছে।

রাজা দোবরু উৎসবের অন্য আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, এইবার আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন।

আমি বলিলাম—ঝুলন কি আপনাদের এখানে বরাবর হয় ?

রাজা দোবরু বলিলেন—আমাদের বংশে বহুদিনের উৎসব এইটি। এ সময়ে অনেক দূর থেকে আত্মীয়স্বজন আসে ঝুলনে নাচতে। আড়াই মণ চাল রান্না হবে কাল।

মটুকনাথ আসিয়াছে পণ্ডিত-বিদায়ের লোভে—ভাবিয়াছিল কত বড় রাজবাড়ী, কি

কাণ্ডই আসিয়া দেখিবে! তাহার মুখের ভাবে মনে হইল সে বেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। এ রাজবাড়ী অপেক্ষা টোলগৃহ যে অনেক ভাল।

রাজু তো মনের কথা চাপিতে না পারিয়া স্পষ্টই বলিল—রাজা কোথায় হুজুর, এ তো এক সাঁওতাল সর্দ্দার! আমার যে ক'টা মহিষ আছে, রাজার শুনলাম তাও নেই, হুজুর!

সে ইহারই মধ্যে রাজার পার্থিব সম্পদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছে—গরু, মহিষ এদেশে সম্পদের বড় মাপকাঠি। যার যত মহিষ, সে তত বড়লোক।

গভীর-রাত্রে চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না বনের বড় বড় গাছপালার আড়ালে উঠিয়া যখন সেই বন্য গ্রামের গৃহস্থবাড়ীর প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারের জাল বুনিয়াছে, তখন শুনিলাম রাজবাড়ীতে বহু নারীকণ্ঠের সম্মিলিত এক অদ্ভুত ধরনের গান। কাল ঝুলন পূর্ণিমা, রাজবাড়ীতে নবাগত কুটুম্বিনী ও রাজকন্যার সহচরীগণ কল্যকার নাচগানের মহলা দিতেছে। সারারাত ধরিয়া তাহাদের গান ও মাদল বাজনা থামিল না।

শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, ঘুমের মধ্যেও ওদের সেই গান কতবার যেন শুনিতে পাইতেছিলাম।

৩

কিন্তু পরদিন ঝুলনোৎসব দেখিয়া মটুকনাথ, রাজু, এমন কি মুনেশ্বর সিং পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি ভানুমতীর বয়সী কুমারী মেয়েই অন্ততঃ ত্রিশজন চারি পাশের বহু টোলা ও পাহাড়ী বস্তি হইতে উৎসব উপলক্ষে আসিয়া জুটিয়াছে। একটি ভাল প্রথা দেখিলাম, এত নাচগানের মধ্যে ইহাদের কেহই মহুয়ার মদ খায় নাই। রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হাসিয়া গর্ব্বের সুরে বলিলেন—আমাদের বংশে মেয়েদের মধ্যে ও নিয়ম নেই। তা ছাড়া, আমি হুকুম না দিলে, কারো সাধ্যি নেই আমার ছেলেমেয়ের সামনে মদ খায়।

মটুকনাথ দুপুর বেলা আমায় চুপি চুপি বলিল—রাজা দেখছি আমার চেয়ে গরীব। রাঁধবার জন্যে দিয়েছে মোটা রাঙা চাল, আর পাকা চালকুমড়ো, আর বুনো ধুঁধুল। এতগুলো লোকের জন্যে কি রাঁধি বলুন তো?

সারা সকাল ভানুমতীর দেখা পাই নাই—খাইতে বসিয়াছি, সে এক বাটি দুধ আনিয়া আমার সামনে বসিল।

বলিলাম—তোমাদের গান কাল রাত্রে বেশ লেগেছিল।

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আমাদের গান বুঝতে পারেন?

বলিলাম—কেন পারব না? এতদিন তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমাদের গান বুঝব না কেন?

—আজ ও-বেলা আপনি ঝুলন দেখতে যাবেন তো ?

—সে জন্যেই তো এসেছি। কতদূর যেতে হবে ?

ভানুমতী ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণীর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আপনি তো গিয়েছেন ও পাহাড়ে। আমাদের সেই মন্দির দেখেন নি ?

এই সময় ভানুমতীর বয়সী একদল কিশোরী মেয়ে আমার খাবার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বাঙালী বাবুর ভোজন পরম কৌতুহলের সহিত দেখিতে এবং পরস্পরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

ভানুমতী বলিল—যা সব এখান থেকে, এখানে কি ?

একটি মেয়ের সাহস অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশী, সে একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—বাবুজীকে ঝুলনের দিন নুন করমচা খেতে দিস্ নি তো ?

তাহার এ কথায় পিছনের সব মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া এ উহার গায়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ভানুমতীকে বলিলাম—ওরা হাসছে কেন ?

ভানুমতী সলজ্জ মুখে বলিল—ওদের জিজ্ঞেস করুন। আমি কি জানি।

ইতিমধ্যে একটি মেয়ে বড় একটা পাকা কামরাঙা লঙ্কা আনিয়া আমার পাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—খান বাবুজী একটু লঙ্কার আচার। ভানুমতী শুধু আপনাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, তা তো হবে না। আমরা একটু ঝাল খাওয়াই !

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। এতগুলি তরুণীর মুখের সরল হাসিতে দিনমানেই যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একদল তরুণ-তরুণী পাহাড়ের দিকে রওনা হইল—তাহাদের পিছু পিছু আমরাও গেলাম—সে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা। পূর্ব্বদিকে নাওয়াদা লছমীপুরার সীমানায় ধন্‌ঝরি পাহাড়, যে পাহাড়ের নীচে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে, সে পাহাড়ের বনশীর্ষে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, এক দিকে নীচু উপত্যকা, বনে বনে সবুজ, অন্যদিকে ধন্‌ঝরি শৈলমালা। মাইল-খানেক হাঁটিয়া আমরা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া পৌছিলাম। কিছুদূর উঠিতে একটা সমতল স্থান পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছ—গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় জড়ানো। রাজা দোবরু বলিলেন—এই গাছ অনেক কালের পুরোনো—আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি এই গাছের তলায় ঝুলনের সময় মেয়েরা নাচে।

আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল—পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা।···

কত রাত পর্য্যন্ত সমান ভাবে নাচ ও গান চলিল—মাঝে মাঝে দলটি একটু বিশ্রাম

করিয়া লয় আবার আরম্ভ করে—মাদলের বোল, জ্যোৎস্না, বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমি, সুঠাম শ্যামা নৃত্যপরায়ণা তরুণীর দল—সব মিলিয়া কোন বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত তা সুশ্রী—একটি মধুর সঙ্গীতের মত তার আকুল আবেদন। মনে পড়ে দূর ইতিহাসের সোলাঙ্কি-রাজকন্যা ও তার সহচরীগণের এমনি ঝুলন নাচ ও গানের কথা, মনে পড়ে রাখাল বালক বাপ্পাদিত্যকে খেলার ছলে মালাদানের কথা।

আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ

ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ্

তার চেয়েও বহু দূরের অতীতে, প্রাচীন প্রাচীন যুগের প্রস্তর-যুগের ভারতের রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাসের সকল ঘটনা যেন আবার সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম—আদিম ভারতের সংস্কৃত যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে সরলা পর্ব্বতবালা ভানুমতী ও তাহার সখীগণের নৃত্যে—হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এমনি কত বন, কত শৈলমালা, এমনিতর কত জ্যোৎস্নারাত্রি, ভানুমতীর মত কত বালিকার নৃত্যচঞ্চল চরণেব ছন্দে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মুখের সে হাসি আজও মরে নাই—এই সব গুপ্ত অরণ্য ও শৈলমালার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তারা তাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের রক্তে আজও আনন্দ ও উৎসাহের বাণী পাঠাইয়া দিতেছে।

গভীর রাত্রি। চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে পশ্চিম দিকের দূর বনের পিছনে। আমরা সবাই পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম। সুখের বিষয় আজ আকাশে মেঘ নাই, কিন্তু আর্দ্র বাতাস শেষরাত্রে অত্যন্ত শীতল হইয়া উঠিয়াছে। অত রাত্রেও আমি খাইতে বসিলে ভানুমতী দুধ ও পেঁড়া আনিল।

আমি বলিলাম—বড় চমৎকার নাচ দেখলাম তোমাদের।

সে সলজ্জ হাসিমুখে বলিল—আপনার কি আর ভাল লাগবে বাবুজী—আপনাদের কলকাতায় ওসব কি ত্থাখে?

পরদিন ভানুমতী ও তাহার প্রপিতামহ রাজা দোবরু আমায় কিছুতেই আসিতে দিবে না। অথচ আমার কাজ ফেলিয়া থাকিলে চলে না, বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় ভানুমতী বলিল—বাবুজী, কল্‌কাতা থেকে আমার জন্যে একখানা আয়না এনে দেবেন? আমার আয়না একখানা ছিল, অনেক দিন ভেঙে গিয়েছে।

ষোল বছর বয়সের সুশ্রী নবযৌবনা কিশোরীর আয়নার অভাব! তবে আয়নার সৃষ্টি হইয়াছে কাদের জন্যে? এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণিয়া হইতে একখানা ভাল আয়না আনাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

১

কয়েক মাস পরে। ফাল্গুন মাসের প্রথম। লবটুলিয়া হইতে কাছারি ফিরিতেছি, জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীর ধারে বাংলা কথাবার্ত্তায় ও হাসির শব্দে ঘোড়া থামাইলাম। যত কাছে যাই, ততই আশ্চর্য্য হই। মেয়েদের গলাও শোনা যাইতেছে—ব্যাপার কি? জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢুকাইয়া কুণ্ডীর ধারে লইয়া গিয়া দেখি বনঝাউয়ের ঝোপের ধারে শতরঞ্চি পাতিয়া আট-দশটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, পাঁচ-ছয়টি মেয়ে কাছেই রান্না করিতেছে, ছয়-সাতটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কোথা হইতে এতগুলি মেয়ে-পুরুষ এই ঘোর জঙ্গলে ছেলেপুলে লইয়া পিকনিক করিতে আসিল বুঝিতে না পা পারিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় সকলের চোখ আমার দিকে পড়িল—একজন বাংলায় বলিল—এ ছাতুটা আবার কোথা থেকে এসে জুটল এ জঙ্গলে? আমব্রেলু?

আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাদের কাছে যাইতে যাইতে বলিলাম—আপনারা বাঙালী দেখছি—এখানে কোথা থেকে এলেন?

তারা খুব আশ্চর্য্য হইল, অপ্রতিভও হইল। বলিল—ও, মশায় বাঙালী? হেঁ-হেঁ কিছু মনে করবেন না, আমরা ভেবেছি—হেঁ-হেঁ—

বলিলাম—না না, মনে করবার আছে কি! তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন বিশেষ মেয়েদের নিয়ে—

আলাপ জমিয়া গেল। এই দলের মধ্যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রায় বাহাদুর। বাকী সকলে তাঁর ছেলে, ভাইপো, ভাইঝি, মেয়ে, নাতনী, জামাই, জামাইয়ের বন্ধু—ইত্যাদি। রায় বাহাদুর কলিকাতায় থাকিতে একখানি বই পড়িয়া জানিতে পারেন, পূর্ণিয়া জেলায় খুব শিকার মেলে, তাই শিকার করিবার কোন সুবিধা হয় কিনা দেখিবার জন্য পূর্ণিয়ায় তাঁর ভাই মুন্সেফ, সেখানেই আসিয়াছিলেন। আজ সকালে সেখান হইতে ট্রেনে চাপিয়া বেলা দশটার সময় কাটারিয়া পৌছেন। সেখানে হইতে নৌকা করিয়া কুশী নদী বাহিয়া এখানে পিক্‌নিক করিতে আসিয়াছেন—কারণ সকলের মুখেই নাকি শুনিয়াছেন লবটুলিয়া বোমাইবুরু ও ফুল্‌কিয়া বইহারের জঙ্গল না দেখিয়া গেলে জঙ্গল দেখাই হইল না। পিকনিক্ সারিয়াই চার মাইল হাঁটিয়া মোহনপুরা জঙ্গলের নীচে কুশী নদীতে গিয়া নৌকা ধরিবেন—ধরিয়া আজ রাত্রেই কাটারিয়া ফিরিয়া যাইবেন।

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম। সম্বলের মধ্যে দেখিলাম ইহাদের সঙ্গে আছে একটা দো-নলা শট-গান্—ইহাই ভরসা করিয়া এ ভীষণ জঙ্গলে ইহারা ছেলেমেয়ে লইয়া পিকনিক্ করিতে আসিয়াছে! অবশ্য, সাহস আছে অস্বীকার করিব না, কিন্তু অভিজ্ঞ রায় বাহাদুরের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের নিকট দিয়া এদেশের জংলী

লোকেরাই সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাইতে সাহস করে না বন্য মহিষের ভয়ে। বাঘ বার হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। বুনো শূয়োর আর সাপের তো কথাই নাই। ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্‌ করিতে আসিবার জায়গা নয় এটা।

রায় বাহাদুর আমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। বসিতে হইবে, চা খাইতে হইবে। আমি এ জঙ্গলে কি করি, কি বৃত্তান্ত। আমি কি কাঠের ব্যবসা করি? নিজের ইতিহাস বলিবার পরে তাঁহাদিগকে সবসুদ্ধ কাছারিতে রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা রাজী হইলেন না। রাত্রি দশটার ট্রেনে কাটারিয়াতে উঠিয়া পূর্ণিয়া আজই রাত বারোটায় পৌছিতে হইবে। না ফিরিলে বাড়ীতে সকলে ভাবিবে, কাজেই থাকিতে অপারগ—ইত্যাদি।

জঙ্গলের মধ্যে ইহারা এত দূর কেন পিক্‌নিক করিতে আসিয়াছে তাহা বুঝিলাম না। লবটুলিয়া বইহারের উন্মুক্ত প্রান্তর বনানী ও দূরের পাহাড়রাজির শোভা, সূর্য্যাস্তের রং, পাখীর ডাক, দশ হাত দূরে বনের মধ্যে ঝোপের মাথায় মাথায় এই বসন্তকালে কত চমৎকার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—এসবের দিকে ইহাদের নজর নাই দেখিলাম। ইহারা কেবল চীৎকার করিতেছে, গান গাহিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, খাওয়ার তরিবৎ কিসে হয়, সে-ব্যবস্থা করিতেছে। মেয়েদের মধ্যে দুটি কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বাকী দু-তিনটি স্কুলে পড়ে। ছেলেগুলির মধ্যে একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বাকীগুলি বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে দৈবাৎ যদি আসিয়াই পড়িয়াছে, দেখিবার চোখ নাই আদৌ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা আসিয়াছিল শিকার করিতে—খরগোস, পাখী, হরিণ—পথের ধারে যেন ইহাদের বন্দুকের গুলি খাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

যে মেয়েগুলি আসিয়াছে, এমন কল্পনার-লেশ-পরিশূন্য মেয়ে যদি কখনও দেখিয়াছি। তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে, বনের ধার হইতে রান্নার জন্য কাঠ কুড়াইয়া আনিতেছে, মুখে বকুনির বিরাম নাই—কিন্তু একবার কেহ চারিধারে চাহিয়া দেখিল না যে কোথায় বসিয়া তাহারা খিচুড়ি রাঁধিতেছে, কোন্ নিবিড় সৌন্দর্য্যভরা বনানীপ্রান্তে!

একটি মেয়ে বলিল—'টিনকাটার' ঢুকবার বড্ড সুবিধে এখানে, না? কত পাথরের

আর একটি মেয়ে বলিল—উঃ কি জায়গা! ভাল চাল কোথাও পাবার জো নেই—কাল সারা টাউন খুঁজে বেড়িয়েছি—কি বিশ্রী মোটা চাল—তোমরা আবার বলছিলে পোলাও হবে!

ইহারা কি জানে, যেখানে বসিয়া তারা রান্না করিতেছে, তার দশ-বিশ হাতের মধ্যে রাত্রের জ্যোৎস্নায় পরীরা খেলা করিয়া বেড়ায়?

ইহারা সিনেমার গল্প শুরু করিয়াছে। পূর্ণিয়ায় কালও রাত্রে তাহারা সিনেমা দেখিয়াছে, তা নাকি যৎপরোনাস্তি বাজে। এই সব গল্প। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সিনেমার

সঙ্গে তাহার তুলনা করিতেছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, কথা মিথ্যা নয় বৈকাল পাঁচটার সময় ইহারা চলিয়া গেল।

যাইবার সময় কতকগুলি খালি জমাট দুধের ও জ্যামের টিন ফেলিয়া রাখিয়া গেল। লবটুলিয়া জঙ্গলের গাছপালার তলায় সেগুলি আমার কাছে কি খাপছাড়াই দেখাইতেছিল!

২

বসন্তের শেষ হইতেই এবার লবটুলিয়া বইহারের গম পাকিয়া উঠিল। আমাদের মহালে রাই সরিষার চাষ ছিল গত বৎসর খুব বেশী। এবার অনেক জমিতে গমের আবাদ, সুতরাং এবছর এখানে কাটুনি মেলার সময় পড়িল বৈশাখের প্রথমেই।

কাটুনি মজুরদের মাথায় যেন টনক আছে, তাহাদের দল এবার শীতের শেষে আসে নাই, এ সময়ে দলে দলে আসিয়া জঙ্গলের ধারে, মাঠের মধ্যে সর্ব্বত্র খুপড়ি বাঁধিয়া বাস করিতে শুরু করিয়াছে। দুই-তিন হাজার বিঘা জমির ফসল কাটা হইবে, সুতরাং মজুরও আসিয়াছে প্রায় তিন-চার হাজারের কম নয়। আরও শুনিলাম আসিতেছে।

আমি সকাল হইলেই ঘোড়ায় বাহির হই, সন্ধ্যায় ঘোড়ার পিঠ হইতে নামি। কত নূতন ধরনের লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কত বদমাইস, গুণ্ডা, চোর, রোগগ্রস্ত—সকলের উপর নজর না রাখিলে এসব পুলিসবিহীন স্থানে একটা দুর্ঘটনা যখন-তখন ঘটিতে পারে।

দু-একটি ঘটনা বলি।

একদিন দেখি এক জায়গায় দুটি বালক ও একটি বালিকা রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে।

ঘোড়া হইতে নামিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে তোমাদের?

উত্তরে যাহা বলিল উহার মর্ম্ম এইরূপ: উহাদের বাড়ী আমাদের মহালে নয়, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার গ্রামে। উহারা সহোদর ভাই-বোন, এখানে কাটুনি মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। আজই আসিয়া পৌছিয়াছে, এবং কোথায় নাকি লাঠি ও দড়ির ফাঁসের জুয়াখেলা হইতেছিল, বড় ছেলেটি সেখানে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। একটা লাঠির যে-দিকটা মাটিতে ঠেকিয়া আছে সেই প্রান্তটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়, যদি দড়ি খুলিতে খুলিতে লাঠির আগায় ফাঁস জড়াইয়া যায়, তবে খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়।

বড় ভাইয়ের কাছে ছিল দশ আনা পয়সা, সে একবারও লাঠিতে ফাঁস বাধাইতে পারে নাই, সব পয়সা হারিয়া ছোট ভাইয়ের আট আনা ও পরিশেষে ছোট বোনের চার আনা

পয়সা পর্য্যন্ত লইয়া বাজি ধরিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে! এখন উহাদের খাইবার পয়সা নাই, কিছু কেনা বা দেখাশোনা তো দূরের কথা।

আমি তাহাদের কাঁদিতে বারণ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া জুয়াখেলার অকুস্থানের দিকে চলিলাম। প্রথমে তাহারা জায়গাই স্থির করিতে পারে না, পরে একটা হরীতকী গাছ দেখাইয়া বলিল—এরই তলায় খেলা হচ্ছিল। জনপ্রাণী নাই সেখানে। কাছারির রূপসিং জমাদারের ভাই সঙ্গে ছিল, সে বলিল—জুয়াচোরেরা কি এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকে হুজুর? লম্বা দিয়েছে কোন্ দিকে।

বিকালের দিকে জুয়াড়ী ধরা পড়িল। সে মাইল তিন দূরে একটি বস্তিতে জুয়া খেলিতেছিল, আমার সিপাহীরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে আমার নিকট হাজির করিল। ছেলেমেয়েগুলিও দেখিয়াই চিনিল।

লোকটা প্রথমে পয়সা ফেরত দিতে চায় না। বলে, সে তো জোর করিয়া কাড়িয়া লয় নাই, উহারা স্বেচ্ছায় খেলিয়া পয়সা হারিয়াছে, ইহাতে তাহার দোষ কি? অবশেষে তাহাকে ছেলেমেয়েদের সব পয়সা তো ফেরত দিতেই হইল—আমি তাহাকে পুলিসে দিবার আদেশ দিলাম।

সে হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল। বলিলাম—তোমার বাড়ী কোথায়?

—বালিয়া জেলা, বাবুজী।

—এ রকম করে লোককে ঠকাও কেন? কত পয়সা ঠকিয়েছ লোকজনের?

—গরীব লোক, হুজুর! আমায় ছেড়ে দিন এবার। তিন দিনে মোটে দু-টাকা তিন আনা রোজগার—

—তিন দিনে খুব বেশী রোজগার হয়েছে মজুরদের তুলনায়।

—হুজুর, সারা বছরে এ-রকম রোজগার ক'বার হয়? বছরে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয়।

লোকটাকে সেদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম—কিন্তু আমার মহাল ছাড়িয়া সেদিনই চলিয়া যাইবার কড়ারে। আর তাকে কোনদিন কেউ আমাদের মহালের সীমানার মধ্যে দেখেও নাই।

এবার মঞ্চীকে কাটুনী মজুরদের মধ্যে না দেখিয়া উদ্বেগ ও বিস্ময় দুই-ই অনুভব করিলাম। সে বারবার বলিয়াছিল গম কাটিবার সময়ে নিশ্চয়ই আমাদের মহালে আসিবে। ফসল কাটার মেলা আসিল, চলিয়াও গেল—কেন যে সে আসিল না, কিছুই বুঝিলাম না।

অন্যান্য মজুরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান মিলিল না। মনে ভাবিলাম, এত বিস্তীর্ণ ফসলের মহাল কাছাকাছির মধ্যে আর কোথাও নাই, এক কুশীনদীর দক্ষিণে ইসমাইলপুরের দ্বিয়ারা মহাল ছাড়া। কিন্তু সেখানে কেন সে যাইবে, অত দূরে, যখন মজুরি উভয় স্থানেই একই।

অবশেষে ফসলের মেলার শেষ দিকে জনৈক গাঙ্গোতা মজুরের মুখে মঞ্চীর সংবাদ পাওয়া

গেল। সে মঞ্চীকে ও তাহার স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎকে চেনে। একসঙ্গে বহু জায়গায় কাজ করিয়াছে নাকি। তাহারই মুখে শুনিলাম গত ফাল্গুন মাসে সে উহাদের আকবরপুর গবর্ণমেণ্ট খাসমহলে ফসল কাটিতে দেখিয়াছে। তাহার পর তাহারা যে কোথায় গেল সে জানে না।

ফসলের মেলা শেষ হইয়া গেল জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, এমন সময় একদিন সদর কাছারির প্রাঙ্গণে নক্‌ছেদী ভকৎকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। নক্‌ছেদী আমার পা জড়াইয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—কি ব্যাপার? তোমরা এবার ফসলের সময় আস নি কেন? মঞ্চী ভাল আছে তো? কোথায় সে?

উত্তরে নক্‌ছেদী যাহা বলিল তাহার মোট মর্ম এই, মঞ্চী কোথায় তাহা সে জানে না। খাসমহলে কাজ করিবার সময়েই মঞ্চী তাহাদের ফেলিয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজ করিয়াও তাহার পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম বৃদ্ধ নক্‌ছেদী ভকতের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নাই, যা কিছু ভাবনা সবই সেই বন্য মেয়েটির জন্য। কোথায় সে গেল, কে তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল, কি অবস্থায় কোথায় বা সে আছে। সস্তায় বিলাসদ্রব্যের প্রতি তাহার যে রকম আসক্তি লক্ষ্য করিয়াছি সে-সবের লোভ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়াও কষ্টকর নয়। তাহাই ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তার ছেলে কোথায়?

—সে নেই। বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে মাঘ মাসে।

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম শুনিয়া। বেচারী পুত্রশোকেই উদাসী হইয়া, যেদিকে দু-চোখ যায়, চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—তুলসী কোথায়?

—সে এখানেই এসেছে। আমার সঙ্গেই আছে। আমায় কিছু জমি দিন হুজুর। নইলে আমরা বুড়োবুড়ী, ফসল কেটে আর চলে না। মঞ্চী ছিল, তার জোরে আমরা বেড়াতাম। সে আমার হাত-পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার পর নক্‌ছেদীর খুপড়িতে গিয়া দেখিলাম তুলসী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া চীনার দানা ছাড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেখিলাম মঞ্চী চলিয়া যাওয়াতে সেও যথেষ্ট দুঃখিত। বলিল—হুজুর, সব ঐ বুড়োর দোষ। গোরমিণ্টের লোক মাঠে সব টিকে দিতে এল, বুড়ো তাকে চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে তাড়ালে। কাউকে টিকে নিতে দিল না। বললে, টিকে নিলে বসন্ত হবে। হুজুর, তিন দিন গেল না, মঞ্চীর ছেলেটার বসন্ত হল, মারাও গেল। তার শোকে সে পাগলের মত হয়ে গেল—খায় না, দায় না, শুধু কাঁদে।

—তার পর?

—তার পর হুজুর, খাসমহল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে। বললে—বসন্তে তোমাদের লোক মারা গিয়াছে, এখানে থাকতে দেবো না! এক ছোকরা রাজপুত মঞ্চীর দিকে নজর

দিত। যেদিন আমরা খাসমহল থেকে চলে এলাম, সেই রাত্রেই মঞ্চী নিরুদ্দেশ হল। আমি সেদিন সকালে ঐ ছোকরাটাকে খুপড়ির কাছে ঘুরতে দেখেছি। ঠিক তার কাজ, হুজুর! ইদানীং মঞ্চী বড় কলকাতা দেখব, কলকাতা দেখব, করত। তখনই জানি একটা কিছু ঘটবে।

আমারও মনে পড়িল মঞ্চী আর-বছর কলিকাতা দেখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল বটে। আশ্চর্য্য নয়, ধূর্ত্ত রাজপুত যুবক সরলা বন্যমেয়েটিকে কলিকাতা দেখাইবার লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি জানি এ অবস্থায় এদেশের মেয়েদের শেষ পরিণতি হয় আসামের চা-বাগানে কুলীগিরিতে। মঞ্চীর অদৃষ্টে কি শেষকালে নির্ব্বান্ধব আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দাসত্ব ও নির্ব্বাসন লেখা আছে?

বৃদ্ধ নক্‌ছেদীর উপর খুব রাগ হইল। এই লোকটা যত নষ্টের মূল। বৃদ্ধ বয়সে মঞ্চীকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল কেন? দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্টের টিকাদারকে ঘুষ দিয়া বিদায় করিয়াছিল কেন? যদি উহাকে জমি দিই, সে ওর জন্য নয়, উহার প্রৌঢ়া স্ত্রী তুলসী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়াই দিব।

দিলামও তাই। নাঢ়া বইহারে শীঘ্র প্রজা বসাইতে হইবে, সদর আপিসের হুকুম আসিয়াছে, প্রথম প্রজা বসাইলাম নক্‌ছেদীকে।

নাঢ়া বইহারে ঘোর জঙ্গল। মাত্র দু-চার ঘর প্রজা সামান্য জঙ্গল কাটিয়া খুপড়ি বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। নক্‌ছেদী প্রথমেই জঙ্গল দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, বলিল—হুজুর দিনমানেই বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে ওখানে—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি—

তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলাম, তার পছন্দ না হয়, সে অন্যত্র দেখুক।

নিরুপায় হইয়া নক্‌ছেদী নাঢ়া বইহারের জঙ্গলেই জমি লইল।

৩

সে এখানে আসা পর্য্যন্ত আমি কখনও তাহার খুপড়িতে যাই নাই। তবে সেদিন সন্ধ্যার সময় নাঢ়া বইহারের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া আসিতে দেখি ঘন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—নিকটে কাশের দুটি ছোট খুপড়ি। একটার ভিতর হইতে আলো বাহির হইতেছে।

সেইটাই যে নক্‌ছেদীর তা আমি জানিতাম না, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুপড়ির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিলাম সে তুলসী।

—তোমরা এখানে জমি নিয়েছ? নক্‌ছেদী কোথায়?

তুলসী আমায় দেখিয়া থতমত খাইয়া গিয়াছে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে গমের ভূষি-ভরা

একটা চটের গদি পাতিয়া দিয়া বলিল—নামুন বাবুজী—বসুন একটু। ও গিয়েছে লবটুলিয়া, তেল নুন কিনে আনতে দোকানে। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

—তুমি একা এই ঘন-বনের মধ্যে আছ?

—ও-সব সয়ে গিয়েছে, বাবুজী। ভয়ডর করলে কি আমাদের গরীবদের চলে? একা তো থাকতে হত না—কিন্তু অদৃষ্ট যে খারাপ। মঞ্চী যত দিন ছিল, জলে জঙ্গলে কোথাও ভয় ছিল না। কি সাহস, কি তেজ ছিল তার বাবুজী!

তুলসী তাহার তরুণী সপত্নীকে ভালবাসিত। তুলসী ইহাও জানে এই বাঙালী বাবু মঞ্চীর কথা শুনিতে পাইলে খুশী হইবে।

তুলসীর মেয়ে সুরতিয়া বলিল—বাবুজী, একটা নীলগাইয়ের বাচ্চা ধরে রেখেছি, দেখবেন? সেদিন আমাদের খুপড়ির পেছনের জঙ্গলে এসে বিকেলবেলা খস্‌খস্ করছিল—আমি আর ছনিয়া গিয়ে ধরে ফেলেছি। বড় ভাল বাচ্চা।

বলিলাম—কি খায় রে?

সুরতিয়া বলিল—শুধু চীনার দানার ভুষি আর গাছের কচি পাতা। আমি কচি কেঁদ পাতা তুলে এনে দিই।

তুলসী বলিল—দেখা না বাবুজীকে—

সুরতিয়া ক্ষিপ্রপদে হরিণীর মত ছুটিয়া খুপড়ির পিছন দিকে অদৃশ্য হইল। একটু পরে তাহার বালিকা-কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল—আরে নীলগাইয়া তো ভাগলুয়া হৈ রে ছনিয়া—উধার—ইধার—জল্‌দি পাকড়া—

দুই বোনে হুটাপুটি করিয়া নীলগাইয়ের বাচ্চা পাকড়াও করিয়া ফেলিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিমুখে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

অন্ধকারে আমার দেখিবার সুবিধার জন্য তুলসী একখানা জ্বলন্ত কাঠ উঁচু করিয়া ধরিল। সুরতিয়া বলিল, কেমন, ভাল না বাবুজী? একে খাবার জন্যে কাল রাত্রে ভালুক এসেছিল। ওই মহুয়া গাছে কাল ভালুক উঠেছিল মহুয়া ফুল খেতে—তখন অনেক রাত—বাপ মা ঘুমোয়, আমি সব টের পাই—তারপর গাছ থেকে নেমে আমাদের খুপড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল। আমি একে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুই রাতে—ভালুকের পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মুখ হাত দিয়ে জোর করে চেপে আরও জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম—

—ভয় করল না তোর, সুরতিয়া?

—ইস্! ভয় বই কি! ভয় আমি করি নে। কাঠ কুড়ুতে গিয়ে জঙ্গলে কত ভালুকঝোড় দেখি—তাতেও ভয় করি নে। ভয় করলে চলে বাবুজী?

সুরতিয়া বিজ্ঞের মত মুখখানা করিল।

বড় বড় কলের চিমনির মত লম্বা, কালো কেঁদ গাছের গুঁড়ি ঠেলিয়া আকাশে উঠিয়াছে খুপড়ির চারিধারে, যেন কালিফোর্ণিয়া রেডউড গাছের জঙ্গল। বাদুড় ও নিশাচর কাঁক পাখীর ডানা-ঝটাপটি ডালে ডালে, ঝোপে ঝোপে অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে, খুপড়ির

পিছনের বনেই শিয়াল ডাকিতেছে—এই কয়টি ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া উহাদের মা যে কেমন করিয়া এই নির্জ্জন বনে-প্রান্তরে থাকে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। হে বিজ্ঞ, রহস্যময় অরণ্য, আশ্রিত জনের প্রতি তোমার সত্যই বড় কৃপা।

কথায় কথায় বলিলাম—মঞ্চী নিজের জিনিস সব নিয়ে গিয়েছে?

সুরতিয়া বলিল—ছোট মা কোন জিনিস নিয়ে যায় নি। ওর যে বাক্সটা সেবার দেখেছিলেন—ফেলেই রেখে গিয়েছে। দেখবেন? আনছি।

বাক্সটা আনিয়া সে আমার সামনে খুলিল। চিরুণী, ছোট আয়না, পুঁতির মালা, একখানা সবুজ-রঙের খেলো রুমাল—ঠিক যেন ছোট খুকির পুতুল-খেলার বাক্স! সেই হিংলাজের মালাছড়াটা কিন্তু নাই, সেবার লবটুলিয়া থামারে সেই যেটা কিনিয়াছিল।

কোথায় চলিয়া গেল নিজের ঘর-সংসার ছাড়িয়া কে বলিবে? ইহারা তো জমি লইয়া এতদিন পরে গৃহস্থালি পাতাইয়া বসবাস শুরু করিয়াছে, ইহাদের দলের মধ্যে সে-ই কেবল যে-ভবঘুরেই রহিয়া গেল!

ঘোড়ায় উঠিবার সময় সুরতিয়া বলিল—আর এক দিন আসবেন বাবুজী—আমরা পাখী ধরি ফাঁদ পেতে। নূতন ফাঁদ বুনেছি। একটা ডাহুক আর একটা গুড়গুড়ি পাখী পুষেছি। এরা ডাকলে বনের পাখী এসে ফাঁদে পড়ে—আজ আর বেলা নেই—নইলে ধরে দেখাতাম—

নাঢ়া বইহারের বন-প্রান্তরের পথে এত রাত্রে আসিতে ভয় ভয় করে। বাঁয়ে ছোট একটি পাহাড়ী ঝরনার জলস্রোত কুলকুল করিয়া বহিতেছে, কোথায় কি বনের ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধে ভরা অন্ধকার এক-এক জায়গায় এত নিবিড় যে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম দেখা যায় না, আবার কোথাও নক্ষত্রালোকে পাতলা।

নাঢ়া বইহার নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, বন্যজন্তু ও পাখীদের আশ্রয়স্থান—প্রকৃতি ইহার বন-ভূমি ও প্রান্তরকে অজস্র সম্পদে সাজাইয়াছে, সরস্বতী কুণ্ডী এই নাঢ়া বইহারেরই উত্তর সীমানায়। প্রাচীন জরিপের থাক-নক্সায় দেখা যায় সেখানে কুশীনদীর প্রাচীন খাত ছিল—এখন মজিয়া মাত্র ঐ জলটুকু অবশিষ্ট আছে—অন্য দিকে সেই প্রাচীন খাতই ঘন অরণ্যে পরিণত—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্—

কি অবর্ণনীয় শোভা দেখিলাম এই বনভূমির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে! কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া বইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু-বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুশ্রী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া। প্রকৃতি নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া-বইহার, ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে?

কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই জনারের ক্ষেত, শোনের গাদা, দড়ির চার-পাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।

হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।

আর একদিন গেলাম সুরতিয়াদের পাখী-ধরা দেখিতে।

সুরতিয়া ও ছনিয়া দুটি খাঁচা লইয়া আমার সঙ্গে নাঢ়া বইহারের জঙ্গলের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের দিকে চলিল।

বৈকাল বেলা, নাঢা বইহারের মাঠে সুদীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে নামিয়া পড়িয়াছে।

একটা শিমুলচারার তলায় ঘাসের উপর খাঁচা দুটি নামাইল। একটিতে একটি বড় ডাহুক অন্যটিতে গুড়গুড়ি। এ দুটি শিক্ষিত পাখী, বন্য পাখীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ডাহুকটি অমনি ডাকিতে আরম্ভ করিল।

গুড়গুড়িটা প্রথমতঃ ডাকে নাই।

সুরতিয়া শিস্ দিয়া তুড়ি দিয়া বলিল—বোলো রে বহিনিয়া—তোহর কির—

গুড়গুড়ি অমনি ডাকিয়া উঠিল—গুড-ড়-ড়-ড়—

নিস্তব্ধ অপরাহ্নে বিস্তীর্ণ মাঠের নির্জ্জনতার মধ্যে সে অদ্ভুত সুর শুধুই মনে আনিয়া দেয় এমনি দিগন্তবিস্তীর্ণতার ছবি, এমনি মুক্ত দিকৃচক্রবালের স্বপ্ন, ছায়াহীন জ্যোৎস্নালোক নিকটেই ঘাসের মধ্যে যেখানে রাশি রাশি হলুদ রঙের দুধলি ফুল ফুটিয়াছে তারই উপর ছনিয়া ফাঁদ পাতিল—যেন পাখীর খাঁচার বেড়ার মত, বাঁশের তৈরী। সেই বেড়া ক'খানা দিয়া গুড়গুড়ি-পাখীর খাঁচাটা ঢাকিয়া দিল।

সুরতিয়া বলিল—চলুন বাবুজী, লুকিয়ে বসি গে ঝোপের আড়ালে, মানুষ দেখলে চিড়িয়া ভাগবে।—সবাই মিলিয়া আমরা শাল-চারার আড়ালে কতক্ষণ ঘাপটি মারিয়া বসিয়া রহিলাম।—

ডাহুকটি মাঝে মাঝে থামিতেছে—গুড়গুড়ির কিন্তু রবের বিরাম নাই—একটানা ডাকিয়াই চলিয়াছে—গুড়-ড়-ড়-ড়—

সে কি মধুর অপার্থিব রব! বলিলাম—সুরতিয়া, তোদের গুড়গুড়িটা বিক্রী করবি? কত দাম?

সুরতিয়া বলিল—চুপ চুপ বাবুজী, কথা বলবেন না—ঐ শুনুন বুনো পাখী আসছে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে অন্য একটি সুর মাঠের উত্তর দিকে বন-প্রান্তর হইতে ভাসিয়া আসিল—গুড়-ড়-ড়-ড।

আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। বনের পাখী খাঁচার পাখীর সুরে সাড়া দিয়াছে।

ক্রমে সে সুর খাঁচার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইটি পাখীর রব পাশাপাশি শোনা যাইতেছিল, ক্রমে দুইটি সুর যেন মিশিয়া এক হইয়া গেল···হঠাৎ আবার একটা সুর···একটা পাপীই ডাকিতেছে—খাঁচার পাখীটা।

ছনিয়া ও সুরতিয়া ছুটিয়া গেল, ফাঁদে পাখী পড়িয়াছে। আমিও ছুটিয়া গেলাম।

ফাঁদে পা বাধাইয়া পাখীটা ঝটপট্ করিতেছে। ফাঁদে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত।

সুরতিয়া পাখীটা হাতে তুলিয়া দেখাইল—দেখুন বাবুজী, কেমন ফাঁদে পা আটকেছে। দেখলেন?

সুরতিয়াকে বলিলাম—পাখী তোরা কি করিস?

সে বলিল—বাবা তিরাশি-রতনগঞ্জের হাটে বিক্রী করে আসে। এক একটা গুড়গুড়ি দু'পয়সা—একটা ডাহুক সাত পয়সা।

বলিলাম—আমাকে বিক্রী কর, দাম দেব।

সুরতিয়া গুড়গুড়িটা আমায় এমনিই দিয়া দিল—কিছুতেই তাহাকে পয়সা লওয়াইতে পারিলাম না।

৪

আশ্বিন মাস। এই সময় একদিন সকালে পত্র পাইলাম রাজা দোবরু পান্না মারা গিয়াছেন, এবং রাজপরিবার খুব বিপন্ন—আমি সময় পাইলে যেন যাই। পত্র দিয়াছে জগরু পান্না, ভানুমতীর দাদা।

তখনি রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চকমকিটোলা পৌঁছিয়া গেলাম। রাজার বড় ছেলে ও নাতি আমাকে আগাইয়া লইয়া গেল। শুনিলাম, রাজা দোবরু গরু চরাইতে চরাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে আঘাত প্রাপ্ত হন, শেষ পর্য্যন্ত হাঁটুর সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটে।

রাজার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র মহাজন আসিয়া গরু-মহিষ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। টাকা না পাইলে সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। এদিকে বিপদের উপর বিপদ, নূতন রাজার অভিষেক-উৎসব আগামীকল্য সম্পন্ন হইবে। তাহাতেও কিছু খরচ আছে। কিন্তু সে-টাকা কোথায়? তা ছাড়া গরু-মহিষ মহাজনে যদি লইয়া যায়, তবে রাজপরিবারের অবস্থা খুবই হীন হইয়া পড়িবে—ঐ দুধের ঘি বিক্রয় করিয়া রাজার সংসারের অর্দ্ধেক খরচ চলিত—এখন তাহাদের না খাইয়া মরিতে হইবে।

শুনিয়া আমি মহাজনকে ডাকাইলাম। তার নাম বীরবর সিং। আমার কোন কথাই সে দেখিলাম শুনিতে প্রস্তুত নয়। টাকা না পাইলে কিছুতেই সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। লোকটা ভাল নয় দেখিলাম।

ভানুমতী আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে তাহার জ্যাঠামশায় অর্থাৎ প্রপিতামহকে বড়ই ভালবাসিত—জ্যাঠামশায় থাকিতে তাহারা যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিল, যেমনি তিনি

চোখ বুজিয়াছেন, আর অমনি এই সব গোলমাল! এই সব কথা বলিতে বলিতে ভানুমতীর চোখের জল কিছুতেই থামে না। বলিল—চলুন বাবুজী, আমার সঙ্গে—জ্যাঠামশায়ের গোর আপনাকে দেখিয়ে আনি পাহাড়ের উপর থেকে। আমার কিছু ভাল লাগছে না বাবুজী, কেবল ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর কবরের কাছে বসে থাকি।

বলিলাম—দাঁড়াও, মহাজনের একটা কি ব্যবস্থা করা যায় দেখি। তার পর যাব—কিন্তু মহাজনের কোন ব্যবস্থা করা আপাততঃ সম্ভব হইল না। দুর্দ্দান্ত রাজপুত মহাজন কারও অনুরোধ উপরোধ শুনিবার পাত্র নয়। তবে সামান্য একটু খাতির করিয়া আপাততঃ গরু-মহিষগুলি এখানেই বাঁধিয়া রাখিতে সম্মত হইল মাত্র, তবে দুধ এক ফোঁটাও লইতে দিবে না। মাস দুই পরে এ দেনা শোধার উপায় হইয়াছিল—সেকথা এখন নয়।

ভানুমতী দেখি একা ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া। বলিল—বিকেল হয়ে গিয়েছে, এর পর যাওয়া যাবে না, চলুন কবর দেখতে।

ভানুমতী একা যে আমার সঙ্গে পাহাড়ে চলিল ইহাতে বুঝিলাম সরলা পর্ব্বতবালা এখন আমাকে তাহার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরমাত্মীয় মনে করে। এই পাহাড়ী বালিকার সরল ব্যবহার ও বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

বৈকালের ছায়া নামিয়াছে সেই বড় উপত্যকাটায়।

ভানুমতী বড় তড়বড় করিয়া চলে, ত্রস্তা হরিণীর মত। বলিলাম—শোন ভানুমতী, একটু আস্তে চল, এখানে শিউলিফুলের গাছ কোথায় আছে?

ভানুমতীর দেশে শিউলিফুলের নাম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকমত তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। পাহাড়ের উপরে উঠিতে উঠিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। নীল ধনঝরি শৈলমালা ভানুমতীদের দেশকে, রাজ্যহীন রাজা দোবরু পান্নার রাজ্যকে মেখলাকারে ঘেরিয়া আছে, বহুদূর হইতে হু হু খোলা হাওয়া বহিয়া আসিতেছে।

ভানুমতী চলিতে চলিতে থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবুজী, উঠতে কষ্ট হচ্ছে?

—কিছু না। একটু আস্তে চল কেবল—কষ্ট কি।

আর খানিকটা চলিয়া সে বলিল—জ্যাঠামশাই চলে গেল, সংসারে আমার আর কেউ রইল না, বাবুজী—

ভানুমতী ছেলেমানুষের মত কাঁদ-কাঁদ হইয়া কথাটা বলিল।

উহার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। বৃদ্ধ প্রপিতামহই না হয় মারা গিয়াছে, মাও নাই, নতুবা উহার বাবা, ভাই, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা সবাই বাঁচিয়া, চারিদিকে জাজ্বল্যমান সংসার। হাজার হোক, ভানুমতী স্ত্রীলোক এবং বালিকা, পুরুষের একটু সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ও মেয়েলি আদর-কাড়ানোর প্রবৃত্তি তার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভানুমতী বলিল—আপনি মাঝে মাঝে আসবেন বাবুজী, আমাদের দেখাশুনো করবেন—ভুলে যাবেন না বলুন—

নারী সব জায়গায় সব অবস্থাতেই সমান। বন্য বালিকা ভানুমতীও সেই একই ধাতুতে গড়া!

বলিলাম—কেন ভুলে যাব? মাঝে মাঝে আসব নিশ্চয়ই—

ভানুমতী কেমন একরকম অভিমানের সুরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—হাঁ, বাংলা দেশে গেলে, কলকাতা শহরে গেলে আপনার আবার মনে থাকবে এ পাহাড়ে জংলী দেশের কথা—একটু থামিয়া বলিল—আমাদের কথা - আমার কথা—

স্নেহের সুরে বলিলাম—কেন, মনে ছিল না ভানুমতী? আয়নাখানা পাও নি? মনে ছিল কি ছিল না ভাব—

ভানুমতী উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ বাবুজী, বড চমৎকার আয়না—সত্যি, সে-কথা আপনাকে জানাতে ভুলেই গিয়েছি!

সমাধি স্থানের সেই বটগাছের তলায় যখন গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বেলা নাই বলিলেও হয়, দূর পাহাড়শ্রেণীর আড়ালে সূর্য্য লাল হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, কখন ক্ষীণাঙ্গ চাঁদ উঠিয়া বটতলায় অপরাহ্নের এই ঘন ছায়া ও সম্মুখবর্ত্তী প্রদোষের গভীর অন্ধকার দূর করিবে, স্থানটি যেন তাহারই স্তব্ধ প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ভানুমতীকে কিছু বনের ফুল কুড়াইয়া আনিতে বলিলাম, উহার ঠাকুরদাদার কবরের পাথরে ছড়াইবার জন্য। সমাধির উপর ফুল-ছড়ানো-প্রথা এদের দেশে জানা নাই, আমার উৎসাহে সে নিকটের একটা বুনো শিউলি গাছের তলা হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর ভানুমতী ও আমি দুজনেই ফুল ছড়াইয়া দিলাম রাজা দোবরু পান্নার সমাধির উপরে।

ঠিক সেই সময় ডানা ঝট্‌পট্‌ করিয়া একদল সিল্লি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল বটগাছটার মগডাল হইতে—যেন ভানুমতী ও রাজা দোবরুর সমস্ত অবহেলিত অত্যাচারিত, প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু! সাধু! কারণ আর্য্য-জাতির বংশধরের এই বোধ হয় প্রথম সম্মান অনার্য্য রাজ-সমাধির উদ্দেশে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১

ধাওতাল সাহু মহাজনের কাছে আমাকে একবার হাত পাতিতে হইল। আদায় সেবার হইল কম, অথচ দশ হাজার টাকা রেভিনিউ দাখিল করিতেই হইবে। তহসিলদার বনোয়ারীলাল পরামর্শ দিল, বাকী টাকাটা ধাওতাল সাহুর কাছে কর্জ্জ করুন। আপনাকে সে নিশ্চয়ই দিতে আপত্তি করিবে না। ধাওতাল সাহু আমার মহালের প্রজা নয়, সে থাকে গবর্ণমেণ্টের

খাসমহলে। আমাদের সঙ্গে তার কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই, এ অবস্থায় সে যে এক কথায় আমাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজার-তিনেক টাকা ধার দিবে, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। একদিন বনোয়ারীলালকে সঙ্গে লইয়া গোপনে গেলাম ধাওতাল সাহুর বাড়ী, কারণ কাছারির অপর কাহাকেও জানিতে দিতে চাহি না কর্জ্জ করিয়া দিতে হইতেছে।

ধাওতাল সাহুর বাড়ী পওসদিয়ার একটা ঘিঞ্জি টোলার মধ্যে। বড় একখানা খোলার চালার সামনে খানকতক দড়ির চারপাই পাতা। ধাওতাল সাহু উঠানের এক পাশের তামাকের ক্ষেত নিড়ানি দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল—আমাদের দেখিয়া শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল, কোথায় বসাইবে, কি করিবে ভাবিয়া পায় না, খানিকক্ষণের জন্য যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

—একি! হুজুর এসেছেন গরীবের বাড়ী, আসুন, আসুন। বসুন হুজুর। আসুন তহসিলদার সাহেব।

ধাওতাল সাহুর বাড়ীতে চাকর-বাকর দেখিলাম না। তাহার একজন হৃষ্টপুষ্ট নাতি, নাম রামলখিয়া, সে-ই আমাদের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাড়ীঘর আসবাবপত্র দেখিয়া কে বলিবে ইহা লক্ষপতি মহাজনের বাড়ী।

রামলখিয়া আমার ঘোড়ার পিঠ হইতে জিন খুবপাচ খুলিয়া ঘোড়াকে ছায়ায় বাঁধিল। আমাদের জন্য পা ধুইবার জল আনিল। ধাওতাল সাহু নিজেই একখানা তালের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সাহুজীর এক নাতনী তামাক সাজিতে ছুটিল। উহাদের যত্নে বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম—ব্যস্ত হবার দরকার নেই সাহুজী, তামাক আনতে হবে না, আমার কাছে চুরুট আছে।

যত আদর-আপ্যায়নই করুক, আসল ব্যাপার সম্বন্ধে কথা পাড়িতে একটু সমীহ হইতেছিল, কি করিয়া কথাটা পাড়ি?

ধাওতাল সাহু বলিল—ম্যানেজার সাহেব কি এদিকে পাখী মারতে এসেছিলেন?

—না, তোমার কাছেই এসেছিলাম সাহুজী।

—আমার কাছে হুজুর? কি দরকার বলুন তো?

—আমাদের কাছারির সদর খাজনার টাকা কম পড়ে গিয়েছে, সাড়ে তিন হাজার টাকার বড় দরকার, তোমার কাছে সেজন্যেই এসেছিলাম।

মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, বলিতেই যখন হইবে।

ধাওতাল সাহু কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—তার জন্যে আর ভাবনা কি হুজুর? সে হয়ে যাবে এখন, তবে তার জন্যে কষ্ট করে আপনার আসবার দরকার কি ছিল? একখানা চিরকুট লিখে তহসিলদার সাহেবের হাতে পাঠিয়ে দিলেই আপনার হুকুম তামিল হত।

মনে ভাবিলাম এখন আসল কথাটা বলিতে হইবে। টাকা আমি ব্যক্তিগতভাবে লইব, কারণ জমিদারের নামে টাকা কর্জ্জ করিবার আমমোক্তারনামা আমার নাই। একথা

শুনিলেও ধাওতাল কি আমায় টাকা দিবে? বিদেশী লোক আমি। আমার কি সম্পত্তি আছে এখানে যে এতগুলি টাকা বিনা বন্ধকে আমায় দিবে? কথাটা একটু সমীহের উপরই বলিলাম।

—সাহুজী, লেখাপড়াটা কিন্তু আমার নামেই করতে হবে। জমিদারের নামে হবে না।

ধাওতাল সাহু আশ্চর্য্য হইবার সুরে বলিল—লেখাপড়া কিসের? আপনি আমার বাড়ী ব'য়ে এসেছেন, সামান্য টাকার অভাব পড়েছে তাই নিতে। এ তো আসবার দরকারই ছিল না, হুকুম করে পাঠালেই টাকা দিতাম। তার পর যখন এসেছেনই—তখন লেখাপড়া কিসের? আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান, যখন কাছারিতে আদায় হবে, আমায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

বলিলাম—আমি হ্যাণ্ডনোট দিচ্ছি, টিকিট সঙ্গে করে এনেছি। কিংবা তোমার পাকা খাতা বার কর, সই করে দিয়ে যাই।

ধাওতাল সাহু হাত জোড় করিয়া বলিল—মাপ করুন হুজুর। ও কথাই তুলবেন না। মনে বড় কষ্ট পাব। কোন লেখাপড়ার দরকার নেই, টাকা আপনি নিয়ে যান।

আমার পীড়াপীড়িতে ধাওতাল কর্ণপাতও করিল না। ভিতর হইতে আমায় নোটের তাড়া গুনিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—হুজুর, একটা কিন্তু অনুরোধ আছে।

—কি?

—এ-বেলা যাওয়া হবে না। সিধা বার করে দিই, রান্নাখাওয়া করে তবে যেতে পাবেন।

পুনরায় আপত্তি করিলাম, তাহাও টিকিল না। তহসিলদারকে বলিলাম—বনোয়ারীলাল, রাঁধতে পারবে তো? আমার দ্বারা সুবিধে হবে না।

বনোয়ারী বলিল—তা চলবে না, হুজুর, আপনাকে রাঁধতে হবে। আমার রান্না খেলে এ পাড়াগাঁয়ে আপনার দুর্নাম হবে। আমি দেখিয়ে দেব এখন।

বিরাট এক সিধা বাহির করিয়া দিল ধাওতাল সাহুর নাতি। রন্ধনের সময় নাতি-ঠাকুরদা মিলিয়া নানা রকম উপদেশ-পরামর্শ দিতে লাগিল রন্ধন সম্বন্ধে।

ঠাকুরদাদার অনুপস্থিতিতে নাতি বলিল—বাবুজী, ঐ দেখেছেন আমার ঠাকুরদাদা, ওঁর জন্যে সব যাবে। এত লোককে টাকা ধার দিয়েছেন বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, বিনা তমসুকে—এখন আর টাকা আদায় হতে চায় না। সকলকে বিশ্বাস করেন, অথচ লোকে কত ফাঁকিই দিয়েছে। লোকের বাড়ী বয়ে টাকা ধার দিয়ে আসেন।

গ্রামের আর একজন লোক বসিয়া ছিল, সে বলিল—বিপদে আপদে সাহুজীর কাছে হাত পাতলে ফিরে যেতে কখনো কাউকে দেখি নি বাবুজী। সেকেলে ধরনের লোক, এতবড় মহাজন, কখনো আদালতে মোকদ্দমা করেন নি। আদালতে যেতে ভয় পান। বেজায় ভীতু আর ভালমানুষ।

সেদিন যে-টাকা ধাওতাল সাহুর নিকট হইতে আনিয়াছিলাম, তাহা শোধ দিতে প্রায়

ছ'মাস দেরি হইয়া গেল—এই ছ'মাসের মধ্যে ধাওতাল সাহু আমাদের ইসমাইলপুর মহালের ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটে নাই, পাছে আমি মনে করি যে সে টাকার তাগাদা করিতে আসিয়াছে। ভদ্রলোক আর কাহাকে বলে।

২

প্রায় বছর-খানেক রাখালবাবুদের বাড়ী যাওয়া হয় নাই, ফসলের মেলার পরে একদিন সেখানে গেলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী আমায় দেখিয়া খুব খুশি হইলেন। বলিলেন—আপনি আর আসেন না কেন দাদা, কোন খোঁজখবর নেন না—এই নির্ব্বান্ধব জায়গায় বাঙালীর মুখ দেখা যে কি—আর আমাদের এই অবস্থায়—

বলিয়া দিদি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। বাড়ীঘরের অবস্থা আগের মতই হীন, তবে এবার ততটা যেন বিশৃঙ্খল নয়। রাখালবাবুর বড় ছেলেটি বাড়ীতেই টিনের মিস্ত্রীর কাজ করে—সামান্যই উপার্জ্জন—তবু যা হয় সংসার একরকম চলিতেছে।

রাখালবাবুর স্ত্রীকে বলিলাম—ছোট ছেলেটিকে অন্তত ওর মামার কাছে কাশীতে রেখে একটু লেখাপড়া শেখান।

তিনি বলিলেন—আপন মামা কোথায় দাদা? দু-তিনখানা চিঠি লেখা হয়েছিল এত বড় বিপদের খবর দিয়ে—দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে সেই যে চুপ করল—আর দেড় বছর সাড়াশব্দ নেই। তার চেয়ে দাদা ওরা মকাই কাটবে, জনার কাটবে, মহিষ চরাবে—তবুও তেমন মামার দোরে যাবে না।

আমি তখনই ঘোড়ায় ফিরিব—দিদি কিছুতেই আসিতে দিলেন না। সেবেলা থাকিতে হইবে। তিনি কি-একটা খাবার করিয়া আমায় না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না।

অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইল। মকাইয়ের ছাতুর সহিত ঘি ও চিনি মিশাইয়া এক রকম লাড্ডু বাঁধিয়া ও কিছু হালুয়া তৈরী করিয়া দিদি খাইতে দিলেন। দরিদ্র সংসারে যতটা আদর-অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে, তাহার ত্রুটি করিলেন না।

বলিলেন—দাদা, ভাদ্র মাসের মকাই রেখেছিলাম আপনার জন্য তুলে। আপনি ভুট্টা-পোড়া খেতে ভালবাসেন, তাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মকাই কোথায় পেলেন? কিনেছিলেন?

—না। ক্ষেতে কুড়ুতে যাই, ফসল কেটে নিয়ে গেলে যে-সব ভাঙা, ঝরা ভুট্টা চাষারা ক্ষেতে রেখে যায় গাঁয়ের মেয়েরাও যায়, আমিও যাই ওদের সঙ্গে—এক ঝুড়ি, দেড় ঝুড়ি করে রোজ কুড়োতাম।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—ক্ষেতে কুড়ুতে যেতেন?

—হ্যাঁ, রাত্রে যেতাম, কেউ টের পেত না। গাঁয়ের কত মেয়েরা তো যায়। তাদের সঙ্গে এই ভাদ্র মাসে কম্‌সে-কম দশ টুক্‌রি ভুট্টা কুড়িয়ে এনেছিলাম।

মনে বড় দুঃখ হইল। এ কাজ গরীব গাঙ্গোতার মেয়েরা করিয়া থাকে—এদেশের ছত্রি বা রাজপুত মেয়েরা গরীব হইলেও ক্ষেতের ফসল কুড়াইতে যায় না। আর, একজন বাঙালীর মেয়েকে এ-কাজ করিতে শুনিলে মনে বড়ই লাগে। এই অশিক্ষিত গাঙ্গোতাদের গ্রামে বাস করিয়া দিদি এ সব হীনবৃত্তি শিখিয়াছেন—সংসারের দারিদ্র্যও যে তাহার একটা প্রধান কারণ সে-বিষয়ে ভুল নাই। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না, পাছে মনে কষ্ট দেওয়া হয়। এই নিঃস্ব বাঙালী পরিবার বাংলার কোন শিক্ষা-সংস্কৃতি পাইল না, বছর কয়েক পরে চাষী গাঙ্গোতায় পরিণত হইবে, ভাষায়, চালচলনে, হাবভাবে। এখন হইতেই সে-পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

রেলস্টেশন হইতে বহু দূরে অজ পল্লীগ্রামে আমি আরও দু-একটি এরকম বাঙালী-পরিবার দেখিয়াছি। এই সব পরিবারে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! এমনি আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবার জানিতাম—দক্ষিণবিহারে এক অজ গ্রামে তাঁরা থাকিতেন। অবস্থা নিতান্তই হীন, বাড়ীতে তাঁদের তিনটি মেয়ে ছিল, বড়টির বয়স একুশ-বাইশ বছর, মেজটির কুড়ি, ছোটটিরও সতের। ইহাদের বিবাহ হয় নাই, হইবার কোন উপায়ও নাই—সঘর জোটানো, বাঙালী পাত্রের সন্ধান পাওয়া এ-সব অঞ্চলে অত্যন্তই কঠিন।

বাইশ বছরের বড মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী—এক বর্ণও বাংলা জানে না—আকৃতি-প্রকৃতিতে খাঁটি দেহাতী বিহারী মেয়ে—মাঠ হইতে মাথায় মোট করিয়া কলাই আনে, গমের ভূষি আনে।

এই মেয়েটির নাম ছিল ধ্রুবা। পুরাদস্তুর বিহারী নাম।

তাহার বাবা প্রথমে এই গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করিতে আসিয়া চাষবাসের কাজও আরম্ভ করেন। তার পর তিনি মারা যান, বড ছেলে, একেবারে হিন্দুস্থানী—চাষবাস দেখাশুনা করিত, বয়স্থা ভগ্নীদের বিবাহের যোগাড় সে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ পণ দিবার ক্ষমতা তাদের আদৌ ছিল না জানি।

ধ্রুবা ছিল একেবারে কপালকুণ্ডলা। আমাকে ভাইয়া অর্থাৎ দাদা বলিয়া ডাকিত। গায়ে অসীম শক্তি, গম পিষিতে, উদুখলে ছাতু কুটিতে, মোট বহিয়া আনিতে, গরু-মহিষ চরাইতে চমৎকার মেয়ে, সংসারের কাজকর্মে ঘুণ। তাহার দাদা এ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, এমন যদি কোন পাত্র পান, তিনটি মেয়েকেই এক পাত্রে সম্প্রদান করিবেন। মেয়ে তিনটিরও নাকি অমত ছিল না।

মেজ মেয়ে জবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—বাংলা দেখতে ইচ্ছে হয়?

জবা বলিয়াছিল নেই ভেইয়া, উঁহাকো পানি বড্ডি নরম ছে—

শুনিয়াছিলাম বিবাহ করিতে ধ্রুবারও খুব আগ্রহ। সে নিজে নাকি কাহাকে বলিয়াছিল তাহাকে যে বিবাহ করিবে, তাহার বাড়ীতে গরুর দোহাল বা উদুখলওয়ালী ডাকিতে হইবে

না—সে একাই ঘণ্টায় পাঁচ সের গম কুটিয়া ছাতু করিতে পারে।

হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী! এত বৎসর পরেও সে নিশ্চয় আজও গাঙ্গোতীন সাজিয়া দাদার সংসারে যব কুটিতেছে, কলাইয়ের বোঝা মাথায় করিয়া মাঠ হইতে আনিতেছে, কে আর দরিদ্রা দেহাতী বয়স্কা মেয়েকে বিনাপণে বিবাহ করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে, মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে!

শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূর পাহাড়ের গা বাহিয়া যে সরু পথটি দেখা যায় ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথির মত, ব্যর্থযৌবনা, দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও এত বছরের পরে সেই পথ দিয়া শুক্‌নো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তেমনি প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমার দিদি, রাখালবাবুর স্ত্রী, হয়তো আজও বৃদ্ধা গাঙ্গোতীনদের মত গভীর রাত্রে চোরের মত লুকাইয়া ক্ষেতে থামারে শুক্‌নো তলায়-ঝরা ভুট্টা ঝুড়ি করিয়া কুড়াইয়া ফেরেন।

৩

ভানুমতীদের ওখান হইতে ফিরিবার পরে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সেবার ঘোর বর্ষা নামিল। দিনরাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ঘন কাজল-কালো মেঘপুঞ্জে আকাশ ছাইয়াছে; নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তরেখা বৃষ্টির ধোঁয়ায় ঝাপসা, মহালিখারূপের পাহাড় মিলাইয়া গিয়াছে—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের শীর্ষদেশ কখনও ঈষৎ অস্পষ্ট দেখা যায়, কখনও যায় না। শুনিলাম পূর্ব্বে কুশী ও দক্ষিণে কারো নদীতে বন্যা আসিয়াছে।

মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া কাশ ও ঝাউবন বর্ষার জলে ভিজিতেছে, আমার আপিস-ঘরের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া দেখিতাম, আমার সামনে কাশবনের মধ্যে একটা বনঝাউয়ের ডালে একটা সঙ্গীহারা ঘুঘু বসিয়া অঝোরে ভিজিতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবেই বসিয়া আছে—মাঝে মাঝে পালক উসকোখুসকো করিয়া ঝুলাইয়া বৃষ্টির জল আটকাইবার চেষ্টা করে, কখনও এমনিই বসিয়া থাকে।

এমন দিনে আপিস-ঘরে বসিয়া দিন কাটানো আমার পক্ষে কিন্তু অসম্ভব হইয়া উঠিত। ঘোড়ায় জিন কষিয়া বর্ষাতি চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। সে কি মুক্তি! কি উদ্দাম জীবনানন্দ! আর, কি অপরূপ সবুজের সমুদ্র চারিদিকে—বর্ষার জলে নবীন, সতেজ, ঘনসবুজ কাশের বন গজাইয়া উঠিয়াছে—যত দূর দৃষ্টি চলে, এদিকে নাঢ়া বইহারের সীমানা ওদিকে মোহনপুরা অরণ্যের অস্পষ্ট নীল সীমারেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে—এই সবুজের সমুদ্র—বর্ষাসজল হাওয়ায় মেঘকজ্জল আকাশের নীচে এই দীর্ঘ মরকতশ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—আমি যেন একা এ অকূল-সমুদ্রের নাবিক—কোন্ রহস্যময় স্বপ্নবন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছি।

এই বিস্তৃত মেঘচ্ছায়াশ্যামল মুক্ত তৃণভূমির মধ্যে ঘোড়া ছুটাইয়া মাইলের পর মাইল যাইতাম—কখনও সরস্বতীকুণ্ডীর বনের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিয়াছি—প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব নিভৃত সৌন্দর্য্যভূমি যুগলপ্রাসাদের স্বহস্তে রোপিত নানাজাতীয় বন্য ফুলে ও লতায় সজ্জিত হইয়া আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সরস্বতী হ্রদ ও তাহার তীরবর্ত্তী বনানীর মত সৌন্দর্য্যভূমি খুব বেশী নাই—এ নিঃসন্দেহে বলতে পারি। হ্রদের ধারে রেড ক্যাম্পিয়নের মেলা বসিয়াছে এই বর্ষাকালে—হ্রদের জলের ধারের নিকট। জলজ ওয়াটারক্রোফ্‌টের বড় বড় নীলাভ সাদা ফুলে ভরিয়া আছে। যুগলপ্রসাদ সেদিনও কি একটা বন্যলতা আনিয়া লাগাইয়া গিয়াছে জানি। সেদিন আজমাবাদ কাছারিতে মুহুরীর কাজ করে বটে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্ত্তী লতাবিতানে ও বন্যপুষ্পের কুঞ্জে।

সরস্বতী কুণ্ডীর বন হইতে বাহির হইতাম—আবার মুক্ত প্রান্তর, আবার দীর্ঘ তৃণভূমি—বনের মাথায় ঘন নীল বর্ষার মেঘ আসিয়া জমিতেছে, সমগ্র জলভার নামাইয়া রিক্ত হইবার পূর্ব্বেই আবার উঠিয়া আসিতেছে নবমেঘপুঞ্জ—একদিকের আকাশে এক অদ্ভুত ধরনের নীল রং ফুটিয়াছে—তাহার মধ্যে একখণ্ড লঘুমেঘ অস্তদিগন্তের রঙে রঞ্জিত হইয়া বহির্বিশ্বের দিগন্তে কোন্ অজানা পর্ব্বতশিখরের মত দেখা যাইতেছে।

সন্ধ্যার বিলম্ব নাই। দিগন্তহারা ফুলকিয়া বইহারের মধ্যে শিয়াল ডাকিয়া উঠিত—একে মেঘের অন্ধকার, তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছে—ঘোড়ার মুখ কাছারির দিকে ফিরাইতাম।

কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থম্‌কানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরের সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড়-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্ব্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরে অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্ব্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।

আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত-প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্ত-মেঘস্তূপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন,

সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।

৪

এমনি এক বর্ষামুখর শ্রাবণ-দিনে ধাতুরিয়া ইসমাইলপুর কাছারিতে আসিয়া হাজির।

অনেক দিন পরে উহাকে দেখিয়া খুশী হইলাম।

—কি ব্যাপার, ধাতুরিয়া? ভাল আছিস ত?

যে ছোট পুঁটুলির মধ্যে তাহার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি বাঁধা, সেটা হাত হইতে নামাইয়া আমায় হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—বাবুজী, নাচ দেখাতে এলাম। বড় কষ্টে পড়েছি, আজ এক মাস কেউ নাচ দেখে নি। ভাবলাম, কাছারিতে বাবুজীর কাছে যাই, সেখানে গেলে তাঁরা ঠিক দেখবেন। আরো ভাল ভাল নাচ শিখেছি বাবুজী।

ধাতুরিয়া যেন আরও রোগা হইয়া গিয়াছে। উহাকে দেখিয়া কষ্ট হইল।

—কিছু খাবি ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে খাইবে।

আমার ঠাকুরকে ডাকিয়া ধাতুরিয়াকে কিছু খাবার দিতে বলিলাম। তখন ভাত ছিল না, ঠাকুর দুধ ও চিঁড়া আনিয়া দিল। ধাতুরিয়ার খাওয়া দেখিয়া মনে হইল সে অন্ততঃ দু-দিন কিছু খাইতে পায় নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধাতুরিয়া নাচ দেখাইল। কাছারির প্রাঙ্গণে সেই বন্য অঞ্চলের অনেক লোক জড় হইয়াছিল ধাতুরিয়ার নাচ গান দেখিবার জন্য। আগের চেয়েও ধাতুরিয়া নাচে অনেক উন্নতি করিয়াছে। ধাতুরিয়ার মধ্যে যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে। আমি নিজে কিছু দিলাম, কাছারির লোক চাঁদা করিয়া কিছু দিল। ইহাতে তাহার কত দিনই বা চলিবে?

ধাতুরিয়া পরদিন সকালে আমার নিকট বিদায় লইতে আসিল।

—বাবুজী, কবে কলকাতা যাবেন?

—কেন বল ত?

—আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবেন বাবুজী। সেই যে আপনাকে বলেছিলাম?

—তুমি এখন কোথায় যাবে ধাতুরিয়া? খেয়ে তবে যেও।

—না, বাবুজী, ঝল্লুটোলাতে একজন ভুঁইহার বাভনের বাড়ী, তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে হয়তো নাচ দেখতে পারে। সেই চেষ্টাতে যাচ্ছি। এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা—এখন রওনা হ'লে বিকেল নাগাদ পৌঁছব।

ধাতুরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে মন সরে না। বলিলাম—কাছারিতে যদি কিছু জমি দিই, তবে এখানে থাকতে পারবে? চাষবাস কর, থাক না কেন?

মটুকনাথ পণ্ডিতেরও দেখিলাম খুব ভাল লাগিয়াছে ধাতুরিয়াকে। তাহার ইচ্ছা ধাতুরিয়াকে সে টোলের ছাত্র করিয়া লয়। বলিল—বলুন না ওকে বাবুজী, দু-বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ শেষ করিয়ে দেব। ও থাকুক এখানে।

জমি দেওয়ার কথায় ধাতুরিয়া বলিল—বাবুজী, আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত, আপনার বড় দয়া। কিন্তু চাষ-কাজ কি আমায় দিয়ে হবে? ওদিকে আমার মন নেই যে! নাচ দেখাতে পেলে আমার মনটা ভারি খুশী থাকে। আর কিছু তেমন ভাল লাগে না।

—বেশ, মাঝে মাঝে নাচ দেখাবে, চাষ করতে ত জমির সঙ্গে তোমায় কেউ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে না?

ধাতুরিয়া খুব খুশী হইল। বলিল—আপনি যা বলবেন, আমি তা শুনব। আপনাকে বড় ভাল লাগে, বাবুজী। আমি ঝল্লুটোলা থেকে ঘুরে আসি—আপনার এখানেই আসব।

মটুকনাথ পণ্ডিত বলিল—আর সেই সময় তোমাকে টোলেও ঢুকিয়ে নেব। তুমি না হয় রাত্রে এসে প'ড়ো আমার কাছে। মূর্খ থাকা কিছু নয়, কিছু ব্যাকরণ, কিছু কাব্য লব্জ রাখা দরকার।

ধাতুরিয়া তাহার পর বসিয়া বসিয়া নৃত্যশিল্পের বিষয়ে নানা কথা কি সব বলিল, আমি তত বুঝিলাম না। পূর্ণিয়ার হো-হো-নাচের ভঙ্গীর সঙ্গে ধরমপুর অঞ্চলের ঐ শ্রেণীর নাচের কি তফাৎ—সে নিজে নূতন কি একটা হাতের মুদ্রা প্রবর্ত্তন করিয়াছে—এই সব ধরনের কথা।

—বাবুজী, আপনি বালিয়া জেলায় ছট্ পরবের সময় মেয়েদের নাচ দেখেছেন? ওর সঙ্গে ছক্করবাজি নাচের বেশ মিল থাকে একটা জায়গায়। আপনাদের দেশে নাচ কেমন হয়?

আমি তাহাকে গত বৎসর ফসলের মেলায় দৃষ্ট ননীচোর নাটুয়া'র নাচের কথা বলিলাম। ধাতুরিয়া হাসিয়া বলিল—ও কিছু না বাবুজী, ও মুঙ্গেরের গেঁয়ো নাচ। গাঙ্গোতাদের খুশী করবার নাচ। ওর মধ্যে খাঁটি জিনিস কিছু নেই। ও ত সোজা।

বলিলাম—তুমি জানো? নেচে দেখাও ত?

ধাতুরিয়া দেখিলাম নিজের শাস্ত্রে বেশ অভিজ্ঞ। 'ননীচোর নাটুয়ার' নাচ সত্যিই চমৎকার নাচিল—সেই খুঁৎ খুঁৎ করিয়া ছেলেমানুষের মত কান্না, সেই চোরা ননী বিতরণ করিবার ভঙ্গী—সেই সব। তাহাকে আরও মানাইল এই জন্য যে, সে সত্যিই বালক।

ধাতুরিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল—এত মেহেরবানিই যখন করলেন বাবুজী, একবার কলকাতায় কেন নিয়ে চলুন না? ওখানে নাচের আদর আছে।

এই ধাতুরিয়ার সহিত আমার শেষ দেখা।

মাস দুই পরে শোনা গেল, বি এন ডব্লিউ রেল লাইনের কাটারিয়া স্টেশনের অদূরে লাইনের উপর একটি বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়—নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার মৃতদেহ বলিয়া সকলে চিনিয়াছে। ইহা আত্মহত্যা কি দুর্ঘটনা তাহা বলিতে পারিব না। আত্মহত্যা হইলে, কি দুঃখেই বা সে আত্মহত্যা করিল ?

সেই বন্য অঞ্চলে দু-বছর কাটাইবার সময় যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—তার মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার মধ্যে যে একটি নির্লোভ, সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয় !

৫

আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

নাঢ়া বইহার ও লবটুলিয়ার সমুদয় জঙ্গল-মহাল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোথাও পূর্ব্বের মত বন নাই। প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জ্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়োঝাঁকার নিভৃত লতাবিতান, কত স্বপ্নভূমি—জনমজুরেরা নির্ম্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল এক দিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষের দেবতা দয়ালু টাঁড়বারো হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া বন্য মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।

নাঢ়া বইহার নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র। যে দিকে চোখ যায়, শুধু চালে চালে লাগানো অপকৃষ্ট খোলার ঘর। কোথাও বা কাশের ঘর। ঘন ঘিঞ্জি বসতি—টোলায় টোলায় ভাগ করা—ফাঁকা জায়গায় শুধুই ফসলের ক্ষেত। এতটুকু ক্ষেতের চারিদিকে ফনিমনসার বেড়া। ধরণীর মুক্তরূপ ইহারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আছে কেবল একটি স্থান, সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্ত্তী বনভূমি।

চাকুরির খাতিরে মনিবের স্বার্থরক্ষার জন্য সব জমিতেই প্রজাবিলি করিয়াছি বটে, কিন্তু যুগলপ্রসাদের হাতে সাজানো সরস্বতী-তীরের অপূর্ব্ব বনকুঞ্জ কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। কত বার দলে দলে প্রজারা আসিয়াছে সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের জমি লইতে—বর্দ্ধিত হারে সেলামী ও খাজনা দিতেও চাহিয়াছে, কারণ একে ঐ জমি খুব উর্ব্বরা, তাহার উপর নিকটে জল থাকায় মকাই প্রভৃতি ভাল জন্মাইবে ; কিন্তু আমি রাজী হই নাই।

তবে কতদিন আর রাখিতে পারিব ? সদর আপিস হইতে মাঝে মাঝে চিঠি আসিতেছে.

সরস্বতী কুণ্ডীর জমি আমি কেন বিলি করিতে বিলম্ব করিতেছি। নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়া এখনও পর্য্যন্ত রাখিয়াছি বটে, কিন্তু বেশী দিন পারিব না। মানুষের লোভ বড় বেশী, দুটি ভুট্টার ছড়া আর চীনাঘাসের এককাঠা দানার জন্য প্রকৃতির অমন স্বপ্নকুঞ্জ ধ্বংস করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বাধিবে না, জানি। বিশেষ করিয়া এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য্য বোঝে না, রম্য ভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মত পেটে খাইয়া জীবন যাপন করিতে। অন্য দেশ হইলে আইন করিয়া এমন সব স্থান সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, যেমন আছে কালিফোর্নিয়ার যোসেমাই ন্যাশনাল পার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক, বেলজিয়ান কঙ্গোতে আছে পার্ক ন্যাশনাল আলবার্ট। আমার জমিদাররা ও ল্যাণ্ডস্কেপ বুঝিবে না, বুঝিবে সেলামীর টাকা, খাজনার টাকা, আদায় ইরশাল, হস্তবুদ।

এই জন্মান্ধ মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল জানি না—শুধু তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আজও সরস্বতী হ্রদের তীরবর্ত্তী বনানী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।

কিন্তু কতদিন রাখিতে পারিব?

যাক্, আমারও কাজ শেষ হইয়া আসিল বলিয়া।

প্রায় তিন বছর বাংলা দেশে যাই নাই—মাঝে মাঝে বাংলা দেশের জন্য মন বড় উতলা হয়। সারা বাংলা দেশ আমার গৃহ—তরুণী কল্যাণী বধূ সেখানে আপন হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখায়; এখানকার এমন লক্ষ্মীছাড়া উদাস ধূ ধূ প্রান্তর ও ঘন বনানী নয়—যেখানে নারীর হাতের স্পর্শ নাই।

কি হইতে যেন মনে অকারণ আনন্দের বান ডাকিল তাহা জানি না। জ্যোৎস্না-রাত্রি—তখনই ঘোড়ায় জিন কষিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে রওনা হইলাম, কারণ তখন নাঢ়া ও লবটুলিয়া বইহারের বনরাজি শেষ হইয়া আসিয়াছে—যাহা কিছু অরণ্য-শোভা ও নির্জ্জনতা আছে তখনও সরস্বতীর তীরেই। আমি মনে মনে বেশ বুঝিলাম, এ আনন্দকে উপভোগ করিবার একমাত্র পটভূমি হইতেছে সরস্বতী হ্রদের তীরবর্ত্তী বনানী।

ঐ সরস্বতীর জল জ্যোৎস্নালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে—চিক্ চিক্ করিতেছে কি শুধু? ঢেউয়ে ঢেউয়ে জ্যোৎস্না ভাঙিয়া পড়িতেছে। নির্জ্জন, স্তব্ধ বনানী হ্রদের জলের তিন দিকে বেষ্টন করিয়া, বন্য লাল হাঁসের কাকলী, বন্য শেফালী-পুষ্পের সৌরভ; কারণ যদিও জ্যৈষ্ঠ মাস, শেফালীফুল এখানে বারোমাস ফোটে।

কতক্ষণ হ্রদের তীরে এদিকে ওদিকে ইচ্ছামত ঘোড়া চালাইয়া বেড়াইলাম। হ্রদের জলে পদ্ম ফুটিয়াছে, তীরের দিকে ওয়াটারক্রোফ্‌ট ও যুগলপ্রসাদের আনীত স্পাইডার লিলির ঝাড় বাঁধিয়াছে। দেশে চলিয়াছি কতকাল পরে, এ নির্জ্জন অরণ্যবাস হইতে মুক্তি পাইব, সেখানে বাঙালী মেয়ের হাতে রান্না খাদ্য খাইয়া বাঁচিব, কলিকাতায় এক-আধ দিন থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিব, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কত কাল পরে আবার দেখা হইবে।

এইবার ধীরে ধীরে সে অননুভূত আনন্দের বন্যা আমার মনের কূল ভাসাইয়া দোলা দিতে

লাগিল। যোগাযোগ হইয়াছিল বোধ হয় অদ্ভুত—এতদিন পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন, সরস্বতী হ্রদের জ্যোৎস্নালোকিত-বারিরাশি ও বনফুলের শোভা, বন্য শেফালীর জ্যোৎস্না-মাখানো সুবাস, শান্ত স্তব্ধতা—ভাল ঘোড়ার চমৎকার কোণাকুণি ক্যাণ্টার চাল, হু হু হাওয়া—সব মিলিয়া স্বপ্ন! স্বপ্ন! আনন্দের ঘন নেশা! আমি যেন যৌবনোন্মত্ত তরুণ দেবতা, বাধাবন্ধহীন, মুক্ত গতিতে সময়ের সীমা পার হইয়া চলিয়াছি—এই চলাই যেন আমার অদৃষ্টের জয়লিপি, আমার সৌভাগ্য, আমার প্রতি কোন্ সুপ্রসন্ন দেবতার আশীর্ব্বাদ!

হয়তো আর ফিরিব না—দেশে ফিরিয়া মরিয়াও ত যাইতে পারি। বিদায় সরস্বতী-কুণ্ডী, বিদায়—তীরতরু-সারি, বিদায়—জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত বনানী। কলিকাতার কোলাহলমুখর রাজপথে দাঁড়াইয়া তোমার কথা মনে পড়িবে, বিস্মৃত জীবনদিনের বীণার অনতিস্পষ্ট ঝঙ্কারের মত—মনে পড়িবে যুগলপ্রসাদের আনা গাছগুলির কথা. জলের ধারে স্পাইডার লিলি ও পদ্মের বন, তোমার বনের নিবিড় ডালপালার মধ্যে স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক, অস্তমেঘের ছায়ায় রাঙা ময়নাকাঁটার গুঁড়ি ও ডাল, তোমার নীল জলে উপরকার নীল আকাশে উড়ন্ত সিল্লি ও লাল হাঁসের সারি—জলের ধারের নরম কাদার উপরে হরিণ-শিশুর পদচিহ্ন··· নির্জ্জনতা, সুগভীর নির্জ্জনতা। বিদায়, সরস্বতী কুণ্ডী।

ফিরিবার পথে দেখি সরস্বতী হ্রদের বন হইতে বাহির হইয়া মাইলখানেক দূরে একটা জায়গায় বন কাটিয়া একখানা ঘর বসাইয়া মানুষ বাস করিতেছে—এই জায়গাটার নাম হইয়াছে নয়া লবটুলিয়া—যেমন নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ বা নিউ ইয়র্ক। নূতন গৃহস্থ পরিবার আসিয়া বনের ডালপালা কাটিয়া (নিকটে বড় বন নাই, সুতরাং সরস্বতীর তীরবর্ত্তী বন হইতেই আমদানী নিশ্চয়ই) ঘাসের ছাওয়া তিন-চারখানা নীচু নীচু খুপড়ি বাঁধিয়াছে। তারই নীচে এখনও পর্য্যন্ত ভিজা দাওয়ার উপর একটা নারিকেল কিংবা কড়ুয়া তেলের গলা-ভাঙা বোতল, একটি উলঙ্গ হামাগুড়িরত কৃষ্ণকায় শিশু, কয়েকটি সিহোড়া গাছের সরু ডালে বোনা ঝুড়ি, একটি মোটা রূপার অনন্ত পরা যক্ষের মত কালো আঁটসাঁট গড়নের বউ, খানকয়েক পিতলের লোটা ও থালা ও কয়েকখানা দা, খোন্তা, কোদাল। ইহাই লইয়া ইহারা প্রায় সবাই সংসার করে। শুধু নিউ লবটুলিয়া কেন, ইসমাইলপুর ও নাঢ়া বইহারের সর্ব্বত্রই এইরূপ। কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাই ভাবি; ভদ্রাসন, নাই, পৈতৃক ভিটা নাই, গ্রামের মায়া নাই, প্রতিবেশীর স্নেহমমতা নাই—আজ ইসমাইলপুরের বনে, কাল মুঙ্গেরের দিয়ারা চরে, পরশু জয়ন্তী পাহাড়ের নীচে তরাই ভূমিতে—সর্ব্বত্রই ইহাদের গতি, সর্ব্বত্রই ইহাদের ঘর।

পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া দেখি রাজু পাঁড়ে এই ধরনের একটি গৃহস্থ-বাড়ীতে বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে। উহাকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। আমায় সবাই মিলিয়া খাতির করিয়া বসাইল। রাজুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে এখানে কবিরাজি করিতে আসিয়াছিল। ভিজিট পাইয়াছে চারিকাঠা যব এবং নগদ আট পয়সা। ইহাতেই সে মহা খুশী হইয়া ইহাদের সহিত আসর জমাইয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে।

আমায় বলিল—বসুন, একটা কথার মীমাংসা করে দিন ত বাবুজী! আচ্ছা, পৃথিবীর কি

শেষ আছে ? আমি ত এদের বলছি বাবু, যেমন আকাশের শেষ নেই, পৃথিবীরও তেমনি শেষ নেই। কেমন, তাই না বাবুজী ?

বেড়াইতে আসিয়া এমন গুরুতর জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই।

রাজু পাঁড়ের দার্শনিক মন সর্ব্বদাই জটিল তত্ত্ব লইয়া কারবার করে জানি এবং ইহাও জানি যে ইহাদের সমাধানে সে সর্ব্বদাই মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, যেমন রামধনু উইয়ের ঢিবি হইতে জন্মায়, নক্ষত্রদল যমের চর, মানুষ কি পরিমাণে বাড়িতেছে তাহাই সরেজমিনে তদারক করিবার জন্য যম কর্তৃক উহারা প্রেরিত হয়—ইত্যাদি।

পৃথিবীতত্ত্ব যতটা আমার জানা আছে বুঝাইয়া বলিতে রাজু বলিল—কেন সূর্য্য পূর্ব্বদিকে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়, আচ্ছা কোন্ সাগর থেকে সূর্য্য উঠছে আর কোন্ সাগরে নামছে এর কেউ নিরাকরণ করতে পেরেছে ? রাজু সংস্কৃত পড়িয়াছে, 'নিরাকরণ' কথাটা ব্যবহার করাতে গাঙ্গোতা গৃহস্থ ও তাহার পরিবার-বর্গ সপ্রশংস ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল ইংরেজীনবিশ বাংগালী বাবুকে কবিরাজ মশায় একেবারে কি অথৈ জলে টানিয়া লইয়া ফেলিয়াছে ! বাংগালী বাবু এবার হাবুডুবু খাইয়া মরিল দেখিতেছি।

বলিলাম—রাজু, তোমার চোখের ভুল, সূর্য্য কোথাও যায় না, এক জায়গায় স্থির আছে।

রাজু আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গাঙ্গোতার দল হা হা করিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে হাসিয়া উঠিল। হায় গ্যালিলিও, এই নাস্তিক বিচারমূঢ় পৃথিবীতেই তুমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলে !

বিস্ময়ের প্রথম রেশ কাটিয়া গেলে রাজু আমায় বলিল স্থরযনারায়ণ পূর্ব্বে উদয়-পাহাড়ে উঠেন না বা, পশ্চিম-সমুদ্রে অস্ত যান না ?

বলিলাম—না।

—এ-কথা ইংরিজি বইতে লিখেছে ?

—হাঁ।

জ্ঞান মানুষকে সত্যই সাহসী করে ; যে শান্ত, নিরীহ রাজু পাঁড়ের মুখে কখনও উঁচু সুরে কথা শুনি নাই—সে সতেজে, সদর্পে বলিল—ঝুট্ বাত বাবুজী। উদয়-পাহাড়ের যে গুহা থেকে স্থরযনারায়ণ রোজ ওঠেন সে গুহা একবার মুঙ্গেরের এক সাধু দেখে এসেছিলেন। অনেক দূর হেঁটে যেতে হয়, পূর্ব্বদিকের একেবারে সীমানায় সে পাহাড়, গুহার মুখে মস্ত পাথরের দরজা, ওঁর অভ্রের রথ থাকে সেই গুহার মধ্যে। যে-সে কি দেখতে পায় হুজুর ? বড় বড় সাধু মহান্ত দেখেন। ঐ সাধু অভ্রের রথের একটা কুচি এনেছিলেন—এই এত বড় চক্‌চকে অভ্র—আমার গুরুভাই কামতাপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখেছেন।

কথা শেষ করিয়া রাজু সগর্ব্বে একবার সমবেত গাঙ্গোতাদের মুখের দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া চাহিল।

উদয়-পর্ব্বতের গুহা হইতে সূর্য্যের উত্থানের এতবড় অকাট্য ও চাক্ষুষ প্রমাণ উত্থাপিত করার পরে আমি সেদিন একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১

যুগলপ্রসাদকে একদিন বলিলাম—চল, নতুন গাছপালার সন্ধান ক'রে আসি মহালিখারূপের পাহাড়ে।

যুগলপ্রসাদ সোৎসাহে বলিল—এক রকম লতানে গাছ আছে ওই পাহাড়ের জঙ্গলে—আর কোথাও নেই। চীহড় ফল বলে এদেশে, চলুন খুঁজে দেখি।

নাঢ়া বইহারের নূতন বস্তিগুলির মধ্য দিয়া পথ। এরই মধ্যে এক-এক পাড়ায় সর্দ্দারের নাম অনুসারে টোলার নামকরণ হইয়াছে—ঝল্লুটোলা, রূপদাসটোলা, বেগমটোলা ইত্যাদি। উদুখলে ধুপধাপ যব কোটা হইতেছে, খোলাছাওয়া মাটির ঘর হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উপরে উঠিতেছে—উলঙ্গ কৃষ্ণকায় শিশুর দল পথের ধারে ধূলাবালি ছড়াইয়া খেলা করিতেছে।

নাঢ়া বইহারের উত্তর সীমানা এখনও ঘন বনভূমি। তবে লবটুলিয়া বইহারে আর এতটুকু বনজঙ্গল বা গাছপালা নাই—নাঢ়া বইহারের শোভাময়ী বনভূমির বারোআনা গিয়াছে, কেবল উত্তর সীমানায় হাজার দুই বিঘা জমি এখনও প্রজাবিলি হয় নাই। দেখিলাম যুগলপ্রসাদ ইহাতে বড় দুঃখিত।

বলিল · গাঙ্গোতার দল ব'সে সব নষ্ট করলে, হুজুর। ওদের ঘরঘাড়ী নেই, হাঘরের দল। আজ এখানে, কাল সেখানে। এমন বন নষ্ট করলে!

বলিলাম—ওদের দোষ নেই যুগলপ্রসাদ। জমিদারে জমি ফেলে রাখবে কেন, তারাও তো গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ দিচ্ছে, চিরকাল ঘর থেকে রেভিনিউ গুনবে? জমিদার ওদের এনেছে, ওদের কি দোষ?

—সরস্বতী কুণ্ডী দেবেন না হুজুর। বড় কষ্টে ওখানে গাছপালা সংগ্রহ করে এনে বসিয়েছি—

—আমার ইচ্ছেয় ত হবে না, যুগল। এতদিন বজায় রেখেছি এই যথেষ্ট, আর কত দিন রাখা যাবে বল। ওদিকে জমি ভাল দেখে প্রজারা সব ঝুঁকছে।

সঙ্গে আমাদের দু-তিন জন সিপাহী ছিল। তারা আমাদের কথাবার্ত্তার গতি বুঝিতে না পারিয়া আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিল কিছু ভাববেন না হুজুর, সামনে চৈতী ফসলের পরে সরস্বতী কুণ্ডীর জমি এক টুক্‌রো পড়ে থাকবে না।

মহালিখারূপের পাহাড় প্রায় নয় মাইল দূরে। আমার আপিসঘরের জানালা হইতে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাইত। পাহাড়ের তলায় পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল।

কি সুন্দর রৌদ্র আব কি অদ্ভুত নীল আকাশ সেদিন! এমন নীল কখনও যেন আকাশে দেখি নাই · কেন যে এক-এক দিন আকাশ এমন গাঢ় নীল হয়, রৌদ্রের কি অপূর্ব্ব রং, নীল আকাশ যেন মদের নেশার মত মনকে আচ্ছন্ন করে। কচি পত্রপল্লবের গায়ে রৌদ্র পড়িয়া

স্বচ্ছ দেখায়—আর নাঢ়া বইহারের ও লবটুলিয়ার যত বন্য পক্ষীর ঝাঁক বাসা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কতক সরস্বতী সরোবরের বনে, কতক এখানে ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে আশ্রয় লইয়াছে - তাহাদের কি অবিশ্রান্ত কূজন !

ঘন বন। এমন ঘন নির্জ্জন আরণ্যভূমিতে মনে একটি অপূর্ব্ব শান্তি ও মুক্ত অবাধ স্বাধীনতার ভাব আনে—কত গাছ, কত ডালপালা, কত বনফুল, কত বড় বড় পাথর ছড়ানো—যেখানে সেখানে বসিয়া থাক, শুইয়া পড, অলস জীবনমুহূর্ত্ত প্রস্ফুটিত পিয়াল বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় বসিয়া কাটাইয়া দাও—বিশাল নির্জ্জন আরণ্যভূমি তোমার শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে জড়াইয়া দিবে।

আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি—বড় বড় গাছ মাথার উপরে সূর্য্যের আলোক আটকাইয়াছে—ছোট বড় ঝরনা কল্ কল্ শব্দে বনের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিতেছে—হরীতকী গাছ, কেলিকদম্ব গাছের সেগুন পাতার মত বড বড় পাতায় বাতাস বাধিয়া শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। বন-মধ্যে ময়ূরের ডাক শোনা গেল।

আমি বলিলাম—যুগলপ্রসাদ, চীহড় ফলের গাছ কোথায়, খোঁজ।

চীহড় ফলের গাছ পাওয়া গেল আরও অনেক উপরে উঠিয়া। স্থলপদ্মের পাতার মত পাতা, খুব মোটা কাষ্ঠময় লতা, আঁকিয়া বাঁকিয়া অন্য গাছকে আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে। ফলগুলি শিমজাতীয়, তবে শিমের দুখানি খোলা কটকী চটিজুতার মত বড়, অমনি কঠিন ও চওড়া—ভিতরে গোল বীচি। আমরা শুকনো লতাপাতা জ্বালাইয়া বীচি পুড়াইয়া খাইয়াছি—ঠিক যেন গোল আলুর মত আস্বাদ।

অনেক দূর উঠিয়াছি। ওই দূরে মোহনপুরা ফরেস্ট—দক্ষিণে ওই আমাদের মহাল, ওই সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্ত্তী জঙ্গল অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ওই নাঢ়া বইহারের অবশিষ্ট সিকিভাগ বন—ওই দূরে কুশী নদী মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের পূর্ব্ব সীমানা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত—নিম্নের সমতল ভূমির দৃশ্য যেন ছবির মত !

—ময়ূর ! ময়ূর—হুজুর, ঐ দেখুন, ময়ূর !—

প্রকাণ্ড একটা ময়ূর মাথার উপরেই এক গাছের ডালে বসিয়া। একজন সিপাহী বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল, সে গুলি করিতে গেল, আমি বারণ করিলাম।

যুগলপ্রসাদ বলিল—বাবুজী, একটা গুহা আছে পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলে কোথায়—তার গায়ে সব ছবি আঁকা আছে—কত কালের কেউ জানে না, সেটাই খুঁজছি।

হয়তো বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের হাতে আঁকা বা খোদাই ছবি গুহার কঠিন পাথরের গায়ে ! পৃথিবীর ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বৎসরের যবনিকা এক মুহূর্ত্তে অপসারিত হইয়া সময়ের উজানে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে আমাদের !

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাঙ্কিত ছবি দেখিবার প্রবল আগ্রহে জঙ্গল ঠেলিয়া গুহা খুঁজিয়া বেড়াইলাম—গুহাও মিলিল, কিন্তু যে অন্ধকার তাহার ভিতরে ঢুকিবার সাহস হইল না। ঢুকিলেই বা অন্ধকারের মধ্যে কি দেখিব ! অন্য একদিন তোড়জোড় করিয়া আসিতে হইবে—আজ

থাক্। অন্ধকারে কি শেষে ভীষণ বিষধর চন্দ্রবোড়া কিংবা শঙ্খচূড় সাপের হাতে প্রাণ দিব? এ-সব স্থানে তাহাদের অভাব নাই।

যুগলপ্রসাদকে বলিলাম—এ জঙ্গলে কিছু গাছপালা লাগাও-নূতন ধরনের। পাহাড়ের বন কেউ কখনো কাটবে না। লবটুলিয়া তো গেল—সরস্বতী কুণ্ডীর ভরসাও ছাড়—

যুগলপ্রসাদ বলিল—ঠিক বলেছেন হুজুর। কথাটা মনে লেগেছে। কিন্তু আপনি ত আসছেন না, আমাকে একাই করতে হবে।

—আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। তুমি লাগাও।

মহালিখারূপের পাহাড় একটা পাহাড় নয়, একটা নাতিদীর্ঘ, অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, কোথাও দেড় হাজার ফুটের বেশী উঁচু নয়—হিমালয়েরই পাদশৈলের নিম্নতর শাখা, যদিও তরাই প্রদেশের জঙ্গল ও আসল হিমালয় এখান হইতে এক-শ হইতে দেড়-শ মাইল দূরে। মহালিখারূপের পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের সমতল ভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় প্রাচীন যুগের মহাসমুদ্র এক সময়ে এই বালুকাময় উচ্চ তটভূমির গায়ে আছড়াইয়া পড়িত, গুহাবাসী মানব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিদ্রিত এবং মহালিখারূপের পাহাড় তখন সেই সুপ্রাচীন মহাসাগরের বালুকাময় বেলাভূমি।

যুগলপ্রসাদ অন্তত আট-দশ রকমের নূতন গাছ-লতা দেখাইল—সমতল ভূমির বনে এগুলি নাই—পাহাড়ের উপরকার বনের প্রকৃতি অন্য ধরনের—গাছপালাও অনেক অন্য রকম।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কি রকমের বনফুলের গন্ধ খুব পাওয়া যাইতেছিল—বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। গাছের ডালে ঘুঘু, পাহাড়ী বনটিয়া, হরটিট প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কূজন!

বাঘের ভয় বলিয়া সঙ্গীরা পাহাড় হইতে নামিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, নতুবা এই আসন্ন সন্ধ্যায় নিবিড় ছায়ায় নির্জ্জন শৈলসানুর বনভূমিতে যে শোভা ফুটিয়াছে, তাহা ফেলিয়া আসিতে ইচ্ছা করে না।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গলের চেয়েও এখানে বাঘের ভয় বেশী। বিকেলের পর এখানে যারা কাঠকুটো কাটতে আসে সব নেমে যায়। আর দল না বেঁধে একা কেউ এ পাহাড়ে আসেও না। বাঘ আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে—দেখছেন না কি গজাড় জঙ্গল সারা পাহাড়ে!

অগত্যা আমরা নামিতে লাগিলাম। পাহাড়ের জঙ্গলে কেলিকদম্ব গাছের বড় পাতার আড়ালে শুক্র ও বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

একদিন দেখি এমনি একটি নূতন গৃহস্থের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া গনোরী তেওয়ারী স্কুলমাস্টার শাল পাতার ওপর ছাতুর তাল মাখিয়া খাইতেছে।

—হুজুর যে! ভাল আছেন?

—বেশ আছি। তুমি কবে এলে? কোথায় ছিলে? এরা তোমার কেউ হয় নাকি?

—কেউ নয়। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বেলা হয়ে গিয়েছে, ব্রাহ্মণ, এদের এখানে অতিথি হ'লাম। তাই দুটো খাচ্ছি। চেনা-শুনো ছিল না, তবে আজ হল।

গৃহকর্তা আগাইয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—আসুন, হুজুর, বসুন উঠে।

—না, বসব না। বেশ আছি। কতদিন জমি নিয়েছ?

—আজ দু-মাস হুজুর। এখনও জমি চষতে পারি নি।

গনোরী তেওয়ারীকে একটি ছোট মেয়ে আসিয়া কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা দিয়া গেল। সে খাইতেছে কলাইয়ের ছাতু, নুন ও লঙ্কা। ছাতুর সে বিরাট তাল শীর্ণ গনোরী তেওয়ারীর পেটে কোথায় ধরিবে বোঝা কঠিন। গনোরী খাঁটি ভবঘুরে। যেখানে খাইতে বসিয়াছে, সেই দাওয়ার এক পাশে একটি ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, একটি গেলাপ অর্থাৎ পাতলা বালাপোশ-জাতীয় লেপ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম উহা গনোরীর—এবং উহাই উহার সমগ্র জাগতিক সম্পত্তি। গনোরীকে বলিলাম—ব্যস্ত আছি, তুমি কাছারিতে এসো ওবেলা।

বিকালে গনোরী কাছারিতে আসিল।

বলিলাম—কোথায় ছিলে গনোরী?

—বাবুজী, মুঙ্গের জেলায় পাড়াগাঁ অঞ্চলে। বহুৎ পাড়াগাঁয়ে ঘুরেছি।

—কি করে বেড়াতে?

—পাঠশালা করতাম। ছেলে পড়াতাম।

—কোনো পাঠশালা টিকল না?

—দু তিন মাসের বেশী নয় হুজুর। ছেলেরা মাইনে দেয় না।

—বিয়ে-থাওয়া করেছ? বয়স কত হল?

– নিজেরই পেট চলে না হুজুর, বিয়ে করব কি? বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হয়েছে।

গনোরীর মত এত দরিদ্র লোক এ অঞ্চলেও বেশী দেখা যায় না। মনে পড়িল, গনোরী একবার বিনা-নিমন্ত্রণে ভাত খাইতে আমার কাছারিতে আসিয়াছিল, প্রথম যেবার এখানে আসি। বর্ত্তমানে বোধ হয় কত কাল সে ভাত খাইতে পায় নাই। গাঙ্গোতা-বাড়ীতে অতিথি হইয়া কলাইয়ের ছাতু খাইয়া দিন কাটাইতেছে।

বলিলাম—গনোরী, আজ রাত্রে আমার এখানে খাবে। কণ্ট মিশির রাঁধে, তার হাতে তোমার তো খেতে আপত্তি নেই?···

গনোরী বেজায় খুশী হইল। একগাল হাসিয়া বলিল—কণ্টু আমাদেরই ব্রাহ্মণ, ওর

হাতে আগেও তো খেয়েছি—আপত্তি কি ?

তার পর বলিল—হুজুর, বিয়ের কথা যখন তুললেন তখন বলি। আর বছর শ্রাবণ মাসে একটা গাঁয়ে পাঠশালা খুললাম। গাঁয়ে একঘর আমাদেরই ব্রাহ্মণ ছিল। তার বাড়ীতে থাকি। ওর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা সব ঠিকঠাক, এমন কি আমি মুঙ্গের থেকে ভাল মেরজাই একটা কিনে আনলাম—তার পর পাড়ার লোক ভাঙচি দিলে—বললে—ও গরীব স্কুলমাস্টার, চাল নেই, চুলো নেই, ওকে মেয়ে দিও না। তাই সে বিয়ে ভেঙে গেল। আমি সে গাঁ ছেড়ে চলেও গেলাম।

—মেয়েটিকে দেখেছিলে ? দেখতে ভাল ?

—দেখি নি ? চমৎকার মেয়ে, হুজুর ! তা আমাকে কেন দেবে ? সত্যিই তো। আমার কি আছে বলুন না ?

দেখিলাম গনোরী বেশ দুঃখিত হইয়াছে বিবাহ ফাঁসিয়া যাওয়াতে, মেয়েটিকে মনে ধরিয়াছিল।

তারপর অনেকক্ষণ বসিয়া সে গল্প করিল। তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল জীবন তাহাকে কোনো জিনিস দেয় নাই—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়াছে দুটি পেটের ভাতের জন্য ! তাও জোটাইতে পারে নাই। গাঙ্গোতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াই অর্দ্ধেক জীবন কাটাইয়া দিল।

বলিল—অনেক দিন পরে তাই লবটুলিয়াতে এলাম। এখানে অনেক নতুন বস্তি হয়েছে শুনলাম। সে জঙ্গল-মহাল আর নেই। এখানে যদি একটা পাঠাশালা খুলি—তাই এলাম। চলবে না, কি বলেন হুজুর ?

তখনই মনে মনে ভাবিলাম, এখানে একটা পাঠশালা করিয়া দিয়া গনোরীকে রাখিয়া দিব। এতগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার মহালে নব আগন্তুক, তাহাদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা আমারই কর্ত্তব্য ; দেখি কি করা যায়।

৩

অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না-রাত। যুগলপ্রসাদ ও রাজু পাঁড়ে গল্প করিতে আসিল। কাছারি হইতে কিছু দূরে একটি ছোট বস্তি বসিয়াছে। সেখানকার একটি লোকও আসিল। আজ চার দিন মাত্র তাহারা ছাপরা জেলা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে।

লোকটি তাহার জীবনের ইতিহাস বলিতেছিল। স্ত্রী-পুত্র লইয়া কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, কত চরে জঙ্গলে বন কাটিয়া কতবার ঘরদোর বাঁধিয়াছে। কোথাও তিন বছর, কোথাও পাঁচ বছর, এক জায়গায় কুশী নদীর ধারে ছিল দশ বছর। কোথাও উন্নতি করিতে পারে নাই। এইবার লবটুলিয়া বইহারে আসিয়াছে উন্নতি করিতে।

এই সব যাযাবর গৃহস্থজীবন বড় বিচিত্র। কথা বলিয়া দেখিয়াছি ইহাদের সঙ্গে, সম্পূর্ণ

বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের জীবন—সমাজ নাই, সংসার নাই, ভিটার মায়া নাই। নীল আকাশের নীচে সংসার রচনা করিয়া, বনে শৈলে শ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায়, বড় নদীর নির্জ্জন চরে ইহাদের বাস। আজ এখানে, কাল সেখানে।

ইহাদের প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু সবই আমার কাছে নূতন ও অদ্ভুত। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত লাগিল বর্ত্তমানে এই লোকটির উন্নতির আশা।

এই লবটুলিয়ার জঙ্গলে সামান্য পাঁচ বিঘা কি দশ বিঘা জমিতে গম চাষ করিয়া সে কিরূপ উন্নতির আশা করে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। নাম বলভদ্র সেন্হাই, জাতে চাষা কালোয়ার অর্থাৎ কলু। এই বয়সে সে এখনও আশা রাখে জীবনে উন্নতি করিবার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বলভদ্র, এর আগে কোথায় ছিলে?

—হুজুর, মুঙ্গের জেলায় এক দিয়াডার চরে। দু-বছর সেখানে ছিলাম - তার পরে অজন্মা হয়ে মকাই ফসল নষ্ট হয়ে গেল। সে-জায়গায় উন্নতি হবার আশা নেই দেখলাম। হুজুর, সংসারে সবাই উন্নতি করবার জন্যে চেষ্টা পায়। এইবার দেখি হুজুরের আশ্রয়ে—

রাজু পাঁড়ে বলিল—আমার ছটা মহিষ ছিল যখন প্রথম এখানে আসি—এখন হয়েছে দশটা। লবটুলিয়া উন্নতির জায়গা—

বলভদ্র বলিল—মহিষ আমায় এক জোড়া কিনে দিও পাঁড়েজী। এবার ফসল হোক, সেই টাকা দিয়ে মহিষ কিনতেই হবে—ও ভিন্ন উন্নতি হয় না।

গনোরী ইহাদের কথা শুনিতেছিল। সেও বলিল—ঠিক কথা! আমারও ইচ্ছে আছে মহিষ দু-একটা কিনব। একটু কোথাও বসতে পারলেই—

মহালিখারূপের পাহাড়ের গাছপালা এবং তাহারও পিছনে ধন্‌ঝরি শৈলমালা অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে জ্যোৎস্নার আলোয়, একটু একটু শীত বলিয়া ছোট একটি অগ্নিকুণ্ড করা হইয়াছে আমাদের সামনে—এক দিকে রাজু পাঁড়ে ও যুগলপ্রসাদ, অন্য দিকে বলভদ্র ও তিন-চারটি নবাগত প্রজা।

আমার কাছে কি অদ্ভুত ঠেকিতেছিল ইহাদের বৈষয়িক উন্নতির কথা। উন্নতি সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা অভাবনীয় ধরনের উচ্চ নয়—ছ'টি মহিষের স্থানে দশটা মহিষ না-হয় বারোটা মহিষ—এই সুদূর দুর্গম অরণ্য ও শৈলমালা বেষ্টিত বন্য দেশেও মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কেমন, জানিবার সুযোগ পাইয়া আজকার জ্যোৎস্না-রাতটাই আমার নিকটে অপূর্ব্ব রহস্যময় মনে হইল। শুধু জ্যোৎস্নারাত কেন, মহালিখারূপের ঐ পাহাড়, দূরে ওই ধন্‌ঝরি শৈলমালা, ঐ পাহাড়ের উপরকার ঘন বনশ্রেণী।

কেবল যুগলপ্রসাদ এ-সব বৈষয়িক কথাবার্ত্তায় থাকে না। ও আর এক ধরনের ব্রাত্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে—জমি-জমা, গরু মহিষের আলোচনা করিতে ভালও বাসে না, তাহাতে যোগও দেয় না।

সে বলিল সরস্বতী কুণ্ডীর পূব পাড়ের জঙ্গলে যতগুলো হংসলতা লাগিয়েছিলাম, সবগুলো

কেমন ঝাঁপালো হয়ে উঠেছে দেখেছেন বাবুজী? এবার জলের ধারে স্পাইডার-লিলির বাহারও খুব। চলুন, যাবেন জ্যোৎস্নারাতে বেড়াতে?

দুঃখ হয়—যুগলপ্রসাদের এত সাধের সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমি—কত দিন বা রাখিতে পারিব? কোথায় দূর হইয়া যাইবে হংসলতা আর বন্য শেফালিবন। তাহার স্থানে দেখা দিবে শীর্ষ-ওঠা মকাই ও জনারের ক্ষেত এবং সারি সারি খোলা-ছাওয়া ঘর, চালে চালে ঠেকানো, সাম্‌নে চারপাই পাতা।···কাদা-হাবড় আঙিনায় গরু-মহিষ নাদায় জাব খাইতেছে।

এই সময় মটুকনাথ পণ্ডিত আসিল। আজকাল মটুকনাথের টোলে প্রায় পনরটি ছাত্র কলাপ ও মুগ্ধবোধ পড়ে। তাহার অবস্থা আজকাল ফিরিয়া গিয়াছে। গত ফসলের সময় যজমানদের ঘর হইতে এত গম ও মকাই পাইয়াছে যে, টোলের উঠানে তাহাকে একটা ছোট গোলা বাঁধিতে হইয়াছে!

অধ্যবসায়ী লোকের উন্নতি যে হইতেই হইবে—মটুকনাথ পণ্ডিত তাহার অকাট্য প্রমাণ।

উন্নতি!—আবার সেই উন্নতির কথা আসিয়া পড়িল।

কিন্তু উন্নতির কথা না আসিয়া উপায় নাই। চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি মটুকনাথ উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই তাহার আজকাল খুব খাতির সম্মান—আমার কাছারির যে-সব সিপাহী ও আমলা মটুকনাথকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিত—গোলাবাঁধার পর হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি তাহারা মটুকনাথকে সম্মান ও খাতির করিয়া চলে। সঙ্গে সঙ্গে টোলের ছাত্রসংখ্যাও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ যুগলপ্রসাদ বা গনোরী তেওয়ারীকে কেউ পোঁছেও না। রাজু পাড়েও নবাগত প্রজাদের মধ্যে খুব খাতির জমাইয়া ফেলিয়াছে—জড়িবুটির পুঁটুলি হাতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যায় গৃহস্থবাড়ীর ছেলেমেয়েদের নাড়ী টিপিয়া বেড়াইতেছে। তবে রাজু পাড়ে পয়সা তেমন বোঝে না, খাতির পাইয়া ও গল্প করিয়াই

৪

মাস তিন-চারের মধ্যে মহালিখারূপের পাহাড়ের কোল হইতে লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারের উত্তর সামীনা পর্য্যন্ত প্রজা বসিয়া গেল। পূর্ব্বে জমি বিলি হইয়া চাষ আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোকের বাস এত হয় নাই—এ বছর দলে দলে লোক আসিয়া রাতারাতি গ্রাম বসাইয়া ফেলিতে লাগিল।

কত ধরনের পরিবার। শীর্ণ টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বিছানাপত্র, বাসন, পিতলের ঘয়লা, কাঠের বোঝা, গৃহদেবতা, তোলা উনুন চাপাইয়া একটি পরিবারকে আসিতে দেখা গেল। মহিষের পিঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, হাঁড়িকুড়ি, ভাঙা লণ্ঠন, এমন কি চারপাই পর্য্যন্ত চাপাইয়া আর এক পরিবার আসিল। কোন কোন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া জিনিসপত্র ও শিশুদের বাঁকের দু-দিকে চাপাইয়া বাঁক কাঁধে বহুদূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেছে।

ইহাদের মধ্যে সদাচারী, পণ্ডিত মৈথিল ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙ্গোতা ও দোসাদ পর্য্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের লোকই আছে। যুগলপ্রসাদ মুহুরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কি এতদিন গৃহহীন অবস্থায় ছিল? এত লোক আসছে কোথা থেকে?

যুগলপ্রসাদের মন ভাল নয়। বলিল—এদেশের লোকই এই রকম। শুনেছে এখানে জমি সস্তায় বিলি হচ্ছে—তাই দলে দলে আসছে। সুবিধে বোঝে থাকবে, নয়তো আবার ডেরা উঠিয়ে অন্য জায়গায় ভাগবে।

—পিতৃপিতামহের ভিটের কোন মায়া নেই এদের কাছে?

—কিছু না বাবুজী। এদের উপজীবিকাই হচ্ছে নূতন-ওঠা চর বা জঙ্গলমহাল বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাস করা। বাস করাটা আনুষঙ্গিক। যতদিন ফসল ভাল হবে, খাজনা কম থাকবে, ততদিন থাকবে।

—তার পর?

—তার পর খোঁজ নেবে অন্য কোথায় নূতন চর বা জঙ্গল বিলি হচ্ছে, সেখানে চলে যাবে। এদের ব্যবসাই এই।

৫

সেদিন গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মাপিয়া দিতে গিয়াছি, আস্‌রফি টিণ্ডেল জমি মাপিতেছিল, আমি ঘোড়ার উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় কুন্তাকে টোলার পথ ধরিয়া যাইতে দেখিলাম।

কুন্তাকে অনেকদিন দেখি নাই। আস্‌রফিকে বলিলাম—কুন্তা আজকাল কোথায় থাকে, ওকে দেখি নি ত?

আস্‌রফি বলিল—ওরা কথা শোনেন নি বাবুজী? ও মধ্যে এখানে ছিল না অনেক দিন—

—কি রকম?

—রাসবিহারী সিং ওকে নিয়ে যায় তার বাড়ী। বলে, তুমি আমাদের জাতভাইয়ের স্ত্রী—আমার এখানে এসে থাক—

—বেশ।

—সেখানে কিছুদিন থাকবার পরে—ওর চেহারা দেখেছেন ত বাবুজী, এত দুঃখে কষ্টে এখনও—তার পর রাসবিহারী সিং কি-সব কথা বলে—এমন কি ওর উপর অত্যাচারও করতে যায়—তাই আজ মাসখানেক হ'ল সেখান থেকে পালিয়ে এসে আছে। শুনি রাসবিহারী ছোরা নিয়ে ভয় দেখায়। ও বলেছিল, মেরে ফেল বাবুজী, জান দেগা—ধরম দেগা নেহিন।

—কোথায় থাকে?

—ঝল্লুটোলায় এক গাঙ্গোতার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গোয়ালঘরের পাশে একখানা ছোট্ট চালা আছে সেখানেই থাকে।

—চলে কি করে? ওর ত দু-তিনটি ছেলেমেয়ে।

—ভিক্ষে করে—ক্ষেতের ফসল কুড়োয়। কলাই গম কাটে। বড় ভাল মেয়ে বাবু কুন্তা। বাইজীর মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু ভাল ঘরের মেয়ের মত মন-মেজাজ—কোন অসৎ কাজ ওকে দিয়ে হবে না।

জরীপ শেষ হইল। বালিয়া জেলার একটি প্রজা এই জমি বন্দোবস্ত লইয়াছে—কাল হইতে এখানে সে বাড়ী বাঁধিবে। গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের মহিমাও ধ্বংস হইল।

মহালিখারূপের পাহাড়ে উপরকার বড় বড় গাছপালার মাথায় রোদ রাঙা হইয়া আসিল। সিল্লীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে উড়িয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার আর দেরি নাই।

একটা কথা ভাবিলাম।

এতটুকু জমি কোথাও থাকিবে না এই বিশাল লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারে, যেমন দেখিতেছি। দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল—কিন্তু এই আরণ্যভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ অথচ যাহারা নিঃস্ব, হতভাগ্য—জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই বলিয়াই কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের অন্তত এতটুকু উপকার করিবই।

আস্‌রফিকে বলিলাম—আস্‌রফি, কুন্তাকে কাল সকালে কাছারিতে হাজির করতে পারবে? ওকে একটু দরকার আছে।

—হাঁ, হুজুর, যখন বলবেন।

পরদিন সকালে কুন্তাকে আস্‌রফি আমার আপিস-ঘরের সামনে বেলা ন'টার সময় লইয়া আসিল।

বলিলাম—কুন্তা, কেমন আছ?

কুন্তা আমায় দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—জী হুজুর, ভাল আছি।

—তোমার ছেলেমেয়েরা?

—ভাল আছে হুজুরের দোয়ায়।

—বড়ছেলেটি কত বড় হ'ল?

—এই আট বছরে পড়েছে, হুজুর।

—মহিষ চরাতে পারে না?

—অতটুকু ছেলেকে কে মহিষ চরাতে দেবে হুজুর?

কুন্তা সত্যই এখনও দেখিতে বেশ, ওর মুখে অসহায় জীবনের দুঃখকষ্ট যেমন ছাপ মারিয়া দিয়াছে—সাহস ও পবিত্রতাও তেমনি তাদের দুর্লভ জয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

এই সেই কাশীর বাইজীর মেয়ে, প্রেমবিহ্বলা কুন্তা!···প্রেমের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা এই দুঃখিনী রমণীর হাতে এখনও সগৌরবে জ্বলিতেছে, তাই ওর এত দুঃখ-দৈন্য, এত হেনস্থা, অপমান।

প্রেমের মান রাখিয়াছে কুন্তা।

বলিলাম—কুন্তা, জমি নেবে ?

কুন্তা কথাটি ঠিক শুনিয়াছে কিনা যেন বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত মুখে বলিল—জমি, হুজুর ?

—হাঁ, জমি। নূতন বিলি জমি !

কুন্তা একটুখানি কি ভাবিল। পরে বলিল—আগে ত আমাদেরই কত জোতজমা ছিল। প্রথম প্রথম এসে দেখেছি। তার পর সব গেল একে একে। এখন আর কি দিয়ে জমি নেব, হুজুর ?

—কেন, সেলামীর টাকা দিতে পারবে না ?

—কোথা থেকে দেব ? রাত্তির ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়োই পাছে দিনমানে কেউ অপমান করে। আধ টুকৃরি এক টুকৃরি কলাই পাই—তাই গুঁড়ো করে ছাতু করে বাচ্ছাদের খাওয়াই। নিজে খেতে সব দিন কুলোয় না—

কুন্তা কথা বন্ধ করিয়া চোখ নীচু করিল। দুই চোখ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আস্‌রফি সরিয়া গেল। ছোকরার হৃদয় কোমল, এখনও পরের দুঃখ ভাল রকম সহ্য করিতে পারে না।

আমি বলিলাম—কুন্তা, আচ্ছা ধর যদি সেলামী না লাগে ?

কুন্তা চোখ তুলিয়া জলভরা বিস্মিত চোখে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আস্‌রফি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কুন্তার সামনে হাত নাড়িয়া বলিল—হুজুর তোমায় এমনি জমি দেবেন, এমনি জমি দেবেন—বুঝলে না দাইজী ?

আস্‌রফিকে বলিলাম—ওকে জমি দিলে ও চাষ করবে কি করে আস্‌রফি ?

আস্‌রফি বলিল—সে বেশী কঠিন কথা নয় হুজুর। ওকে দু-একখানা লাঙল দয়া করে সবাই ভিক্ষে দেবে। এত ঘর গাঙ্গোতা প্রজা, একখানা লাঙল ঘর-পিছু দিলেই ওর জমি চাষ হয়ে যাবে। আমি সে-ভার নেব, হুজুর।

—আচ্ছা, কত বিঘে হ'লে ওর হয়, আস্‌রফি ?

—দিচ্ছেন যখন মেহেরবানি ক'রে হুজুর, দশ বিঘে দিন।

কুন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা, কেমন, দশ বিঘে জমি যদি তোমায় বিনা সেলামীতে দেওয়া যায়—তুমি ঠিকমত চাষ করে ফসল তুলে কাছারির খাজনা শোধ করতে পারবে ত ? অবিশ্যি প্রথম দু-বছর তোমার খাজনা মাপ। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে।

কুন্তা যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছি, না সত্য কথা বলিতেছি—ইহাই যেন এখনও সম্‌ঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

কতকটা দিশাহারাভাবে বলিল—জমি ! দশ বিঘে জমি !

আস্‌রফি আমার হইয়া বলিল—হাঁ—হুজুর তোমায় দিচ্ছেন। খাজনা এখন দু-বছর

মাপ। তীসরা সাল থেকে খাজনা দিও। কেমন রাজী?

কুন্তা লজ্জাজড়িত মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

আমার ইঙ্গিতে আস্‌রফি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১

সন্ধ্যার পরে লবটুলিয়ার নূতন বস্তিগুলি দেখিতে বেশ লাগে। কুয়াসা হইয়াছে বলিয়া জ্যোৎস্না একটু অস্পষ্ট, বিস্তীর্ণ প্রান্তরব্যাপী কৃষিক্ষেত্র, দূরে দূরে দু-পাঁচটা আলো জ্বলিতেছে বিভিন্ন বস্তিতে। কত লোক, কত পরিবার অন্নের সংস্থান করিতে আসিয়াছে আমাদের মহালে—বন কাটিয়া গ্রাম বসাইয়াছে, চাষ আরম্ভ করিয়াছে। আমি সব বস্তির নামও জানি না, সকলকে চিনিও না। কুয়াসাবৃত জ্যোৎস্নালোকে এখানে ওখানে দূরে নিকটে ছড়ানো বস্তিগুলি কেমন রহস্যময় দেখাইতেছে। যে-সব লোক এই সব বস্তিতে বাস করে, তাহাদের জীবনও আমার কাছে এই কুয়াসাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মত রহস্যাবৃত। ইহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি—জীবন সম্বন্ধে ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী, ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমার বড় অদ্ভুত লাগে।

প্রথম ধরা যাক ইহাদের খাদ্যের কথা। আমাদের মহালের জমিতে বছরে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায়—ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কড়াই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশী হয় না, কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশী নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশী, গম তাহার অর্দ্ধেক। সুতরাং লোকের প্রধান খাদ্য কলাইয়ের ছাতু।

ধান একেবারেই হয় না—ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি নাই। এ অঞ্চলের কোথাও—এমন কি কড়ারী জমিতে কিংবা গবর্ণমেণ্ট খাসমহালেও ধান হয় না। ভাত জিনিসটা সুতরাং এখানকার লোকে কালেভদ্রে খাইতে পায়—ভাত খাওয়াটা শখের বা বিলাসিতার ব্যাপার বলিয়া গণ্য। দু-চার জন খাদ্যবিলাসী লোক গম বা কলাই বিক্রয় করিয়া ধান কিনিয়া আনে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

তার পর ধরা যাক্ ইহাদের বাসগৃহের কথা। এই যে আমাদের মহালের দশ হাজার বিঘা জমিতে অগণ্য গ্রাম বসিয়াছে—সব গৃহস্থের বাড়ীই জঙ্গলের কাশ ছাওয়া, কাশ ডাঁটার বেড়া, কেহ কেহ তাহার উপর মাটি লেপিয়াছে, কেহ কেহ তাহা করে নাই। এদেশে বাঁশগাছ আদৌ নাই, সুতরাং বনের গাছের, বিশেষ করিয়া কেঁদ ও পিয়াল ডালের বাতা, খুঁটি ও আড়া দিয়াছে ঘরে।

ধর্ম্মের কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। ইহারা যদিও হিন্দু, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার

মধ্যে ইহারা হনুমানজীকে কি করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে জানি না—প্রত্যেক বস্তীতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই—এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়। রাম-সীতার কথা কচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশী আড়ালে ফেলিয়াছে। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার প্রচার তত নাই—আদৌ আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ আমাদের মহালে তো আমি দেখি নাই।

ভুলিয়া গিয়াছি, একজন শিবভক্ত দেখিয়াছি বটে। তার নাম দ্রোণ মাহাতো, জাতিতে গাঙ্গোতা। কাছারিতে কোথা হইতে কে একটা শিলাখণ্ড আনিয়া আজ নাকি দশ-বারো বছর কাছারির হনুমানজীর ধ্বজার নীচে রাখিয়া দিয়াছে—সিপাহীরা মাঝে মাঝে পাথর-খানাতে সিঁদুর মাখায়, এক ঘটি জলও কেউ কেউ দেয়। কিন্তু পাথরখানা বেশীর ভাগ অনাদৃত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে।

কাছারির কিছুদূরে একটা নূতন বস্তি আজ মাস-দুই গড়িয়া উঠিয়াছে—দ্রোণ মাহাতো সেখানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। দ্রোণের বয়স সত্তরের বেশী ছাড়া কম নয়—প্রাচীন লোক বলিয়াই তাহার নাম দ্রোণ, আধুনিক কালের ছেলেছোকরা হইলে নাকি নাম হইত ডোমন, লোধাই, মহারাজ ইত্যাদি। এসব বাবুগিরি নাম সেকালে বাপ-মায়ে রাখিতে লজ্জাবোধ করিত।

যাহা হউক, বৃদ্ধ দ্রোণ একবার কাছারি আসিয়া হনুমান-ধ্বজার নীচে পাথরখানা লক্ষ্য করিল। তার পর হইতে বৃদ্ধ কল্‌বলিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া এক ঘটি জল প্রত্যহ আনিয়া নিয়মিতভাবে পাথরের উপরে ঢালিত ও সাতবার পরম ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তবে বাড়ী ফিরিত।

দ্রোণকে বলিয়াছিলাম—কল্‌বলিয়া তো এক ক্রোশ দূর, রোজ যাও সেখানে, তার চেয়ে ছোট কুণ্ডীর জল আনলেই পার—

দ্রোণ বলিল—মহাদেওজী স্রোতের জলে তুষ্ট থাকেন, বাবুজী। আমার জন্ম সার্থক যে ওঁকে রোজ জল দিয়ে স্নান করাতে পাই।

ভক্তও ভগবানকে গড়ে। দ্রোণ মাহাতোর শিবপূজার কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন বস্তিতে ছড়াইয়া পড়িতেই মাঝে মাঝে দেখি দু-পাঁচজন শিবের পূজারী নর-নারী যাতায়াত শুরু করিল। এ অঞ্চলে এক ধরনের সুগন্ধ ঘাস জঙ্গলে উৎপন্ন হয়, ঘাসের পাতা বা ডাঁটা হাতে লইয়া আঘ্রাণ লইলে চমৎকার সুবাস পাওয়া যায়। ঘাস যত শুকায়, গন্ধ তত তীব্র হয়। কে একজন সেই ঘাস আনিয়া শিবঠাকুরের চারিধারে রোপণ করিল। একদিন মটুকনাথ পণ্ডিত আসিয়া বলিল—বাবুজী,—একজন গাঙ্গোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে ?

বলিলাম—পণ্ডিতজী, সেই গাঙ্গোতাই ওই ঠাকুরটিকে লোক-সমাজে প্রচার করেছে যতদূর দেখতে পাচ্ছি ! কই তুমিও তো ছিলে, এক ঘটি জল তো কোনদিন দিতে দেখি নি তোমায়।

রাগের মাথায় খেই হারাইয়া মটুকনাথ বলিয়া বসিল—ও শিবই নয় বাবুজী। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পূজো পাওয়ার যোগ্য হয় না। ও তো একখানা পাথরের নুড়ি।

—তবে আর বলছ কেন? পাথরের নুড়িতে জল দিলে তোমার আপত্তি কি?

সেই হইতেই দ্রোণ মাহাতো কাছারির শিবলিঙ্গের চার্টার্ড পূজারী হইয়া গেল।

কার্ত্তিক মাসে ছট্-পরব এদেশের বড় উৎসব। বিভিন্ন টোলা হইতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ী পরিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে কল্‌বলিয়া নদীতে ছট্ ভাসাইতে চলিয়াছে। সারাদিন উৎসবের ধুম। সন্ধ্যায় বস্তিগুলির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ছট্-পরবের পিঠে ভাজার ভরপুর গন্ধ পাওয়া যায়। কত রাত পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাসি কলরব, মেয়েদের গান—যেখানে নীল গাইয়ের জেরা গভীর রাত্রে দৌড়িয়া যাইত, হায়েনার হাসি ও বাঘের কাসি (অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানে, বাঘে অবিকল মানুষের গলায় কাসির মত এক প্রকার শব্দ করে) শোনা যাইত—সেখানে আজকাল কলহাস্যমুখরিত, গীতিরবপূর্ণ উৎসবদীপ্ত এক বিস্তীর্ণ জনপদ।

ছট্-পরবের সন্ধ্যায় ঝল্লুটোলায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। শুধু এই একটি টোলায় নয়—পনেরোটি বিভিন্ন টোলা হইতে ছট্-পরবের নিমন্ত্রণ পাইয়াছি কাছারি সুদ্ধ সকল আমলা।

ঝল্লুটোলার মোড়ল ঝল্লু মাহাতোর বাড়ী গেলাম প্রথমে।

ঝল্লু মাহাতোর বাড়ীর এক পাশে দেখি এখনও জঙ্গল কিছু কিছু আছে। ঝল্লু উঠানে এক ছেঁড়া সামিয়ানা টাঙাইয়াছে—তাহারই তলায় আমাদের আদর করিয়া বসাইল। টোলার সকল লোক ফর্সা ধুতি ও মেরজাই পরিয়া সেখানে ঘাসে-বোনা একজাতীয় মাদুরের আসনে বসিয়া আছে। বলিলাম—খাইবার অনুরোধ রাখিতে পারিব না, কারণ অনেক স্থানে যাইতে হইবে।

ঝল্লু বলিল—একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে। মেয়েরা নইলে বড় ক্ষুণ্ণ হবে, আপনি পায়ের ধুলো দেবেন বলে ওরা বড় উৎসাহ ক'রে পিঠে তৈরী করেছে।

উপায় নাই। গোষ্ঠবাবু মুহুরী, আমি ও রাজু পাঁড়ে বসিয়া গেলাম। শালপাতায় কয়েকখানি আটা ও গুড়ের পিঠে আসিল—এক একখানি পিঠে এক ইঞ্চি পুরু ইটের মত শক্ত, ছুঁড়িয়া মারিলে মানুষ মরিয়া না গেলেও দস্তুরমত জখম হয়। অথচ প্রত্যেকখানা পিঠে ছাঁচে ফেলা চন্দ্রপুলির মত বেশ লতাপাতা কাটা। ছাঁচে ফেলিবার পরে তবে ঘিয়ে ভাজা হইয়াছে।

অত যত্নে মেয়েদের হাতে তৈরী পিষ্টকের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। আধখানা অতিকষ্টে খাইয়াছিলাম। না মিষ্টি, না কোন স্বাদ। বুঝিলাম গাঙ্গোতা মেয়েরা খাবার দাবার তৈরি করিতে জানে না। রাজু পাঁড়ে কিন্তু চার-পাঁচখানা সেই বড় বড় পিঠে দেখিতে দেখিতে খাইয়া ফেলিল এবং আমাদের সামনে চক্ষুলজ্জা বশতঃই বোধ হয় আর চাহিতে পারিল না।

ঝল্লুটোলা হইতে গেলাম লোধাইটোলা। তারপর পর্ব্বতটোলা, ভীমদাসটোলা, আসরফি-টোলা, লছমনিয়াটোলা। প্রত্যেক টোলায় নাচগান, হাসিবাজনার ধুম। আজ সারারাত ইহারা ঘুমাইবে না। এ-বাড়ী ও-বাড়ী খাওয়া দাওয়া করিয়া নাচ-গান করিয়াই কাটাইয়া দিবে!

একটি ব্যাপার দেখিয়া আনন্দ হইল, মেয়েরা সব টোলাতেই যত্ন করিয়া নাকি খাবার তৈরি করিয়াছে আমাদের জন্য। ম্যানেজার বাবু নিমন্ত্রণে আসিবেন শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের ও যত্নের সহিত নিজেদের চরম রন্ধন-কৌশল প্রদর্শন করিয়া পিষ্টক গড়িয়াছে। মেয়েদের সহৃদয়তার জন্য মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেও তাহাদের রন্ধন-বিদ্যার প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, ইহা আমার পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয়। ঝল্লুটোলার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর পিষ্টকের সহিতও স্থানে স্থানে পরিচয় ঘটিল।

সব জায়গায়ই দেখি রঙীন শাড়ী-পরা মেয়েরা কৌতূহলপূর্ণ চোখে আড়াল হইতে ভোজনরত বাংগালী বাবুদের দিকে চাহিয়া আছে। রাজু পাঁড়ে কাহাকেও মনে কষ্ট দিল না—পিষ্টক ভক্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজু পাঁড়ে ক্রমশ অসীমের দিকে চলিতে লাগিল দেখিয়া আমি গণনার হাল ছাড়িয়া দিলাম—সুতরাং সে কয়খানা পিষ্টক খাইয়াছিল বলিতে পারিব না।

শুধু রাজু কেন—নিমন্ত্রিত গাঙ্গোতাদের মধ্যে সেই ইটের মত কঠিন পিষ্টক এক একজন এক কুড়ি দেড় কুড়ি করিয়া খাইল—চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত যে সেই জিনিস মানুষে অত খাইতে পারে।

নাঢ়া বইহারে ছনিয়া ও সুরতিয়াদের ওখানে গেলাম।

সুরতিয়া আমায় দেখিয়া ছুটিয়া আসিল।

—বাবুজী, এত রাত ক'রে ফেললেন? আমি আর মা দু-জনে ব'সে আপনার জন্যে আলাদা করে পিঠে গড়েছি—আমরা হাঁ করে বসে আছি আর ভাবছি এত দেরি হচ্ছে কেন। আসুন, বসুন।

নকছেদী সকলকে খাতির করিয়া বসাইল।

তুলসীকে খুব যত্ন করিয়া খাইবার আসন করিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। ইহাদের এখানে খাইবার অবস্থা কি আর আছে?

সুরতিয়াকে বলিলাম—তোমার মাকে বল পিঠে তুলে নিতে। এত কে খাবে?

সুরতিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ও কি বাবুজী, এই ক'খানা খাবেন না? আমি আর ছনিয়াই ত পনর-ষোলখানা করে খেয়েছি। খান—আপনি খাবেন বলে ওর ভেতরে মা কিশমিশ দিয়েছে—ভাল আটা এনেছে বাবা ভীমদাসটোলা থেকে—

খাইব না বলিয়া ভাল করি নাই। সারা বছর এই বালক-বালিকা এ-সব সুখাদ্যের মুখ দেখিতে পায় না। এদের কত কষ্টের, কত আশার জিনিস! ছেলেমানুষকে খুশী করিবার জন্য মরীয়া হইয়া দুইখানা পিষ্টক খাইয়া ফেলিলাম।

সুরতিয়াকে খুশী করিবার জন্য বলিলাম—চমৎকার পিঠে। কিন্তু সব জায়গায় কিছু কিছু খেয়েছি বলে খেতে পারলুম না সুরতিয়া। আর একদিন এসে হবে এখন।

রাজু পাঁড়ের হাতে একটা ছোটখাটো বোঁচকা। সে প্রত্যেকের বাড়ী হইতে ছাঁদা বাঁধিয়াছে, এক একখানি পিষ্টকের ওজন বিবেচনা করিলে রাজুর বোঁচকার ওজন দশ-বারো সেরের কম ত কোন মতেই হইবে না।

রাজু খুব খুশী। বলিল—এ পিঠে হঠাৎ নষ্ট হয় না হুজুর, দু-তিন দিন আর আমায় রাঁধতে হবে না। পিঠে খেয়েই চলবে।

কাছারিতে পরদিন সকালে কুন্তা একখানি পিতলের থালা লইয়া আসিয়া আমার সামনে সসঙ্কোচে স্থাপন করিল। এক টুক্‌রা ফর্সা নেকড়া দিয়া থালাখানা ঢাকা।

বলিলাম—ওতে কি কুন্তা ?

কুন্তা সলজ্জ কণ্ঠে বলিল ছট্-পরবের পিঠে বাবুজী। কাল রাত্রে দু-বার নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছি।

বলিলাম—কাল অনেক রাত্রে ফিরেছি, ছট্-পরবের নেমন্তন্ন রাখতে বেরিয়েছিলাম। আচ্ছা রেখে দাও, খাব এখন।

ঢাকা খুলিয়া দেখি, থালায় কয়েকখানি পিষ্টক, কিছু চিনি, দুটি কলা, একখণ্ড ঝুনা নারিকেল, একটা কলম্বা লেবু।

বলিলাম—বাঃ, বেশ পিঠে দেখছি।

কুন্তা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে সসঙ্কোচে বলিল—বাবুজী, সবগুলো মেহেরবানি করে খাবেন। আপনি খাবেন বলে আলাদা করে তৈরি করেছি। তবুও আপনাকে গরম খাওয়াতে পারলাম না, বড় দুঃখ রইল।

—কিছু হয় নি তাতে, কুন্তা। আমি সবগুলো খাব। দেখতে বড় চমৎকার দেখাচ্ছে।

কুন্তা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

একদিন মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, ওই বনের মধ্যে গাছের নীচে একটা লোক ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে আছে—লোকজনে তাকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—ঢিল ছুঁড়ে মারে, আপনি হুকুম করনে ত তাকে নিয়ে আসি।

কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। বৈকাল বেলা, সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই, শীত তেমন না হইলেও কার্ত্তিক মাস, রাত্রে যথেষ্ট শিশির পড়ে, শেষ রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা। এ অবস্থায় একটা লোক বনের মধ্যে গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে কেন, লোক তাকে ঢিল ছুঁড়িয়াই বা মারে কেন বুঝিতে পারিলাম না।

গিয়া দেখি গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের ওদিকে (আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগে গ্র্যাণ্ট সাহেব আমীন লবটুলিয়ার বন্য মহাল জরীপ করিতে আসিয়া এই বটতলায় তাঁবু ফেলেন, সেই হইতেই গাছটির এই নাম চলিয়া আসিতেছে) একটা বনঝোপে একটা অর্জ্জুন গাছের তলায় একটা লোক ছেঁড়া ময়লা নেকড়াকানি পাতিয়া শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া আছে। ঝোপের অন্ধকারে লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইয়া বলিলাম—কে ওখানে? বাড়ী কোথায়? বের হয়ে এস—

লোকটি বাহির হইয়া আসিল—অনেকটা হামাগুড়ি দিয়া, অতি ধীরে ধীরে—বয়স পঞ্চাশের উপর, জীর্ণশীর্ণ চেহারা, মলিন ছেঁড়া কাপড় ও মেরজাই গায়ে,—যতক্ষণ সে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল, কি একরকম, অদ্ভুত, অসহায় ভাবে শিকারীর তাড়া-খাওয়া পশুর মত ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিল।

ঝোপের অন্ধকার হইতে দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসিলে দেখিলাম, তাহার বাম হাতে ও বাম পায়ে ভীষণ ক্ষত। বোধ হয় সেই জন্য সে একবার বসিলে বা শুইলে হঠাৎ আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, ওর ওই ঘায়ের জন্যই ওকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—জল পর্য্যন্ত চাইলে দেয় না। ঢিল মারে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়—

বোঝা গেল তাই এ লোকটা বনের পশুর মত বন-ঝোপের মধ্যেই আশ্রয় লইয়াছে এই হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে।

বলিলাম—তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

লোকটা আমায় দেখিয়া ভয়ে কেমন হইয়া গিয়াছে—ওর চোখে রোগকাতর ও ভীত অসহায় দৃষ্টি। তা ছাড়া আমার পিছনে লাঠি-হাতে মুনেশ্বর সিং সিপাহী! বোধ হয় সে ভাবিল, সে যে বনে আশ্রয় লইয়াছে তাহাতেও আমাদের আপত্তি আছে—তাহাকে তাড়াইয়া দিতেই আমি সিপাই সঙ্গে করিয়া সেখানে গিয়াছি।

বলিল—আমার নাম?—নাম হুজুর গিরধারীলাল, বাড়ী তিনটাঙা। পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভুত স্বরে—মিনতি, প্রার্থনা এবং বিকারের রোগীর অসঙ্গত আবদারের স্বর এই কয়টি মিলাইয়া এক ধরনের স্বরে বলিল—একটু জল খাব—জল—

আমি ততক্ষণে লোকটাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। সেবার পৌষ মাসের মেলায় ইজারাদার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে সেই যে দেখিয়াছিলাম—সেই গিরধারীলাল। সেই ভীত দৃষ্টি, সেই নম্র মুখের ভাব—

দরিদ্র, নম্র, ভীরু লোকদেরই কি ভগবান জগতে এত বেশী করিয়া কষ্ট দেন! মুনেশ্বর সিংকে বলিলাম—কাছারি যাও—চার-পাঁচজন লোক আর একটা চারপাই নিয়ে এস—

সে চলিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে গিরধারীলাল? আমি তোমায় চিনি। তুমি আমায় চিনতে পার নি? সেই যে সেবার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে মেলার সময় তোমার

সঙ্গে দেখা হয়েছিল—মনে নেই ? কোন ভয় নেই।—কি হয়েছে তোমার ?

গিরধারীলাল ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হাত ও পা নাড়িয়া দেখাইয়া বলিল—হুজুর, কেটে গিয়ে ঘা হয়। কিছুতেই সে ঘা সারে না, যে যা বলে তাই করি—ঘা ক্রমেই বাড়ে। ক্রমে সকলে বললে—তোর কুষ্ঠ হয়েছে। সেইজন্য আজ চার-পাঁচ মাস এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। বস্তির মধ্যে ঢুকতে দেয় না! ভিক্ষে করে কোন রকমে চালাই। রাত্রে কোথাও জায়গা দেয় না—তাই বনের মধ্যে ঢুকে শুয়ে থাকব বলে—

—কোথায় যাচ্ছিলে এদিকে ? এখানে কি করে এলে ?

গিরধারীলাল এরই মধ্যে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। একটু দম লইয়া বলিল—পূর্ণিয়ার হাসপাতালে যাচ্ছিলাম হুজুর—নইলে ঘা তো সারে না।

আশ্চর্য্য না হইয়া পারিলাম না। মানুষের কি আগ্রহ বাঁচিবার! গিরধারীলাল যেখানে থাকে, পূর্ণিয়া সেখান হইতে চল্লিশ মাইলের কম নয়—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মত শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্যভূমি সামনে—ক্ষতে-অবশ হাত-পা লইয়া সে চলিয়াছে এই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলের পথ ভাঙিয়া পূর্ণিয়ার হাসপাতালে!

চারপাই আসিল। সিপাহীদের বাসার কাছে একটা খালি ঘরে উহাকে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলাম। সিপাহীরাও কুষ্ঠ বলিয়া একটু আপত্তি তুলিয়াছিল, পরে বুঝাইয়া দিতে তাহারা বুঝিল।

গিরধারীকে খুব ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া মনে হইল। অনেকদিন সে যেন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। কিছু গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে সে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

সন্ধ্যার দিকে তাহার ঘরে গিয়া দেখি সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

পরদিন স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক রাজু পাঁড়েকে ডাকাইলাম। রাজু গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর নাড়ী দেখিল, ঘা দেখিল। রাজুকে বলিলাম—দেখ, তোমার দ্বারা হবে, না পূর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দেব ?

রাজু আহত অভিমানের সুরে বলিল—আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে হুজুর, অনেক দিন এই কাজ করছি। পনের দিনের মধ্যে ঘা ভাল হয়ে যাবে।

গিরধারীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেই ভাল করিতাম পরে বুঝিলাম। ঘায়ের জন্য নহে, রাজু পাঁড়ের জড়ি-বুটির গুণে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ঘায়ের চেহারা বদলাইয়া গেল—কিন্তু মুশকিল বাধিল তাহার সেবা-শুশ্রূষা লইয়া। তাহাকে কেহ ছুঁইতে চায় না, ঘায়ে ঔষধ লাগাইয়া দিতে চায় না, তাহার খাওয়া জলের ঘটিটা পর্য্যন্ত মাজিতে আপত্তি করে।

তাহার উপর বেচারীর হইল জ্বর। খুব বেশী জ্বর।

নিরুপায় হইয়া কুন্তাকে ডাকাইলাম। তাহাকে বলিলাম—তুমি বস্তি থেকে একজন গাঙ্গোতার মেয়ে ডেকে দাও, পয়সা দেব—ওকে দেখাশুনো করতে হবে।

কুন্তা কিছুমাত্র না ভাবিয়া তখনই বলিল—আমি করব বাবুজী। পয়সা দিতে হবে না।

কুন্তা রাজপুতের স্ত্রী, সে গাঙ্গোতা রোগীর সেবা করিবে কি করিয়া? ভাবিলাম আমার

কথা সে বুঝিতে পারে নাই।

বলিলাম, ওর এঁটো বাসন মাজতে হবে, ওকে খাওয়াতে হবে, ও তো উঠতে পারে না। সে-সব তোমায় দিয়ে কি করে হবে ?

কুন্তা বলিল—আপনি হুকুম করলেই আমি সব করব। আমি রাজপুত কোথায় বাবুজী ! আমার জাত-ভাই কেউ এতদিন আমায় কি দেখেছে ? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব ! আমার আবার জাত কি !

রাজু পাঁড়ের জড়ি-বুটির গুণে ও কুন্তার সেবাশুশ্রূষায় মাসখানেকের মধ্যে গিরধারীলাল চাঙ্গা হইয়া উঠিল ! কুন্তা এজন্য দিতে গেলেও কিছু লইল না। গিরধারীলালকে সে ইতিমধ্যে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিলাম। বলিল—আহা, বাবা বড় দুঃখী, বাবার সেবা করে আবার পয়সা নেব ? ধরমরাজ মাথার উপর নেই ?

জীবনে যে কয়টি সৎ কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি প্রধান সৎ কাজ নিরীহ ও নিঃস্ব গিরধারীলালকে বিনা সেলামীতে কিছু জমি দিয়া লবটুলিয়াতে বাস করানো।

তাহার খুপড়িতে একদিন গিয়াছিলাম।

নিজের বিঘা পাঁচেক জমি সে নিজের হাতেই পরিষ্কার করিয়া গম বুনিয়াছে। খুপড়ির চারিপাশে কতগুলি গোঁড়ালেবুর চারা পুঁতিয়াছে।

—এত গোঁড়ালেবুর গাছ কি হবে গিরধারীলাল ?

—হুজুর, ওগুলো শরবতী নেবু। আমি বড় খেতে ভালবাসি। চিনি-মিছরি জোটে না আমাদের, ভূরা গুড়ের শরবৎ করে ওই লেবুর রস দিয়ে খেতে ভারি তার !

দেখিলাম আশার আনন্দে গিরধারীলালের নিরীহ চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—ভাল কলমের লেবু। এক-একটা হবে এক পোয়া। অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে, যদি কখনো জমি জায়গা করতে পারি, তবে ভাল শরবতী লেবুর গাছ লাগাব। পরের দোরে লেবু চাইতে গিয়ে কতবার অপমান হয়েছি হুজুর। সে দুঃখ আর রাখব না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১

এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। একবার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ধন্‌ঝরি শৈলমালা একটি সুন্দর স্বপ্নের মত আমার মন অধিকার করিয়া আছে···তাহার বনানী···তাহার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি···

সঙ্গে লইলাম যুগলপ্রসাদকে।

তহসিলদার সজ্জন সিং-এর ঘোড়াটাতে যুগলপ্রসাদ চড়িয়াছিল—আমাদের মহালের সীমানা পার হইতে না-হইতেই বলিল—হুজুর, এ ঘোড়া চলবে না, জঙ্গলের পথে রহক্ষ চাল

ধরলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও পা খোঁড়া হবে। বদলে নিয়ে আসি।

তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। সজ্জন সিং ভাল সওয়ার, সে কতবার পূর্ণিয়ায় মোকদ্দমা তদারক করিতে গিয়াছে এই ঘোড়ায়। পূর্ণিয়া যাইতে হইলে কেমন পথে যাইতে হয় যুগলপ্রসাদের তাহা অজ্ঞাত নয় নিশ্চয়ই।

শীঘ্রই কারো নদী পার হইলাম।

তার পর অরণ্য, অরণ্য—সুন্দর, অপূর্ব্ব, ঘন নির্জ্জন অরণ্য! পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ-জঙ্গলে মাথার উপরে গাছপালার ডালে ডালে জড়াজড়ি নাই—কেঁদচারা, শালচারা, পলাশ, মহুয়া, কুলের অরণ্য—প্রস্তরাকীর্ণ রাঙা মাটির ডাঙা, উঁচু-নীচু। মাঝে মাঝে মাটির উপর বন্য হস্তীর পদচিহ্ন। মানুষজন নাই।

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম লবটুলিয়ার নূতন তৈরী ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা ও বস্তি এবং একঘেয়ে ধূসর, চষা জমি দেখিবার পরে। এ-রকম আরণ্য প্রদেশ এদিকে আর কোথাও নাই।

এই পথের সেই দুটি বন্য গ্রাম—বুরুডি ও কুলপাল—বেলা বারোটার মধ্যেই ছাড়াইলাম। তার পরেই ফাঁকা জঙ্গল পিছনে পড়িয়া রহিল—সম্মুখে বড় বড় বনস্পতির ঘন অরণ্য। কার্ত্তিকের শেষ, বাতাস ঠাণ্ডা—গরমের লেশ মাত্রও নাই।

দূরে দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিল।

সন্ধ্যার পরে কাছারিতে পৌঁছিলাম। যে বিড়িপাতার জঙ্গল আমাদের স্টেট নীলামে ডাকিয়া লইয়াছিল, এ-কাছারি সেই জঙ্গলের ইজারাদারের!

লোকটা মুসলমান, শাহাবাদ জেলায় বাড়ী। নাম আবদুল ওয়াহেদ। খুব খাতির করিয়া রাখিয়া দিল। বলিল—সন্ধ্যের সময় পৌঁছেছেন, ভাল হয়েছে বাবুজী। জঙ্গলে বড় বাঘের ভয় হয়েছে।

নির্জ্জন রাত্রি।

বড় বড় গাছে শন্ শন্ করিয়া বাতাস বাধিতেছে।

কাছারির বারান্দায় বসিবার ভরসা পাইলাম না কথাটা শুনিয়া।

ঘরের মধ্যে জানালা খুলিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি—হঠাৎ কি একটা জন্তু ডাকিয়া উঠিল বনের মধ্যে। যুগলকে বলিলাম—কি ও?

যুগল বলিল—ও কিছু না, হুড়াল। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।

একবার গভীর রাত্রে বনের মধ্যে হায়েনার হাসি শোনা গেল—হঠাৎ শুনিলে বুকের রক্ত জমিয়া যায় ভয়ে, ঠিক যেন কাশরোগীর হাসি, মাঝে মাঝে দম বন্ধ হইয়া যায়, মাঝে মাঝে হাসির উচ্ছ্বাস।

পরদিন ভোরে রওনা হইয়া বেলা ন-টার মধ্যে দোবরু পান্নার রাজধানী চক্‌মকিটোলায় পৌঁছানো গেল। ভানুমতী কী খুশী আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে! তার মুখ-চোখে খুশী যেন চাপিতে পারিতেছে না, উপচাইয়া পড়িতেছে।

—আপনার কথা কালও ভেবেছি বাবুজী। এতদিন আসেন নি কেন?

ভানুমতীকে একটু লম্বা দেখাইতেছে, একটু রোগাও বটে। তাছাড়া মুখশ্রী আছে ঠিক তেমনি লাবণ্যভরা, সেই নিটোল গড়ন তেমনি আছে!

—নাইবেন তো ঝরনায়? মহুয়া তেল আনব না কড়ুয়া তেল? এবার বর্ষায় ঝরনায় কি সুন্দর জল হয়েছে দেখবেন চলুন।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—ভানুমতী ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে তার সেদিক দিয়া তুলনাই হয় না—তার বেশভূষা ও প্রসাধনের সহজ সৌন্দর্য্য ও রুচিবোধই তাহাকে অভিজাতবংশের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে-মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছি, তাহার উঠানের চারিধারে বড় বড় আসান ও অর্জুন গাছ। এক ঝাঁক সবুজ বনটিয়া সামনের আসান গাছটার ডালে কলরব করিতেছে। হেমন্তের প্রথম, বেলা চড়িলেও বাতাস ঠাণ্ডা। আমার সামনে আধ মাইলেরও কম দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে চেরা সিঁথির মত পথ—একদিকে অনেক দূরে নীল মেঘের মত দৃশ্যমান গয়া জেলার পাহাড়শ্রেণী।

বিড়ির পাতার জঙ্গল ইজারা লইয়া এই শান্ত জনবিরল বন্য প্রদেশের পল্লবপ্রচ্ছায় উপত্যকার কোনো পাহাড়ী ঝরনার তীরে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতাম চিরদিন! লবটুলিয়া তো গেল, ভানুমতীর দেশের এ-বন কেহ নষ্ট করিবে না। এ-অঞ্চলে মরুমকাঁকর ও পাইওরাইট্ বেশী মাটিতে, ফসল তেমন হয় না—হইলে এ-বন কোন্ কালে ঘুচিয়া যাইত। তবে যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে, সে স্বতন্ত্র কথা…

তামার কারখানার চিমনি, ট্রলি লাইন, সারি সারি কুলি-বস্তি, ময়লা জলের ড্রেন, এঞ্জিন-ঝাড়া কয়লার ছাইয়ের স্তূপ—দোকান-ঘর, চায়ের দোকান, সস্তা সিনেমায় 'জোয়ানী-হাওয়া' 'শের শমশের' 'প্রণয়ের জের' (ম্যাটিনিতে তিন আনা, পূর্ব্বাহ্নে আসন দখল করুন)—দেশী মদের দোকান, দরজীর দোকান। হোমিও ফার্ম্মেসী (সমাগত দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়)। আদি ও অকৃত্রিম আদর্শ হিন্দু হোটেল।

কলের বাঁশীতে তিনটার সিটি বাজিল।

ভানুমতী মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই—চার পয়সা ঝুড়ি।

ভানুমতী তেল আনিয়া সামনে দাঁড়াইল। ওদের বাড়ীর সবাই আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতীর ছোট কাকা নবীন যুবক জগরু একটা গাছের ডাল ছুলিতে ছুলিতে আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। এই ছেলেটিকে আমি বড় পছন্দ করি! রাজপুত্রের মত চেহারা ওর, কালোর উপরে কি রূপ! এদের বাড়ীর মধ্যে এই যুবক এবং ভানুমতী, এদের দুজনকে দেখিলে সত্যই যে ইহারা বন্য জাতির মধ্যে অভিজাতবংশ, তা মনে না হইয়া পারে না।

বলিলাম—কি জগরু, শিকার-টিকার কেমন চলেছে?

জগরু হাসিয়া বলিল—আপনাকে আজই খাইয়ে দেব বাবুজী, ভাববেন না। বলুন কি

খাবেন, সজারু না হরিয়াল, না বনমোরগ ?

স্নান করিয়া আসিলাম। ভানুমতী নিজের সেই আয়নাখানি (সেবার যেখানা পূর্ণিয়া হইতে আনাইয়া দিয়াছিলাম) আর একখানা কাঠের কাঁকুই চুল আঁচড়াইবার জন্য আনিয়া দিল।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ভানুমতী প্রস্তাব করিল—বাবুজী চলুন, পাহাড়ে উঠবেন না। আপনি তো ভালবাসেন।

যুগলপ্রসাদ ঘুমাইতেছিল, সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিলে আমরা বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। সঙ্গে রহিল ভানুমতী, ওর খুড়তুতো বোন—জগরু পান্নার মেজ ভাইয়ের মেয়ে, বছর বারো বয়স—আর যুগলপ্রসাদ।

আধ মাইল হাঁটিয়া পাহাড়ের নীচে পৌছিলাম।

ধন্‌ঝরির পাদমূলে এই জায়গায় বনের দৃশ্য এত অপূর্ব্ব যে, খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকেই বড় বড় গাছ, লতা, উপল-বিছানো ঝরনার খাদ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট-বড় শিলাস্তূপ। ধন্‌ঝরির দিকে বন ও পাহাড়ের আড়ালে আকাশটা কেমন সরু হইয়া গিয়াছে, সামনে লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা উঁচু হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের ও-পারের দিকে উঠিয়াছে, কেমন খট্‌খটে শুক্‌নো ডাঙা মাটি, কোথাও ভিজা নয়, স্যাঁৎসেতে নয়। ঝরনার খাদেও এতটুকু জল নাই।

পাহাড়ের উপরে ঘন বন ঠেলিয়া কিছুদূর উঠিতেই কিসের মধুর সুবাসে মনপ্রাণ মাতিয়া উঠিল, গন্ধটা অত্যন্ত পরিচিত—প্রথমটা ধরিতে পারি নাই, তারপরে চারিদিকে চাহিয়া দেখি—ধন্‌ঝরি পাহাড়ে যে এত ছাতিম গাছ তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই—এখন প্রথম হেমন্তে ছাতিম গাছে ফুল ধরিয়াছে, তাহারই সুবাস।

সে কি দু-চারটি ছাতিম গাছ! সপ্তপর্ণের বন, সপ্তপর্ণ আর কেলিকদম্ব—কদম্বফুলের গাছ নয়, কেলিকদম্ব ভিন্নজাতীয় বৃক্ষ, সেগুন পাতার মত বড় বড় পাতা, চমৎকার আঁকাবাঁকা ডালপালাওয়ালা বনস্পতিশ্রেণীর বৃক্ষ।

হেমন্তের অপরাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্ত্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কৃষ্ণা বনদেবী। রাজকুমারী তো ও বটেই! এই বনাঞ্চল, পাহাড়, ওই মিছি নদী, কারো নদীর উপত্যকা, এদিকে ধন্‌ঝরি ওদিকে নওয়াদার শৈলশ্রেণী—এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্য্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মত। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

আজকার এই অপরাহ্ণটি আমার জীবনের আরও বহু সুন্দর অপরাহ্নের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় স্মৃতির সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—স্বপ্নের মত মধুর, স্বপ্নের মতই অবাস্তব।

ভানুমতী বলিল—চলুন, আরও উঠবেন না?

—কি সুন্দর ফুলের গন্ধ বল তো! একটু বসবে না এখানে? সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, দেখি—

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আপনার যা মর্জ্জি বাবুজী। বসতে বলেন এখানে বসি। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের কবরে ফুল দেবেন না? আপনি সেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি রোজ পাহাড়ে উঠি ফুল দিতে। এখন তো বনে কত ফুল।

দূরে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়া পাহাড়ের নীচে দিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে।

নওয়াদার দিকে যে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী, তারই পিছনে সূর্য্য অস্ত গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী হাওয়া আরও শীতল হইল। ছাতিম ফুলের সুবাস আরও ঘন হইয়া উঠিল, ছায়া গাঢ় হইয়া নামিল শৈলসানুর বনস্থলীতে, নিম্নের বনাবৃত উপত্যকায়, মিছি নদীর পরপারের গণ্ড-শৈলমালার গাত্রে।

ভানুমতী এক গুচ্ছ ছাতিম ফুল পাড়িয়া খোঁপায় গুঁজিল। বলিল—বসব, না উঠবেন বাবুজী?

আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যেকের হাতে এক-একটা ছাতিম ফুলের ডাল। একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গেলাম। সেই প্রাচীন বটগাছটা ও তার তলায় প্রাচীন রাজ-সমাধি। বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের মত পাথর চারিদিকে ছড়ানো। রাজা দোবরু পান্নার কবরের উপর ভানুমতী ও তাহার বোন নিছনী ফুল ছড়াইল, আমি ও যুগলপ্রসাদ ফুল ছড়াইলাম।

ভানুমতী বালিকা তো বটেই, সরলা বালিকার মতই মহা খুশী। বালিকার মত আব্দারের সুরে বলিল—এখানে একটু দাঁড়াই বাবুজী, কেমন? বেশ লাগছে, না?

আমি ভাবিতেছিলাম—এই শেষ। আর এখানে আসিব না। এ পাহাড়ের উপরকার সমাধিস্থান, এ বনাঞ্চল আর দেখিব না। ধন্‌ঝরির শৈলচূড়ায় পুষ্পিত সপ্তপর্ণের নিকট, ভানুমতীর নিকট, এই আমার চিরবিদায়। ছ-বছরের দীর্ঘ বনবাস সাঙ্গ করিয়া কলিকাতা নগরীতে ফিরিব—কিন্তু যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কেন এত বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি!

ভানুমতীকে কথাটা বলিবার ইচ্ছা হইল, ভানুমতী কি বলে আমি আর আসিব না শুনিয়া—জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কি হইবে সরলা বনবালাকে বৃথা ভালবাসার, আদরের কথা বলিয়া?

সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নূতন সুবাস পাইলাম। আশে-পাশের বনের মধ্যে যথেষ্ট শিউলি গাছ আছে। বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের ঘন সুগন্ধ সান্ধ্য-বাতাসকে সুমিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ছাতিম বন এখানে নাই—সে আরও নীচে নামিলে তবে। এরই মধ্যে গাছপালার ডালে জোনাকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস কি সতেজ, মধুর, প্রাণারাম! এ বাতাস সকালে বিকালে উপভোগ করিলে আয়ু না বাড়িয়া পারে? নামিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কিন্তু বন্য জন্তুর ভয় আছে—তা ছাড়া ভানুমতী সঙ্গে রহিয়াছে। যুগল-

প্রসাদ বোধ হয় ভাবিতেছিল নূতন কোন্ ধরনের গাছপালা এ জঙ্গল হইতে লইয়া গিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে পারে। দেখিলাম তাহার সমস্ত মনোযোগ নূতন লতাপাতার ফুল, সুদৃশ্য পাতার গাছ প্রভৃতির দিকে নিবদ্ধ—অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। যুগলপ্রসাদ পাগলই বটে, কিন্তু ঐ এক ধরণের পাগল।

নূরজাহান নাকি পারস্য হইতে চেনার গাছ আনিয়া কাশ্মীরে রোপণ করিয়াছিলেন। এখন নূরজাহান নাই, কিন্তু সারা কাশ্মীর সুদৃশ্য চেনার বৃক্ষে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যুগলপ্রসাদ মরিয়া যাইবে, কিন্তু সরস্বতী হ্রদের জলে আজ হইতে শতবর্ষ পরেও হেমন্তে ফুটন্ত স্পাইডার-লিলি বাতাসে সুগন্ধ ছড়াইবে, কিংবা কোন-না-কোন বনঝোপে বন্য হংসলতার হংসাকৃতি নীলফুল দুলিবে, যুগলপ্রসাদই যে সেগুলি নাঢ়া বইহারের জঙ্গলে আমদানি করিয়াছিল একদিন —একথা না-ই বা কেহ বলিল!

ভানুমতী বলল—বাঁয়ে ওই সেই টাঁড়বারোর গাছ—চিনেছেন?

বন্য-মহিষের রক্ষাকর্ত্তা সদয় দেবতা টাঁড়বারোর গাছ অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই। আকাশে চাঁদ নাই, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

অনেকটা নামিয়া আসিয়াছি। এবার সেই ছাতিম বন। কি মিষ্টি মনমাতানো গন্ধ!

ভানুমতীকে বলিলাম—একটু বসি।

পরে সেই বনপথে অন্ধকারের মধ্যে নামিতে নামিতে ভাবিলাম, লবটুলিয়া গিয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার গিয়াছে—কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় রহিল—ভানুমতীদের ধন্‌ঝরি পাহাড়ের বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না—শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।

২

রাত্রে বসিয়া জগরু পান্না ও তাহার দাদার মুখে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা শুনিলাম। মহাজনের দেনা এখনও শোধ যায় নাই, দুইটি মহিষ ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছে, না কিনিলে চলে না, গয়ার এক মারোয়াড়ী মহাজন আগে আসিয়া ঘি কিনিয়া লইয়া যাইত—আজ তিন চার মাস সে আর আসে না। প্রায় আধ মণ ঘি ঘরে মজুত, খরিদ্দার নাই।

ভানুমতী আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিল। যুগলপ্রসাদ অত্যন্ত চা-খোর, সে চা-চিনি সঙ্গে আনিয়াছে আমি জানি। কিন্তু লাজুকতাবশতঃ গরম জলের কথা বলিতে পারিতেছে না, তাহাও জানি। বলিলাম—চায়ের জল একটু গরম করার সুবিধে হবে কি ভানুমতী?

রাজকুমারী ভানুমতী চা কখনও করে নাই। চা খাইবার রেওয়াজই নাই এখানে।

তাহাকে জলের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতে সে মাটির হাঁড়িতে জল গরম করিয়া আনিল। তাহার ছোট বোন কয়েকটি পাথরবাটি আনিল। ভানুমতীকে চা খাইবার অনুরোধ করিলাম, সে খাইতে চাহিল না। জগরু পান্না পাথরের ছোট খোরায় এক খোরা চা শেষ করিয়া আরও খানিকটা চাহিয়া লইল।

চা খাইয়া আর-সকলে উঠিয়া গেল, ভানুমতী গেল না। আমায় বলিল—ক'দিন এখন আছেন বাবুজী? এবার বড় দেরি করে এসেছেন। কাল তো যেতেই দেব না। চলুন আপনাকে কাল ঝাটি ঝরণা বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঝাটি ঝরণায় আরও ভয়ানক জঙ্গল। ওদিকে বড্ড বুনো হাতী। অনেক বনময়ূরও আছে দেখতে পাবেন। চমৎকার জায়গা। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর নেই।

ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ভানুমতী, কখনো কোন শহর দেখেছ?

—না বাবুজী।

—দু-একটা শহরের নাম বল তো?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কল্‌কতার নাম শোন নি?

—হাঁ বাবুজী।

—কোন্‌দিকে জান?

—কি জানি বাবুজী।

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল সে শোনে নাই। কখনও কোথায় যায় নাই চকমকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে?

একটু পরে বলিল—আমার জ্যাঠামশায় একটা মহিষ এনেছিলেন, সেটা এবেলা তিন সের, ওবেলা তিন সের দুধ দিত। তখন আমাদের এর চেয়ে ভাল অবস্থা ছিল বাবুজী, তখন যদি আপনি আসতেন, আপনাকে রোজ খোয়া খাওয়াতাম। জ্যাঠামশায় নিজের হাতে খোয়া তৈরি করতেন। কি মিষ্টি খোয়া! এখন তেমন দুধই হয় না তার খোয়া। তখন আমাদের খাতিরও ছিল খুব।

পরে হাতখানি একবার তুলিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া গর্ব্বের সহিত বলিল—জানেন বাবুজী, এই সমস্ত দেশ আমাদের রাজ্য ছিল! সারা পৃথিবীটা। বনে যে গোঁড় দেখেন, সাঁওতাল দেখেন ওরা আমাদের জাত নয়। আমরা রাজগোঁড়। আমাদের প্রজা ওরা, আমাদের রাজা ব'লে মানে।

উহার কথায় দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মহাজনে দেনার দায়ে দুই বেলা যাহাদের

মহিষ ধরিয়া লইয়া যায়, সেও রাজবংশের গর্ব্ব করিতে ছাড়ে না।

বলিলাম—আমি জানি ভানুমতী তোমাদের কত বড় বংশ—

ভানুমতী বলিল—তারপর শুনুন বাবুজী, আমাদের সেই মহিষটা বাঘে নিয়ে গেল। জ্যাঠামশায় যে মহিষটা এনেছিলেন।

—কি করে?

—জ্যাঠামশায় ওই পাহাড়ের নীচে চরাতে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় বসে ছিলেন, সেখানে বাঘে ধরল।

বলিলাম—তুমি বাঘ দেখেছ কখনও?

ভানুমতী কালো জোড়া-ভুরু দুটি আশ্চর্য্য হইবার ভঙ্গিতে উপরের দিকে তুলিয়া বলিল—বাঘ দেখিনি বাবুজী! শীতকালে আসবেন চকমকিটোলায়—বাড়ীর উঠোন থেকে গরু বাছুর ধরে নিয়ে যায় বাঘে—

বলিয়াই সে ডাকিল—নিছনি, নিছনি—শোন—

ছোট বোন আসিলে বলিল—নিছনি, বাবুজীকে শুনিয়ে দে তো আর বছর শীতকালে বাঘ রোজ রাতে আমাদের উঠোনে এসে কি করে বেড়াত। জগরু একদিন ফাঁদ পেতেছিল। ধরা পড়ল না।

পরে হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, বাবুজী, একখানা চিঠি পড়ে দেবেন? কোথা থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, কে পড়বে, এমনি তোলা রয়েছে। যা নিছনি, চিঠিখানা নিয়ে আয়, আর জগরু-কাকাকেও ডেকে নিয়ে আয়—

নিছনি চিঠি পাইল না। তখন ভানুমতী নিজে গিয়া অনেক খুঁজিয়া সেখানা বাহির করিয়া আমার হাতে আনিয়া দিল।

বলিলাম—কবে এসেছে এখানা?

ভানুমতী বলল—মাস ছ-সাত হবে বাবুজী—তুলে রেখে দিইছি, আপনি এলে পড়াবো। আমরা তো কেউ পড়তে পারি নে। ও নিছনি, জগরু-কাকাকে ডেকে নিয়ে আয়। চিঠি পড়া হবে—সবাইকে ডাক দে।

ছ-সাত মাস পূর্ব্বের পুরনো অপঠিত পত্রখানা আমি যুগলপ্রসাদের উনুনের আলোয় পড়িতে বসিলাম—আমার চারিধারে বাড়ীসুদ্ধ লোক ঘিরিয়া বসিল চিঠি শুনিবার জন্য। চিঠিখানা কায়েথী-হিন্দীতে লেখা—রাজা দোবরু পান্নার নামে চিঠি। পাটনার জনৈক মহাজন রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে, এখানে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে কিনা—থাকিলে কি দরে ইজারা বিলি হয়।

এ পত্রের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই—ইহাদের অধীনে কোন বিড়িপাতার জঙ্গল নাই। রাজা দোবরু, নামে রাজা ছিলেন, চকমকিটোলার নিজ বসতবাটির বাহিরে তাঁর যে কোথাও এক ছটাক জমিও নাই একথা পাটনার উক্ত পত্রলেখক মহাজন জানিলে ডাকমাশুল খরচ করিয়া বৃথা পত্র দিত না নিশ্চয়ই।

একটু দূরে দাওয়ার ও-পাশে যুগলপ্রসাদ রান্না করিতেছে। তাহার কাঠের উনুনের আলোয় দাওয়ার খানিকটা আলো হইয়াছে। এদিকে দাওয়ার অর্দ্ধেকটায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, যদিও কৃষ্ণপক্ষের আজ মোটে তৃতীয়া—ধন্‌ঝরি পাহাড়ের আড়াল কাটাইয়া এই কিছুক্ষণ মাত্র চাঁদ ফাঁকা আকাশে দৃশ্যমান হইয়াছে। সামনে কিছুদূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়শ্রেণী—চকমকিটোলার বস্তির ছেলেপুলেদের কথা ও কলরব শোনা যাইতেছে।···কি সুন্দর ও অপূর্ব্ব মনে হইতেছিল এই বন্য গ্রামে যাপিত এই রাত্রিটি। ভানুমতীর তুচ্ছ ও সাধারণ গল্পও কি আনন্দই দিতেছিল! সেদিন বলভদ্রের মুখে শোনা সেই উন্নতি করিবার কথা মনে পড়িল।

মানুষে কি চায়—উন্নতি, না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে·? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্তি ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।

এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত—আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম। আর শুনিতাম বেশী রাত্রে ওই বনে হুড়ালের ডাক, বনমোরগের ডাক, বন্য হস্তীর বৃংহিত, হায়েনার হাসি। ভানুমতী কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলা দেশে পাওয়া যায় না। আর ওর ওই সতেজ সরল মন! দয়া আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে,– তার কত প্রমাণ পাইয়াছি।···ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন! কি হইবে উন্নতি করিয়া? বলভদ্র সেঙ্গাৎ গিয়া উন্নতি করুক। রাসবিহারী সিং উন্নতি করুক।

যুগলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, রান্না হইয়াছে, চৌকা লাগাইবে কিনা। ভানুমতীদের বাড়ীতে আতিথ্যের কোন ত্রুটি হয় না। এদেশে আনাজ মেলে না, তবুও কোথা হইতে জগরু বেগুন ও আলু আনিয়াছে। মাষকলাইয়ের ডাল, পাখীর মাংস, বাড়ীতে তৈরী অতি উৎকৃষ্ট টাটকা ভয়সা ঘি, দুধ। যুগলপ্রসাদের হাতের রান্নাও চমৎকার।

ভানুমতী, জগরু, জগরুর দাদা, নিছনি—সবাই আজ আমাদের এখানে খাইবে—আমি খাইতে বলিয়াছি। কারণ এমন রান্না উহারা কখনও খাইতে পায় না। বলিলাম—একটু দূরে উহারাও একসঙ্গে সবাই বসুক। যুগলপ্রসাদের দেওয়ারও সুবিধা হইবে। একত্র খাওয়া যাক।

ওরা রাজী হইল না। আমাদের আগে না খাওয়া হইলে উহারা খাইবে না।

পরদিন আসিবার সময় ভানুমতী এক কাণ্ড করিল।

হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল—আজ যেতে দেব না বাবুজী—

আমি অবাক হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কষ্ট হইল।

উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না—দুপুরের আহারাদির পরে বিদায় লইলাম।

*　　*　　*　　*

আবার দুধারে ছায়ানিবিড় বনপথ। পথের ধারে কোথাও রাজকুমারী ভানুমতী যেন দাঁড়াইয়া আছে—বালিকা নয়, যুবতী ভানুমতী—তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই। তার সাগ্রহ দৃষ্টি তার প্রণয়ীর আগমন-পথের দিকে নিবদ্ধ—হয়তো সে পাহাড়ের ওপারের বনে শিকারে গিয়াছে, আসিবার দেরি নাই। তরুণীকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম। ধন্‌ঝরি পাহাড়ের জোনাকি-জ্বলা নিস্তব্ধ প্রাচীন ছাতিম ফুলের বন ও অপূর্ব্ব দূরছন্দা সন্ধ্যার আড়ালে বনবালার গোপন অভিসার সার্থক হউক।

মহালে ফিরিয়া সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া লবটুলিয়া ত্যাগ করিলাম।

আসিবার সময় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আস্‌রফি টিণ্ডেল প্রভৃতি পাল্কীর চারিধারে ঘিরিয়া পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে লবটুলিয়ার সীমানার নূতন বস্তি মহারাজ টোলা পর্য্যন্ত আসিল। মটুকনাথ সংস্কৃতে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিল। রাজু বলিল—হুজুর, আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি এদেশে 'উদাস' শব্দের ব্যবহার এবং উহার অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশী। মকাই-ভাজা খাইতে খারাপ লাগিলে বলে, 'ভাজা উদাস লাগছে।' আমার সম্পর্কে কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হইল ঠিক বলিতে পারিব না।

আমার বিদায় লইয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে কাঁদিয়াছিল। আজ সকাল হইতে আসিয়া সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল—আমার পাল্কী যখন তোলা হইল, তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। মেয়েটি কুন্তা।

নিরাশ্রয়া কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎকাজ। পারিলাম না কিছু করিতে সেই বালিকা মঞ্চীর। অভাগিনীকে কে কোথায় যে ভুলাইয়া লইয়া গেল!—আজ সে যদি থাকিত তাহার নিজের নামে জমি দিতাম বিনা সেলামীতে।

নাঢ়া বইহারের সীমানায় নক্‌ছেদীর ঘর দেখিয়াই আরও কথা মনে পড়িল। সুরতিয়া ঘরের বাহিরে কি করিতেছিল, আমার পাল্কী দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—বাবুজী, বাবুজী, একটু রাখুন—

পরে সে ছুটিয়া আসিয়া পাল্কীর কাছে দাঁড়াইল। ছনিয়াও আসিল পিছু-পিছু।

—বাবুজী, কোথায় যাচ্ছেন?

—ভাগলপুরে। তোর বাবা কোথায়?

—ঝল্লুটোলায় গমের বীজ আনতে গিয়েছে। কবে আসবেন?

—আর আসব না।

—ইস্! মিথ্যে কথা!··

নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্ত্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চীৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল—বাবুজী, আপনার কাজ দেখে আমরা পর্য্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে!

কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে!

দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিলাম।

হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!··

৩

বহু কাল কাটিয়া গিয়াছে তার পর—পনের-ষোল বছর।

বাদাম গাছের তলায় বসিয়া এই সব ভাবিতেছিলাম।

বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে।···

বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত আরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরিধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে।···

আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও।

কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না।

অশনি-সংকেত

নদীর ঘাটে তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে ধাপ তৈরী করা হয়েছে। দুটি স্ত্রীলোক স্নানরতা। একটি স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী। ত্রিশের সামান্য কিছু নিচে হয়তো হবে। অপরটি প্রৌঢ়া।

প্রৌঢ়া বললে—ও বামুন-দিদি, ওঠো—কুমীর এয়েচে নদীতে—

অপরা বধূটির উঠবার ইচ্ছে নেই জল থেকে এত তাড়াতাড়ি। সে কোনো জবাব না দিয়ে গলাজলে দাঁড়িয়ে রইল।

—বামুন-দিদিকে নিয়ে আর কক্ষনো যদি নাইতে আসি!

—রাগ কোরো না পুঁটির মা—সত্যি বলচি জলে নামলে আমার আর ইচ্ছে করে না যে উঠি—

—কেন বামুন-দিদি?

—যে গাঁয়ে আগে ছিলাম সেখানে কি জলকষ্ট। সে যদি তুমি দেখতে! একটা বিল ছিল, তার জল যেতো শুকিয়ে। জষ্টি মাসে এক বালতি জলে নাওয়া, অথচ তার নাম ছিল —পদ্মবিল—

বধূটি হি হি করে হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললে—পদ্মবিল! দ্যাখো তো কি মজা পুঁটির মা? চত্তির মাসে জল যায় শুকিয়ে। নাম পদ্মবিল—

এই সময় একটি কিশোরী জলের ঘাটে নামতে নামতে বললে—অনঙ্গ-দিদি, তোমার বাড়ীতে কলু তেল দিতে এসে দাঁড়িয়ে আছে—শীগ্‌গির যাও, আমায় বলছিল আমি বললাম, ঘাটে যাচ্চি—ডেকে দেবো এখন—

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি তখনও থামে নি। সে বললে—তোর বৌদিদির কাছে গল্প করছি পদ্মবিলের—জল থাকে না চত্তির মাসে—নাম পদ্মবিল—

মেয়েটি বললে—সে কোথায় অনঙ্গ-দি?

—সেই যেখানে আগে ছিলাম—সেই গাঁয়ে—

—সে কোথায়?

—ভাতছালা বলে গাঁ। অম্বিকপুরের কাছে—

—তোমার শ্বশুরবাড়ী বুঝি?

—না। আমার শ্বশুরবাড়ী হরিহরপুর, নদে জেলা। সেখানে বড্ড চলা-চলতির কষ্ট দেখে সেখান থেকে বেরুলাম তো এলাম ওই পদ্মবিলের গাঁয়ে—

—তারপর?

—তারপর সেখান থেকে এখানে।

অনঙ্গ জল থেকে উঠে বাড়ী চলে গেল।

গ্রামখানিতে এরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ-পরিবার, আর সবাই কাপালী ও গোয়ালা। নদীর ধারে এ-গ্রাম বেশি দিনের নয়। বসিরহাট অঞ্চলের চাষী, জমি নোনা লেগে নষ্ট হওয়াতে সেখান থেকে আজ বারো-তেরো বছর আগে কাপালীরা উঠে এসে নদীতীরের এই অনাবাদী পতিত জমি সস্তায় বন্দোবস্ত করে নিয়ে গ্রামখানা বসিয়েছিল। তাই এখনও এর নাম নতুন

গাঁ, কেউ কেউ বলে চর পোলতার নতুন পাড়া।

অনঙ্গদের বাড়ী গোয়ালপাড়ার প্রান্তে, দুখানা মেটে ঘর। খড়ের ছাউনি, একখানা দোচালা রান্নাঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠানের ধারে ধারে পেঁপে ও মানকচু গাছ। চালে দিশি কুমড়োর লতা দেওয়া হয়েচে কঞ্চি দিয়ে, রান্নাঘরের পাশে গোটাকতক বেগুন গাছ, ঢেঁড়স গাছ।

অনঙ্গ এসে দেখলে বষ্ঠিনাথ কলু বড় একটা ভাঁড়ে প্রায় আড়াই সের খাঁটি সর্ষে-তেল এনেচে। তেল মাপা হয়ে গেলে বষ্ঠিনাথ বললে—মা-ঠাকরুণ, আজ আর সর্ষে দেবেন নাকি?

—উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো। এখন এই তেলে একমাস চলে যাবে—

—আর পয়সা ছ'টা?

—কেন খোল তো নিয়েচ, আবার পয়সা কেন?

—ছটা পয়সা দিতে হবে সর্ষে ভাঙানির মজুরি। খোলের আর কত দাম মা-ঠাকরুণ। তাতে আমাদের পেট চলে?

—আচ্ছা উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো।

অনঙ্গ-বৌয়ের দুটি ছেলে। বড়টির বয়েস এগারো বছর, তার ডাকনাম পটল। ছোটটি আট বছরের। তাকে এখনও খোকা বলেই ডাকা হয়। পটল খুব সংসারী ছেলে—এ সব তরিতরকারীর ক্ষেত সে-ই করেচে বাড়ীতে। এখন সে উঠানের একপাশে বসে বেড়া বাঁধবার জন্যে বাঁশের বাখারি চাঁচছিল। ওর মা বললে—পটলা, ও সব রাখ্, এত বেলা হোল, দুধ দেয় নি কেন দেখে আয় তো?

পটল বাখারি চাঁচতে চাঁচতেই বললে—আমি পারবো না।

—পারবি নে তো কে যাবে? আমি যাবো দুধ আনতে সেই কেষ্টদাসের বাড়ী?

—আহা, ভারি তো বেলা হয়েচে, এখন বেড়াটা বেঁধে নিই, একটু পরে দুধ এনে দেবো—

—না এখুনি যা।

—তোমার পায়ে পড়ি মা। বাবা বাড়ী এলে আর বেড়া বাঁধতে পারবো না। এই ছাখো ছাগল এসে আজ বেগুন গাছ খেয়ে গিয়েচে।

খোকা এসে বললে—মা, আমি দুধ আনবো? দাদা বেড়া বাঁধুক—

অনঙ্গ সে কথা গায়ে না মেখে বললে—খোকা, গাছ থেকে দুটো কাঁচা ঝাল তোল্, তোদের মুড়ি মেখে দি—

খোকা জেদের সুরে বললে—আমি দুধ আনবো না মা?

—না।

—কেন আমি পারি নে!

—তোকে বিশ্বাস নেই—ফেলে দিলেই গেল।

—তুমি দিয়ে ছাখো। না পারি, কাল থেকে আর দিও না।

—কাল থেকে তো দেবো না। আজকের দু'সের দুধ তো বালির চড়ায় গড়াগড়ি খাক! তোর সর্দ্দারি করবার দরকার কি বাপু? দুটো কাঁচা ঝাল তুলতে বললাম, তাই তোল্।

এমন সময়ে পটলের বাবা গঙ্গাচরণ চক্কত্তি বাড়ী ঢুকে বললে—কোথায় গেলে—এই মাছটা ধরো, দীনু তীওর দিলে, বললে সাত-আটটা মাছ পেয়েচি—এটা ব্রাহ্মণের সেবায় লাগুক। বেশ বড় মাছটা—না? এই পটলা পড়া গেল, শুনো গেল, ও কি হচ্চে সকাল বেলা?

পটল মৃদু প্রতিবাদের নাকিসুরে বললে—সকাল বেলা বুঝি? এখন তো দুপুর হয়ে এল—

—না, তা হোক, ব্রাহ্মণের ছেলে, বাঁশ-কঞ্চি নিয়ে থাকে না রাতদিন?

—ছাগল যে বেগুন গাছ খেয়ে যাচ্ছে?

—যাক গে খেয়ে। উঠে আয় ওখান থেকে। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কি কাপালীর ছেলের মত দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত?

অনঙ্গ বললে—কেন ছেলেটার পেছনে অমন করে লাগছ গা? বেড়া বাঁধছে বাঁধুক না? ছুটির দিন তো।

গঙ্গাচরণ চক্কত্তি বললে—না, ওসব শিক্ষে ভাল না। ব্রাহ্মণের ছেলে ও রকম কি ভালো?

পটল নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বেড়া বাঁধা রেখে উঠে এল।

অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো, একবার হরিহরের হাটে যাও না?

—কেন?

—একবার দেখে এসো নতুন গুড় উঠলো কিনা।

—সে তুমি ভেবো না, আমার গুড় কিনতে হবে না। এখান থেকেই পাওয়া যাবে। সবাই ভক্তি করে।

বাইরে থেকে কে ডাকলে চক্কত্তি মশায়, বাড়ী আছেন?

গঙ্গাচরণ বললে—কে? রামলাল? দাঁড়াও—

আগন্তুক ম্যালেরিয়া রোগী, তার চেহারা দেখেই তা বোঝা যায়। গঙ্গাচরণ বাড়ীর বাইরে আসতেই সে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—একবার হাতখানা দেখুন তো?

গঙ্গাচরণ ধীরভাবে বললে—অমন করে হাত দেখে না। বসো, ঠাণ্ডা হও। হেঁটে এসেচ, নাড়ী চঞ্চল হবে যে। বাপু এ কোদাল-কোপানো নয়। এসব ডাক্তার-বদ্দির কাজ, বড্ড ঠাণ্ডা মাথায় করতে হয়। কাল কেমন ছিলে?

— রাত্রিতে জ্বর-জ্বর ভাব, শরীর যেন ভারী পাথর—

—কি খেয়েছিলে?

—দুটো ভাত খেয়েছিলাম চক্কত্তি মশাই, আর কি খাবো বলুন, তা ভাত মুখে ভাল লাগলো না।

—যা ভেবেছি তাই। ভাত খেলে কি বলে? জ্বর সারবে কি করে?

—আর খাবো না।

—সে তো বুঝলাম—যা খেয়ে ফেলেচ, তার ঠ্যালা এখন সামলাবে কে? বোসো, দুটো বড়ি নিয়ে যাও—শিউলি পাতার রস আর মধু দিয়ে খেও, দ্যাখো কেমন থাকো—

ওষুধ নিয়ে রামলাল চলে যাচ্ছিল, গঙ্গাচরণ ডেকে বললে—ওহে রামলাল, ভালো কথা, এবার নতুন সর্ষে হয়েছে ক্ষেতে? দুকাঠা পাঠিয়ে দিও তো। আমি বাজারের তেল খাইনে বাপু, সর্ষে দিয়ে কলুবাড়ী থেকে ভাঙিয়ে নিই।

—যে আজ্ঞে। আমার ছেলে ওবেলা দিয়ে যাবে'খন। তেমন সর্ষে এবার হয় নি চক্কত্তি মশাই। বিষ্টি হওয়াতে সর্ষে গাছে পোকা ধরে গেল কার্ত্তিক মাসে।

রামলালকে বিদায় দিয়ে গঙ্গাচরণ সগর্ব্বে স্ত্রীর কাছে বলল—দেখলে তো? যাকে যা বলবো, না বলুক দিকি কেউ? সে জো নেই কারো।

স্বামীগর্ব্বে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আদরের সুরে বললে—এখন নেয়ে নাও দিকি? বেলা তেতপ্পরে হয়েচে। সেই কখন বেরিয়েচ—দুটো ছোলা-গুড় মুখে দিয়ে নাও—এখুনি তো তোমার ছাত্তরের দল আসতে শুরু করবে। তেল দিই—

নদীতে স্নান সেরে এসে জলখাবার অর্থাৎ ছোলা ভিজে ও এক টুকরো আখের পাটালি খেতে খেতে গঙ্গাচরণের মুখ তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। অনঙ্গ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গা, পাঠশালা খোলার কথা কিছু হোল বিশ্বেস মশায়ের সঙ্গে?

—সব হয়ে যাবে। ওঁরা নিজেরা ঘর বেঁধে দেবেন বললেন—

—ছেলে হবে কি রকম?

—দুটো গাঁয়ের ছেলেমেয়ে পাচ্চি—তাছাড়া প্রাইবিট পড়ার ছাত্তর তো অছেই হাতে। এ দিগরে লেখাপড়া জানা লোক কোথায় পাবে ওরা? সকলের এখন চেষ্টা দাঁড়িয়েচে যাতে আমি থাকি।

—সে তো ভালই। উড়ে উড়ে বেরিয়ে কি করবে—এখানেই থাকা যাক্। আমার বড্ড পছন্দ হয়েচে। কোন জিনিসের অভাব নেই। মুখের কথা খসতে যা দেরি—

—রও, সব দিক থেকে বেঁধে ফেলতে হবে ব্যাটাদের। চাষা গাঁ, জিনিস বলো পত্তর বলো, ডাল বলো, মুলো বেগুন বলো—কোনো জিনিসের অভাব হবে না। এ গাঁয়ে পুরুত নেই ওরা বলচে, চক্কত্তি মশাই, আমাদের লক্ষ্মীপুজো, মনসা পুজোটাও কেন আপনি করুন না?

—সে বাপু আমার মত নেই।

—কেন—কেন?

—কাপালীদের পুরুতগিরি করবে? শুদ্দুর-যাজক বামুন হোলে লোকে বলবে কি?

—কে টের পাচ্ছে বলো? এ অজ পাড়াগাঁয়ে কে দেখতে আসচে—তুমিও যেমন?

—কিন্তু ঠাকুরপুজো জানো? না জেনে পুজো-আচ্চা করা—ওসব কাঁচা-খেকো দেবতা, বড্ড ভয় হয়। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করা—

—অত ভয় করলে সংসার করা চলে না। পাঁজিতে আজকাল ষষ্টিপুজো মাকালপুজো সব লেখা থাকে—দেখে নিলেই হবে।

—তুমি যা বোঝো—

—কোনো ভয় নেই বৌ—তুমি দেখে নিও, এ ব্যাটাদের সব দিক থেকে বেঁধে ফেললে কোনো ভাবনা হবে না আমাদের সংসারে।

অনঙ্গও তা জানে। স্বামীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তার অসীম বিশ্বাস। কিন্তু কথা তা নয়—এক জায়গায় টিকে থাকতে পারলে সব হতে পারে, কিন্তু স্বামীর মন উড়ু উড়ু, কোনো গাঁয়ে এক বছরের বেশি তো টিকে থাকতে দেখা গেল না। বাসুদেবপুরেই বা মন্দ ছিল কি? একটু সুবিধে হয়ে উঠতে না উঠতে উনি অমনি বললেন—চলো বৌ, এখানে আর মন টিকচে না।

অমন করে উড়ে উড়ে বেড়ালে কি কখনো সংসারে উন্নতি হয়? তবে একথা ঠিক বাসুদেবপুরে শুধু পাঠশালায় ছেলেপড়ানোতে মাসে আট দশ টাকা আয় হত।—আর এখানে জিনিসপত্র পাওয়া যায় কত? উন্নতি হয় তো এখান থেকেই হবে। উনি যদি মন বসিয়ে থাকেন তবে সবই হতে পারে সে জানে।

একটু পরে চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে শ্লেট বই নিয়ে দড়িবাঁধা দোয়াত ঝুলিয়ে গঙ্গাচরণের কাছে পড়তে এল।

গঙ্গাচরণ বললে, আমি এই খেয়ে উঠলাম, একটু শুয়ে নিই—তোরা পুরোনো পড়া ছাখ ততক্ষণ। ওরে নস্থ, তোদের বাড়ীতে বেগুন হয়েছে?

একটি ছোট ছেলে বললে—হ্যাঁ গুরুমশায়—

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—গুরুমশায় কি রে? সার্ বলবি। শিখিয়ে দিইচি না? বল্—

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে—হ্যাঁ সার্—

—যা গিয়ে বসে লিখগে—বেগুন নিয়ে আসবি কাল, বুঝলি?

—আনবো সার্।

ছেলে ক'টি দাওয়ায় বসে এমন চীৎকার জুড়ে দিল যে তাদের ত্রি-সীমানায় কারো নিদ্রা বা বিশ্রাম সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো তোমার ছাত্তরেরা যে কানের পোকা বের করে দিলে। ওদের একটু থামিয়ে দাও—

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই! পড়া থাক এখন, সবাই শটকে কড়াংকে লিখে রাখ শেলেটে। আমি ঘুমিয়ে উঠে দেখবো।

তারপর স্ত্রীকে খুশির স্বরে বললে—ছটা হয়েচে আরও সাত-আটটা কাল আসছে পুব পাড়া থেকে। ভীম ঘোষ বলছিল, বাবা ঠাকুর, আমাদের পাড়ার সব ছেলে আপনার কাছে পাঠাবো। নেতা কাপালীর কাছে পড়লে যদি ছেলে মানুষ হোত, তা হোলে আর ভাবনা ছিল না। ব্রাহ্মণ হোল সমাজের সব কাজের গুরুমশায়। কথায় বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

গঙ্গাচরণ মন দিয়ে ছেলে পড়ায় বটে। ঘুম থেকে উঠে সে ছেলেদের নিয়ে অনেকক্ষণ ব্যস্ত রইল—কাউকে নামতা পড়ায়, কাউকে ইংরেজী ফার্স্ট বুক পড়ায়—ফাঁকিবাজ গুরুমশায়

কেউ তাকে বলতে পারবে না। বেলা বেশ পড়ে গেলে সে ছাত্রদের ছুটি দিয়ে লাঠি নিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করতে অনঙ্গ এসে বললে—ওগো, কিছু খেয়ে যাবে না—আজ দু'বাড়ী থেকে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল, একটু ক্ষীর করেচি—

বৈকালিক জলযোগ অনেকদিন অদৃষ্টে ঘটে নি।

নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে আজ তিনটি বছর কাটচে স্বামী-স্ত্রীর। সুতরাং স্ত্রীর কথা গঙ্গাচরণের কানে একটু নতুন শোনালো।

স্ত্রীকে বললে—ছেলেদের দিয়েচ?

সে ভাবনা তো তোমার করতে হবে না, তুমি খেয়ে নাও—

খেতে খেতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে স্ত্রীকে বললে—এখানে আছি ভালই, কি বল?

অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে সমর্থনসূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, সে কোনো উত্তর করলে না। লক্ষ্মীর কৃপা যদি হয়ই, মুখে তা নিয়ে বড়াই করতে নেই। তাতে লক্ষ্মী রাগ করেন।

গঙ্গাচরণ খানিকটা ক্ষীরসুদ্ধ বাটিটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললে - এই নাও—

—ও কি! না-না—সবটা খেয়ে ফেল—

—তুমি এটুকু—

—আমার জন্যে আছে গো আছে, সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না—

—তা হোক। আর খাবো না—এবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী যাই। পাকাপাকি করে আসি।

—বেশি দেরি কোরো না—এখেনে নাকি বুনো শুওর বেরোয় সন্দের পর। আমার বড্ড ভয় করে বাপু—

গঙ্গাচরণ ছায়া-ভরা বিকেলে মাঠের রাস্তা বেয়ে গন্তব্যস্থানে যেতে যেতে কল্পনাচক্ষে তার ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীর ছবি আঁকছিল। বেশ লাগে ভাবতে। এই সব মাঠে ভাল চাষের জমি পাওয়া যায়, যদি কিছু জমি তাড়ংগাড়ার বাঁড়ুয্যে জমিদারদের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়ার যোগাযোগ ঘটে, যদি বিশ্বাস মশায়কে বলে কয়ে একখানা লাঙল করা যায় তক্ষে ভাত-কাপড়ের ভাবনা দূর হবে সংসারের।

অনেকদিন থেকে সে-জিনিসের ভাবনাটা চলে আসছে।

হয়তো ভগবান ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসে ফেলেচেন এতদিনে।

বিশ্বাস মশায়ও যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন গঙ্গাচরণকে এ-গ্রামে বসাবার জন্যে। বললেন—আপনারা আমাদের মাথার মণি—আমি আপনাকে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—একটা পাঠশালার বন্দোবস্ত আপনি করে দিন—

—সব হয়ে যাবে—আপাতত যাতে আপনার চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে তো? বাড়ীতে খেতে ক'জন?

আমার স্ত্রী ও দুটি ছেলে—

বিশ্বাস মশায় মনে মনে হিসেব করে বললেন—ধরুন মাসে দশ আড়ি ধান—পনেরো কাঠা চাল হলে আপনার মাস চলে যাবে—কি বলেন ?

—হ্যাঁ, তাই ধরুন—

—আর সংসারের ডালডুল, তেল মুন—ও হয়ে যাবে। পুরুতগিরিটাও ধরুন—

—সে তো ঠিক করেই রেখেছি—সংস্কৃত জিনিসটা কষ্ট করে শিখতে হয়েচে—ও বড় শক্ত জিনিস, সকলের মুখ দিয়ে কি বেরোয় ? এই শুনুন তবে—ধ্যায়েন্নিত্যং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং—ইয়ে—পরশুমৃগবরা ভীতিহস্তা—ইয়ে রত্নকল্পজ্জলাং—

—বাঃ, বাঃ—

—এটা কি বলুন তো ?

—কি করে জানবো বলুন—আমরা হচ্ছি চাষীবাসী গেরস্ত, আংক আস্ক পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যে। আর শিশুবোধক। পড়েচেন শিশুবোধক ?

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল—

দেখুন কদ্দিন আগে পড়েচি, ভুলি নি। সব মনে আছে।

গঙ্গাচরণ উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললে—বেশ—বেশ—

বিশ্বাস মশায় হৃষ্ট মনে বললেন—বাবা মারা গেলেন অল্প বয়সে। সংসারে দুটি নাবালক ভাই—জমিজমা যা ছিল এক জ্ঞাতি খুড়ো সব নিজের বলে লিখিয়ে নিলে জরিপের সময়—

—সে কোথায় ?

—চিত্রাঙ্গপুর, ডাবতলীর কাছে। ডাবতলীর গরুর হাট ও-দিগের নামকরা। অত বড় গরুর হাট এ জেলায় নেই।

—সেখান থেকে বুঝি এখানে এলেন ?

—হ্যাঁ, দেখলাম ও গাঁয়ে আর সুবিধে হবে না। মনে মনে বললাম, মন, পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়। এখানে কি না খেয়ে মরবো ? আমি আর বিষ্টু সা। বিষ্টু সা আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। আমার সঙ্গে গাঁ ছেড়ে যেতে রাজী হল। তখন খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। এ বলে ওখানে জমি সস্তা ও বলে ওখানে জমি সস্তা। কিন্তু মশায় জমি পাওয়াই যায় না। সস্তা কোথাও দেখলাম না। পঞ্চাশ টাকার কমে কোথাও জমি নেই—

—ধানের জমি—

বিশ্বাস মশায়ের অন্দরমহলে এই সময় শাঁকে ফুঁ পড়লো, গঙ্গাচরণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বললে—ও, সন্দে হয়ে গেল—আমি এইবার যাই—এবার সন্দে-আহ্নিক করতে হবে কিনা ?

আসল কথা, স্ত্রীর বুনো-শুওর সংক্রান্ত সতর্কবাণী তার মনে পড়েচে। নতুন গাঁয়ের আশে-পাশে এখনও যথেষ্ট বনজঙ্গল, অন্ধকারে চলাফেরা না করাই ভালো। সাবধানের মার নেই।

বিশ্বাস মশায় বলেন—তা বিলক্ষণ! এখানে আমার এই বাইরের ঘরেই সন্ধে-আহ্নিকের জায়গা করে দিই। গঙ্গাজল আছে বাড়ীতে। আমরা জেতে কাপালী বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেয়েরা স্নান না করে মুখে জলটুকু দেয় না—সব মাজাঘষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণের সন্ধে-আহ্নিক হোলে এ বাড়ীতে, বাড়ী আমার পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর একটু জল মুখে দিন—

—না না, সে সবে এখন আর দরকার নেই—যখন এখানে আছি, তখন সবই হবে—উঠি এখন—গঙ্গাচরণ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—আমার গল্পটা শুনে যান। তারপর তো—

—আচ্ছা ও আর একদিন শুনবো এখন। সন্ধে-আহ্নিকের সময় হয়ে গেলে আমার আর কোনোদিকে মন থাকে না। ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত পড়িচি—নিত্যকর্ম্মগুলো তো ছাড়তে পারবো না—

গঙ্গাচরণের কণ্ঠস্বর ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলো।

গঙ্গাচরণের পাঠশালা বেশ জমে উঠেছে।

আজ সকালে সাত-আটটি নতুন ছাত্র দড়ি-বাঁধা মাটির দোয়াত হাতে ঝুলিয়ে এসে উপস্থিত। গঙ্গাচরণ তাদের নিয়ে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত ব্যস্ত রইল। ছাত্রদের মধ্যে সকলেই স্থূলবুদ্ধি, এদের বাপ-ঠাকুরদাদা কখনও নিজের নাম লিখতে শেখে নি, জমি চষে কলা বেগুন করে জীবিকানির্ব্বাহ করে এসেচে, লেখাপড়া শেখাটা এদের বংশে একেবারে অভিনব পদার্থ।

গঙ্গাচরণ বললে, সকাল থেকে চেষ্টা করে ক'য়ের আঁকুড়ি দিতে শিখলি নে? তা শিখবি কোথা থেকে? এখন ওসব আঙুল সোজা হতে ছ'মাস কেটে যাবে। লাঙলের মুঠি ধরে ধরে আড়ষ্ট হয়ে আছে যে। এই ভূতো, যা একটু তামাক সেজে নিয়ে আয় দিকি! রান্নাঘরে তোর কাকিমার কাছ থেকে আগুন নিয়ে আয়—

দুটি ছাত্র ছুটলো তখুনি আগুন আনতে।

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই! যাবার দরকার কি তোমার?—ভূতো একাই পারবে।

অন্য একটি ছেলের দিকে চেয়ে বলল—তোর বাবা বাড়ী আছে?

—ছেলেটি বললে—হ্যাঁ সার্—

—কাল যেন আমায় এসে কামিয়ে যায় বলে দিস্—

—সার্, বাবা কাল ভিন্‌গাঁয়ে কামাতে গিয়েচে।

—এলে বলে দিস্ এখানে যেন আসে।

অনঙ্গ-বৌ ডেকে পাঠালে বাড়ীর মধ্যে থেকে।

গঙ্গাচরণ গিয়ে বললে—ডাকছিলে কেন?

অনঙ্গ বললে—শুধু ছেলেদের নিয়ে বসে থাকলে চলবে? কাঠ ফুরিয়েছে তার ব্যবস্থা দ্যাখো—

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য্য হবার সুরে বললে—সে কি ? এই যে সেদিন কাঠ কাটিয়ে দিলাম এক-গাড়ী। সব পুড়িয়ে ফেললে এর মধ্যে ?

অনঙ্গ রাগ করে বললে—কাঠ কি খাবার জিনিস যে খেয়ে ফেলেচি ? রোজ এক হাড়ি ধান সেদ্ধ হবে, চিঁড়ে কোটা হোল দশ-বারো কাঠা—এতে কাঠ খরচ হয় না ?

অনঙ্গ কথাটা একটু গর্ব্ব ও আনন্দের সুরেই বলল, কারণ সে যে দরিদ্র ঘর থেকে এসেচে। সেখানে একদিনে এত ধানের চিঁড়েকোটারূপ সচ্ছলতা স্বপ্নের বিষয় ছিল—যে-দারিদ্র্যের মধ্যে এসে পড়েছিল প্রথম শ্বশুরবাড়ী এসে, এখন সে-কথা ভাবতেও যেন পারা যায় না।

বাসুদেবপুর এসে আগের চেয়ে অবিশ্যি অবস্থা ভালই হয়েছিল। তবে সে গ্রামে শুধু পাঠশালার ছেলে পড়ানোর আয় ছিল সম্বল, জিনিসপত্র কেউ দিত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখনও বাসুদেবপুর নিয়ে কথা ওঠে।

সেদিনই দুপুরের পর আহারান্তে গঙ্গাচরণ একটু বিশ্রাম করছিল, অনঙ্গ এসে বললে—বাসুদেবপুর আবার যাবার ইচ্ছে আছে ?

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—কেন বল দিকি ?

—না তাই বলচি। সেখানকার ঘরখানা তো এখনও রেখেই দিয়েচ, বিক্রি করেও তো এলে না।

—তখন কি জানি এখানে বেশ জমে উঠবে ?

—ভাতছালার জন্যে কিন্তু মন কেমন করে। সেখানকার পদ্মবিলের কথা মনে আছে ?

—পদ্মবিল তো ভালই ছিল। বেশ জল।

—চত্তির মাসে জল থাকতো না বটে, কিন্তু না থাকুক বাপু, গাঁখানার লোকগুলো ছিল বড্ড ভাল। তিনদিকে মাঠ, একদিকে অতবড় বিল, সুন্দর দেখতে ছিল।

—তুমি তো বলেছিলে পদ্মবিলের ধারে ঘর বাঁধবে।

—ভেবেছিলাম নতুন খড় উঠলেই পদ্মবিলের ধারে ঘর তৈরি করবো। লোকজনকে বলেও রেখেছিলাম। সস্তায় খড় দিত।

অনঙ্গ আপন মনে হিসেব করবার ভঙ্গিতে বললে আঙুল গুণে গুণে—হরিহরপুরে বিয়ে হোল। সেখান থেকে ভাতছালা, তারপর বাসুদেবপুর, তারপর এখানে। অনেক দেশ বেড়ানো হোল আমাদের—কি বলো ?

গঙ্গাচরণ গর্ব্বের সুরে বললে—বলি হরিহরপুর গাঁয়ের ক'জন এত দেশ দেখে বেড়িয়েচে ?

অনঙ্গ বললে—শুধু দেখে বেড়ানো কি বলো গো ! বাসও করা হয়েচে।

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু একটা কথা বাপু···

—কি ?

—এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও আর যেও না।

—যদ্দিন চলা-চলতির সুবিধে থাকে, থাকবো বৈকি। এখন তো বেশই হচ্ছে—বিশ্বাস

মশায় এ গাঁয়ের মোড়ল। সে যখন ভরসা দিয়েছে, তখন আর ভয় করি নে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার যে মন টেকে না কোথাও বেশিদিন।

—হাতে পয়সা এলেই মন টিকবে। ·তা ছাড়া দিব্যি নদী—

আমার কিন্তু ইচ্ছে করে একবার ভাতছালা দেখতে।

—তা একবার গেলেই হয়। গরুর গাড়ীতে একদিনের রাস্তা। বিশ্বেস মশায়ের কাছে বললেই গরুর গাড়ী দিতে পারে।

অনঙ্গ আগ্রহের সঙ্গে বললে—হ্যাঁ গা তা বলো না। বলবে একবার বিশ্বেস মশায়কে?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কেন? ভাতছালা যাবার খুব ইচ্ছে?

—খু-উ-ব।

—তুমি তাহোলে পটল আর খোকাকে নিয়ে ঘুরে এসো একদিন।

—কেন তুমি?

—আমার পাঠশালার ছুটি কই? আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।

—কতকাল যাই নি ভাতছালা। চার বছর কি পাঁচ বছর। ভাতছালার বিনি নাপতিনীকে মনে আছে? আহা, কি ভালই বাসতো। আবার দেখা হোলে সেও কত খুশী হয়! সেই আমবাগানের ধারে আমাদের ঘরখানা।—আচ্ছা কত জায়গায় ঘর বাঁধলে বলো তো?

গল্পগুজবে শীতের বেলা পড়ে এল। গঙ্গাচরণ উঠে বললে—যাই। একবার পাশের গাঁয়ে যাবো। পাঠশালার জন্যে আরও ছাত্র যোগাড় করে আনি। ছাত্র যত বেশি হবে ততই সুবিধে।

—একটু কিছু জল খেয়ে যাও—

গঙ্গাচরণ আহ্লাদে হেসে বললে—অভ্যেস খারাপ করে দিও না বলচি। এ সময় জলখাবার খেয়েচি কবে?

অনঙ্গ হাসিমুখে বললে—মা-লক্ষ্মী যখন জুটিয়ে দিয়েচেন, তখন খাও। দাঁড়াও আমি আনি—

একটা পাথরের বাটিতে কয়েক টুকরো পেঁপে কাটা ও আখের টিক্‌লি এবং অন্য একটা কাঁসার বাটিতে খানিকটা সর নিয়ে অনঙ্গ-বৌ স্বামীর সামনে রাখলে। গঙ্গাচরণ খেতে খেতে বললে—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না?

—কি?

—আচ্ছা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে হয় না?

অনঙ্গ ঠোঁট উল্টে বললে—ওঃ! তোমার যদি হোল তো সব চাই। চা!

—কেন?

—ওসব বড়মানুষে খায়। গরীবের ঘরে কি পোষায়?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আসলে তুমি চা তৈরী করতে জান না তাই বলো!

অনঙ্গ মুখভঙ্গি করে বললে—আহা-হা!

—পারো চা করতে? কোথায় করলে তুমি?

অনঙ্গ এক ধরনের হাসলে, যার মানে হচ্ছে আর ভান করে কি করবো ?

গঙ্গাচরণ বললে—কেমন ধরে ফেলেচি কিনা ?

অনঙ্গ প্রত্যুত্তরে আর একবার হেসে বললে—না করি, করতে দেখেচি তো। বাসুদেবপুরে চক্কত্তি-বাড়ী চা খেতো সবাই। আমি গিন্নীর কাছে বসে বসে দেখতাম না বুঝি ?

গঙ্গাচরণ পাশের গ্রামে যখন মাঠের পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে। সারাদিনের তাজা খর রোদে উলু ও কাশবনে কেমন সুন্দর একটা সোঁদা গন্ধ। শীতও আজ পড়েচে মন্দ নয়।

একটা লোক খেজুর গাছে মাটির ভাঁড় নিয়ে উঠচে দেখে গঙ্গাচরণ ডেকে বললে—বলি ও ছিদাম, একদিন খেজুর-রস খাওয়াও বাবা।

লোকটা গাছের ওপর থেকেই বললে—গুরুমশায় ? কাল সকালে পেটিয়ে দেবেন একটা ছেলে। এক ভাঁড় যেন নিয়ে যায়—

গঙ্গাচরণের মনে যথেষ্ট আনন্দ ও সন্তোষ এই ভেবে যে, কেউ তার কথা এখানে ঠেলতে পারে না। সবাই মানে, যার কাছে যে জিনিস চাওয়া যায়, কেউ দিতে অস্বীকার করে না। বাসুদেবপুরে এমন ছিল না, ভাতছালাতেও না।

পাশের গ্রামের কোনো নাম নেই—'পশ্চিমপাড়া' বলে সবাই। এর একটা কারণ—এসব গ্রাম আজ কয়েক বৎসর হল বসেচে। আগে এসব পতিত মাঠ বা অনাবাদী চর ছিল, এদেশের চাষাদের জমির অভাব ছিল না, তাদের মধ্যে কেউ এসে সব জঙ্গল ও নলখাগড়া ভরা পতিত জমিতে চাষ করতে রাজী নয়। অন্য জেলা থেকে কাপালী জাতীয় চাষীরা এসে এই অনাবাদী চরে সোনা ফলিয়েচে, এরাই নতুন গ্রামগুলো বসিয়েচে—গ্রামের নামকরণ এখনও হয় নি।

পশ্চিমপাড়াতে ঢুকেই গ্রামের মণ্ডপ ঘর। বিকেলে দু-পাঁচজন লোক এখানে বসে তামাক পোড়াচ্চে।

একজন গঙ্গাচরণকে দেখে বললে—কি মনে করে দাদাঠাকুর ? পেরনাম হই। আসুন—

গঙ্গাচরণ ভড়ং দেখাবার জন্যে ফতুয়ার নিচে থেকে পৈতেটা বার করে আঙুলে জড়িয়ে হাত তুলে বললে—জয়স্তু।

তারপর বসে একবার এদিকওদিক তাকিয়ে বললে—এটা বেশ ঘরখানা করচে তো ? পূজো হয় ?

দলের মধ্যে একজন গঙ্গাচরণকে তামাক খাওয়াবার জন্যে কলাপাত আনতে ছুটলো। একজন বললে—পূজো হয় নি দাদাঠাকুর। সামনের বারে করবার ইচ্ছে আছে—আচ্ছা, আপনি পারবেন দাদাঠাকুর ?

গঙ্গাচরণ অবজ্ঞাসূচক হাসি হেসে চুপ করে রইল, উত্তর দিলে না। ওতে পসার থাকে না।

ওদের মধ্যে আর একজন পূর্ব্বের লোকটিকে ধমক দিয়ে বললে—জানিস নে শুনিস নে কথা বলতে যাস—ওই তো তোর দোষ। উনি জানেন না পুজো কত্তি তো কে করবে? উনি নেকাপড়া জানা পণ্ডিত মানুষ।

গঙ্গাচরণ ধীর ভাবে বললে—থাক থাক, ও ছেলেমানুষ···বলেচে বলেচে—

ইতিমধ্যে কলার পাত এল, একজন হুঁকো থেকে কল্কে খুলে গঙ্গাচরণের হাতে দিতে যেতেই গঙ্গাচরণ বিস্মিত ভাবে বললে—কি?

—তামাক ইচ্ছে করুন—

—তোমাদের উচ্ছিষ্ট কলকেতে আমি তামাক খাবো?

দলের যে লোকটি কল্কে এগিয়ে হাতে দিতে গিয়েছিল, সে দস্তুরমত অপ্রতিভ হোল।

তখন ওদের মধ্যে সেই বিজ্ঞ লোকটি আবার ধমক দিয়ে বললে—একি পাঁচু-ঠাকুরকে পেয়েছিস তোরা, কাকে কি বলিস তার ঠিক নেই। দাঁড়ান, দাদাঠাকুর, আমার বাড়ীতে নতুন কলকে আড়ায় টাঙানো আছে, নিয়ে আসি।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—হাত ধুয়ে এনো—

উপস্থিত লোকগুলি ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়লো। হাত ধুয়ে নতুন কল্কেতে তামাক সাজতে হয় যার জন্যে, এমন ব্রাহ্মণ সত্যি কথা বলতে গেলে তারা কখনো দেখে নি।

নতুন কল্কে আনীত হোল, নতুন কলাপাতাও। গঙ্গাচরণের হাতে ভক্তিভাবে টাটকা-সাজা তামাক এগিয়ে দেওয়া হোল।

গঙ্গাচরণ বললে—কথাবার্ত্তা বলতে হয় বুঝে-সুজে বাপু। আমি পুজো করতে জানি না-জানি তোমরা যে জিজ্ঞেস করলে—তোমরা এর কিছু বুঝবে?

বিজ্ঞ লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—হুঁঃ, একদম অর্গ মুখ্যু!

এই কথা বলে নিজের বিজ্ঞতা প্রমাণ করে সে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাদ দিন ওদের কথা। ওরা কাকে কি বলতে হয় জানে?

গঙ্গাচরণ বললে—সে কথা যাক গে। এখন তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি জানো?

দলের অন্য লোকেরা কথা বলতে সাহস না করতে শুধু বিজ্ঞ লোকটিই এর উত্তরে বললে—কি বলুন দাদাঠাকুর?

—আমি একটা পাঠশালা খুলেচি নতুন গ্রামে। তোমাদের গ্রামের ছেলেগুলি সেখানে পাঠাতে হবে।

—বেশ কথা দাদাঠাকুর। এ তো খুব ভাল—আমাদের ছেলেপিলেদের একটা হিল্লে হয় তা হলে—

—খুব ভালো। সেজন্যে তো আমি এলাম তোমাদের কাছে। তুমি একবার সবাইকে

বলো)—

লোকটি [illegible] দিকে চেয়ে বললে—শুনলে তো সবাই দাদাঠাকুর যা বললেন? আপনি

বসুন, আমি ওদের ডেকে নিয়ে একটু পরামর্শ করি—

একটা কাঁটালতায় সকলে মিলে জোট পাকিয়ে কি বলা-কওয়া করলে, তারপর বিজ্ঞ লোকটি আবার ফিরে এসে গঙ্গাচরণের কাছে বসলো। বললে—সব ঠিক হয়ে গেল দাদাঠাকুর—

—কি ?

—সবাই ছেলে পেটিয়ে দেবে কাল থেকে। ওনারা আর একটা কথা বলচেন—

—কি কথা ?

—আমাদের এখেনে যদি পাঠশালা খোলেন তবে কেমন হয় ?

—দু'জায়গায় হয় না। ও গ্রামে বাস করি, এ গ্রামে পাঠশালা—তাও হয় না।

—কত দিতে হবে আমাদের, একটা ঠিক করে ছান্—

—আমার বাপু জোরজবরদস্তি নেই, বিদ্যাদানং মহাপুণ্যং, বিদ্যাদান করলে কোটি অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তবে আমারও তো চলা-চলতির ব্যবস্থা একটা চাই, এই বুঝে তোমরা যা দাও। নিজেরাই ঠিক করো। আমার মুখে বলাটা ভালো হবে না।

গঙ্গাচরণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এভাবে অগ্রসর হলে ফল ভাল হয় সে জানে। কাজেই বাড়ীতে ফিরে অনঙ্গ যখন বললে—তা ওদের ওপর ফেলে দিলে কেন ? তোমার নিজের বলা উচিত ছিল—তখন গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আরে না জেনে কি আর আমি তাড় ঘাঁটতে গিয়েচি। আমি নিজের মুখে হয়তো বলতাম চার আনা—ওরা দেবে আট আনা—দেখে নিও তুমি।

পরদিন সকালে খোদ বিশ্বাস মশাইকে নিজের বাড়ীতে আসতে দেখে গঙ্গাচরণ বিস্মিত হোল। ছেলেকে ডেকে বললে—পটলা, ডেক্‌সোটা নিয়ে আয় চট করে—

ডেক্‌সো মানে একটা কেরোসিন কাঠের পুরোনো প্যাক বাক্স। এর নাম 'ডেক্‌সো' কেন হয়েচে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা দুষ্কর।

বিশ্বাস মশায় বললেন—থাক থাক—আমার জন্যে কেন—

—সে কি হয় ? বসুন বসুন—তারপর কি মনে করে সকালবেলা ?

—একটা কথা ছিল। আমার বাড়ীতে কাল আপনি সমস্তো বলেচেন, বাড়ীর মেয়েরা সব শুনেচে। আমার একটা গাইগরুর আজ মাসাবধি হোল দড়ি গলায় আটকে অপমিত্যু ঘটেচে। সবারই মন সেজন্যে খারাপ। আমার নাতির অসুখ সেই থেকে সারচে না—জ্বর আর সর্দ্দি লেগেই আছে—বুঝলেন ?

গঙ্গাচরণ গম্ভীর ও চিন্তাকুল ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো। ভাবটা এই রকম যে, "ও তো না হয়েই যায় না"—

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন কি করা যায় ? কাল রাত্তিরে আমার পরিবার বললে—ওনার কাছে যাও, উনি পণ্ডিত লোক, একটা হিল্লে হবে।

গঙ্গাচরণ পূর্ব্ববৎ চিন্তাকুল। সংক্ষেপে শুধু বললে—হুঁ—

ওর হাবভাব দেখে বিশ্বাস মশায় ভয় পেয়ে গেলেন। খুব গুরুতর কিছু ঘটবার সূত্রপাত নাকি তাঁর সংসারে? শাস্ত্র জানা ব্রাহ্মণ, কি বুঝেচে কি জানি? আর কিছু বলতে তাঁর সাহস যোগাল না।

গঙ্গাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিছু খরচ করতে হবে। বিপদে ফেলেচে।

বিশ্বাস মশায় উদ্বেগের সুরে বললেন—কি রকম? কি রকম?

—গোবধ মহাপাপ। এত বড় মহাপাপ যে—

বিশ্বাস মশায় বাধা দিয়ে বললেন—কিন্তু এ তো আমরা ইচ্ছে করে করি নি? মাঠে বাঁধা ছিল, দড়ি গলায় কি করে আটকে—

—ওই একই কথা। গোবধ ওকেই বলে—মহাপাপ।

—এখন কি করা যায় তা হোলে?

—স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, সামনের আমাবস্যের দিন যোগাড় করতে হবে সব। টাকা পনেরো-কুড়ি খরচ হবে।

বিশ্বাস মশায় উদ্বিগ্ন সুরে বললেন—কি কি লাগবে একটা ফর্দ্দ করে দিন না ঠাকুর মশাই।

গঙ্গাচরণ গম্ভীর ভাবে বললে—দেখে শুনে ফর্দ্দ করতে হবে। একটা গুরুতর ব্যাপার, আপনার নাতির অসুখ সারা না-সারা এর ওপর নির্ভর করচে। যা তা করে দিলেই তো হবে না? দাঁড়ান একটু, আসচি—

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই দেখলে অনঙ্গ-বৌ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্ত্তা সব আড়াল থেকে শুনেচে।

স্বামীকে দেখে বললে—ও কে গা?—কি হয়েচে?

গঙ্গাচরণ স্ত্রীকে হাতছানি দিয়ে ভেতরের উঠোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—বড় খদ্দের। উনি হোলেন বিশ্বেস মশায়। তোমার কাপড় আছে ক'খানা?

—আমার?

—আঃ, তাড়াতাড়ি বল না? তোমার নয়তো কি আমার?

—আমার আটপৌরে শাড়ী আছে দু'খানা, আর একখানা, তিনখানা। তোরঙ্গের মধ্যে তোলা ভালো শাড়ী আছে দু'খানা।

—কি নেবে বলো। ভালো শাড়ী না আটপৌরে?

—ভালো শাড়ী একখানা হোলে বড্ড ভালো হয়, কস্তাপেড়ে, এই—এই রকম জলচুড়ি দেওয়া, বাসুদেবপুরে চক্কত্তি-গিন্নীর পরনে দেখে সেই পর্য্যন্ত বড্ড মনটার ইচ্ছে- হ্যাঁ গা, কে দেবে গা?

—আঃ, একটু আস্তে কথা বলতে পার না ছাই! দাঁড়িয়ে রয়েচে বাইরে। আর শোনো, গাওয়া ঘি আছে ঘরে?

অনঙ্গ ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—গাওয়া ঘি! বলে ভাত পায় না, মুড়কি জলপান—

গঙ্গাচরণ বাইরে এসে বললে—এই যে বিশ্বাস মশায়, বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু এসব কাজ ভেবে চিন্তে করে দিতে হয়। শুনে নিন—ভালো লালপাড় শাড়ী একখানা, গাওয়া ঘি আধ সের—ওটা—তিন পোয়াই ধরুন। চিনি পাঁচপোয়া, পাকাকলা একছড়া, সন্দেশ পাঁচপোয়া, গামছা দুখানা, পেতলের থালা একখানা, ঘটি একটা, ধুনো একপোয়া···ওঃ ভুলে গিয়েচি মধুপর্কের বাটি একটা, আসন একটা—

বিশ্বাস মশায় মন দিয়ে ফর্দ্দ শুনে বললেন—আর সব নতুন দেবো, কিন্তু ও থালাঘটি কি নতুনই দিতে হবে? আপনার বাড়ী থেকে না হয় দিন, কিছু দাম ধরে দিলে হয় না?

—তা হয়। তবে খুঁৎ না রাখাই ভালো। আপনি নতুনই দেবেন।

—দিন ঠিক করে দিন—

—সামনের আমাবস্যায় হবে, ও আর দিন ঠিক কি। বলেছি তো। দক্ষিণে লাগবে দু'টাকা।

বিশ্বাস মশায় অনুরোধের সুরে বললেন—টাকা খরচের জন্যে আপত্তি নেই—যাতে নাতিটি আমার—ঠাকুর মশাই—যাতে সেরে ওঠে—

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলেন উনি।

গঙ্গাচরণ আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললে—হুঁঃ, গোবধ! বলে কত কত শক্ত কাণ্ডের জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে এলাম! কোনো ভয় নেই, যান আপনি।

অনঙ্গ স্বামীর কৃতিত্বে খুশি না হয়ে পারলো না যেদিন গঙ্গাচরণ বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী থেকে একরাশি জিনিসপত্র বহন করে বাড়ী নিয়ে এল। একগাল হেসে বললে—দেখি শাড়ীখানা? বাঃ, চমৎকার কস্তাপেড়ে—গাওয়া ঘি? কতটা?

—তা আছে পাকি তিনপোয়া। বাড়ীর তৈরী খাঁটি ঘি।

—এইবার একবার ভাতছালা বেড়িয়ে আসি, কি বলো?

—বিশ্বেস মশায়কে বলেও এসেছি। গরুর গাড়ী দেবে বলেচে—

—তুমি যাবে না?

—আমার কি সময় আছে যে যাবো? ছেলে পড়াতে হবে না? তুমি যাও ছেলেদের নিয়ে। এসময়ে টাকাও পেয়েচি দুটো। একটা থাক্, একটা খরচ করে এসো।

কিন্তু যাই যাই করে শীত কেটে গিয়ে ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। তখন অনঙ্গ একদিন বিশ্বাস মশায়ের গরুর গাড়ীতে ছেলেদের নিয়ে ভাতছালা রওনা হোল। দু'ক্রোশ পথ গিয়ে কাঁটালিয়া নদী পার হতে হোল জোড়াখেয়া নৌকোতে গরুর গাড়ীসুদ্ধ। অনঙ্গ-বৌয়ের বেশ মজা লাগলো এমনভাবে নদী পার হতে। ওপারে উঁচু ডাঙায় নদীতীরে প্রথম বসন্তে বিস্তর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, বাতাসে ভুর ভুর করচে আমের বউলের মিষ্ট সুবাস, আঁকাবাঁকা

শিমুলগাছে রাঙাফুল ফুটে আছে।

অনঙ্গ ছেলেদের বললে—এখানে এই ছায়ায় বসে দুটো মুড়ি খেয়ে নে—কখন ভাতছালা পৌছবি তার ঠিক নেই।

বড়ছেলেটা বললে—ওঃ কি আমের বোল হয়েচে ছাখো সব গাছে। এবার বড্ড আম হবে, না মা?

—খেয়ে নে মুড়ি। আমের বোল দেখবার সময় নেই এখন।

ছেলে দুটি ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো নদীর পাড়ে গাছপালার ছায়ায়, ফড়িং ধরবার জন্যে। অনঙ্গ ওদের বকেঝকে আবার গাড়ীতে ওঠালে।

নিস্তব্ধ ফাগুন-দুপুরে মেঠোপথে আমবন, জাম, বট, বাঁশ, শিমুলগাছের ছায়ায় ছায়ায় গরুর গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে বসে অনঙ্গ-বৌয়ের ঝিমুনি ধরলো। বড়ছেলে বললে—মা, তুমি ঢুলে পড়ে যাচ্চ যে, উঠে বোসো।

অনঙ্গ অপ্রতিভ হয়ে বললে—চোখে একটু জল দিলে হোত। ঘুম আসচে।

ভাতছালা পৌছুতে বেলা পড়ে গেল। গাড়োয়ান বললে—তবু সকালে সকালে এসে গ্যালাম মা-ঠাকরোণ। ন' কোশ রাস্তা আমাদের গাঁ থে। গরুদুটোর সুধার বয়েস তাই আসতে পারলে।

ভাতছালাতে অনঙ্গ-বৌয়ের ঘর ছিল গ্রামের বাগ্‌দি পাড়া থেকে অল্পদূরে খুব বড একটা বিলের কাছে। একখানা খড়ের ঘর, সঙ্গে ছোট একখানা রান্নাঘর, অনেকদিন কেউ না থাকাতে চালার খড কিছু কিছু উড়ে পড়েচে, মাটির দাওয়াতে ছাগল গরু উঠে খুঁড়ে ফেলেচে। উঠোনের চারিধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছিল, ফাঁকে ফাঁকে রাংচিতার গাছ। বেড়ার শুকনো বাঁশ লোকে ভেঙে নিয়েছে অনেক।

মতি বাগ্‌দিনী ছুটে এল ওদের গরুর গাড়ী দেখে। মহাখুশীর সঙ্গে বললে—বামুন-দিদি আলেন নাকি? ওমা, আমাদের কি ভাগ্যি—

অনঙ্গ-বৌ বললে—আয় আয় ও মতি, ভাল আছিস?

—দাঁডান, আগে একটু গড করে নিই। পায়ের ধুলো ছান এটু—খোকারা বেশ বড় হয়েচে দেখচি। বাঃ—

—ভাল ছিলি?

—আপনাদের ছিচরণের আশীব্বাদে। এগন আছেন কোথায়?

—ওই নতুনগাঁ, কাপালীপাড়ায়। ন'কোশ রাস্তা এখান থেকে।

—এখানে এখন থাকবেন তো?

—বেশিদিন কি থাকতে পারি? সেখানে উনি ইস্কুল খুলেচেন মস্তবড়। এক-ঘর ছাত্তর। দুদিন থাকবো তাই তাঁকে রেঁধে খেতে হবে।

—খাওয়াদাওয়ার যোগাড করবো?

—আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে পুঁটুলিতে। তুই দুটো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে দিয়ে যা।

পদ্মবিলের থেকে কিছু দূরে মুচিপাড়া। প্রায় একশো ঘর মুচির বাস। পদ্মবিলে মাছ ধরে আশপাশের গ্রামে বেচে এরা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। পোয়াটাক পথ দূরে গ্রামের অন্য অন্য জাত বাস করে। ব্রাহ্মণের বাস এ গ্রামেও নেই—এর একটা প্রধান কারণ, গঙ্গাচরণ এমন গ্রামে বাস করে নি যেখানে ব্রাহ্মণের বাস আছে। কারণ সে গ্রামে তার পসার থাকবে না। তার বদলে অন্য ব্রাহ্মণ যেখানে ডাকবার সুবিধে আছে, এমন গ্রামে সে ঘর বাঁধতে যাবে কি জন্যে? তাতে আদর হয় না।

অনঙ্গ-বৌয়ের আগমনের সংবাদে গোয়ালাপাড়া থেকে বৌ-ঝিয়েরা দেখা করতে এল। কেউ নিয়ে এল একটি ঘটিতে সেরখানেক দুধ, কেউ নিয়ে এল খানিকটা খেজুর-গুড়ের পাটালি, কেউ একছড়া পাকা মর্ত্তমান কলা। অনেক রাত পর্য্যন্ত ঝি-বৌয়েরা দাওয়ায় বসে গল্প করলে। সকলেই মহাখুশি অনঙ্গ-বৌ আসাতে। সকলেই অনুরোধ জানালে এখানে কিছুদিন থাকতে। এখানে আবার উঠে এলে কেমন হয়? তারা সব সুবিধে করে দেবে বসবাসের। কোনো অভাব-অভিযোগ থাকতে দেবে না। আসুন না বামুনদিদি তাঁদের গাঁয়ে আবার?

ওরা নিজেরাই ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিলে। মাটির প্রদীপে তেল সলতে দিয়ে আলো জেলে দিলে।

মতি মুচিনী বললে—রাত্তিরে আমি এসে শোবো ঘরের দাওয়ায়। দুটো খেয়ে আসি—

অনঙ্গ-বৌ তাকে বাড়ী গিয়ে খেতে দিলে না। যা রান্না হয়, এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে নিলেই হবে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানও তো খাবে।

সন্ধ্যার পরে বেশ জোৎস্না উঠলো। একটু ঠাণ্ডা পড়েচে জোর দক্ষিণ বাতাসে। বৌ-ঝিয়েরা একে একে চলে গেল। মতি মুচিনী কলার পাত কেটে এনে বিলের ধারে ঘাসের উপর ভাত খেতে বসলো। গাড়োয়ান বললে তার শরীর খারাপ হয়েচে সে কিছু খাবে না রাত্রে।

অনঙ্গ মাদুর পেতে গল্প করতে বসলো বিলের দিকের জোৎস্নালোকিত দাওয়ায়। শ্যামাচরণ ঘোষের বিধবা মেয়ে একটা কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে এসে হাজির হোল অনেক রাত্রে। সেও রাত্রে এখানে শোবে। অনঙ্গ-বৌকে সেও বড় ভালবাসে। এ মেয়েটির বিবাহ হয়েছিল পাশের গ্রাম কুমুরে। এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়েচে, এখন প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর বয়েস, দেখতে এখনও সুন্দরী, টকটকে ফর্সা রং, মুখশ্রীও ভাল।

অনঙ্গ হেসে বললে—আয় কালী, চাঁদনী রাতে আবার একটা টেমি কেন?

কালী আঁচল দিয়ে টেমিটা বাঁচিয়ে আনচে পদ্মবিলের জোর দক্ষিণ হাওয়া থেকে। বললে—সে জন্যে নয় দিদি, ওই মুচিপাড়ার বাঁশবাগান দিয়ে আসতে গা ছম ছম করে এত রাত্তিরে।

—কেন রে? ভূতে তোর ঘাড় মটকাবে?

কালী হেসে বললে—ওসব নাম কোরো না রাত্তির বেলা। তুমি ডাকাত মেয়েমানুষ বাবা—

—দূর পোড়ারমুখী, ব্রাহ্মণের আবার ভয় কি রে ?

—ভূতে বামুন-বোষ্টম মানে না বৌদি, সত্যি কথা বলচি। সেবার হোল কি—

মতি মুচিনী ভয় পেয়ে বলল—বাদ দেও, ওসব গল্প এখন করে না। এই খেজুরের চটখানা পেতে শুয়ে পড় বামুন-দিদির পাশে।

অনঙ্গ-বৌয়ের মনে আজ খুব আনন্দ। অনেকদিন পরে সে তার পুরোনো ঘরে ফিরে এসেচে। আবার পুরোনো সঙ্গিনীদের সঙ্গে দেখা হয়েচে। পদ্মবিলের ওপর এমন জ্যোৎস্নারাত্রি কতকাল সে দেখে নি। অথচ এখানে যখন ছিল, তখন কোনদিন খাওয়া জুটতো, কোনদিন জুটতো না। এই মতি মুচিনী কত পাকা আম কুড়িয়ে এনে দিয়েচে, লোকের গাছের পাকা কাঁটাল চুরি করে পর্য্যন্ত এনে খাইয়েচে। এই কালী গোয়ালিনী বাড়ী থেকে ভাইবৌকে লুকিয়ে নতুন ধানের চিঁড়ে এনে দিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ বিলের জলের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বললে—মনে আছে কালী সেই একদিন লক্ষ্মীপূজোর রাতের কথা ?

কালী মৃদু হেসে চুপ করে রইল। বামুনের মেয়েকে খাবার জোগাড় ক'রে দিয়েচে একদিন, তা কি সে এখন মুখে বলবে ?

—মনে নেই ?

—ও কথা ছেড়ে দাও বৌদিদি।

—তুই সেদিন চিঁড়ে না আনলে উপোস দিতে হোত।

—আবার ও কথা ? ছিঃ—

অনঙ্গ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই পদ্মবিলের ওখানটাতে একটা শোল মাছ ধরেছিলাম মনে আছে মতি ?

মতি বললে—গামছা দিয়ে। ওমা, সেদিনের কথা যে! খুব মনে আছে। তুমি আর আমি নাইতি গিয়েছিলাম—

—মস্ত বড় মাছটা ছিল। না রে ?

—ভাল কথা মনে হোল। কাল মনে করে দিয়ো দিকিনি। দেওর মাছ ধরবে কাল, একটা বাণ মাছ কাল খাওয়াবো বামুনদিদিকে। বড্ড সোয়াদ বিলির মাছের—

—সে যেন তুই আমায় নতুন শেখাচ্চিস মতি !

কালী বলে উঠলো—ওই শোনো মতির কথা! মুচি তা আর কত বুদ্ধি হবে ? বৌদিদি যেন আর এ গাঁয়ের মানুষ না ? তু'দিনের জন্যে চলে গিয়েচে তাই কি ? আবার ফিরে আসবে না বৌদি ?

—কেন আসবো না ? আমার সাধ ছিল পদ্মবিলের একেবারে ধারে একখানা ঘর বাঁধবো।

—তোমার এ ঘরও তো বিলের ধারে বৌদি ? কত দূর আর ? ওই তো কাছেই।

—তা না রে, বিলের একেবারে ধারে ওই যে বাঁশঝাড়টা ওরই পাশে ঘর বাঁধবার ইচ্ছে

ছিল। বেশ ভালো হোত না?

—এখন বাঁধো। আমি বাঁশ, খড় সব জুটিয়ে দেবো বাবাকে বলে।

অনঙ্গ-বৌয়ের ঘুম এল না অনেক রাত পর্য্যন্ত।

সে ভাবছিল তার জীবনের গত দিনগুলির কথা। ছুতোরখালি গ্রামে তার বাপের বাড়ী। বাবা ছিলেন সামান্য অবস্থার গৃহস্থ, জমিজমার সামান্য আয়ে সংসার চালাতেন। হরিহরপুরে কি একটা কাজে গিয়ে গঙ্গাচরণের বাবার সঙ্গে আলাপ হয়—সেই সূত্রে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেন গঙ্গাচরণের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বেই হঠাৎ তিনি মারা যান। মামাদের চেষ্টায় ও গঙ্গাচরণের বাবার দয়ায় হরিহরপুরেই বিবাহ হয়! একখানা মাত্র লালপাড় শাড়ী ও মায়ের হাতের সোনা-বাঁধানো শাঁখা—এর বেশি কিছু জোটে নি অনঙ্গ-বৌয়ের ভাগ্যে বিয়ের সময়ে।

এদিকে বিয়ের কিছুদিন পরে গঙ্গাচরণের বাবাও মারা গেলেন। গঙ্গাচরণের জ্ঞাতিরা নানারকম শত্রুতা করতে লাগলো। হরিহরপুরে একখানা পুরোনো কোঠাবাড়ী ও একটা আমবাগান ছাড়া অন্য কিছু আয়কর সম্পত্তি ছিল না, জ্ঞাতিদের শত্রুতায় অবস্থা শেষে এমন দাঁড়ালো যে আমবাগানের একটি আমও ঘরে আসে না। কোনো আয় ছিল না। সংসারের, উঠোনের মানকচু তুলে কামারগাঁতির হাটে নিজের মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে গঙ্গাচরণকে চাল কিনে আনতে হয়েচে, তবে স্বামী-স্ত্রীর সংসার চলেচে।

একদিন খুব বর্ষার দিন। ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ে ঘর ভেসে যাচ্চে, অনঙ্গ-বৌ স্বামীকে বললে—হ্যাঁ গা, বাড়ীঘর না সারলে এখানে তো আর থাকা যায় না?

গঙ্গাচরণ বললে—কি করি বৌ, বসন্ত মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করি নি ভাবচো। আমি বসে নেই। দুশোটি টাকার এক পয়সার কমে ও ছাদে উঠবে না।

—কোথায় পাবে দুশো টাকা? দু'টাকার সম্বল আছে তোমার? আমার পরামর্শ শোনো, এ-দেশ ছেড়ে চলো অন্য জায়গায় যাই।

—কোথায় যাই বলো দেশ ছেড়ে, কে জায়গা দেবে?

—সে কথা আমি জানি? পুরুষমানুষ—সে তুমি বোঝো। আর জ্ঞাতি-শত্তুরের সঙ্গে বিবাদ করে এখানে টিঁকে থাকতে পারবেও না তুমি।

সেই হোল ওদের দেশত্যাগের সূত্রপাত। তারপর আশ্বিন মাসে পূজোর পরই ওরা প্রথমে এল এই ভাতছালা। এখানে প্রথম প্রথম ভালই চলেছিল, পরে একটু অসুবিধে হয়ে গেল। তার প্রধান কারণ, ভাতছালায় এরা এসেছিল স্থানীয় গোয়ালারা ধানের জমি করে দেবে আশা দিয়েছিল বলে। কিন্তু দু'বছর হয়ে গেল, ধানের জমির কোনো বন্দোবস্তই আর হয়ে উঠলো না। এক বেলা খাওয়া হয় ওদের তো অন্য বেলা হয় না। সেই সময় এই কালী গোয়ালিনী যথেষ্ট সাহায্য করেছিল ওদের। বিরক্ত হয়ে ওরা এখান থেকে উঠে যায় বাসুদেবপুরে। সেখানে অন্য সুবিধে মন্দ ছিল না, কিন্তু

ম্যালেরিয়াতে অনঙ্গ-বৌ মরে যাওয়ার যোগাড় হোল। তখন নতুন গাঁয়ের কাপালীদের সঙ্গে বাসুদেবপুরের হাটেই আলাপ হয় গঙ্গাচরণের, কাপালীরা পাঠশালার মাস্টার চাইচে শুনে গঙ্গাচরণ যেতে রাজী হয়। ওরাও খুব আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায়। সেই থেকেই নতুন গাঁয়ে বাস।

অনঙ্গ বল্লে—কালী ঘুমুলে নাকি? বাবাঃ কি ঘুম তোদের?

মতি ঘুমজড়িত স্বরে বলে—বামুন-দিদি, ঘুমোও নি এখনো? রাত যে পুইয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়ো। পূবে ফর্সা হোল—

—তোর মুণ্ডু হোল পোড়ারমুখী—

অনঙ্গ-বৌ ভাবছিল তার জীবনে কত জায়গায় যাওয়া হোল, কত কি দেখা হোল! তার বয়সী ক'টা মেয়ে এমন নানা জায়গায় বেড়িয়েচে? ওই তো তারই সমবয়সী হৈম রয়েচে হরিহরপুরে, তার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে। কোথাও যায় নি, কোনো দেশ দেখে নি।

সে ভাবলে—ভালো কাপড় পরতে পারি নে, খেতে পাই নি তাই কি? আমার মত এত জায়গা বেড়িয়েচে হৈম? কত জায়গা। ধর হরিহরপুর, সেখান থেকে ভাতছালা, ভাতছালা থেকে বাসুদেবপুর—তার পর এখন নতুনগাঁ। উঃ—কথাটা কালীকে বলবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো—ডাক দিলে—ও কালী, কালী, একটা কথা শোন্ না?

মতি ঘুমজড়িত স্বরে বললে—বামুন-দিদি, তুমি জ্বালালে দেখচি, ঘুমুতি দেবা না রাত্তিরে? কালী ঘুমিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ, ওকে আর ডাকাডাকি কোরো না। রাত পুইয়ে গেল যে।

অনঙ্গ-বৌ হেসে তার গায়ে একটা কাটি ছুঁড়ে মেরে বললে—দূর পোড়ারমুখী—

যে দু'দিন অনঙ্গ এখানে রইল, এমন নিছক আনন্দের দুটি দিন ওর জীবনে কতকাল আসে নি। চলে আসবার দিন মতি মুচিনী কেঁদে আকুল হোল। সে এ গাঁয়ে আর থাকতে চায় না, অনঙ্গ-বৌয়ের সঙ্গে চলে যাবে। কালী গোয়ালিনী আধ সের ভাল গাওয়া ঘি ও দুটো বড় মানকচু নিয়ে এসে দিলে। মতি খেজুর গুড়ের পাটালি নিয়ে এলো খেজুর গাছের বাকলায় বেঁধে।

গঙ্গাচরণ জিনিসপত্র দেখে বললে—বাঃ, অনেক সওদা করে এনেছ দেখচি—

অনঙ্গ হাসি হাসি মুখে বললে—দাম দিতে হবে আমাকে কিন্তু।

—ভাল কথাই তো। কেমন দেখলে?

—অতি চমৎকার। আমার যে কি ভাল লেগেচে! মতি এল, কালী এল, গাঁয়ের কত ঝি-বৌ দেখতে এল—

—ওরা এখনো ভোলে নি আমাদের?

—ভুলে যাবে? সবাই বলে এখানে এসে আবার বাস করুন বামুন-দিদি। হ্যাঁ গা, পদ্মবিলের ধারে একখানা ঘর বাঁধো না কেন? আমার বড্ড সাধ কিন্তু।

—আবার ভাতছালা ফিরে যাবে? সে হয় না। পাঠশালা জমে উঠেচে। এখন কি নড়া যায়, গেলেই লোকসান।

—তুমি যা ভালো বোঝো। আমার কিন্তু বাপু ওখানে একখানা ঘর বাঁধবার বড্ড ইচ্ছে।

গঙ্গাচরণ সেদিন পাঠশালা জমিয়ে বসেচে, সামনের পথ দিয়ে একজন পথ-চল্‌তি লোক যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পাঠশালার মধ্যে ঢুকে বললে—এটা পাঠশালা?

—হ্যাঁ।

—মশাই দেখচি ব্রাহ্মণ, একটু তামাক খাওয়াতে পারেন? আমিও ব্রাহ্মণ। নমস্কার।

—বসুন বসুন, নমস্কার—ওরে—

গঙ্গাচরণের ইঙ্গিতে একজন ছাত্র তামাক সাজতে ছুটলো।

আগন্তুক লোকটির পায়ে পুরোনো ও তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতো, গায়ে মলিন পিরান, হাতে একগাছি তৈলপক্ব সরু বাঁশের ছড়ি। পায়ে জুতো থাকা সত্ত্বেও সাদা ধুলো হাঁটু পর্য্যন্ত উঠেচে। লোকটি একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর ক্লান্তভাবে বসে পড়লো।

গঙ্গাচরণ বললে—মশায়ের নাম?

—আজ্ঞে দুর্গা বাঁড়ুযো। নিবাস, কুমুরে নাগরখালি, আড়ংঘাটার সন্নিকট। আমিও আপনার মত ইস্কুল মাস্টার।—অম্বিকপুর চেনেন? এখান থেকে পাঁচ কোশ পথ। অম্বিকপুরে লোয়ার প্রাইমারী ইস্কুলে সেকেন্ পণ্ডিত।

—বেশ, বেশ। তামাক ইচ্ছে করুন—

—আগে আমায় একটু জল খাওয়াতে পারেন?

—ডাব খাবেন? ওরে পাঁচু, যাও বাবা, হবি কাপালীর চারাগাছ থেকে আমার নাম করে দুটো ডাব চট্ করে পেড়ে নিয়ে এসো তো?

আগন্তুক লোকটি প্রশংসমান দৃষ্টিতে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাঃ, আপনার দেখচি এখানে বেশ পসার।

গঙ্গাচরণ মৃদু হেসে চুপ করে রইল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের পসার-প্রতিপত্তির কথা নিজের মুখে বলে না।

ইতিমধ্যে ডাব এসে পড়লো। ডাবের জল খেয়ে দুর্গাপদ বাঁড়ুযো আরামে নিঃশ্বাস ফেলে হুঁকো হাতে নিয়ে সজোরে ধূমপান করতে লাগলো। আপন মনেই বললে—বেশ আছেন আপনি—বেশ আছেন—

গঙ্গাচরণ বিনীতভাবে বললে—আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে এক রকম চলে যাচ্চে—

—না, না, বেশ আছেন। দেখে আনন্দ হল, আমার মতই ইস্কুল মাস্টার একজন, ভাল ভাবে থাকতে দেখলেই আনন্দ হয়।

—আপনি ওখানে কি রকম পান ?

—মাইনে পাই তিন টাকা ইস্কুল থেকে। গবর্ণমেণ্টের এড্ পাই দেড় টাকা। ইউনিয়ন বোর্ডে এড্ পাই ন'-সিকে মাসে। এই ধরুন সর্ব্বসাকুল্যে পৌনে সাত টাকা। তা এক রকম চলে যায়—

গঙ্গাচরণ বললে—মাসে মাসে পান তো ?

দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে গর্ব্বের স্বরে বললে—নিশ্চয়ই, এ হোল গবর্ণমেণ্টের কারবার। এতে কোনো গোলমাল হবার জোটি নেই। তবে মোটে সাত টাকায় সংসার ভাল চলে না।

—মশায়ের ছেলেপিলে কি ?

—একটি মাত্র মেয়ে, আর আমার পরিবার। তবে আমার বিধবা ভগ্নী আমার সংসারেই থাকে। সাত টাকায় এতগুলি লোকের—

—আর কিছু আয় নেই ?

—আজ্ঞে না। আমি বিদেশী লোক, ওখানে আর কি আয় থাকবে ?

—ও গ্রামে কি ব্রাহ্মণের বাস বেশি ? নাকি অন্য অন্য জাতও আছে ? আপনি সঙ্গে সঙ্গে দশকর্ম্ম ধরুন না কেন ? এই ধরুন লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজো, ষষ্ঠীপুজোটুজো—

—ও-সব চলবে না। সেখানে পুরুত আছে গ্রামে। ব্রাহ্মণের গ্রাম—

—ওখানেই আপনি ভুল করেচেন—এই! গোলমাল করবি তো একেবারে পিঠের ছাল তুলবো সব। ব্রাহ্মণের গ্রামে বসতে নেই কক্ষনো। ওতে পসার হয় না মশাই—

—কথাটা ঠিকই বলেচেন। আপনি বেশ আছেন, ডাব আনতে বললেন অমনি ডাব এসে হাজির। এমন না হোলে বাসের সুখ। আমার আর কোনো আয় নেই ওই পৌনে সাত টাকা ছাড়া। তবে ধরুন কলাটা, বেগুনটা মধ্যে মধ্যে ছাত্রেরা আনে।

দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে কথাবার্ত্তার ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবতে লাগলো। পুনরায় তামাক সেজে যখন হুঁকো তার হাতে দেওয়া হোল, তখন বললে—একটা কথা ভাবচি—

—কি বলুন ?

—দু'জনে মিলে একটা আপার প্রাইমারি ইস্কুল গড়ে তুলি না কেন ? আপনি কি গুরুট্রেনিং পাস ?

—না।

দুর্গাপদ চিন্তাকুল ভাবে বলল—তাই ত। গুরুট্রেনিং পাস না থাকলে হেড মাস্টার হতে পারবেন না যে! বাইরে থেকে আবার কাউকে আনলে তাকে ভাগ দিতে হবে কিনা? সে নিজের কোলে সব ঝোল টেনে নেবে। তাতে সুবিধে হবে না—আমার ওখানে আর ভাল লাগচে না। সঙ্গী নেই, দুটো কথা কইবার মানুষ নেই—ব্রাহ্মণ যা আছে, সব অশিক্ষিত, চাষবাসই নিয়ে আছে। সংসার অনিত্য, আমি মশাই আবার একটু ধর্ম্মকথা, একটু সৎ আলোচনা বড্ড পছন্দ করি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—এই রে, পেয়েচে!—মুখে বলল—সে তো খুব ভালো কথা।

—আপনি আর আমি সমব্যবসায়ী। তাই আপনার কাছে এত কথা খুলে বললাম। কিছু মনে করবেন না যেন। আচ্ছা আজ উঠি। অনেকদূর যেতে হবে।

—আবার যখন এদিকে আসবেন, দেখা দেবেন দয়া করে।

—সে আর বলতে মশাই ? একদিন আমার পরিবারকে নিয়ে এসে আপনাদের বাড়ীতে আলাপ করিয়ে দেবো। আচ্ছা আসি, নমস্কার—

গ্রামের বিশ্বাস মশায়ের নাতিটি কাকতালীয় ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলো গঙ্গাচরণের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের পরে। এতে গঙ্গাচরণের পসার আরও বেড়ে গেল গ্রামের লোকদের কাছে। একদিন একজন লোক এসে গঙ্গাচরণকে বললে—আমাদের গাঁয়ে একবার যেতে হচ্ছে পণ্ডিত মশায়—

—এসো, বসো। কোথায় বাড়ী ?

—কামদেবপুর, এখান থেকে তিন কোশ। আপনার নাম শুনে আসচি। সবাই বললে, পণ্ডিত মশায় বড় গুণী লোক। আমাদের গাঁয়ের আশপাশে বড় ওলাউঠোর ব্যায়রাম চলচে। আপনাকে যেয়ে আমাদের গাঁ বন্ধ করতে হবে।

গঙ্গাচরণ 'গাঁ বন্ধ করা' কথাটা প্রথম শুনলো। তবুও আন্দাজ করে নিল লোকটা কি চাইচে। তাদের গ্রামে যাতে ওলাউঠার অসুখ না ঢোকে, এজন্যে মন্ত্র পড়ে গ্রামের চারিদিক গণ্ডি টেনে দিয়ে মহামারীর আগমন বন্ধ করতে হবে, এই ব্যাপার।

কাঁচা লোকের মত গঙ্গাচরণ তখনই বলে উঠলো না, 'হ্যাঁ, এখুনি করে দেবো, তাতে আর কি' ইত্যাদি। সে গম্ভীর ভাবে তামাক টেনে যেতে লাগলো, উত্তরে 'হ্যাঁ' কি 'না' কিছুই বললে না।

লোকটি উদ্বিগ্নস্বরে বললে—ঠাকুর মশায়, হবে তো আমাদের ওপর দয়া ?

গঙ্গাচরণ স্থির ভাবে বললে—তাই ভাবচি।

—কেন পণ্ডিত মশায় ? এ আপনাকে হাতে নিতেই হবে—

—বড্ড শক্ত কাজ। বড্ড শক্ত—

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। পরে লোকটা পুনরায় আকুল ভাবে বললে—তবে কি হবে না ?

গঙ্গাচরণ নীরব। দু'মিনিট।

— পণ্ডিত মশায় ?

—বাপু হে, অমন বক্ বক্ কোরো না। মাথা ধরিয়ে দিলে যে বকে। দাঁড়াও, ভাবতে দাও—

লোকটা ধমক খেয়ে চুপ করে রইল, যদিও সে বুঝতে পারলে না এতক্ষণ সে এমন কি বকছিল, যাতে পণ্ডিত মশায়ের মাথা ধরতে পারে। নিজে থেকে সে কোনো কথা বলতে আর সাহস করলে না। গঙ্গাচরণ নিজেই খানিকটা চিন্তার পর বললে—কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ করতে হবে, বড্ড শক্ত কথা। পয়সা খরচ করতে হবে। পারবে ?

লোকটা এবার উৎসাহ পেয়ে বললে—আপনি যা বলেন পণ্ডিতমশাই। আমাদের গাঁয়ে আমরা ষাট-সত্তর ঘর বাস করি। হিঁদু-মোছলমানে মিলে চাঁদা তুলে খরচ যোগাবো। প্রাণ নিয়ে কথা, আশপাশের গাঁ মরে উজোড় হয়ে যাচ্চে, যদি পয়সা খরচ কল্লি আমাদের প্রাণগুলো বাঁচে—

—নদীর জল খাও?

—আজ্ঞে হাঁ, আমাদের গাঁয়ের নিচেই বাঁওড়—বাঁওড়ের জল খাই।

—গাঁ বন্ধ করলে বাঁওড়ের জল আর খেতে পাবে না কেউ। পাতকুয়োর জল খেতে হবে।

—সে আপনি যেমন আজ্ঞে করবেন—কত খরচ হবে বলুন।

গঙ্গাচরণ মনে মনে হিসেব করবার ভঙ্গি করে কিছুক্ষণ পরে বললে—সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ হবে—ফর্দ্দ করে দিচ্চি নিয়ে যাও।

লোকটা যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এত গম্ভীর ভূমিকার পরে মাত্র ত্রিশটি টাকা খরচের প্রস্তাব সে আশা করে নি। কিন্তু গঙ্গাচরণের উচ্চাশার সীমা পৌঁছে গিয়েচে ভাতছালাতেও যাকে স্ত্রীপুত্রসহ অনেক সময় দিনে রাতে একবার মাত্র অন্নাহার করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েচে, সে এর বেশী চাইতে পারে কি করে?

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলে। সংসারের কি কি দরকার? অনঙ্গ-বৌ বেশি আদায় করতে জানে না। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে একটা ফর্দ্দ খাড়া করলে, তেমন ব্যয়সাধ্য ফর্দ্দ নয়।

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুমি গাঁ বন্ধ করতে পারবে তো? এতগুলো লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আমি পাঠশালায় ছেলেদের 'স্বাস্থ্য প্রবেশিকা' বই পড়াই। তাতে লেখা আছে মহামারীর সময় কি কি করা উচিত অনুচিত। আসলে তাতেই গাঁ বন্ধ হবে। মন্ত্র পড়ে গাঁ বন্ধ করতে হবে না।

বাইরে এসে বললে—ফর্দ্দ লিখে নাও—আলোচাল দশ সের, পাকা কলা দশ ছড়া, গাওয়া ঘি আড়াই সের, সন্দেশ আড়াই সের কাপড় চাই তিনখানা শাড়ী, কস্তাপেড়ে, তিন ভৈরবীর, আর প্রমাণ ধুতিচাদর ভৈরবের—আরও ধরো—হোমের তাম্রকুণ্ডু।—

লোকটা ফর্দ্দ নিয়ে চলে গেল।

কামদেবপুর গ্রামে যেদিন গঙ্গাচরণ যায়, সেদিনই সেখানে একজন বললে—পণ্ডিত মশাই, চাল বড্ড আক্রা হবে, কিছু চাল এ সময় কিনে রাখলে ভাল হয়।

—কত আক্রা হবে?

—তা ধরুন মণে দু টাকা চড়া আশ্চয্যি নয়।

কথাটা উপস্থিত কেউই বিশ্বাস করলে না। শান্তিস্বস্ত্যয়ন এবং গাঁ বন্ধ করার প্রক্রিয়া

দেখবার জন্যে আশপাশ থেকে অনেক লোক জড় হয়েছিল। গ্রামের চাষীরা বললে—মণে দু টাকা! তা'হলি আর ভাবনা ছেল না। কে বলেচে এ সব কথা?

আগেকার বক্তা নিতান্তই বাজে লোক নয়—ধান চালের চালানি কাজ করেচে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়। সে জোর গলায় বললে—তোমরা কিছু বোঝো না হে—আমার মনে হচ্চে গতিক দেখে, চালের দর ঠিক বাড়বে। আমি এ কারবার অনেকদিন ধরে করে আসচি, আমি বুঝতে পারি।

কথাটা কেউ গায়ে মাখলে না। তখন গাঁ বন্ধ করাব ব্যাপার নিয়ে সকলে গঙ্গাচরণকে সাহায্য করতে ব্যস্ত। হোম শেষ ক'রে পুজো আরম্ভ করতে গঙ্গাচরণ পুরো তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। এসব অজ্ঞ পাড়াগাঁ, এখানকার হাল-চাল ভালই জানা আছে তার। পয়সা কি অমনি অমনি রোজকার হয়? তিনটি মাটির কলসী সিঁদুর দিয়ে চিত্রিত করতে হয়েচে, তালপাতার তীর বানিয়ে চারকোণে পুঁতে পৈতের সুতো দিয়ে সেগুলো পরস্পর বাঁধতে হয়েচে, গাবকাঠের পুতুল তৈরি করতে হয়েচে গ্রাম্য ছুতোর দিয়ে, তেল সিঁদুর লেপে সেটাকে তেমাথা রাস্তায় পুঁততে হয়েচে—হাঙ্গামা কি কম? সে যত বিদঘুটে ফরমাশ করে, গ্রামের লোকের তত শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তার ওপরে।

ওর কানে গেল লোকে বলাবলি করচে—বলি, এ কি তুই যা তা পেলি রে? ওঁর পেটে এলেম কত? যাকে বলে পণ্ডিত! এ কি তুই বাগান গাঁর দীনু ভট্চায পেয়েচিস?

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—নিষ্কালি সরা দু'খানা আর শ্বেত আকন্দের ডাল দুটো—

ঠিক দুপুরবেলা, এখন এ সব জিনিস কোথা থেকে যোগাড় হয়, আর কেই বা আনে। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

একজন বিনীত ভাবে বললে—আজ্ঞে, এ গাঁয়ে তো কুমোর নেই, নিষ্কালি সরা এখন কোথায় পাই?

গঙ্গাচরণ রাগের সুরে বললে—তবে থাকলো পড়ে, ফাঁকি-জুকির কাজ আমায় দিয়ে হবে না। গাঁ বন্ধ করতে নিষ্কালি সরা লাগে এ কথা কে না জানে? আগে থেকে যোগাড় ক'রে রেখে দিতে পারো নি?

গ্রামের লোকে নিজেদের অজ্ঞতায় নিজেরাই লজ্জিত হয়ে উঠলো। বলাবলি করলে এ খাঁটি লোক বাবা। এর কাছে কোন কাজের ফাঁকি নেই। যেভাবে হোক সরা এনে দিতেই হবে।

নানা অপরিচিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বেলা দু'টোর সময়ে প্রক্রিয়া শেষ হোল।

গঙ্গাচরণ বললে—সবাই এসে শান্তিজল নিয়ে যাও—

খুব ঘটা ক'রে শান্তিজল ছিটিয়ে দিয়ে গঙ্গাচরণ গম্ভীর মুখে বললে—এবার আসল কাজটি বাকি—

উপস্থিত সকলে এ ওর মুখের দিকে চায়। সকাল থেকে ফাইফরমাসের চোটে প্রত্যেকে হিমশিম্ খেয়ে গিয়েচে, শান্তিজল পর্য্যন্ত ছিটানো হয়ে গেল, তবুও এখনও আসল কাজটি

হোল না। বেলা তিনটে বাজে এদিকে।

গ্রামের মাতব্বর লোক এক-আধজন এগিয়ে বললে—আজ্ঞে, কি কাজের কথা বলচেন পণ্ডিত মশাই ?

—ঈশান কোণে নিমগাছ আছে এ গাঁয়ে ?

—আজ্ঞে কোথায় বললেন ?

—ঈশান কোণে।

তারা মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে –সে কোথায় ?

—ঈশান কোণ জানো না ? উত্তর-পশ্চিম কোণ –এই দিক—

আঙুল দিয়ে গঙ্গাচরণ ঈশান কোণ দেখিয়ে দেয়। গ্রামে ঢুকবার পথই সেদিক দিয়ে, আসবার সময় সেদিকে একটা বড় নিমগাছ সে লক্ষ্য করে এসেচে আজই সকাল বেলা।

একজন বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বটে একটা।

– আছে ? থাকতেই হবে। ঈশানে যোগিনী যে—

—আজ্ঞে, কি করতে হবে ?

—ওখানে ধ্বজা বাঁধতে হবে। চলো আমার সঙ্গে—

দুজন জোয়ান ছোকরা গঙ্গাচরণের আদেশে নিমগাছের মগডালে ধ্বজা বাঁধতে উঠলো। বেলা চারটে বাজে।

গঙ্গাচরণ হাঁপ ফেলে নিশ্চিত হবার ভঙ্গিতে বললে—যাক্, এবার ব্যাপারটা মিটে গেল। বাবাঃ, পয়সা খরচ ক'রে ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করলে তোমরা, এর মধ্যে খুঁত থাকতে দেবো কেন ? এবার তোমরাও নিশ্চিন্দি, আমিও নিশ্চিন্দি। গাঁ বন্ধ বললেই গাঁ বন্ধ হয় ! খাটুনি আছে।

সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলো। এমন না হোলে পণ্ডিত ?

গ্রামের সবাই মিলে অনুরোধ ক'রে এক গোয়ালা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাচরণের জলযোগের ব্যবস্থা করলে। গঙ্গাচরণ বললে—ডাবের জল ছাড়া আমি অন্য জল খাবো না। তোমরাও নদীর জল ব্যবহার বন্ধ কর একেবারে। এক মাসকাল নদীর জল কেউ খেতে পাবে না। বাসি বা পচা জিনিস খাবে না। মাছি বসলে সে খাবার তখুনি ফেলে দেবে। মনে থাকবে ? সবাইকে বলে দাও—

মাতব্বর লোকেরা সকলকে কথাটা বলে বুঝিয়ে দিলে।

সন্ধ্যার আগে গরুর গাড়ী করে ফিরচে, পথে গ্রাম্য পুরোহিত দীনু ভট্চায এসে বললে—নমস্কার, চললেন—

—আজ্ঞে হাঁ।

—আমার একটা কথা আছে, গাড়ী থেকে নেমে একটু শুনুন—

গঙ্গাচরণ গাড়ী থেকে নেমে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে দীনু ভট্চাযের সঙ্গে কথা বললে। দীনু ওর হাত দুটি ধরে বললে—আমার একটা অনুরোধ—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন—

—আমায় কিছু দিয়ে যান আজ যা পেলেন—

—কেন ?

—আমি না খেয়ে মরচি। ঘরে এক দানা চাল নেই। চালের দাম হু হু ক'রে বাড়চে। ছিল সাড়ে চার, হোল ছ'টাকা! পাঁচ ছটি পুষ্যি নিয়ে এখন চালাই কি ক'রে বলুন ? আমি নিজে এই বুড়ো বয়সে রোজকার না করলে সংসার চলে না। অথচ বুড়ো হয়ে পড়েচি বলে এখন আর কেউ ডাকেও না, চোকি আর তেমন ভাল দেখি নে।

গঙ্গাচরণ চুপ করে থেকে বললে—তাই তো—বড় মুশকিল দেখ্‌চি। আপনার বয়স কত ?

—উনসত্তর যাচ্চে। মেয়েরা বড়, ছেলে বড় হোলে ভাল ছিল। এ বুড়ো বয়সে রোজকার করার কেউ নেই আমি ছাড়া।

—চালের দাম কত চড়েচে ?

—আরও নাকি চড়বে শুনচি। এখনই খেতে পাচ্চি নে—আরও বাড়লে কি কিনে খেতে পারবো! এই যুদ্ধুর দরুণ নাকি অমনটা হচ্চে—

গঙ্গাচরণ মাঝে-মিশালে শোনে বটে যুদ্ধের কথা। মাঝে মাঝে দু-একখানা এরোপ্লেন মাথার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেচে। তবে এ অজ চাষাগাঁয়ে কেউ খবরের কাগজ নেয় না, শহরও সাত-আট মাইল দূরে। গঙ্গাচরণ নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে, ওসব চর্চ্চা করবার সময়ও তার নেই। তবুও কথাটা তাকে ভাবিয়ে তুললে। সে বুড়ো ভট্‌চাযকে বললে যা চাল পেয়েছি, তা থেকে কিছু আপনি নিয়ে যান—আর কিছু ডাল আর গাওয়া ঘি—

দীনু ভট্‌চায বললে—না, গাওয়া ঘি আমার দরকার নেই। বলে ভাত জোটে না, গাওয়া ঘি! আচ্ছা, আমি এই কাপড়ের মুড়োতেই চাল ডাল বেঁধে নিই। আপনি আমায় বাঁচালেন। ভগবান আপনার ভাল করুন।

কথাটা ভাবতে ভাবতে গঙ্গাচরণ বাড়ী এসে পৌছুল। অনঙ্গ-বৌ জিনিসপত্র দেখে খুব খুশি। বললে—চাল এত কম কেন ?

— এক বুড়ো বামুন ভট্‌চায্যিকে কিছু দিয়ে এসেচি পথে।

—যাক গে, ভালই করেচ। দিলে তাতে কমে না, বরং বেড়ে যায়।

—শুনচি নাকি চালের দাম বাড়বে, সবাই বলচে।

—ছ'টাকা থেকে আরও বাড়বে! বল কি গো?

—সবাই তো বলচে। যুদ্ধুর দরুণ নাকি এমন হচ্ছে—

—কার সঙ্গে যুদ্ধু বেধেচে গো ?

—সে সব তুমি বুঝতে পারবে না। আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানি আর জাপানের—সব জিনিস নাকি আক্রা হয়ে উঠবে।

—হোক গে, আমাদের তো অর্দ্ধেক জিনিস কিনে খেতে হয় না। তবে চালটা যদি বেড়ে যায়—

—সেই কথাই তো ভাবচি—

সেদিন বিকেলে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী বসে এই সব কথার আলোচনা হচ্ছিল। বিশ্বাস মশায় বললেন—আমাদের ভাবনা কি? ঘরে আমার দু'গোলা ধান বোঝাই। দেখা যাবে এর পরে।

বৃদ্ধ নবদ্বীপ ঘোষাল বললে—এ সব হাঙ্গামা কতদিনে মিটবে ঠাকুর মশাই? শুনচি নাকি কি একটা পুব জারমান নিয়ে নিয়েচে?

বিশ্বাস মশায় বললে—সিঙ্গাপুর—

নবদ্বীপ বললে—সে কোন্ জেলা? আমাদের এই যশোর, না খুলনে? মামুদপুরের কাছে?

বিশ্বাস মশায় হেসে বললেন—যশোরও না, খুলনেও না। সে হোল সমুদ্দুরের ধারে। বোধ হয় পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলা। তাই না পণ্ডিত মশাই?

গঙ্গাচরণ ভাল জানে না, কিন্তু এদের সামনে অজ্ঞতাটা দেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং সে বললে—হাঁ। একটু দূরে—পশ্চিম দিকে। ঠিক কাছে নয়।

নবদ্বীপ বললে—পুরীর কাছে? আমার মা একবার পুরী গিয়েছিলেন। পুরী, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর। সে বুঝি মেদিনীপুর জেলা?

বিশ্বাস মশায় বললেন—হ্যাঁ।

ভৌগোলিক আলোচনা শেষ হলে যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বসে পরদিন ছেলেদের জিজ্ঞেস করলে—এই সিঙ্গাপুর কোথায় জানিস?

কেউ বলতে পারলে না, কেউ নামই শোনে নি।

গঙ্গাচরণ নিজের ছেলের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললে—হাবু, সিঙ্গাপুর কোথায়?

হাবু দাঁড়িয়ে উঠে সগর্ব্বে বললে—পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলায়।

পাঠশালার অন্যান্য ছেলেরা ঈর্ষামিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতে হাবুর দিকে চেয়ে রইল।

বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে কতকগুলি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলে গঙ্গাচরণ বাজারের জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে। প্রত্যেক জিনিসের দাম ক্রমশঃ চড়ে যাচ্চে। কিন্তু তা যাক গে, সেদিন হাটে একটা ঘটনা দেখে শুধু গঙ্গাচরণ নয়, হাটের সব লোকই অবাক হয়ে গেল।

ঘটনাটা অতি সামান্য। ইয়াসিন বিশ্বাসের বড় গোলদারি দোকান। তাতে কেরোসিন তেল আনতে গিয়ে অনেকে শুধু হাতে ফিরে গেল। তেল নাকি নেই।

গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হোল না কথাটা। সে নিজেও তেল নেবে। তেলের বোতল হাতে

দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই ইয়াসিনের দাদা ইয়াকুব বললে—তেল নেই পণ্ডিত মশাই—

—নেই ?

—আজ্ঞে না।

—তেল আনো নি ?

—আজ্ঞে পাওয়া যাচ্চে না।

—সে কি কথা ? ক্রাসিন পাওয়া যাচ্চে না ?

—আমাদের চালান আসে নি এবার একদম। শুনলাম নাকি মহকুমা হাকিমের কাছে দরখাস্ত করতে হবে চালান পাঠাবার আগে।

—কবে আসতে পারে ?

—আজ্ঞে কিছু ঠিক নেই—

গঙ্গাচরণ বোতল হাতে বেরিয়ে আসচে, ইয়াকুব স্বর নিচু করে বললে—বাবু, এই বেলা কিছু নুন আর কিছু চাল কিনে রাখুন—ও দুটো জিনিস যদি ঘরে থাকে, তা হলে কষ্টেস্রেষ্ট করে আধপেটা খেয়েও চলবে !

—কেন, ও দুটো জিনিসও কি পাওয়া যাবে না নাকি ?

—পণ্ডিত মশাই, সাবধানের মার নেই, আমরা হোলাম ব্যবসাদার মানুষ, সব দিকে নজর রেখে চলতি হয় কিনা ? কে জানে কি হয় মশাই।

গঙ্গাচরণ ভাবতে ভাবতে বাড়ী চলে এসে স্ত্রীকে বললে—আজ একটি আশ্চর্য্যি কাণ্ড দেখলাম—

—কি গা ?

—পয়সা হোলেও জিনিস মেলে না এই প্রথম দেখলাম। কোনো দোকানেই নেই—আরও একটি কথা বললে দোকানদার। চালও কিনে রাখতে হবে নাকি !

অনঙ্গ-বৌ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—দূর ! রেখে দাও ওদের সব গাঁজাখুরি কথা। চাল পাওয়া যাবে না, নুন পাওয়া যাবে না, তবে দুনিয়া পৃথিমে লোকে বাঁচতে পারে কক্খনো ? কি খাবে এখন ?

—যা দেবে।

অনঙ্গ টাটকা-ভাজা মুড়ি গাওয়া ঘিতে মেখে নিয়ে এসে দিলে—তার সঙ্গে শসা কুচোনো। বললে—একটু চিনি দেবো, ওর সঙ্গে মেখে খাবে ?

—নাঃ, চিনি আমার ভাল লাগে না। হাবু কোথায় ?

—বাড়ী নেই। বিশ্বেস মশায়ের নাতির সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েচে কিনা ? ডেকে নিয়ে গেল এসে। বড় মানুষের নাতির সঙ্গে ভাব থাকা ভালো। সময়ে অসময়ে দুটো জিনিস চাইলেও পাওয়া যাবে। সেজন্যে আমিও যেতে বারণ করি নি।

—এসো দুটো মুড়ি খাও আমার সঙ্গে।

অনঙ্গ-বৌ সলজ্জ হেসে বললে—আহা, রস যে উথলে উঠচে। আজ বাদে কাল যে

ছেলের বৌ ঘরে আনতে হবে খেয়াল আছে ?

বলেই এসে স্বামীর পাশে বসে বাটি থেকে এক মুঠো ঘি-মাখা মুড়ি তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিল। স্বামীর দিকে বিলোল কটাক্ষে চেয়ে বললে—মনে পড়ে, সেই ভাতছালায় বিলের ধারে একদিন তুমি আর আমি একবাটি থেকে চিঁড়ের ফলার খেয়েছিলাম ? হাবু তখন ছোট।

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি ও চোখের বিলোল দৃষ্টি প্রমাণ করিয়ে দিলে সে বিগতযৌবনা নয়, পুরুষের মন এখনও হরণ করার শক্তি সে হারায় নি।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

ফাল্গুন মাসের শেষে গঙ্গাচরণ একদিন পাঠশালার ছুটি দিয়ে চলে আসছে, কামদেবপুরের দুর্গা পণ্ডিত পথে ওকে ধরে বললে—ভাল আছেন ? সেদিন গিয়েছিলেন কামদেবপুর, আমি ছিলাম না, নমস্কার।

—নমস্কার। ভাল আছেন ?

—একরকম চলে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসা।

—কেন বলুন ?

—আমার তো আর ওখানে চলে না। পৌনে সাত টাকা মাইনেতে একেবারে অচল হোল। চালের মণ হয়েচে দশ টাকা।

গঙ্গাচরণের বুকটার মধ্যে ধ্বক্ করে উঠলো। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দুর্গা পণ্ডিতের দিকে চেয়ে সে বললে—কোথায় শুনলেন ?

—আপনি জেনে আসুন রাধিকাপুরের বাজারে।

—সেদিন ছিল চার টাকা, হোল ছ'টাকা, এখন অমনি দশ টাকা !

—মিথ্যে কথা বলি নি। খোঁজ নিয়ে দেখুন।

—মণে চার টাকা চড়ে গেল। বলেন কি ?

—তার চেয়েও একটি কথা শোনলাম, তা আরও ভয়ানক। চাল নাকি এইবার না কিনলে এরপরে বাজারে আর মিলবে না। শুনে তো পেটের মধ্যে হাত পা ঢুকে গেল মশাই।

গঙ্গাচরণের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা পণ্ডিত ওর বাড়ী পর্যন্ত এল। গঙ্গাচরণের বাইরের ঘর নেই, উঠোনের ঘাসের ওপরে মাদুর পেতে দুর্গা পণ্ডিতের বসবার জায়গা করে দিলে। তামাক সেজে হাতে দিলে। বললে—ডাব কেটে দেবো ? খাবেন ?

—হ্যাঁ, সে তো আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। বেশ আছেন।

—আর কিছু খাবেন ?

—না, না, থাক। বসুন আপনি।

একথা ওকথা হয়, দুর্গা পণ্ডিত কিন্তু ওঠবার নাম করে না।

গঙ্গাচরণ ভাবলে, কামদেবপুর এতটা পথ—যাবে কি করে? সন্দে তো হয়ে গেল।

আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। গঙ্গাচরণ কিছু বুঝতে পারচে না।

এখনও যায় না কেন? শীতের বেলা, কোন্ কালে সূর্য্য অস্তে গিয়েচে।

হঠাৎ দুর্গা পণ্ডিত বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা।—এবেলা আমি দুটো খাবো কিন্তু এখানে।

—খাবেন? তাহোলে বাড়ীর মধ্যে বলে আসি।

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরে চাল ভাজছিল, স্বামীকে দেখে বললে—ওগো, তোমার সেই পণ্ডিত মশায়ের জন্যে দুটো চাল ভাজচি যে। তেল নুন মেখে তোমরা দুজনেই খাওগে—

—শোনো পণ্ডিত মশাই রাত্তিরে এখানে খাবেন।

—তুমি বললে বুঝি?

—না, উনিই বলচেন। আমি কিছু বলি নি।

—অন্য কিছু নয়, কি দিয়ে ভাত দিই পাতে? একটু দুধ যা ছিল, ওবেলা তুমি আর হাবু খেয়েচ।

দুর্গা পণ্ডিতের কথাবার্ত্তা শুনে গঙ্গাচরণের মনে হোল সে খুব ভয় পেয়েচে। এমন একটা অবস্থা আসবে সে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। ওর ভয়ের ছোঁয়াচ এসে গঙ্গাচরণের মনেও পৌছায়। বাইরে ঘোড়ানিম গাছটার তলায় অন্ধকার রাত্রে বসবার জন্যে হাবু একটা বাঁশের মাচা করেছিল। দুই পণ্ডিতে সেই মাচার ওপর একটি মাদুর বিছিয়ে দিব্যি ফুরফুরে ফাগুনে হাওয়ায় বসে তামাক ধরিয়ে কথাবার্ত্তা বলছিল। হাবু এসে বললে—বাবা, নিয়ে এসো ওঁকে, খাওয়ার জায়গা হয়েচে—

মুগের ডাল, আলুভাতে, পেঁপের ডালনা ও বড়াভাজা। অনঙ্গ-বৌ রাঁধতে পারে খুব ভাল। দুর্গা পণ্ডিতের মনে হোল এমন সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন অনেক দিন খায় নি। হাবু বললে—মা জিজ্ঞেস করচে আপনাকে কি আর দুখানা বড়াভাজা দেবে?

গঙ্গাচরণও ওই সঙ্গে খেতে বসেচে। বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে আয় না! জিজ্ঞেস করাকরি কি?

অনঙ্গ-বৌ আড়ালে থেকে হাবুর হাতে পাঠিয়ে দিলে একটা রেকাবিতে কিছু পেঁপের ডালনা, ক'খানা বড়াভাজা।

গঙ্গাচরণ বললে—ওগো, তুমি ওঁর সামনে বেরোও, উনি তোমার ধনপতি কাকার বয়েসী। আপনার বয়েস আমার চেয়ে বেশি হবে, কি বলেন?

দুর্গা পণ্ডিত বললে—অনেক বেশি। বৌমাকে আসতে বলুন না? একটা কাঁচা ঝাল নিয়ে আসুন।

একটু পরে অনঙ্গ-বৌ লজ্জা-কুণ্ঠা-জড়িত সুঠাম সুগৌর কাঁচের চুড়ি-পরা হাতে গোটা-দুই কাঁচা লঙ্কা এনে দুর্গা পণ্ডিতের পাতে ফেলে দিতেই দুর্গা পণ্ডিত ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললে—মা যে আমার লক্ষ্মী পিরতিমে। আমার এক ভাইঝির বয়িসী বটে। কোনো লজ্জা নেই আমার সামনে বৌমা—একটু সর্ষের তেল আছে। দাও তো মা—

হাবু বললে—মা বলচে দুধ নেই। একটু তেঁতুল গুড় মেখে ভাত ক'টা খাবেন?

—হাঁ হাঁ, খুব। দুধ কোথায় পাবো? বাড়ীতেই কি রোজ দুধ খাই নাকি?

দুর্গা পণ্ডিত এই বয়সেও কিন্তু বেশ খেতে পারে। মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত শুধু তেঁতুল গুড় মেখেই যা খেলে, গঙ্গাচরণের তা দু'বেলার আহার। অনঙ্গ-বৌ কিন্তু খুব খুশি হোল দুর্গা পণ্ডিতের খাওয়া দেখে। যে মানুষ খেতে পারে, তাকে নাকি খাইয়ে সুখ। নিজের জন্যে রাখা বড়াভাজাগুলো সে সব দিয়ে দিলে অতিথির পাতে।

গঙ্গাচরণ মনে মনে ভাবলে পৌনে সাত টাকায় বেচারী নিশ্চয় আধ পেটা খেয়ে থাকে—

রাত দশটার বেশী নয়। একটু ঠাণ্ডা রাতটা। আবার এসে দুজনে বসলো নিমগাছের তলায় বাঁশের মাচায় হাবু। তামাক সেজে এনে দিলে।

দুর্গা পণ্ডিত বললে—এখন কি করি আমায় একটা পরামর্শ দাও তো ভায়া। যে রকম শুনচি—

গঙ্গাচরণ চিন্তিত সুরে বললে—তাই তো! আমারও তো কেমন কেমন মনে হচ্চে। কেরাসিন তেল বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছে না, আবার কাল থেকে শুনচি দেশালাইও নাকি নেই।

—সে মরুক গে, যাক কেরাসিন তেল। অন্ধকারে থাকবো। কিন্তু খাবো কি? চাল নাকি মোটেই মিলবে না। দামও চড়বে।

—দাম আরও চড়বে? দশ টাকা হয়েচে, আরও?

—একজন ভালো লোক বলছিল সেদিন। এই বেলা কিছু কিনে রাখতে পারলে ভাল হোত, কিন্তু পৌনে সাত টাকা মাইনেতে রোজকার চাল কেনাই কঠিন হয়ে পড়েচে। আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী হোল ওগাঁয়ের রতিকান্ত ঘোষ। গোলাপালা আছে বাড়ীতে। ধানচাল মজুদ আছে। সেদিন বললাম আমায় একমণ চাল দিন, মাইনে থেকে কেটে নেবেন। তা আধমণ দিতে রাজি হয়েচে।

—আপনার কত চাল লাগে রোজ?

—তা সকাল বেলা উঠলি একপালি করে চালের খরচ। খেতে দুবেলায় আট-ন'টি প্রাণী। কি করে চালাই বলো তো ভায়া? ও আধমণ চালে আমার ক'দিন?

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—তার ওপর খাওয়ার যা বহর। অমন যদি সকলের হয় বাড়ীতে, তবে রতিকান্ত ঘোষের বাবাও চাল যুগিয়ে পারবে না—

দুর্গা পণ্ডিত কিছুতেই ঘুমুতে যায় না। মাঝে পড়ে গঙ্গাচরণেরও ঘুম হয় না। অতিথিকে ফেলে রেখে সে একা শুতে যায় কি করে? তার নিজেরও যে ভয় একেবারে না হয়েচে তা নয়।

দুর্গা পণ্ডিত বললে—একটা বিহিত পরামর্শ দাও তো ভায়া। ওখানে একা একা থাকি, যত সব অজ মুখ্যুদের মধ্যিখানে। আমরা কি পারি? আমরা চাই একটু সৎসঙ্গ, বিদ্যে পেটে আছে এমন লোকের সঙ্গ। নয়তো প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠে। না কি বল?

—ঠিক ঠিক!

—তাই ভাবলাম যদি পরামর্শ করতে হয় তবে ভায়ার ওখানে যাই। বাজে লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে কি হবে? তুমি যা বুদ্ধি দিতে পারবে, চাষাভুষো লোকের কাছ থেকে সে পরামর্শ পাবো না। যুদ্ধের খবর কি?

—জাপানীরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েচে।

—শুধু সিঙ্গাপুর কেন? ব্রহ্মদেশও নিয়ে নিয়েচে। জানো না সে খবর?

—না—ইয়ে—শুনি নি তো? ব্রহ্মদেশ? সে তো—

—যেখান থেকে রেঙ্গুন চাল আসে রে ভায়া। ওই যে সস্তা, মোটা মোটা আলো চাল সিদ্ধও আছে, তবে আমি আতপ চালটাই খাই।

এ আবার এক নতুন খবর বটে। কাল বিশ্বাস মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে গল্প করবার একটা জিনিস পাওয়া গেল বটে। উঃ, এ খবরটা সে এত দিন জানে না? কেউ তো বলেও নি। জানেই বা কে এ অজ চাষা-গাঁয়ে? তবে গঙ্গাচরণের কাছে সবটাই ধোঁয়া ধোঁয়া। রেঙ্গুন বা ব্রহ্মদেশ যে ঠিক কোন্ দিকে তা সে জানে না। পুব বা দক্ষিণ দিকে কোন্ জায়গায়। অনেক দূর।

পর দিন দুপুর বেলাতেও দুর্গা পণ্ডিত এখানেই আহার করলে। অনঙ্গ-বৌ তার জন্য দু'তিন রকমের তরকারি রান্না করলে। খেতে ভালবাসে, ব্রাহ্মণ অতিথি। তাদের চেয়ে অনেক গরীব।

অনঙ্গ-বৌ হাবুকে সকালে উঠেই বলেচে—একটা মোচা নিয়ে আয় তো তোর সয়াদের বাগান থেকে।

স্ত্রীকে মোচা কুটতে দেখে গঙ্গাচরণ বললে—আজ যে অতিথি সৎকারের খুব বহর দেখচি—

—ভারি তো। একটু মোচার ঘণ্ট রাঁধবো, আর একটু সুক্তুনি—

—বেশ বেশ। অতিথির দোহাই দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ গা, পণ্ডিত মশাই বড় গরীব, না? দেখে বড় কষ্ট হয়। কি রকম কাপড় পরে এয়েচে, পায়ে জুতো নেই।

—তা অবস্থা ভালো হোলে কি সাত টাকা মাইনেতে পড়ে থাকে পাঠশালায়। আজ ওকে একটু ভালো করে খাওয়াও।

—একটু দুধ যোগাড় করে দেবে?

—দেখি যদি নিবারণ ঘোষের বাড়ীতে মেলে। ওটা কাঁচকলার মোচা নয় তো তা'হলে কিন্তু এত তেতো হবে যে মুখে দেওয়া যাবে না তরকারি।

—না গো, এ কাঁটালি কলার মোচা। আমাকে তুমি আমার কাজ শেখাতে এসো না বলচি।

দুপুর বেলা দুর্গা পণ্ডিত খেতে এসে সপ্রশংস বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পাতের দিকে চেয়ে বললে—এ যে রীতিমত ভোজের আয়োজন করেছেন দেখচি ? আহা, বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এত সব রেঁধেচেন বসে বসে ? ওমা, কোথায় গেলে গো মা ?

অনঙ্গ-বৌ ঘরে ঢুকে সকুণ্ঠিত সলজ্জভাবে মুখ নীচু করে রইল।

দুর্গা পণ্ডিত ভাল করে মোচার ঘণ্ট দিয়ে অনেকগুলে-ভাত মেখে গোগ্রাসে খেতে খেতে বললে—সত্যি, এমন তৃপ্তির সঙ্গে কত কাল খাই নি।

গঙ্গাচরণের মনে হোল দুর্গা পণ্ডিত কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলচে না। ওর স্বরে কপট ভদ্রতা নেই। সত্যি কথাই বলচে ও, এমন কি অনেক দিন পবে ও যেন আজ পেট ভরে দুটি ভাত খেতে পেল।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও হাবু, বল আর কি দেবো ? মোচার ঘণ্ট আর একটু আনি ?

পরিশেষে ঘন জ্বাল দেওয়া এক বাটি দুধ আর নতুন আখের গুড়। দুর্গা পণ্ডিত সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েচে, খাওয়ার সময় ওর চোখ দু'টো যেন কেমন ধরনের চক্‌চক্ করচে। শীর্ণ চেহারা শুধু বোধ হয় না খেয়ে খেয়ে। অনঙ্গ-বৌয়ের মনে মমতা জন্মালো। তাদের যদি অবস্থা থাকতো দেবার, ইচ্ছে হয় রোজ ওই অনাহার শীর্ণ দরিদ্র পণ্ডিত মশাইয়ের পাতে এমনিতর নানা ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেয়।

—আসি বৌমা, আপনাদের যত্নের কথা ভোলবো না কখনো। বাড়ী গিয়ে মনে রাখবো।

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখ দু'টি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

— যদি কখনো না খেয়ে বিপদে পড়ি, তুমি একটু ঠাঁই দিও মা অন্নপূর্ণা। বড্ড গরীব আমি।

দুর্গা পণ্ডিতের অপস্রিয়মাণ ক্ষীণদেহ আম শিমুলের বনের ছায়ায় ছায়ায় দূর থেকে দূরান্তরে গিয়ে পড়লো অনঙ্গ-বৌয়ের স্নেহ-দৃষ্টির সম্মুখে।

সেদিন এক বিপদ।

রাধিকানগরের বাজারে পরদিন বহুলোকের সামনে পাঁচু কুণ্ডুর চালের দোকান লুঠ হোল। দিনমানে এমন ধরনের ব্যাপার এ সব অঞ্চলে কখনো ঘটে নি। গঙ্গাচরণও সেখানে দাঁড়িয়ে। একটা বটতলায় বড় আটচালাওয়ালা দোকানটা। প্রথমে লোকে সবাই এলো চাল কিনতে, তারপর কিসে যে কি হোল গঙ্গাচরণ জানে না, হঠাৎ দেখা গেল যে দোকানের চারিপাশে একটা হৈচৈ গোলমাল। মেলা লোক দোকানে ঢুকচে আর বেরুচ্চে। ধামা ও থলে হাতে বহুলোক মাঠ ভেঙে বাঁওড়ের ধারে-ধারের পথে পড়ে ছুটচে। সন্ধ্যার দেরি নেই বেশি, সূর্য্যদেব পাটে বসে-বসে। গাছের মগডালে রাঙা রোদ।

একজন কে বললে – উঃ, দোকানটা কি করেই লুঠ হচ্চে।

গঙ্গাচরণও গিয়েছিল চাল কিনতে। হাতে তার চটের থলে। কিন্তু দোকানে

দোকানে ঘুরে সে দেখলে চালের বাজার সাড়ে বারো টাকা। গত হাটবারেও ছিল দশ টাকা চার আনা, একটা হাটের মধ্যে মণে একেবারে ন' সিকে চড়ে যাবে এ তো স্বপ্নের অগোচর। চাল কিনবে কি না-কিনবে ভাবচে, এমন সময় এই বিষম হৈচৈ।

লোকের ভিড় ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসচে, সবাই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটচে। কেউ চাল নিয়ে ছুটচে, কেউ শুধু হাতে। গঙ্গাচরণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ভাবচে তখনও, চাল কিনবে কিনা—এমন সময় পেছন থেকে দু'জন লোক এসে ওর ঘাড়ের ওপর পড়লো, তার মধ্যে একজন ওকে জাপটে ধরলে জোর করে ওর চটের থলে সুদ্ধ। গঙ্গাচরণ চমকে উঠে বললে—কে? কে?

কর্কশ কণ্ঠে কে একজন অস্পষ্ট দিবালোকে বলে উঠলো—চাল নিয়ে পালাচ্চো শালা—হাতে-নাতে ধরেচি!

গঙ্গাচরণ ঝাঁকি মেরে উঠে বললে—কে চাল চুরি করেচে? লোক চেনো না?

লোক দু'জন ওর সামনে এসে ভাল করে মুখ দেখলে! গঙ্গাচরণ চিনলে ওদের, বস্তেবেড়ের দফাদার সাধুচরণ মণ্ডল এবং ঐ ইউনিয়নের জনৈক চৌকিদার। ওরা কিন্তু গঙ্গাচরণকে চেনে না।

চৌকিদার বললে—শালা, লোক সবাই ভালো। সকলকেই আমরা চিনি। চাল ফেললি ক'নে?

—আমার নাম গঙ্গাচরণ পণ্ডিত, নতুন গাঁয়ে আমার পাঠশালা। চাল কিনতে এসেছিলাম বাপু, ব্রাহ্মণকে যা তা বোলো না। আমায় সবাই চেনে এ দিগরে। ছেড়ে দাও—

সাধুচরণ দফাদার ওর সামনে এসে মুখ ভালো করে দেখে বললে—এ দেখচি পুরোনো দাগী চোর। এর নাম মনে পড়চে না, বাঁধো একে।

ঠিক সেই সময় নতুন গাঁয়ের তিন জন লোক এসে পড়াতে গঙ্গাচরণ দাগী চোর ও চুরির অভিযোগ থেকে নিস্তার পেলে। এমন হাঙ্গামে গঙ্গাচরণ কখনো পড়ে নি জীবনে।

গঙ্গাচরণের ফিরতে রাত হয়ে গেল সে দিন। অনঙ্গ-বৌ বসে আছে চালের আশায়। এত রাত কখনো হয় না হাট করতে যেয়ে। ব্যাপার কি?

বিনোদ কাপালীর বোন ভানু এসে বললে—কি করচো ঠাকরুণ দিদি?

—এসো ভানু। বসো ভাই—

—দাদাঠাকুর ক'নে?

—রাধিকানগরে হাটে গিয়েচে, এখনো আসবার নামটি নেই।

—আজ নাকি খুব হ্যাংনামা হয়ে গিয়েছে হাটে। দাদা ফিরে এয়েচে, তাই বলছেল।

অনঙ্গ-বৌ উদ্বিগ্ন মুখে বললে—কি হ্যাংনামা রে ভানু? হয়েচে কি?

ভানু বললে—কি নাকি চালের দোকান লুঠ হয়েচে, অনেক লোককে পুলিসে ধরে

নিয়ে গিয়েচে—এই সব।

অনঙ্গ-বৌ আশ্বস্ত হোল, তার স্বামী লুঠের ব্যাপারে কখনো থাকবে না, সুতরাং পুলিসে ধরেও নিয়ে যায় নি, হয়তো ওই সব দেখতে দেরি করে ফেলেচে। তবুও সে হাবুকে ডেকে বললে—ও হেবো, একটু এগিয়ে দেখ না—হাট থেকে লোকজন ফিরে এলো। এত দেরি হচ্ছে কেন?

এমন সময়ে শূন্য চালের থলে হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ী ঢুকে বললে—ওঃ, কি বিপদেই আজ পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে কিনা ধরেচে চোর বলে।

অনঙ্গ বলে উঠলো—সে কি গো?

—হ্যাঁ, ওই বন্যেবেড়ের সাধুচরণ দফাদার আর দু ব্যাটা চৌকিদার।

—ও মা, তারপর?

—তারপর বাঁধে আর কি। শেষে এ গাঁয়ের লোকজন গিয়ে না পড়লে বেঁধে নিয়ে যেতো।

—কি সর্ব্বনাশ গা! মা সাত-ভেয়ে কালীর পুজো দেবো স পাঁচ আনা। মা রক্ষা করেচেন।

—যাক, সে তো গেল এক বিপদ, ইদিকে যে তার চেয়েও বিপদ। চাল পেলাম না হাটে।

—তুমি ভেবো না, আমি রাতটা চালিয়ে দেবো এক রকমে। কাল দুপুরেও চালাবো। সারাদিনে চাল যোগাড় করে আনতে পারবে এখন খুবই।

বাইরে এসে তাড়াতাড়ি ভানুকে বললে—ভানু, দিদি, আমায় এক পালি চাল ধার দিতে পারবে আজ রাতের মত? উনি হাটে গিয়ে হাংনামাতে পড়ে গিয়েছিলেন, চাল কিনতি পারেন নি।

ভানু বললে—এখুনি পেঠিয়ে দিচ্চি ঠাকরুণ দিদি।

—না দিলে কিন্তু রাতে ভাত হবে না!

—ওমা, সে কি কথা ঠাকরুণ দিদি, নয়তো আমি নিজে নিয়ে আসচি।

ভানু চলে গেল বটে কিন্তু চাল নিয়ে এলো না। এই আসে এই আসে করে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, তখনও ভানুর দেখা নেই। অনঙ্গ-বৌ আশ্চর্য্য হয়ে গেল, ব্যাপারটা কি? এই গ্রামে এসে পর্য্যন্ত যার কাছে যা মুখ ফুটে চেয়েচে সে তখুনি পরম খুশির সঙ্গে সে জিনিসটা এনে দিয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েচে। এই প্রথম বার অনঙ্গ-বৌকে সামান্য এক কাঠা চাল ধার চেয়ে বিফল হোতে হোল।

এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, স্বামী হাট থেকে এসে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় হাটের গল্প বলবার জন্যে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী, কি করেই বা তাঁকে সে জানায়? এসে খিদের ওপর ভাত খেতে পাবে না।

সাতপাঁচ ভাবচে, এমন সময় ভানু উঠোন থেকে ডাকলে—ও ঠাকরুণ দিদি?

অনঙ্গ-বৌয়ের প্রাণ এল ফিরে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললে—বসি কি কাণ্ডখানা হ্যাঁ রে ভানু ?

ভানু দাওয়ায় উঠে এসে শুকনো মুখে বললে—ও ঠাকরুণ দিদি, আমি সেই থেকে চাল যোগাড় করবার জন্যে তিন-চার বাড়ী ঘুরে বেড়িয়েচি।—

—কেন, তোদের বাড়ী কি হোল ?

—নেই। হাটে পায় নি আজ।

—হাটে কেন ? ক্ষেতের ধান ?

—আ মোর কপাল ! ক্ষেতের ধান আর কনে। ছ'টাকা মণ যেমন হোল, অমনি কাকা সব ধান আড়তে নিয়ে গেল গাড়ীপুরে। বিক্রি করে নগদ টাকা ঘরে এনলে। ফি-জনে জুতো কেনলে, কাপড় কেনলে, কাকীমা ঘটি বাসন কেনলে, মাছ খালে, সন্দেশ খালে, মাংস খালে। নবাবী করে সে টাকাও উড়িয়ে ফেললে। এখন সে ধানও নেই, সে টাকাও নেই। ক'হাট কিনে খাতি হচ্ছে মোদেরও।

—অন্য বাড়ী যে ঘুরলি বললি ?

—মোদের পাড়ায় কারো ঘরে ধান নেই ঠাকরুণ দিদি। সব কিনে খাওয়ার ওপর ভরসা।

ভানু আঁচলের গেরো খুলতে খুলতে বললে।

—ওতে কি রে ?

—এক খুঁটি মোটা চাল ওই ক্ষুদে গয়লার নাত-বৌয়ের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে—

—হ্যাঁ রে, তারা তো বড্ড গরীব। তুই আনলি, তাদের খাবার আছে তো ? দাঁড়া—

—সে আমি না জেনে আনি নি দিদি ঠাকরুণ। ওরা লোকের ধান ভানে কিনা ? আট কাঠা ধানে এক কাঠা ধান বানি পায়। বানির ধান ভেনে খোরাকি চালায়।

অনঙ্গ-বৌ একটু ভেবে বললে—আমার একটা উপকার করবি ভানু ?

—কি ?

—আচ্ছা সে পরে বলবো এখন। দে চাল ক'টা—

—এক খুঁটি চালি রাতটা হবে এখন তো ? আর না হলিই বা কি করবা ঠাকরুণ দিদি ? কত কষ্টে যে চাল ক'ডা যোগাড় ক'রে এনিচি তা আমিই জানি !

গঙ্গাচরণ ভাত খেতে বসলো অনেক রাতে। ডাল, ভাত আর পুঁই শাকের চচ্চড়ি। বাড়ীর উঠোনেই সুগৃহিণী অনঙ্গ-বৌ পুঁই মাচা তুলে দিয়েচে, লাউ মাচা তুলেচে, কিছু ঢেঁড়স, কিছু নটে শাকের ক্ষেত করেচে। হাবু ও নিজে দুজনে মিলে জল দিয়েচে আগে আগে, তবে এই সব গাছ বেঁচে আজ তরকারি যোগাচ্ছে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—আর দুটো ভাত মেখে নাও, ডাল দিয়ে পেট ভরে খাও—

—এ চাল দু'টো ছিল বুঝি আগের দরুণ ?

—হুঁ।

—কাল হবে ?

—কাল হবে না। সকালে উঠেই চাল যোগাড় করো। রাতটা টেনেটুনে হয়ে গেল।

—সেই বিশ্বাস মশায়ের দরুণ ধানের চাল।

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ স্বামী-পুত্রকে পেট ভরে খাইয়ে সে রাতে এক ঘটি জল আর একটু গুড় খেয়ে উপোস করে রইলো।

দিন পনেরো কেটে গেল।

গ্রামে গ্রামে লোকে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেচে। চাল পাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়েচে।

রাধিকানগরের হাটে, যেখানে আগে বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের চাষাদের মেয়েরা ঢেঁকি ভানা চাল নিয়ে আসতো, সেখানে আজকাল সাত-আট জন স্ত্রীলোক মাত্র দেখা যায়। তাও চাল পাওয়া যায় না। বড়তলার মোড়ে আর ওদিকে সামটা বিলের ধারে ক্রেতার দল ভিড় পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে চাল কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায়।

হাটুরে লোকেরা চাল বড় একটা পায় না।

আজ দু' হাট আদৌ চাল না পেয়ে গঙ্গাচরণ সতর্ক হয়ে এসে সামটা বিলের ধারে দাঁড়িয়েচে, একটা বড় জিউলি গাছের ছায়ায়। সঙ্গে আরও চার-পাচ জন লোক আছে বিভিন্ন গ্রামের। বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। রোদ খুব চড়া।

কম্বরা গ্রামের নবীন পাড়ুই বলচে—বাবাঠাকুর, আমরা তো ভাত না পেয়ে থাকতি পারি নে, আজ তিন দিন ঘরে চাল নেই।

গঙ্গাচরণ বললে—আমার ঘরে আজ দু'দিন চাল নেই।

আর একজন বললে—আমাদের দু'দিন ভাত খাওয়া হয় নি।

নবীন পাড়ুই বললে—কি খেলে ?

—কি আর খাবো ? ভাগ্যিস্ মাগীনরা দুটো চিঁড়ে কুটে রেখেছিল সেই বোশেখ মাসে, তাই দু'টো করে খাওয়া হচ্ছে। ছেলেপিলে তো আর শোনবে না, তারা ভরপেট খায়, আমরা খাই আধপেটা।

—তা চিঁড়ের সেরও দেখতি দেখতি হয়ে গেল বারো আনা, যা ছিল দু' আনা।

—একি বিশ্বেস করতি পারা যায় ? কখনো কেউ দেখেচে না শুনেচে যে চিঁড়ের সের বারো আনা হবে ?

গঙ্গাচরণ বললে—কখনো কি কেউ শুনেচে যে চালের মণ ষোল টাকা হবে ?

নবীন পাড়ুই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। সে জোয়ান মানুষ যদিও তার বয়েস ঠেকেচে পঞ্চাশের কোঠায় ; যেমন বুকের ছাতি, তেমনি বাহুর পেশী। ভূতের মত পরিশ্রম করেও যদি আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়, তবে আর বেঁচে সুখ কি ? আজ দু-তিন দিন তাই জুটেচে ওর ভাগ্যে।

এমন সময় দেখা গেল আকাইপুরের মাঠের পথ বেয়ে তিন-চারটি স্ত্রীলোক চালের ধামা, কেউ বা বস্তা মাথায় বড় রাস্তায় এসে উঠলো।

সবাই এগিয়ে চললো অমনি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে উপস্থিত পাঁচ-ছ জনের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কে কতটা চাল কিনতে পারে! হঠাৎ ওদের মধ্যে কার যেন মনে পড়লো কথাটা, সে জিগ্যেস করলে—কত করে পালি?

একজন চালওয়ালী বললে—পাঁচ সিকে।

গঙ্গাচরণ এবং উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল, পাঁচ সিকে পালি, অর্থাৎ কুড়ি টাকা মণ।

নবীন পাড়ুইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল, সে একটা টাকা এনেচে—পাঁচ সিকে না হোলে এক কাঠা চাল কেউ বিক্রি করবে না। এক টাকার চাল কেউ দেবে না।

এরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেও দেখলে যে চাল যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে এই বেলা। বিলম্বে হতাশ হতে হবে। আরও পাঁচ ছ' জন ক্রেতাকে দূরে আসতে দেখা যাচ্চে।

দু'জন লোক এদের মধ্যে নিরুপায়। ওদের হাতে বেশি পয়সা নেই। সুতরাং চাল কিনবার আশা ওদের ছাডতে হোল। এই দলে নবীন পাড়ুই পডে গেল।

গঙ্গাচরণ বললে—নবীন, চাল নেবে না?

—না বাবাঠাকুর, একটা সিকি কম পড়ে গেল।

—তবে তো মুশকিল। আমার কাছেও নেই যে তোমাকে দেবো।

—আধসের পুঁটি মাছ ধরেলাম সামটার বিলে। পেয়েলাম ছ' আনা। আর কাল মাছ বেচবার দরুণ ছেল দশ আনা। কুড়িয়ে-বুড়িয়ে একটা টাকা এনেলাম চাল কিনতি। তা আবার চালের দাম চড়ে গেল কি করে জানবো?

—তাই তো!

—আধপেটা খেয়ে আছি দু'দিন। চাষীদের ঘরে ভাত আছে, আমাদের তা নেই। আমাদের কষ্ট সকলের অপিক্ষে বেশি। জলের প্রাণী তার ওপর তো জোর নেই? ধরা না দিলে কি করচি। যেদিন পালাম সেদিন চাল আনলাম, যেদিন পালাম না, সেদিন উপোস। আগে ধান চাল ধার দিতো, আজকাল কেউ কিছু দেয় না।

গঙ্গাচরণ কাঠাদুই চাল সংগ্রহ করেছিল কাড়াকাড়ি করে। তার ইচ্ছে হোল একবার এই চাল থেকে নবীন পাড়ুইকে সে কিছু দেয়। কিন্তু তা কি করে দেওয়া যায়, চালের অভাবে হয়তো উপোস করে থাকতে হবে কালই। গ্রামে ধান চাল মেলে না যে তা নয়, মেলে অতি কষ্টে। ধান চাল থাকলেও লোকে স্বীকার করতে চায় না সহজে।

নবীন পাড়ুইকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাচরণ রাধিকানগরের বাজারে এল। এক টাকার চালই কিনে দেবে তাকে। দোকান ছাড়া তো হবে না। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার, বড় বড় তিন চারটি দোকান খুঁজে বেড়ালে, সকলেরই এক বুলি চাল নেই।

গঙ্গাচরণের মনে পড়লো বৃদ্ধ কুণ্ডু মশায়ের কথা। এই গত বৈশাখ মাসেও, কুণ্ডু মশায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্চে সে, কুণ্ডু মশাই তাকে ডেকে আদর করে তামাক সেজে খাইয়ে বলেচে—পণ্ডিত মশাই, আমার দোকান থেকে চাল নেবেন, ভাল চাল আনিয়েচি। কত খাতির করেচে।

কুণ্ডু মশায়ের দোকানে গেলে ফিরতে হবে না, ঠিক পাওয়া যাবেই। কিন্তু সেখানেও তথৈবচ, গঙ্গাচরণ দোকান ঘরটিতে ঢুকবার সময়ে চেয়ে দেখলে বাঁ পাশের যে বাঁশের মাচায় চালের বস্তা ছাদ পর্য্যন্ত সাজানো থাকে, সে জায়গা একদম খালি, হাওয়া খেলচে।

বৃদ্ধ কুণ্ডু মশায় প্রণাম করে বললে—আসুন, কি মনে করে ?

অভ্যর্থনার মধ্যে বৈশাখ মাসের আন্তরিকতা নেই যেন। প্রণামটা নিতান্ত দায়সারা গোছের।

গঙ্গাচরণ বললে—কিছু চাল দিতে হবে।

—কোথায় পাবো, নেই।

—এক টাকার চাল, বেশি নয়। এই লোকটাকে উপোস করে থাকতে হবে। দিতেই হবে আপনাকে।

কুণ্ডু মশায় স্বর নিচু করে বললে—সন্ধ্যের পর আমার বাড়ীতে যেতে বলবেন, খাবার চাল থেকে এক টাকার চাল দিয়ে দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ বললে—ধান চাল কোথায় গেল ? আপনার এত বড় দোকানের মাচা একদম ফাঁক কেন ?

—কি করবো বাপু, সেদিন পাচু কুণ্ডুর দোকান লুঠ হবার পর কি করে সাহস করে মাল রাখি এখানে বলুন। সবারই সে দশা। তার ওপর শুনচি পুলিসে নিয়ে যাবে চাল কম দামে মিলিটারির জন্যে।

—কে বললে ?

—বলচে সবাই। গুজব উঠেচে বাজারে। আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না, চাল আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে রেখে দিইচি। কিন্তু লোকের কাছে কবুল যাবো না, আপনাকে তাই বললাম, অন্যকে কি বলি ?

—আমরা না খেয়ে মরবো ?

—যদ্দিন থাকবে, দেবো। তবে আমার জামাই গরুর গাড়ী করে বদ্দিবাটির হাটে কিছু চাল নিয়ে যেতে চাইচে। তাই ভাবচি।

—পাঠাবেন না, লুঠ হবে পথে। বুঝে কাজ করুন, কিছু চাল দেশে থাকুক, নইলে দুর্ভিক্ষ হবে যে। কি খেয়ে বাঁচবে মানুষ ?

—বুঝি সব, কিন্তু আমি একা রাখলি তো হবে না। খাঁ বাবুরা এত বড় আড়তদার, সব ধান বেচে দিয়েচে গবর্ণমেণ্টের কনট্রাক্‌টারদের কাছে। একদানা ধান রাখে নি। এই রকম অনেকেই করেচে খবর নিয়ে দেখুন। আমি তো চুনোপুঁটি দোকানদার, পঞ্চাশ-ষাট

ৰধ মাস আমার বিয়ে।

গঙ্গাচরণ সন্ধ্যার অন্ধকারে চিন্তান্বিত মনে বাড়ীর পথে চললো।

নবীন পাড়ুই সঙ্গেই ছিল, তাকে যেতে হবে দোমোহানী, নতুন গাঁয়ের পাশেই। বললে— পণ্ডিত মশাই ছেলেন তাই আজ বাচকাচের মুখে দু'টো দানা পড়বে। মোদের কথা ওসব বড় দোকানদার কি শোনে! মোরা হলাম টিকরি মানুষ। কাল দু'টো মাছ পেটিয়ে দেবো আনে।

গঙ্গাচরণ বাড়ী নেই, পাঠশালায় গিয়েচে পড়াতে। হাবু ও পটল বাপের সঙ্গে পাঠশালায়। একা অনঙ্গ-বৌ রয়েছে বাড়ীতে। কে এসে ডাক দিলে—ও পণ্ডিত মশাই—বাড়ীতে আছে গা—

অনঙ্গ-বৌ কারো সামনে বড একটা বার হয় না। বৃদ্ধ ব্যক্তি ডাকাডাকি করচে দেখে দোরের কাছে এসে মৃদুস্বরে বললে—উনি বাড়ী নেই। পাঠশালায় গিয়েচেন—

—কে? মা-লক্ষ্মী?

অনঙ্গ সলজ্জ ভাবে চুপ করে রইল।

বৃদ্ধটি দাওয়ায় উঠে বসে বললে—আমায় একটু খাবার জল দিতি পারবা মা-লক্ষ্মী?

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে এক ঘটি জল নিয়ে এসে রাখলে। তারপর বাড়ীর গামছাখানা বেশ করে ধুয়ে ঘটির ওপর রেখে দিলে। একটু আখের গুড় ও এক গ্লাস জলও নিয়ে এল।

বললে—দু'কোষ কাঁটাল দেবো?

—খাজা না রসা?

—আধখাজা। এখন শ্রাবণ মাসে রসা কাঁটাল বড় একটা থাকে না।

—দাও, নিয়ে এসো—মা, একটা কথা—

—কি বলুন?

—আমি এখানে দু'টো খাবো। আমি ব্রাহ্মণ। আমার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য। বাড়ী কামদেবপুরের সন্নিকট বাসান-গাঁ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—খাবেন বই কি। বেশ, একটু জিরিয়ে নিন। ঠাঁই করে দি—

একটু পরে দীনু ভট্চাজ মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত, ঢেঁড়স ভাজা, বেগুন ও শাকের ডাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল। অনঙ্গ-বৌ বিনীতভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দীনু খেতে খেতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যেন একটু দম নিলে। তারপর বললে—মা-লক্ষ্মীর রান্না যেন অমর্ত্তো চচ্চড়ি আর একটু দাও তো।

অনঙ্গ লজ্জা কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আর তো নেই। ঢেঁড়স ভাজা দু'খানা দেবো?

— তাই দাও মা।

এত বৃদ্ধ লোক যে এতগুলো ভাত এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতে পারে, অনঙ্গ-বৌ নিজের

চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করতো না। বললে—আর ভাত দেবো?

—তা দুটো দাও মা।

—মুশকিল হয়েচে, খাবেন কি দিয়ে। তরকারি বাড়ন্ত।

—তেতুঁল এক গাঁট দিতি পারবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমরা হোলাম গিয়ে গরীব মানুষ। সব দিন কি মাছ তরকারী জোটে? কোনো দিন হোল না। তেতুঁল এক গাঁট দিয়ে এক পাতর ভাত মেরে দেলাম—

অনঙ্গের ভাল লাগছিল এই পিতার বয়সী সরল বৃদ্ধের কথাবার্ত্তা। ইনি বোধ হয় খুব ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন। বলতে নেই, কি রকম গোগ্রাসে ভাত কটা খেয়ে ফেললেন। আরও থাকলে আরও খেতে পারতেন বোধ হয়। কিন্তু বড্ড দুঃখের বিষয়, ভাত তরকারি আর ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অনঙ্গ বললে—তামাক সেজে দেবো?

– তোমাকে দিয়ে তামাক সাজাবো মা-লক্ষ্মী? না—না—কোথায় তামাক বলো। আমি নিজে বলে তামাক সাজতি সাজতি বুড়ো হয়ে গেলাম। উনসত্তর বছর বয়েস হোল।

—উনসত্তর?

—হ্যাঁ। এই আশ্বিন মাসে সত্তর পোরবে। তোমরা তো আমার নাতনীর বয়সী।

দীনু ভট্‌চায হা হা করে হেসে উঠলো কথার শেষে।

অনঙ্গ-বৌ নিজেই তামাক সেজে কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে এল, ওর গাল দুটি ফুলে উঠেচে, আগুনের আভায় রাঙা হয়ে উঠেচে।

দীনু শশব্যস্তে বললেন - ওকি, ওকি,—এই ছাখো আমার মা-লক্ষ্মীর কাণ্ড!

—তাতে কি? এই তো বললেন—আমাকে নাতনীর সমবয়সী।

—না—না, ওটা ভালো না। মা-লক্ষ্মী, তুমি কেন তামাক সাজবে? ওটা আমি পছন্দ করি নে—ছাও হুঁকো আমার হাতে। ফুঁ দিতি হবে না।

অনঙ্গ-বৌ একটা মাদুর ও বালিশ নিয়ে এসে পেতে দিয়ে বললে—গড়িয়ে নিন একটু।

বেলা পাঁচটার সময় পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে কে একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে দাওয়ায় শুয়ে থাকতে দেখে কিছু বুঝতে পারলে না। পরে স্ত্রীর কাছে সব শুনে বললে—ও, কামদেবপুরের সেই বুড়ো ভট্‌চায। চিনেচি এবার। কিন্তু তুমি তা হোলে না খেয়ে আছ?

অনঙ্গ বললে—আহা, আমি তো যা-তা খেয়েই এক বেলা কাটাতে পারি। কিন্তু বুড়ো বামুন, ওর না-খাওয়ার কষ্টটা—

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু যা তা খেয়ে যে কাটাবে—যা-তা ঘরে ছিলই বা কি?

—তোমার সে ভাবনা ভাবতে হবে না।

স্ত্রীকে গঙ্গাচরণ খুব ভালো করেই জানে। ওর সঙ্গে মিছে তর্ক করে কোনো লাভ নেই।

মুখের ভাত অপরকে ধরে দিতেও চিরকাল অভ্যস্ত। অথচ মুখ ফুটে বলবে না কখনো কি খেয়েচে না খেয়েচে। এমন স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বড় মুশকিলের কাণ্ড। কত কষ্টে গত হাটে চাল যোগাড় করেছিল সেই জানে।

ইতিমধ্যে দীনু ভট্‌চায ঘুম ভেঙে উঠে বসলো। বললে—এই যে পণ্ডিত মশাই!

গঙ্গাচরণ দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললে—নমস্কার। ভাল?

দীনু হেসে বললে—মা-লক্ষ্মীর হাতে অন্ন খেয়ে আপাতোক খুবই ভালো। বড্ড জমিয়ে নিয়েচি। মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—ওর মাথাটি খেলে কেউ লক্ষ্মী, কেউ অন্নপূর্ণা বলে। আমি এখন মাঝে পড়ে মারা যাই।

মুখে বললে—হেঁ হেঁ তা বেশ—তা আর কি—

—কোথা থেকে ফিরলেন?

—পাঠশালা থেকে।

—আমি একটু বিপদে পড়ে পরামর্শ করতে এলাম পণ্ডিত মশায়।

—কি বলুন?

—বলবো কি, বলতি লজ্জা হয়। চাল অভাবে সপুরী উপোস করতে হচ্চে। কম দুঃখে পড়ে আপনার কাছে আসি নি।

—কামদেবপুরে মিলচে না?

—আমাদের ওদিকি কোনো গাঁয়ে না। আর যদিও থাকে তো দেড় টাকা করে কাঠা বলচে। এ কি হোল দেশে? আমার বাড়ী চার-পাঁচ জন পুষ্যি। দেড় টাকা চালের কাঠা কিনে খাওয়াতি পারি আমি?

—এদিকেও তো ওই রকম ভট্‌চায মশায়। আমাদের গাঁয়েও তাই।

—বলেন কি?

—ঠিক তাই। ও হাটে অতি কষ্টে দু' কাঠা চাল কিনে এনেছিলাম।

—ধান?

—ধান কেউ বিক্রি করচে না। করলেও ন'টাকা সাড়ে ন'টাকা মণ।

—এর উপায় কি হবে পণ্ডিত মশায়? আপনি বলুন, সেই পরামর্শ করতি তো আমার আসা। সত্যি কথা বলতি কি আপনার কাছে, কাল রাত্তি আমার খাওয়া হয় নি। চাল ছিল না ঘরে। মা-লক্ষ্মীর কাছে অন্ন খেয়ে বাঁচলাম। বুড়ো বয়সে খিদের কষ্ট সহ্যি করতে পারিনে আর।

—কি বলি বলুন, শুনে বড্ড কষ্ট হোল। করবারও তো নেই কিছু। আমাদের গ্রামের অবস্থাও তথৈবচ।

দীনু ভট্‌চায দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—বুড়ো বয়সে এবারডা না খেয়ে মরতি হবে দেখচি!

গঙ্গাচরণ বললে—তাই তো পণ্ডিত মশাই, কি যে করি, বুঝতে তো কিছু পারিনে। তা ছাড়া আপনাদের গাঁয়ের ব্যবস্থা এখান থেকে কি করে করা যাবে। কতটা চাল চান? চলুন দিকি একবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী?

কিন্তু বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী যাওয়া হবে কি, দীনু ভট্‌চায ম্লান মুখে বললে—তাই তো, পয়সাকড়ি তো আনি নি।

গঙ্গাচরণ একটু বিরক্তির সুরে বললে—আনেন নি, তবে আর কি হবে? কি করতে পারি আমি?

গঙ্গাচরণ বোধ হয় একটু কড়া সুরে বলে ফেলেছিল কথাটা।

দীনু ভট্‌চায হতাশভাবে বললে—তাই তো, এবারডা দেখচি সত্যিই না খেয়ে মরতি হবে!

গঙ্গাচরণ ভাবলে ভাল মুশকিল! তুমি না খেয়ে মরবে তা আমি কি করবো? আমার কি দোষ?

এই সময় অনঙ্গ-বৌ দোরের আড়াল থেকে হাতনাড়া দিয়ে গঙ্গাচরণকে ডাকলে।

গঙ্গাচরণ ঘরের মধ্যে গিয়ে বললে—কি বলচ?

—জিজ্ঞেস করো উনি কি এখন দুখানা পাকা কাঁকুড় খাবেন? ঘরে আর তো কিছু নেই।

—থাকে তো দাও না। জিজ্ঞেস করতে হবে না। ফুটি কাঁকুড় কি দিয়ে দেবে? গুড় বা চিনি কিছুই তো নেই।

—সে ব্যবস্থার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। সে আমি দেখচি। আর একটা কথা শোনো। উনি অমন দুঃখু করচেন বুড়ো বয়েসে না খেয়ে মরবেন বলে, তোমাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমাদের বাড়ী এয়েচেন কেন, একটা হিল্লে হবে বলেই তো। আমি দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি। বুড়ো বামুন আমাদের বাড়ী থেকে শুধু হাতে শুধু মুখে ফিরে গেলে অকল্যাণ হবে না! তা ছাড়া যখন আমাদের আশা করে এতটা পথ উনি এয়েচেন, এর একটা উপায় না করলে হয়?

গঙ্গাচরণ বিরক্ত মুখে বললে—কি উপায় হবে? খালি হাতে এসেচে বুড়ো। ও বড্ড ধড়িবাজ। একদিন অমনি কামদেবপুর থেকে ফিরবার পথে চালগুলো নিয়ে নিলে—

অনঙ্গ-বৌ জিভ কেটে বললে—ছিঃ ছিঃ—অতিথি নারায়ণ। আমার বাড়ী উনি এয়েচেন, আমাদের কত ভাগ্যি। ও কথাটি বোলো না। অতিথিকে অমন কথা বলতে আছে? কাকে কি যে বলো! নিয়েচেন চাল, নিয়েচেন। আমাদের বাপের বয়িসী মানুষ। ওঁকে অমন বোলো না—

—তা তো বুঝলাম, বলবো না। কিন্তু পয়সা না থাকলে চাল ধান পাবো কোথায়?

—উনি কি বলেন ছাখো—

—উনি যা বলবেন বোঝাই গিয়েচে। উনি এয়েচেন ভিক্ষে করতে, সোজা কথা।

মেগে পেতে বেড়ানোই ওঁর স্বভাব।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে--আবার ওই সব কথা ?

—তা আমি কি করব এখন ? বলো তাই করি।

—শুধু হাতে উনি না ফেরেন। বাপের বয়িসী বামুন। না হয় আমার হাতের পেটি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা এনে ওঁকে চাল কিনে দাও। দিতেই হবে, না দিলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। চাল তো আমাদেরও কিনতে হবে। রাতে রান্না হবে না।

গঙ্গাচরণ বাড়ীর বাইরে যাচ্ছিল, অনঙ্গ-বৌ বললে—পাকা কাঁকুড় দুখানা খেয়ে যাও। বেরিও না।

গঙ্গাচরণ বিরক্তির সুরে বললে—আমি বিনি মিষ্টিতে ফুটি কাঁকুড় খেতে পারি নে। ওসব বাঙালে খাওয়া তোমরা খাও।

অনঙ্গ-বৌ সকৌতুকে হাসি হাসি চোখ নাচিয়ে বললে—বাঙাল বাঙাল করো না বলচি, ভাল হবে না। আমি বাঙাল, আর উনি এসেচেন একেবারে মুকসুদোবাদ জেলা থেকে—

—সে আবার কি গো ? ও কথা তুমি আবার কোথায় শিখলে ?

—শিখতে হয় গো, শিখতে হয়। সেই যে ভাতছালায় উত্তুরে ঘরামি জন ঘর ছাইতে আসতো মনে পড়ে ? ওরা বলতো না, মা, আমাদের বাড়ী মুকসুদোবাদ জেলা—হি-হি-হি—

একটু পরে বাইরের দাওয়ায় বসে দীনু ও গঙ্গাচরণ দু'জনেই পাকা ফুটি কাঁকুড় খাচ্ছিল, খেজুর গুড়ের সঙ্গে। কোথায় অনঙ্গ-বৌ একটু খেজুর গুড় লুকিয়ে সঞ্চয় করে রেখেছিল সময় অসময়ের জন্যে। অনঙ্গ-বৌ ওই রকম রেখে থাকে। গঙ্গাচরণ জানে অনেক সময় জিনিসপত্র ভেল্‌কিবাজির মত বার করে অনঙ্গ।

দীনু ভট্‌চায কাঁসার বাটী থেকে গুড়টুকু চেটেপুটে খেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—আহা, খেজুর গুড়ের মুখ এবার আর দেখি নি।

গঙ্গাচরণ বললে—তা বটে।

—আগে আগে পণ্ডিত মশাই, গুড় আমাদের কিনতি হোত না। মুচিপাড়ায় বানে খেজুর রস জাল দিতো, ঘটি হাতে করে গিয়ে দাঁড়ালি আধ সের এক সের গুড় এমনি খেতে দিতো। সে সব দিন কোথায় যে গেল!

গঙ্গাচরণ বাড়ী থেকে বার হয়ে গেলেই অনঙ্গ-বৌ দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—কাঁকুড় কেমন খেলেন ?

—চমৎকার মা চমৎকার। তুমি সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, কি আর বলবো তোমায়। একটা কথা বলবো ?

—কি বলুন না ?

—মা একটু চা করে দিতি পারো ?

অনঙ্গ-বৌ বিপন্ন মুখে বললে—চা ?

—কতদিন চা খাই নি। মাসখানেক আগে সবাইপুরের গাঙ্গুলীবাড়ী গিয়ে একদিন চা খেয়েছিলাম। চা আমার বড্ড খেতি ভাল লাগে। আগে আগে বড্ড খ্যাতাম। এদানি হাতে পয়সা অনটন, ভাতই জোটে না বলে চা! আছে কি?

অনঙ্গ-বৌ ভেবে বললে—আচ্ছা, আপনি বসুন—

হাবুকে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—হ্যাঁরে কাপাসীর মার বাড়ী ছুটে যা তো। আমার নাম করে বলগে একটু চা দাও। যদি সেখানে না থাকে, তবে শিবু ঘোষদের বাড়ী যাবি। চা আনতি হবে বাবা।

হাবু বললে—ও বুড়ো কে মা?

—যাঃ, বুড়ো বুড়ো কি রে? ও রকম বলতে আছে? বাড়ীতে নোক এলে তাকে মেনে চলতে হয়। শিখে রাখো।

—হ্যাঁ মা, চা কি দিয়ে হবে? চিনি নেই যে—

—তোর সে ভাবনায় দরকার কি? তুই যা বাপু, চা একটু এনে দে—

আধঘণ্টা পরে প্রফুল্লবদন দীনু ভট্‌চাযের সামনে হাসি হাসি মুখে চায়ের গ্লাস স্থাপন করে অনঙ্গ-বৌ বললে—দেখুন তো কেমন হয়েচে? সত্যি কথা, চায়ের পাটাপাট তেমন তো নেই এ বাড়িতে। কেমন চা করলাম, কে জানে?

দীনু ভট্‌চায চা-পূর্ণ কাঁসার গ্লাস কোঁচার কাপড়ে জড়িয়ে দু-হাতে ধরে এক চুমুক দিয়ে চোখ বুঁজে বললে—বাঃ, বেশ, বেশ—মা-লক্ষ্মী—এই আমার অমর্ত্তো। দিব্যি হয়েছে—

এই সময় গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললে—চলো, ওদিকে একটা কথা শোনো।

অনঙ্গ-বৌ আড়ালে এসে নিচু স্বরে বললে—কি?

—চাল আনলাম এক কাঠা বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে! আর ধারে তিন কাঠা ধানের ব্যবস্থা করে এলাম। দীনু ভট্‌চাযকে কাল সকালে এনে দেবো। আজ আর বুড়ো নড়চে না দেখচি। ও খাচ্চে কি? চা নাকি? কোথায় পেলে? বুড়ো আছে দেখছি ভালোই। আর কি নড়ে এখান থেকে?

—তোমার অত সন্ধানে দরকার কি? তুমি একটু চা খাবে? দিচ্চি। আর ওঁকে অমন বোলো না। বলতে নেই বুড়ো বামুন অতিথ—ছিঃ—

গঙ্গাচরণ মুখ বিকৃতি করে অতিথির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে। মুখে বললে—ওঃ, ভারি আমার অতিথি রে।

ধমক দিয়ে অনঙ্গ-বৌ বললে—ফের? আবার?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে গ্রামের অনেকগুলি লোক জুটেচে। ঘন ঘন তামাক চলচে।

হীরু কাপালী বলচে—আমাদের কিছু ধান ছ্যান বিশ্বেস মশাই, নয়তো আমরা না খেয়ে মলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ-ছ'জন লোক ওই এক কথাই বললে। ধান দিতে হবে, না দিলে তাদের পরিবারে অনাহার শুরু হবে।

বিশ্বাস মশাই বললেন—নিয়ে যাও গোলা থেকে। যা আছে, দু-পাচ আড়ি করে এক একজনের হবে এখন। যতক্ষণ আমার আছে, ততক্ষণ তোমাদের দিয়ে তো যাই, তারপর যা হয়।

গঙ্গাচরণও ধানের জন্যে দরবার করতে গিয়েছিল। তাকে বিশ্বেস মশায় বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। আপনাকে কর্জ্জ হিসেবে ধান আর কি দেবো। পাঁচ আড়ি ধান নিয়ে যান। কিন্তু এই শেষ, আর আমার গোলায় ধান নেই।

গঙ্গাচরণ বিস্মিত হোল বিশ্বাস মহাশয়ের কথায়। যার গোলা ভর্ত্তি ধান, মাত্র এই কয় জন লোককে সামান্য কিছু ধান দিয়ে তার গোলা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এ কেমন কথা হোল?

পথে তাকে হীরু কাপালী গোপনে বললে—বিশ্বেস মশায় ধান সব লুকিয়ে সরিয়ে ফেলে দিয়েচে পণ্ডিত মশাই। পাছে মোদের দিতি হয় সেই ভয়ে। দু' পৌটি ধান ধরে হাতীর মত গোলা—ধান নেই কি রকম?

— তোমরা তো ধান নিলে, কি রকম দেখলে গোলায়?

— গোলা সাবাড় পণ্ডিত মশাই, নিজের চোকে দেকি এলাম। এক দানা নেই ওর মধ্যি।

—তাই তো!

—এবার এই ধান কটা ফুরুলি না খেয়ে মরতি হবে—

—কেন, ভাদ্র মাসের দশ বারো তারিখের মধ্যে আউশ ধান পেকে উঠচে। ভাবনা চলে যাবে তখন।

—তা কি হয় পণ্ডিত মশাই? নতুন ধানের চাল খেলি সদ্য কলেরা। দেখবেন তাই লোকে খাবে পেটের জ্বালায় আর পট্ পট্ মরবে। ও চাল কি এখন খাওয়া যাবে—না পেটে সহ্যি হবে? ও খেতি পারা যাবে কার্ত্তিক অঘ্রাণ মাসের দিকি।

—তবে উপায় কি হবে লোকের?

—এবার যে রকমডা দেখছি, না খেয়ে লোক মরবে।

কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হোল না। না খেয়ে আবার লোক মরে? কখনো দেখা যায় নি কেউ না খেয়ে মরেচে। জুটে যায়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে। যে দেশে এত খাবার জিনিস, সে দেশে লোকে না খেয়ে মরবে?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও কটা ধান আমি নিজেই ভেনে কুটে নেবো ঢেঁকিতে। ওর জন্তে আর কারো খোশামোদ করতে হবে না। কিন্তু ওতে কদিন চলবে?

—তাই তো আমিও ভাবচি।

—আমি একটা কথা ভাবচি। অন্য লোকের চাল কেন আমি ভেনে দেই না? বানি পাবো দু'কাঠা করে চাল মণে।

—ছিঃ ছিঃ, দু'কাঠা চাল বানি দেবে তার জন্যে তুমি দশ আড়ি ধান ভানতে যাবে ? অত কষ্ট করে দরকার নেই।

—কষ্ট আর কি ? দু'কাঠা চালের দাম কত আজকাল ! আমি তা ছাড়বো না।, দু'কাঠা চাল বুঝি ফেলনা।

—লোকে কি বলবে বল তো ?

—বলুক গে। আমার সংসারে যদি দু'কাঠা চালের সাশ্রয় হয় তবে লোকের কথাতে কি আসে যাচ্চে ?

—তুমি যা ভাল বোঝো কর, কিন্তু আমার মনে হচ্চে তোমার শরীর টিকবে না।

—সে তোমায় দেখতে হবে না।

তারপর অনঙ্গ-বৌ হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—তোমায় ঠকিয়েচি গো তোমায় ঠকিয়েচি।

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কি ঠকিয়েচ ?

—ঠকিয়েচি মানে চোখে ধুলো দিইচি।

—কেন ?

—কত দিন আগে থেকে আমি ধান ভানচি।

—সত্যি ?

—সত্যি গো সত্যি। নইলে চালের হিসেব নিয়ে দেখো। দু'কাঠা চাল তো হাট থেকে কিনেছিলে। কত দিন খেলে মনে নেই ?

—আমায় না জানিয়ে কেন অমন করচো তুমি ? ছিঃ ছিঃ—কাদের ধান ভানো ?

—হরি কাপালীদের। শ্যাম বিশ্বেসদের।

—ক' কাঠা চালের জন্যে কেন কষ্ট করা ? ওতে মান থাকে না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কাপালীদের ধান ভানা ? লোকে জানলে কি বলবে বল তো ? এত ছোট নজর তোমার হোল কেমন করে তাই ভাবচি।

—বেশ, লোকে আমায় বলে বলবে, আমার ছেলেপুলে তো দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পাবে। তা ছাড়া কাপালীদের দুই বৌ ধান এলে দেয়। আমি শুধু ঢেঁকিতে পাড় দিই।

—তুমি ধান এলে দিতে পারো ? এলে দেওয়া বড্ড শক্ত—না ?

—এলে দেওয়া শিখতে হয়। তাড়াতাড়ি গড় থেকে যে হাত উঠিয়ে নিতে পারে সে ভাল এলে দিতে পারে। এলে দেওয়ানো শিখচি একটু একটু।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর কথায় ভাবনায় পড়ে গেল। তার স্ত্রী যে তাকে লুকিয়ে এ কাজ করচে তা সে জানতো না। মাঝে মাঝে সে ভেবেচে অবিশ্যি, মাত্র দু'কাঠা এক কাঠা চালে তার এক হাট থেকে আর এক হাট পর্য্যন্ত চলচে কি করে ? এত দিন লুকিয়ে লুকিয়ে অনঙ্গ-বৌ চালাচ্চে তা তো সে জানতো না।

আহা, বেচারী ! যদি ধান এলে দিতে গিয়ে কোনদিন ওর আঙুলে ঢেঁকি পড়ে যায় ?

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বেরিয়ে গেলে হরি কাপালীর ছোট বৌ এসে ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বললে—উনি চলে গিয়েচেন ?

—হ্যাঁ, দিদি। যাই—

—চলো বামুন-বৌ, ওরা সব বসে আছে তোমার জন্যি।

—কত ধান আজকে ?

—পাঁচ আড়ি তিন কাঠা। চিঁড়ে আছে তিন কাঠা।

—আমাকে ধান এলে দেওয়া শিখিয়ে দিবি দিদি ?

—সে তোমার কাজ নয়। অমন চাঁপাফুলের কলির মত আঙুল, ঢেঁকি পড়ে ছেঁচে যাবে। তার দায়িক আমি হবো বুঝি বামুন-বৌ ?

—দায়িক হতে হবে না সে জন্যি। আহা, ভঙ্গি দেখো না! মরণের ভগ্নদশা!

কাপালী-বৌ অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে চোখ মিটকি মারছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করেই অনঙ্গ-বৌয়ের শেষের উক্তিটুকু। হরি কাপালীর ছোট বৌয়ের বয়েস অনঙ্গ অপেক্ষা বছর দুই বেশি হবে, ছেলেপুলে হয় নি, রংও ফর্সা, মুখ-চোখের চটক ও দেহের গড়ন এবং বাঁধুনি ভালোই। রাস্তার লোকে চেয়ে দেখে।

অনঙ্গ হেসে বললে—আড়চোখ দেখাগে অন্য জায়গায়—বহুলোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারবি।

কাপালী-বৌ হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—মুণ্ডু ঘুরিয়ে বেড়ানো বুঝি আমার কাজ ?

—কি জানি দিদি ?

—আর তুমি বামুন-বৌ—তুমি যে অনেক মুনির মন টলিয়ে দিতে পারো মন করলি ? আমরা তো তোমার পায়ের নখের যুগ্যি নই। সামনে খোশামোদ করে বলচি নে বামুন-বৌ। গ্রামের সবাই বলে—

অনঙ্গ-বৌ সলজ্জ হাসি মুখে বললে—যাঃ—

হরি কাপালীর দু'খানা মেটে ঘর, একদিকে পুঁই মাচা, এক দিকে বেড়ার মধ্যে লালডাঁটা ঝিঙে ও বেগুনের চাষ। পুঁই মাচার পাশে ছোট চালার নিচে ঢেঁকি পাতা। সেখানে জড়ো হয়েচে হরি কাপালীর বড়-বৌ, আরও পাড়ার দু-তিনটি ঝি-বৌ। ঢেঁকিঘরের চার পাশে বর্ষাপুষ্ট বনকচুর ঝাড়, ধুতরো গাছ, আদাড় বাগ গাছে রাঙা রাঙা মটর ফল, ঢেঁকিঘরের চালে তেলাকুচো লতা উঠে দুলছে, বর্ষাসজল হাওয়ায় কচি লতাপাতার গন্ধ।

অনঙ্গ-বৌ আর ছোট-বৌ, সেখানে পৌছুতে সবাই খুব খুশি।

বড়-বৌ বললে—এসো বামুন-বৌ, তুমি না এলি ঢেঁকশেলের মজলিশ আমাদের জমে না—

ক্ষিতুরী কাপালী বললে—যা বললে দিদি, ঠাকুরুণ-দিদি আমাদের ঢেঁকশেল আলো

করে থাকেন। আমাদের বুকির মধ্যে হু-হু করতি থাকে উনি না এলি—

অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—তোমাদের যে বড্ড দরদ দেখছি—

ছোট-বৌ বললে—আমিও তা বলছিলাম, বামুন-বৌয়ের রাঙা পায়ের তলায় পড়ে আমি মরতি পারি—

বড-বৌ বললে—সে তো ভাগ্যি—বামুনের এয়িস্ত্রী বৌয়ের পায়ে মরবার ভাগ্যি চাইরে ছুট্‌কি। সে এমনি হয় না।

এদের দুপুরের মজলিশ জমে উঠলো।

কাপালীপাড়ার বৌ-ঝিয়েদের এই একমাত্র আমোদ-আহ্লাদের স্থান। এখানে না এলে ওদের দুপুরটা মিথ্যে হয়ে যায় যেন। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরের মেয়ে, দুপুরে এদের দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই, সময়ও পায় না। ধান ভানা চিঁড়ে কোটাতেই অবসর সময় কেটে যায়, ওর মধ্যেই এদের আড্ডা, গল্পগুজব যা কিছু।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বড়-বৌ, ও ধান কাদের?

—কাল উনি কোত্থেকে কত কষ্টে পাঁচ কাঠা ধান এনেলেন—কিন্তু শুনচি ধান নাকি সব গবরমেণ্টে নিয়ে যাচ্চে?

—কে বললে?

—উনি কাল হাট থেকে নাকি শুনে এয়েচেন।

ছোট-বৌ বললে—ওসব কথা এখন রাখো দিদি। বামুন-বৌয়ের জন্যে একটা পান সেজে নিয়ে এসো দিকি।

—পান আছে, সুপুরি নেই যে? কাল হাটে একটা সুপুরির দাম দু'পয়সা।

সিদ্ধেশ্বর কামারের বৌ বললে—হ্যাঁ দিদি, নাকি আজকাল খেজুরের বীচি দিয়ে পান সাজা হচ্চে সুপুরির বদলে?

অনঙ্গ-বৌ বললে—সত্যি?

কামার-বৌ বললে—সত্যি মিথ্যে জানিনে ঠাকরুণ-দিদি। মিথ্যে কথা বলে শেষকালে বামুনের কাছে, নরকে পচে মরবো? কানে যা শুনিচি—বললাম।

কথা শেষে সে হাতের এক রকম সুন্দর ভঙ্গি করে মৃদু হাসলো।

এই ঢেঁকিশালের মজলিশে অনঙ্গ-বৌয়ের পরে দেখতে ভালো হরি কাপালীর ছোট-বৌ, তার পরেই এই কামার-বৌ। এর বয়েস আরও কম ছোট-বৌয়ের চেয়ে, রংও আর একটু ফর্সা—তবে ছোট-বৌয়ের মুখশ্রী এর চেয়ে ভালো। কামার-বৌ সম্বন্ধে গ্রামে একটু বদনাম আছে, সে অনেক ছেলে-ছোকরার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার জন্যে দায়ী, অনেককে প্রশ্রয়ও দেয়। কিন্তু ছোট-বৌ সম্বন্ধে সে কথা কেউ বলতে পারে না। অনঙ্গ-বৌ বললে—পোড়া কপাল পান খাওয়ার। খেজুরের বীচি দিয়ে পান খেতে যাচ্চি নে।

ক্ষিতুরী কাপালী শুনে হেসে খুন হয় আর কি। সে বিনোদ মোড়লের বিধবা বোন, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস, আধফর্সা থান পরে এসেচে, দেখতে শুনতে নিতান্ত ভালও নয়,

খুব মন্দও নয়। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়া ওর একটা রোগের মধ্যে গণ্য।

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি পেল ক্ষিতুরীর হাসি দেখে।

হাসতে হাসতে বললে—নে, বাপু থাম—তুই আবার জ্বালালি দেখচি—এত হাসিও তোর!

ছোট-বৌ ঠোঁট উল্টে বললে—ওই বোঝো।

ইতিমধ্যে বড়-বৌ কি ভাবে দুটো পান সেজে নিচু ঘরের দাওয়ার ধাপ থেকে নামলো।

ছোট-বৌ বললে—বিনি সুপুরিতে দিদি?

বড়-বৌ ঝঙ্কার দিয়ে বললে—ওরে না না। খুঁজে পেতে ঘর থেকে উটকে বার করলাম।

—কোথায় ছিল?

—তোকে বলবো কেন?

—কেন?

—তুই সব্বস্ব উটকে বের করবি। তোর জ্বালায় ঘরে কিছু থাকবার জো আছে? আমি যাই গিন্নী, তাই সব জিনিস জোগাড় করে তুলে লুকিয়ে রেখে দি। আর তুই সব উটকে উটকে বার করিস।

ছোট-বৌ চোখ পাকিয়ে ভুরু তুলে বললে—আমি?

—হ্যাঁ, তুই। আমি কাউকে ভয় করে কথা বলব নাকি? তুই ছাড়া আর কে?

—তুমি দেখেচ দিদি?

—দেখিনি, একশো দিন দেখিচি। বলি, ঘর বলতি দু'খানা বাতাসা রেখে দিইছিলাম, ওমা সেদিন দেখি নেই সেটুকু। তুই চুরি করে খেয়েচিস। কে ঘরে ঢুকতে গিয়েচে তুই ছাড়া? ছেলেপিলের বালাই নেই যখন বাড়ীতে।

কথাটা বোধ হয় নিতান্ত মিথ্যে নয়, কারণ এই কথার পরে ছোট-বৌয়ের কথার সুর ও তেজ কমে গেল। সে বললে—খেইচি যাও, বেশ করিচি। আমার জিনিস না?

—বড্ড যে স্বত্ব দেখাচ্চিস লা!

অনঙ্গ-বৌ বললে—আহা, কি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দু'বেলা তোমাদের ঝগড়া। থামো না বাপু।

বড়-বৌ বললে—আমি অন্যাই কথাটি বলিচি কি বামুন-বৌ তুমিই বিচের কর। ঘর বলে জিনিস লুকিয়ে রাখি এই যুজ্যের বাজারে। তুই সেগুলো উটকে উটকে চুরি করে খাস কেন?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও ছেলেমানুষ যে বড়-বৌ! তোমার মেয়ে হোলে আজ অত বড় মেয়েই হোত। হোত না?

—আমার মেয়ের পোড়াকপাল!

—ওমা সেকি, পোড়াকপাল কি? ছোট-বৌ দেখতে সুশ্রী কেমন? চেয়ে দেখতে পাও না? দু' চোখের কি মাথা খেয়েচ!

ছোট-বৌ হঠাৎ বড় নরম হয়ে গিয়েছিল। সে বললে—নাও নাও বামুন-বৌ, তোমার আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে!

বড়-বৌ ছোট-বৌয়ের দিকে আড়চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মুখ চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বললে—আহা-হা! বলি কত ঢং দেখালি লা।

ক্ষিত্তুরী কাপালী বড়-বৌয়ের চোখ মুখ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে পুনরায় হেসে গড়িয়ে প্রায় ঢেঁকির গড়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লো। মুখে অসংলগ্ন ভাবে যা বলতে লাগলো তা অনেকটা এই রকম—ওমা পোড়ানি—বড়-বৌ—হি হি—কি কাণ্ড—হি হি—বলে কিনা—ও বামুনদিদি—হি হি—আমি আর বাঁচবো না—ওমা—হি হি—ইত্যাদি।

কামার-বৌ বললে—তা নাও, তুমি আবার যে এক কাণ্ড বাধালে! গড়ে কপাল ছেঁচে না যায় দেখো।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি অবস্থা দেখে অনঙ্গ-বৌ যে এত আশাবাদী, সে পর্য্যন্ত ভয় খেয়ে গেল। ধান চাল হঠাৎ যেন কর্পূরের মত দেশ থেকে উবে গেল কোথায়! এক দানা চাল কোথাও পাওয়া যায় না। অত বড় গোবিন্দপুরের হাটে চাল আসে না আজকাল। খালি ধামা কাঠা হাতে দলে দলে লোক ফিরে ফিরে যাচ্চে চাল অভাবে। হাহাকার পড়ে গিয়েচে হাটে হাটে। কুণ্ডুদের দোকানে যে এত চাল ছিল, বস্তা সাজানো থাকতো বালির বস্তার দেওয়ালের মত, সে গুদাম আজকাল শূন্যগর্ভ। পথেঘাটে ক্রমশঃ ভিখিরীর ভিড় বেড়ে যাচ্চে দিন দিন, এরা এতদিন ছিল কোথায় সকলেই ভাবে, অথচ কেউ জানে না। এ দেশের লোকও নয় এর, বিদেশী ভিখিরী, একদিন অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরে রান্না করচে, হঠাৎ পাঁচ-ছটি অর্দ্ধ উলঙ্গ জীর্ণশীর্ণ স্ত্রীলোক, সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ বালক-বালিকা—ঘরের দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—ফ্যান খাইতাম—ফ্যান খাইতাম—

অনঙ্গ প্রথমটা ওদের উচ্চারণের বিকৃতির দরুন কথাটা কি বলা হচ্চে বুঝতে পারলে না। তা ছাড়া 'খাইতাম' এটা ক্রিয়াপদের অতীত কালের রূপ এসব দেশে, তা বর্ত্তমানে প্রয়োগ করার সার্থকতা কি, এটা বুঝতেও একটুও দেরি হোল।

পরে বুঝলে যখন তখন বললে—একটু দাঁড়াও—ফ্যান দেবো।

ওরা হাঁড়ি, তোবড়ানো টিনের কৌটো পেতে ফ্যান নিয়ে যখন চলে গেল, তখন অনঙ্গ-বৌ কতক্ষণ ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েচে নাকি যে দেশ ছেড়ে এদের বিদেশে আসতে হয়েচে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এক মগ্ ফ্যান ভিক্ষে করতে? অনঙ্গ-বৌয়ের চোখে জল এল। নিজের ছেলেরা পাঠশালায় গিয়েচে, ওদের কথা মনে পড়লো। এতগুলো লোককে ভাত দেওয়ার উপযুক্ত চাল নেই ঘরে, নইলে দিত না হয় ওদের দুটো দুটো ভাত।

ক্রমে নানাস্থান থেকে ভীতিজনক সংবাদ আসতে লাগলো সব। অমুক গ্রামে চাল একদম পাওয়া যাচ্চে না, লোকে না খেয়ে আছে। অমুক গ্রামে অমুক লোক আজ পাঁচদিন

ভাত খায় নি—ইত্যাদি। তবুও সবাই ভাবতে লাগলো, মানুষে কি সত্যি সত্যি না খেয়ে মরে? কখনই নয়! তাদের নিজেদের কোনো বিপদ নেই।

একদিন অনঙ্গ-বৌ খুব ভোরে ঘাটে গিয়ে দেখলে জেলেপাড়ার রয়ে জেলের বৌ ঘাটের ধারের কচুর ডাঁটা তুলে এক বোঝা করেচে।

অনঙ্গ হেসে বললে—কি গা রয়ের-বৌ, আজ বুঝি কচুর শাক খাবে?

জেলে-বৌ যেন ধরা পড়ে একটু চমকে গেল। যেন সে আশা করে নি এত ভোরে কেউ নদীর ঘাটে আসবে। লুকিয়ে লুকিয়ে এ কাজ করছিল সে, এমন একটা ভাব প্রকাশ পেলে ওর ধরনধারনে।

সে মৃদু হেসে বললে—হ্যাঁ, মা।

—তা এত? এ যেন দু'তিন বেলার শাক হবে।

—সবাই খাবে মা, তাই।

বলেই কেমন এক অদ্ভুত ধরনে ওর মুখের দিকে চেয়ে জেলে-বৌ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

অনঙ্গ-বৌ অবাক হয়ে বললে—ওকি রয়ের-বৌ, কাঁদচিস্ কেন? কি হোল?

রয়ের-বৌ আঁচলে চোখের জল মুছে আস্তে আস্তে বলে—কচ্চি কি সাধে মা? এই ভরসা।

—কি ভরসা?

—এই কচুর শাক মা। তিন দিন আজ কারো পেটে লক্ষ্মীর দানা সেধোঁয় নি।

—বলিস কি রয়ের-বৌ? না খেয়ে—

—নিনক্যি, মা নিনক্যি—তোমার কাছে মিছে কথা বলবো না সকালবেলা। কার দোরে যাবো, কে দেবে মোরে এই যুজ্যের বাজারে। যুজ্যের আক্রা ভাত কার কাছে গিয়ে চাইবো মা? তাই বলি এখনো কেউ ওঠে নি, গাঙের ধারে বড় বড় কচুর ডাঁটা হয়েচে তুলে আনি গে। তাই কি তেল নুন আছে মা? শুধু সেদ্ধ।

অন্নকষ্টের এ মূর্ত্তিই কখনো দেখে নি অনঙ্গ। সে ভাবলে—আহা, আমার ঘরে যদি চাল থাকতো! আজ রয়ের-বৌ আর তার ছেলেমেয়েকে কি না খাইয়ে থাকি?

জেলে-বৌ আপন মনে বলতে লাগলো—এক সের দেড় সের মাছ ধরে। পয়সা বড় জোর দশ আনা বারো আনা হয়। এক কাঠা চাল কিনতে একটা টাকা যায়—তাও মিলচে না হাটে বাজারে। মোরা গরীব নোক, কি করে চালাই বলো মা—

অনঙ্গ-বৌ আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে বাড়ী গেল। গঙ্গাচরণ ঘুম থেকে উঠে তামাক খেতে বসেচে। স্বামীকে বললে—হ্যাঁগা, এ কি রকম বাজার পড়লো চালের? ভাত বিনে কি সব উপোস দিতে হবে? আমাদের ঘরেও তো চাল বাড়ন্ত। আজকাল চালের ধান আর কেউ দেয় না। গাঁ থেকে ধান গেল কোথায়।

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—তামার পয়সা যেখানে গিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ রেগে বললে—ত্থাখো ওসব রঙ্গরস ভাল লাগে না। একটা হিল্লে করো—ছেলেপুলে উপোস করে থাকবে শেষে ?

গঙ্গাচরণ চিন্তিত মুখে বললে—তাই ভাবচি ! আমি কি চুপ করে বসে আছি গা ? কি হবে এ ভাবনা আমারও হয়েচে।

—চারিধারের ব্যাপার দেখে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্চে যে—আর বসে থেকো না। উপায় ত্থাখো। তিন দিনের মত চাল ঘরে আছে মজুত—

—আর ধান কতটা আছে ?

—সে ভানলে বড় জোর পাঁচ কাঠা চাল হবে। তাতে ধরো আরো দশদিন। তার পরে ?

—আমিও তাই ভাবচি।

—যা হয় উপায় করো।

দিন দুই পরে গঙ্গাচরণ পাঠশালা বন্ধ রেখে নরহরিপুরের হাটে গেল চালের সন্ধানে। বিষ্টুপুর, ভাতছালা, সুবর্ণপুর, খড়িদীঘি প্রভৃতি গ্রাম থেকে ধানচাল জড়ো হয়ে আগে আগে নরহরিপুরের প্রসিদ্ধ চালের ও ধানের হাট বোঝাই হয়ে যেতো—সেই হাটের অত বড় চালাঘর খালি পড়ে আছে—এক কোণে বসে শুধু এক বুড়ী সামান্য কিছু চাল বিক্রি করচে।

গঙ্গাচরণ কাছে গিয়ে বললে—কি ধানের চাল ?

—কেলে ধান ঠাকুর মশায় ! নেবেন ? খুব ভালো চাল কেলে ধানের। কথায় বলে—

ধানের মধ্যি কেলে, মানুষের মধ্যি ছেলে—

বুড়ীর কবিত্বের দিকে তত মনোযোগ না দিয়ে গঙ্গাচরণ ওর ধামা থেকে চাল তুলে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। যেমন মোটা, তেমনি শুমো। মানুষের অখাদ্য। তবুও চাল বটে, খেয়ে মানুষে প্রাণ বাঁচাতে পারে।

—কতটা আছে ?

—সবটা নেবা তুমি ? তিন কাঠা আছে।

—দাম ?

—দেড় টাকা করে কাঠা।

গঙ্গাচরণ চমকে উঠলো, ভাবলে কথাটা সে শুনতে পায় নি। আবার জিজ্ঞেস করার পরেও যখন বুড়ী বললে এক কাঠার দাম দেড় টাকা, তখন গঙ্গাচরণের কপালে ঘাম দেখা দিয়েচে। দেড় টাকায় আড়াই সের, তা হোলে পড়লো চব্বিশ টাকা মণ। কি সর্ব্বনাশ ! অনঙ্গ-বৌ এত দিন পরের বাড়ীর ধান ভেনে চালিয়ে আসছিল বলে সে অনেকদিন হাটে বাজারের চালের দর জানে না। চাল এত চড়ে গিয়েচে তা তো তার জানা ছিল না। চারিদিক অন্ধকার দেখলো গঙ্গাচরণ। এত বড় নরহরিপুরের হাট—ধান চাল শূন্য। মানুষ এবার কি সত্যিই তবে না খেয়ে মরবে ? কিসের কুলক্ষণ এসব ? পরশুও তো চালের দাম

এত ছিল না। দু'দিনে ষোল টাকা থেকে উঠলো চব্বিশ টাকা এক মণ চালের দর—তাও এই মোটা, গুমো, মানুষের অখাদ্য আউশ চালের!

গঙ্গাচরণের সারা শরীরটা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। কি করে সে চালাবে? নিজেদের ধানের ক্ষেত নেই। চব্বিশ টাকা মণের চাল সে কিনে খাওয়াতে পারবে ক'দিন, বারো টাকা যার মাসিক আয়? অনঙ্গ-বৌ না খেয়ে মরবে? হাবু পটল না খেয়ে—না, আর সে ভাবতে পারে না।

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে বাড়ী ফিরবার পথে দেখলে ধামা কাঠা হাতে আরও অনেকে হাটের দিকে ছুটেচে চালের চেষ্টায়। অনেকে ওকে জিজ্ঞেস করে, চাল কনে পালেন ও পণ্ডিত মশাই? কি দর?

—চব্বিশ টাকা।

—মোটা আশ চাল চব্বিশ? বলেন কি পণ্ডিত মশাই?

—দেখ গে যাও হাটে গিয়ে।

বৃদ্ধ দীনু নন্দী একটা ধামা হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটচে। দীনু নন্দী বাড়ীতে বসে সোনা-রুপোর কাজ করে অর্থাৎ গহনা গড়ে। সোনার কাজ তত বেশি নয়, চাষা-মহলে গহনার কাজে সোনার চেয়ে রুপোর ব্যবহারই বেশি। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে গহনা কে গড়ায়, কাজেই দীনুর ব্যবসা অচল। দুটি বিধবা ভাই-বৌ, বৃদ্ধা মাতা ও কয়েকটি শিশুসন্তান, তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা তার ঘাড়ে। দীনু বললে—পণ্ডিত মশাই, চাল পাবো?

—ছুটে যাও। বড্ড ভিড়।

—ছুটি বা কোত্থেকে, পায়ে বাত হয়ে কষ্ট পাচ্চি বড্ড। দু'বেলা খাওয়া হয় নি—

—বল কি?

—সত্যি বলচি পণ্ডিত মশাই। বামুন দেবতা, এই অবেলায় কি মিছে কথা বলে নরকগামী হবো?

দীনু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সজোরে প্রস্থান করলে।

গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরতে ফিরতেই কত লোক শুধু হাতেই হাট থেকে ফিরচে দেখা গেল। সাগরতলার কর্ম্মকারদের বাড়ীতে একটু বসে তামাক খাচ্ছিল, এমন সময় দু-চার জন লোক সেখানে এসে জুটলো গল্প করতে।

একজন বললে—নরহরিপুরের হাটে চাল পাওয়া গেল না, আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন!

আর একজন বললে—লোকও জড়ো হয়েচে হাটে দেখুন গে। এক কাঠা চাল নেই। কেউ তিন দিন, কেউ পাঁচ দিন না খেয়ে আছে। আমারই বাড়ীতে দুদিন ভাত খায় নি কেউ।

গঙ্গাচরণ বললে—আটা ময়দা নিয়ে যে যাবে, তাও নেই।

—বস্তাপচা আটা আছে দু-এক দোকানে, বারো আনা সের। কে খাবে?

আরও মাইলখানেক এগিয়ে গেল গঙ্গাচরণ। খল্‌সেখালির সনাতন ঘোষ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্চে, ওকে দেখে বললে—পণ্ডিত মশাই, ওতে কি? চাল নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় পেলেন?

—সে যা কষ্ট তা আর বোলো না। এক বুড়ীর কাছ থেকে সামান্য কিছু আদায় করেচি, তাও আগুন দর।

—কই দেখি দেখি?

সনাতন ঘোষ নেমে এসে ওর হাতের পুঁটুলিটা নিজের হাতে নিয়ে পুঁটুলি নিজেই খুলে চাল দেখতে লাগলো। ওর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। চালের দানা পরীক্ষা করতে করতে বললে—বড্ড মোটা। কত দর নিলে। একটা কথা বলবো পণ্ডিত মশাই?

—কি?

—দাম আমি যা হয় দিচ্চি। আমায় অর্দ্ধেকটা চাল দিয়ে যান। দিতেই হবে। দু'দিন না খেয়ে আছে সবাই। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীর থেকে এনে এখন মহা মুশকিল, সে বেচারীর পেটে আজ দু'দিন লক্ষ্মীর দানা যায় নি—কত চেষ্টা করেও চাল পাই নি—

সনাতন ঘোষের অবস্থা খারাপ নয়, বাড়ীতে অনেকগুলো গরু, দুধ থেকে ছানা কাটিয়ে নরহরিপুরের ময়রাদের দোকানে যোগান দেয়—এই তার ব্যবসা। গঙ্গাচরণ ইতিপূর্ব্বে সনাতনের বাড়ী থেকে দু-এক খুলি টাটকা ছানা নিয়েও গিয়েচে। তার আজ এই দশা! কিন্তু চাল মাত্র সে নিয়েচে তিন কাঠা। আর কোথাও চাল পাওয়া যাচ্চে না। এ চাল দিলে তার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকবে দু'দিন পরে। চাল দেওয়ার ইচ্ছে তার মোটেই নেই—এদিকে সনাতন মোক্ষম ধরেচে চালের পুঁটুলি, তার হাত থেকে চাল নিতান্তই ছিনিয়ে নিতে হয় তাহলে। কিংবা ঝগড়া করতে হয়।

সনাতন ততক্ষণে কাকে ডেকে বললে—ওরে একটা ধামা নিয়ে আয় তো বাড়ীর মধ্যে থেকে? একটা কাঠাও নিয়ে আয়—

সনাতন নিজের হাতে এক কাঠা চাল যখন মেপে ঢেলে নিয়েচে, তখন গঙ্গাচরণ মিনতি-সূচক ভদ্রতার সুরে বললে আর না সনাতন, আর নিও না—

—আর আধ কাঠা—

—না বাপু, আমি আর দিতে পারবো না। বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত—বুঝলে না?

সনাতনের নাতিটি বললে—দাদামশাই, ওঁর চাল আর নিও না, দিয়ে দাও।

সনাতন মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো—তোদের জন্যি বাপু খেটে মরি, নিজের জন্যি কিসের ভাবনা। একটা পেট যে করে হোক চলে যাবেই। রইল পড়ে চাল, যা বুঝিস করগে যা।

রাগ না লক্ষ্মী। গঙ্গাচরণ বিনা চক্ষুলজ্জায় সমস্ত চাল উঠিয়ে নিয়ে চলে এল। বাড়ী এসে দেখলে অনঙ্গ-বৌ ভাত চড়িয়ে ওল কুটতে বসেচে রান্না ঘরের দাওয়ায়। স্বামীকে দেখে বললে—ওগো শোনো, আমি এক কাজ করিচি। সেদিন সেই বোষ্টম প্রভাতী সুরে গান

করছিল মনে আছে ? আজ এসেছিল, কি সুন্দর গান যে গায় !

—কে বল তো ?

—সেই যে বলে—'উঠ গো উঠ নন্দরাণী কত নিদ্রা যাও গো'—বেশ গলা—লম্বা মত, ফর্সা মত বোষ্টমটি—

—ওর বাড়ী বেনাপোল। বেনাপোলের হরিদাস ঠাকুরের পীঠ আছে, সেখানকার কাজ-কর্ম্ম করতো। বেশ গায়।

—আমি তাকে বললাম রোজ সকালে এসে আমাদের বাড়ীতে ভগবানের নাম করবে। ভোর বেলায় বড় ভাল লাগে ভগবানের নাম। মাসে একটা টাকা আর এক কাঠা চালের একটা সিধে দিতে হবে বলেচে, এই ধরো ডাল, নুন, বড়ি, দুটো আলু, বেগুন, একটু তেল—এই। আমি বলিচি দেবো। কাল থেকে গাইতে আসবে। হঁ্যাগা, রাগ করলে না তো শুনে ?

—তোমার যে পাগলামি। বলে, নিজে খেতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। দেবে কোথা থেকে ?

—তুমি ঝগড়া কোরো না। সকালে উঠে ভগবানের নাম শুনবে যে রোজ রোজ তখন ? হুঁ-হুঁ—আমি যেথান থেকে পারি জুটিয়ে দেবো, তুমি ভেবো না কিছু। গরীব বলে কি ভাল গান শুনতে নেই ?

পরদিন খুব ভোরে সেই বোষ্টমটি সুস্বরে প্রভাতী গান গাইতে গাইতে ওদের উঠানে এসে দাঁড়ালো। অনঙ্গ-বৌ খুশিতে ভরপুর হয়ে পাশের ঘরে এসে স্বামীকে ডেকে বললে—ওগো শুনচো ? কেমন গায় ? আর ভগবানের নাম—বেশ লাগে—না ?

গঙ্গাচরণ কিছু জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ রাগ করে বললে—আহা, ঢং দ্যাখো না ! ওগো গান শোনো—তাতে জাত যাবে না।

—আমি কি রাজা যে বন্দীরা প্রভাতী গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙাবে ? তোমার পয়সা থাকে তুমি বন্দীদের মাইনে দিয়ো গো রানী। আমি ওর মধ্যে নেই।

—আমার বন্দীর গান যে শুনবে, তাকে পয়সা দিতে হবেই। তবে কানে আঙুল দাও—

গঙ্গাচরণ হেসে কান চেপে ধরে বললে—এই দিলাম।

একটু বেলা হোলে অনঙ্গ-বৌ রান্না চড়ালে, তার পরে মনে মনে হিসেব করে দেখলে দিন দশ বারো পরে চাল একেবারে ফুরিয়ে যাবে, তখন উপায় কি হবে ? চাল নাকি হাটে পাওয়া যাচ্চে না। সবাই বলচে। তার স্বামী নির্ব্বিরোধী মানুষ, কোথা থেকে কি যোগাড় করবে এ দুর্দ্দিনে ? ভাবলে মায়া হয়।

কাপালীদের ছোট-বৌ চুপি চুপি এসে বললে—বামুন-দিদি, একটা কথা বলবো ? এক খুঁচি চাল ধার দিতি পারো ?

—মুশকিল করলি ছোট-বৌ। তোদের চাল কি বাড়ন্ত ?

—মোটে নেই। কাল ছোলা সেদ্ধ খেয়ে সব আছে। না হয় ছোট ছেলেটিকে দুটি ভাত দিও এখন দিদি। আমরা যা হয় করবো এখন।

অনঙ্গ-বৌ কি ভেবে বললে—একটু দাঁড়া। এসেচিস যখন তখন নিয়ে যা এক খুঁচি চাল। ওতে আমাদের কতদিনের সাশ্রয় বা হোতো?

কাপালী-বৌ চাল আঁচল পেতে নিয়ে বললে—এক জায়গায় কচুর শাক আছে তুলতে যাবে বামুন-দিদি? গেরামে তো কচুর শাক নেই—যে যেখান থেকে পারচে তুলে নিয়ে যাচ্চে। গাঙের ধারে এক জায়গায় সন্ধান করিচি, ঢের কচুর শাক হয়ে আছে। দু'জনে চলো চুপি চুপি তুলে আনি।

—চল্, আজ দুপুরে যাবো। চাল তো নেই। যা দেখচি ওই খেয়েই থাকতে হবে দুদিন পরে।

কাপালী-বৌ হেসে বুড়ো আঙুল তুলে নাচিয়ে বললে—লবডঙ্কা! তাই বা কোথায় পাচ্ছ বামুন-দিদি? কাওরা পাড়ার মাগী-মিন্সে এসে গাঙের ধারের যত শুষনি শাক, কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক তুলে উজোড় করে নিয়ে যাচ্চে দিনরাত। গিয়ে দ্যাখো গো কোথাও নেই। আমি কি খোঁজ করি নি বামুন-দিদি? ওই খেয়ে আজ দু'দিন বেঁচে আছি—ওই সব শাক আর ছোলা সেদ্ধ। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে বড়াই করে কি করবো?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী মিটিং বসেচে।

বর্ত্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যেই মিটিং, তবে কাপালী-পাড়ার লোক ছাড়া অন্য কোনো লোক এতে উপস্থিত নেই। ক্ষেত্র কাপালী বললে—এখন ধান আমাদের দেবেন কিনা বলুন বিশ্বেস মশায়।

বিশ্বাস মশায় অনেকক্ষণ থেকে সেই একই কথা বলচেন—ধান নেই, তার দেবো কি। আমার গোলা খুঁজে দ্যাখো।

অধর কপালী বললে—আমাদের পাড়াটা আপনি কর্জ্জ দিয়ে বেঁচিয়ে রাখুন। আসচে বারে আপনার ধার এক দানাও বাকি রাখবো না।

বিশ্বাস মশায়ের বাঁ-দিকে গঙ্গাচরণ অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। সে এসেছিল ধানচাল সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না বিশ্বাস মশায়ের সাহায্যে, সেই চেষ্টায়। এত বড় মিটিং-এর মধ্যে এসে পড়বে তা সে ভাবে নি। সে চুপ করে বসেই আছে।

হঠাৎ তার দিকে ফিরেই বিশ্বাস মশায় বললেন—পণ্ডিত মশাই, আপনি এই নিন গোলার চাবি। এদের গিয়ে খুলে দেখান ওতে কি আছে—

বিশ্বাস মশায় চাবিটা গঙ্গাচরণের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই ক্ষেত্র কাপালী বলে উঠলো—গোলা দেখতে হবে না। আমরা জানি ও গোলাতে আপনার ধান নেই।

চটে উঠে বিশ্বাস মশায় বললেন—তবে কোথায় আছে?

—আপনি ধান লুকিয়ে রেখেছেন বাড়ীতে।

—তুমি দেখেচ?

—দেখতে হবে না, আমরা জানি।

কথা শেষ করে ক্ষেত্র কাপালী মিটিং ছেড়ে উঠে চলে গেল।

অধর কাপালী অনুনয়ের সুরে বললে—শুনুন, বিশ্বেস মশায়, আপনি পাড়ার মা-বাপ। এ বিপদে যদি আপনি না বাঁচান, তবে ছেলেপিলে নিই কোথায় দাঁড়াই বলুন দিকি? অমন করবেন না। ধানের ব্যবস্থা আজ করে দিতেই হবে আপনাকে।

বিশ্বাস মশায় দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—অমনি বলে সবাই! তুমি তো আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি হলে—তারপর ঠ্যালা সামলায় কে শুনি? ধান আমার নেই।

—একটু দয়া করুন—এট্টু আমাদের দিকি চান। আজ দুদিন বাড়ীতে একটা চালের দানা কারো পেটে যাই নি, সত্যি বলচি।

—বেশ, তুমি আধ কাঠা চাল ঘর থেকে নিয়ে যাও না, তাতে কি? না হয় আমি এক মুঠো কম খাবো। সে কথা তো বললিই হয়, কি বলেন ঠাকুর মশাই?

গঙ্গাচরণ চুপ করে রইল, এ কথায় সায় দিলে পাড়ার লোকে তার উপর চটে যাবে, সবাইকে নিয়ে বাস করতে হবে যখন, কাউকে সে চটাতে চায় না।

সভা বেশিক্ষণ চললো না। বিশ্বাস মশায়ের কাছে যারা দরবার করতে এসেছিল, সবাই বুঝলে এখানে ডাল গলানো শক্ত। যে যার বাড়ী চলে গেল।

গঙ্গাচরণ সুযোগ পেয়ে বললে—বিশ্বাস মশায়, আমি কি না খেয়ে মরবো?

—কেন?

—বাজারে চাল অমিল। আর দুদিন পরে উপোস শুরু হবে। কি করি পরামর্শ দিন।

—আমার বাড়ি থেকে দু'কাঠা চাল নিয়ে যাবেন।

—তা দিয়ে ক'দিন চলবে বলুন।

—কেন?

—আমার বাড়ীর পুষ্যি দু'তিন জন। ও দু'কাঠা চাল নিয়ে কদিন খাবো? আমার স্থায়ী একটা ব্যবস্থা না করলে এই বিপদের দিনে আমি কোথায় যাই? পাঠশালা চালাই কি খেয়ে?

—আমার ধানচাল থাকতো তো বলতে পারা যেতো কিন্তু আমার তা নেই। আজ দু'কাঠা চাল নিয়ে যান দিচ্চি—

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে চলে গেল।

সে রাত্রে বিশ্বাস মশায় আহারাদির পর পুকুরপাড় থেকে গরু আনতে গিয়েছেন, কারণ সেখানেই তাঁর গোয়াল—এমন সময় দুজন লোককে গাছের আড়ালে দেখে বলে উঠলেন—ওখানে কে?

—তোর বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে বিশ্বাস মশায়ের মাথায় সজোরে এক লাঠি বসিয়ে দিলে। এর পর ওরা তাঁকে পুকুরপাড়ের বাবলা গাছের সঙ্গে মোটা দড়া দিয়ে বেঁধে ফেললে। বিশ্বাস মশায়ের জ্ঞান রইল না বেশিক্ষণ, মাথার যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে।

জ্ঞান হয়ে প্রথমেই দেখলেন সূর্য্যের আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েচে, তাঁর বিধবা বড় মেয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদচে।

বিশ্বাস মশায় বলে উঠলেন—ডাকাত! ডাকাত!

বড় মেয়ে সৌদামিনী বললে—ভয় কি বাবা? আমি—আমি যে—এই ছাখো।

বিশ্বাস মশায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন।

সৌদামিনী বললে—বাবা কেমন আছ?

বিশ্বাস মশায় একবার ডাইনে বাঁয়ে সতর্কতার সঙ্গে চেয়ে দেখে চুপি চুপি বললে—সব নিয়ে গিয়েচে?

—কি বাবা?

—সেই সব।

—তুমি কিছু ভেবো না বাবা। সব ঠিক আছে।

—সেই যা আড়ায় তোলা আছে? বস্তা?

—কিছু নেয় নি।

—আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখা মা—

সৌদামিনী বাপের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন—তুমি সেরে সেমলে ওঠো, আমি কি মিথ্যে বলচি তোমারে? আড়ার ওপর যে বস্তা রেখিলে তা কেউ নেয় নি।

—তক্তাপোশের তলায় যে বস্তা ছিল?

—সব ঠিক আছে। নেবে কে?

এই সময় গঙ্গাচরণ ঘরে ঢোকাতে ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

গঙ্গাচরণ পাশে বসে বললে—কেমন আছেন বিশ্বেস মশায়?

—আছি এক রকম।

গঙ্গাচরণ মুরুব্বিয়ানা ভাবে বললে—হাতটা দেখি—

পরে বিজ্ঞের মত মুখ করে বিশ্বাস মশায়ের নাড়ী পরীক্ষা করে বললে—হুঁ—

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন স্বরে বললে—কি রকম দেখলেন পণ্ডিত মশাই?

—ভালো। তবে কফের ধাত একটু প্রবল হয়েছে।

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলে—তাতে কি হয়?

—হবে আর কি? তবে বয়েস হয়েচে কিনা, কফের আধিক্য—

—ভাল করে বলুন।

—মানে জিনিসটা ভাল না।

বিশ্বাস মশায় স্বয়ং এবার মিনতির স্বরে বললেন—আমাকে এবারটা চাঙ্গা করে তুলুন পণ্ডিত মশাই। আপনি দশ সের চাল নিয়ে যাবেন।

—থাক থাক, তার জন্যে কি হয়েচে?

সৌদামিনী কিন্তু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলো—না, আজই নিয়ে যাবেন'খন। ধামা

আমি দেবো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন না। সন্দের পরে। কেউ টের না পায়।

গঙ্গাচরণ এ অঞ্চলে কবিরাজিও করে। কিন্তু কবিরাজি এখানে ভাল চলে না—কারণ এখানকার সবার 'সারকুমারী মত'। সে এক অদ্ভুত চিকিৎসার প্রণালী। জ্বর যত বেশিই হোক, তাতে স্নানাহারের কোনো বাধা নেই। দু'চার জন সেরেও ওঠে, বেশির ভাগই মরে। তবু ও-মতের লোক কখনো ডাক্তার বা কবিরাজ দেখাবে না, মরে গেলেও না।

গঙ্গাচরণ কথাটা জানে, তাই বললে—আপনার সেই সারকুমারী মতের ফকির আসবে নাকি?

—নাঃ। সেবার জলজ্যান্ত নাতিটাকে মেরে ফেললে। আমি ও-মতে আর নেই।

—ঠিক তো? দেখুন, তবে আমি চিকিচ্ছে করি মন দিয়ে।

সৌদামিনী বলে উঠলো—আপনি দেখুন ভাল করে। আমি ও-মতে আর কাউকে যেতে দেবো না এ বাড়ীতে। চাল নিয়ে যাবেন সন্দের পরে।

দিন দুই পরে বিশ্বাস মশাই একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে বিশ্বাস মশায় বিছানায় উঠে বসে তামাক খাচ্চেন। গঙ্গাচরণ শুনলে, এ গ্রাম থেকে বিশ্বাস মশায় উঠে যাচ্চেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্চে। বাইরে আট-দশখানা গরুর গাড়ীর চাকার দাগ। রাত্রে এই গাড়ীগুলো যাতায়াত করেচে বলেই মনে হয়। গঙ্গাচরণ বুঝতে পারলে বিশ্বাস মশায় মজুদ ধান চাল সব সরিয়ে দিয়েচেন রাতারাতি।

গঙ্গাচরণ বললে—কোথায় যাবেন নিজের গাঁ ছেড়ে?

বিশ্বাস মশায় বললেন—আপাতোক যাচ্চি গঙ্গানন্দপুর, আমার শ্বশুরবাড়ী। এ গাঁয়ে আর থাকবো না। এ ডাকাতের দেশ। সামান্য দু'চার মণ ধান চাল কে না ঘরে রাখে বলুন তো পণ্ডিত মশায়। তার জন্যে মানুষ খুন? আজ ফস্‌কে গিয়েচে, কাল যে খুন করবে না তার ঠিক কি? না, এ দেশের খুরে নমস্কার বাবা।

—আপনার জমিজমা পুকুর এ সবের কি ব্যবস্থা হবে?

—আমার ভাগ্নে দুর্গাপদ মাঝে মাঝে আসবে যাবে। সে দেখাশুনো করবে। আমি আর এমুখো হচ্চি নে কখনো। ঢের হয়েচে। ভাল কথা, একটা ভাল দিন দেখে দেবেন তো যাবার?

বুধবার সকালবেলা বিশ্বাস মশায় সত্যসত্যই জিনিসপত্র সমেত নতুন গাঁ কাপালী-পাড়ার বাস উঠিয়ে চলে গেলেন।

অনঙ্গ-বৌ শুনে বললে—এই বিপদের দিনে তবুও এই একটা ভরসা ছিল। কোথাও চাল না পাওয়া যায়, ওখানে তবু পাওয়া যেতো। এবার গাঁয়ের খুব দুর্দ্দশা হবে। একদানা ধানচাল কারো ঘরে রইল না আর। ভয়ে পড়েই লোকটা চলে গেল।

শ্রাবণ মাসের শেষ।

বেড়ায় বেড়ায় তিৎপল্লার ফুল ফুটেচে। কোঁচ বকের লম্বা সারি নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যায় এপার থেকে ওপারের দিকে।

অনঙ্গ-বৌ নদীর ঘাটে জল তুলতে গিয়েচে। ভূষণ ঘোষের বৌ এক জায়গায় হাবড় কাদার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি করচে। অনঙ্গ-বৌকে দেখে সে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। যেন এ অবস্থায় কারো সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভালো ছিল, ভাবটা এমন।

অনঙ্গ-বৌ কৌতূহলের সঙ্গে বললে—কি হচ্চে গো গয়লা-দিদি ?

ভূষণ ঘোষের বৌয়ের বয়স বেশী নয়, অনঙ্গ-বৌয়ের সমবয়সী কিংবা দু-এক বছরের বড় হতেও পারে। আঁচলে কি একটা ঢেকে সলজ্জভাবে বললে—কিছু না ভাই—

—কিছু না তবে ওখানে কি হচ্চে তোমার মরণ ?

—এমনি।

—তবুও ?

—সুষনি শাক তুলচি—

বলেই হঠাৎ সলজ্জ হাসি হেসে আঁচল দেখিয়ে বললে—মিথ্যে কথা বলবো না বামুনের মেয়ের সামনে। এই গ্যাখো—

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে ও কি হবে ? হাঁস আছে বুঝি ?

গয়লা-বৌয়ের আঁচলে একরাশ কাদামাখা গেঁড়ি-গুগলি। সে বললে—হাঁস নয় ভাই, আমরাই খাবো।

—ও কি করে খায় ?

—এমনি ! শাঁস বের করে ঝাল-চচ্চড়ি হবে।

—সত্যি ?

—অনেকে খায়, তুমি জানো না ! আমরা শখ করে খাই ভাই।

—কি করে রাঁধে আমাকে বলে দিও তো ?

—না ভাই। তুমি খেতে যাবে কি দুঃখে ? তোমাকে বলে দেবো না।

সেদিনই একটু বেলা হোলে কাপালীদের ছোট-বৌ এসে বললে—এক খুঁচি চাল ধার দিতি পারো ভাই ? বড্ড লজ্জায় পড়িচি—

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি ভাই ?

ভূষণ কাকার বৌ এসেচে দুটো চাল নিতি। দু'দিন ভাত পেটে যায় নি। দুটো গেঁড়ি-গুগলি তুলে এনেচে সেদ্ধ করে খাবে। কিন্তু দুটো চাল নেই—আমার বাড়ী এসেচে —তা বলে, তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে—

—আমারও চাল নেই ভাই।

—দু'টো একটা হবে না ?

—আছে, দেবার মত নেই। তোর কাছে লুকুবো না। সের চারেক চাল আছে, তা থেকে দেবো না। তিন বেলার খোরাকও নেই।

কাপালী-বৌ বসে পড়ে গালে হাত দিয়ে টেনে টেনে বললে—তাই তো, কি হবে উপায় দিদি? চাল তো কোথাও নেই। কি করি বল তো?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ছিল বিশ্বেস মশায়, তার ঘরে যা হয় দুটো ধান চাল ছিল। সেও চলে গেল—

—আমরাও তো তাই বলি—

—তবে কোন্ সাহসে চাল দেবো বের করে?

—তা তো সত্যি কথাই।

হঠাৎ অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—রাগ করলি ভাই ছোট-বৌ?

—না ভাই, এর মধ্যে রাগ কিসের?

—আঁচল পাত। চাল নিয়ে যা—

—তোমাদের?

—যা হয় হবে। তবু থাকতে দেবো না তা কি হয়? নিয়ে যা—

দিন কতক পরে চালের ঘোর অনটন লোকের ঘরে ঘরে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী এসে চাল ধার চায়, কে কাকে দেবে? অনঙ্গ-বৌ দুদিন ছেলেদের মুখে ভাত দিতে পারলে না, শুধু সজনে শাক সেদ্ধ। একদিন এসে কাপালী-বৌ দুটো সুষনি শাক দিয়ে গেল, একদিন গঙ্গাচরণ কোথা থেকে একখানা থোড় নিয়ে এল। ভাতের ফ্যান চেয়ে ঘরে ঘরে ফিরচে ত্রিপুরা জেলা থেকে আগত মেয়েপুরুষ; গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল।

সন্ধ্যার দিকে রামলাল কাপালী এসে গঙ্গাচরণকে চুপি চুপি বললে—পণ্ডিত মশায়, চাল নেবেন?

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কোথায়?

—মেটেরা বাজিতপুর থেকে আমার শ্বশুর এক বস্তা চাল নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেচেন আমার বাড়ী। দেড় মণ চাল, বেনামুড়ি ধানের ভাল চাল। ছোট-বৌ বললে—বামুনদিদির বাড়ী বলে এসো।

—কি দর?

—শ্বশুর বলচেন চল্লিশ টাকা করে মণ—

—আউশ চালের মণ চল্লিশ টাকা?

—তাই মিলচে না দাদাঠাকুর। আপনি তো সব জানো।

গঙ্গাচরণ ইতস্তত: করতে লাগলো। দু'গাছা পাতলা রুলি আছে অনঙ্গ-বৌয়ের হাতে। একবার গেলে আর হবে না।

কিন্তু উপায় কি? ছেলেপুলেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো? বাড়ীতে এসে স্ত্রীর কাছে

বলতেই তখুনি সে খুলে দিলে। এক মণ চালই এসে ঘরে উঠলো।

রামলাল কাপালী বলে দিলে—চুপি চুপি নিয়ে যাবেন দাদাঠাকুর।

সন্ধ্যার অনেক পরে চাল নিয়ে আসতে গিয়ে গঙ্গাচরণ ও তার দুই ছেলে পড়ে গেল নিমাই জেলের সামনে। সে নদীতে যাচ্ছে আলোয় মাছ ধরতে। ওদের দেখে বললে—কে ?

গঙ্গাচরণ বললে—এই আমরা।

—কে পণ্ডিত মশাই ? পেন্নাম হই। কি ওতে ?

—ও আছে।

—ধান বুঝি—পণ্ডিত মশাই ?

—হাঁ।

নিমাই জেলের বিধবা মেয়ে পরদিন ভোর না হতে এসে হাজির। না খেয়ে মারা যাচ্ছে ওরা, দুটো ধান দিতে হবে। অনঙ্গ-বৌ মিথ্যে কথা বলতে তেমন পারে না, না ভেবেই বলে বসলো—ধান তো নেই ঘরে, চাল এনেছিলেন কিনে উনি।

—তাই দুটো ছান বামুন-দিদি, না খেয়ে মরচি।

দিতে হল। ঘরে থাকলে না দিয়ে পারা যায় না। ফলে দলে দলে এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে লোক আসতে লাগলো। কেউ ভাত দাও, কেউ চাল দাও দুটি। এক মণ চাল দশ দিনে উঠে গেল, মাঝে পড়ে অনঙ্গ-বৌয়ের শেষ সম্বল রুলি দু'গাছা অনন্তের পথে যাত্রা করলো।

ইতিমধ্যে একদিন ভাতছালা থেকে মতি মুচিনী এসে হাজির।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি রে মতি ? আয় আয়—

মতি গলায় আঁচল দিয়ে দূর থেকে প্রণাম করে বললে—গড় করি দিদি-ঠাকরুণ।

—কি রকম আছিস ? এ রকম বিচ্ছিরি রোগা কেন ?

—ভালো না দিদি-ঠাকরুণ। না খেয়ে খেয়ে এমনি দশা।

—তোদের ওখানেও মন্বন্তর ?

—বল্লেন কি দিদি-ঠাকরুণ, অত বড় মুচিপাড়ার মধ্যে লোক নেই। সব পালিয়েচে।

—কোথায় ?

—যে দিকি দু' চোক যায়। দিদি-ঠাকরুণ, সাতদিন ভাত খাই নি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর গেঁড়ি-গুগলি। তাও এদানি মেলে না। ভাতছালার সেই বিলির জল ঘোল-দই। শুধু ছাখো মুচিপাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে-ছেলে বৌ-ঝি সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাচ আর গেঁড়ি-গুগলি ধরচে। সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। আর আধ পোয়া মাছও হয় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ডাঙায় বসে কাঁদছে। ওদের মা কাঁচা গেঁড়ি-গুগলি তুলে ওদের মুখে দিয়ে কান্না থামিয়ে এসে আবার জলে নেমেচে। কত মরে গেল ওই সব খেয়ে।

নেত্যু বুনোর ছোট মেয়েটা তো ধড়ফড় করে মরে গেল পেটের অসুখে।

—বলিস কি মতি?

—আর বলবো কি। অত বড় মুচিপাড়া ভেঙে গিয়েচে দিদি-ঠাকরুণ।

—কেন?

—কে কোথায় চলে গেল! না খেয়ে কদিন থাকা যায় বলুন? যার চোক যেদিকে যায় বেরিয়ে পড়েচে। আমার ভাই দুটো, অমন জোয়ান ভাইপো দুটো না খেয়ে খেয়ে এমনি থ্যাংরা কাটি—তারপর কোন দিকি যে তারা চলে গেল তা জানি নে। আহা, অমন জোয়ান দুই ভাইপো!—আর এই ছাখো আমার শরীল—

হাত দুটো বের করে দেখিয়ে মতি মুচিনী হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

অনঙ্গ-বৌ তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললে—কাঁদিস নি মতি। জল খা, একটু গুড় দি। ভাত দেবো। ক'দিন খাস নি?

মতি দু'হাতের আঙুল ফাঁক করে বলল—সাত দিন।

শেষ পর্য্যন্ত মতি মুচিনীর অবস্থা অনঙ্গ-বৌয়ের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলে।

না খেয়েও তাহলে মানুষ কষ্ট পায়, নয় তো ভাতছালার অতগুলো মুচির অবস্থা আজ এরকম হোল কি করে?

এই অসময়ে আবার একদিন এসে পড়লো কামদেবপুরের দুর্গা পণ্ডিত।

সেদিন অনঙ্গ-বৌ দুটো সুষনি শাক তুলে এনেচে নোনাতলার জোল থেকে, সে যেন এক পরম প্রাপ্তি। খুব বেলা গেলে কাপালীদের ছোট-বৌ সেদিন ডাকলে—ও বামুন-দিদি, চলো এক জায়গায়—

—কোথায় রে ছুটকি?

—নোনাতলার জোলে—

—কেন রে, এত বেলা গেলে নোনাতলার জোলে? তোর নাগর বুঝি লুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করবে?

—আ মরণ বামুন-দিদির। সোয়ামী আছে না আমার? অমন বুঝি বলতি আছে সোয়ামী যাদের আছে তাদের? তোমরা রূপসী-বৌ, তোমাদের নাগর থাকুক, আমার দিকি কে তাকাবে তোমরা থাকতি? তা না গো—সুষনি শাক হয়েচে অনেক, লুকিয়ে তুলে আনি চলো। কেউ এখনো টের পায় নি। টের পেলে আর থাকবে না।

নোনাতলার জোল গ্রামের পেছন দিকের বাঁশবন আমতলার পেছনে ঘন ঝোপে ঘেরা জায়গা। বর্ষাকালে নিচু জায়গাতে জল বাধে—এখন জল নেই—শরতের শেষে জলাশয় শুকিয়ে উঠচে। ভিজে মাটির ওপর নতুন সুষনি শাক এক রাশ গজিয়েচে দেখে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে হাসি ধরে না। বললে—এ যে ভাই অনেক।

কাপালী-বৌ হাসতে হাসতে বললে—একেই বলে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো!

—তা হোক, কারো চুরি তো করচি নে।

—ভগমানের জিনিস হয়ে আছে, তুলে খাও। এখনো কেউ টের পাই নি তাই রক্ষে। নইলে ভেসে যেতো সব এতদিন।

অনঙ্গ-বৌ আবার ভীতু মেয়ে, একটা শেয়াল ঝোপের দিকে খসখস করতেই চমকে উঠে বলে উঠলো—কি রে কাপালী-বৌ, বাঘ না তো?

—বাঘ না তোমার মুণ্ডু বামুন-দিদি। দ্যাখো না চেয়ে -

—তুই কি করে এ বনলা জায়গায় শাকের সন্ধান পেলি? সত্যি কথা বল্‌ ছুট্‌কি—

অনঙ্গ-বৌ কাপালীদের ছোট-বউয়ের স্বভাবচরিত্রের কথা কিছু কিছু না জানতো এমন নয়। গোড়া থেকেই ওর মনে সন্দেহ না হয়েছিল এমন নয়।

কাপালী-বৌ হাসতে হাসতে বললে—দূর—

—আবার ঢাকছিস? এখানে তুই কি করে এলি রে? কখন এলি? এখানে মানুষ আসে?

—এ্যালাম।

—কেন এলি?

কাপালী-বৌয়ের মুখ সলজ্জ হয়ে উঠলো। বললে—এমনি।

—মিথ্যে কথা। এমনি নয়। বলি হ্যাঁরে ছুট্‌কি, তোর ও স্বভাব গেল না? ভারি খারাপ ওসব, জানিস? স্বামীকে ঠকিয়ে ওসব এখনো করতে তোর মন সরে? ছিঃ—

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল। অন্য কেউ এমন কথা বললে সে রেগে ঝগড়া-ঝাঁটি করতো, কিন্তু অনঙ্গ-বৌয়ের মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে কারো সাধ্য হয় না তার মুখের ওপর কথা কইতে। বিশেষ করে যখন সে একটা এমন ধরনের ব্যাপারের প্রতিবাদ করচে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—না সত্যি ছুট্‌কি, তুই রাগ করিস নে। আমি ঠিক কথা তোরে বলচি—

কাপালী-বৌ ঝাঁকি মেরে মুখ ওপরের দিকে ফুটন্ত ফুলের মত তুলে বললে—আমি কি আসতে চাই? আমাকে ছাড়ে না যে—

—কে?

—নাম নাই বললাম বউ-দিদি?

—বেশ যাক্ সে। না ছাডলেই তুই অমনি আসবি?

—আমারে চাল যোগাড় করে এনে দেয়। সত্যি, বউ-দিদি তুমি সতী নক্ষি ভাগ্যিমানি —মিথ্যে বলবো না তোমার কাছে, বামুন দেবতা। সেদিন আমি না খেয়ে উপোস করে আর পারি নে। খিদে সহ্যি করতে পারি নে ছেলেবেলা থেকি। বাপ মা থাকতি, সকাল সকাল এক পাথর পান্ত ভাত দুটো কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে বেড়ে দিত। খেতাম পেট ভরে।

তার পর বল্—

—সেদিন উপোস করে আছি সারাদিন, ও এসে বললে—

এই পর্য্যন্ত বলে কাপালী-বৌ লজ্জায় মুখ নিচু করে বলল—না, সে কথা আর—

—কি বললে ?

—চাল দেবো আধ কাঠা।

—তাইতে তুই—

এই পর্য্যন্ত বলেই অনঙ্গ-বৌ চুপ করে গেল। ওর কাছে এসে ওর হাত ধরে গম্ভীর স্বরে বললে—ছুট্‌কি ?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল।

—তুই আমার কাছে গেলি নে কেন ?

—তুমি সেদিনও আমার সঙ্গে শাক তুলে নিয়ে গেছলে। তোমার কাছে কিছু ছিল না সেদিন।

—যেদিন মতে মুচিনী এল ভাতছালা থেকে ?

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখ ছলছল করে এল। সে আর কিছু না বলে কাপালী-বৌয়ের ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

দুর্গা পণ্ডিত এসে আড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল ওদের দাওয়ায়। বাড়ীতে কেউ ছিল না, গঙ্গাচরণ পাঠশালায়, ছেলেরা কোথায় বেরিয়েছিল। অনঙ্গ-বৌ শাক তুলে বাড়ী ফিরে এসে দেখে প্রমাদ গনলো। আজই দিন বুঝে! শুধু এই শাক ভরসা, দুটো কটা মোটা নাগরা চাল কোথা থেকে উনি ওবেলা এনেছিলেন, তাতে একজনেরও পেট ভরবে না।

দুর্গা পণ্ডিত বললেন—এসো মা। তোমার বাড়ী এলাম।

—বসুন, বসুন।

—তোমাদের সব ভালো।

—এক রকম ওই।

আধঘণ্টা পরে দুর্গা পণ্ডিত হাত পা ধুয়ে সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে অনঙ্গ-বৌয়ের কাছে তাঁর দুঃখের বিবরণ দিতে বসলেন। যেন অনঙ্গ-বৌ তাঁর বহুদিনের আপনার জন।

অনঙ্গ বললে—তিন দিন খান নি ? বলেন কি ?

—আমি তো নয়, বাড়ীসুদ্ধ কেউ নয় মা। বলি না খাওয়ার কষ্ট আর সহ্যি হয় না, আমার মায়ের কাছে যাই।

—তা এলেন ভালই করেছেন।

অনঙ্গ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো আপাতোক বুড়োকে কি দিয়ে একটু জল দেওয়া যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল পুরোনো দুটো চা পড়ে আছে হাঁড়ির মধ্যে পুঁটুলিতে। বললে—একটু চা করে দেবো ?

দুর্গা পণ্ডিত খুশির সঙ্গে বলে উঠলো—আহা, তা হোলে তো খুবই ভালো হোল। কতদিন চা পেটে পড়ে নি।

অনঙ্গ-বৌ চিন্তিত মুখে বললে—কিন্তু নুন-চা খেতে হবে। দুধ নেই।

—তাই দাও মা। লবণ-চা আমি বড্ড ভালবাসি।

শুধু এক বাটি নুন-চা। তা ছাড়া অনঙ্গ-বৌয়ের কিছু দেবার উপায়ও ছিল কি?

রাত্রে গঙ্গাচরণ এসে দুর্গা পণ্ডিতকে দেখে মনে মনে ভারি চটে গেল। স্ত্রীকে বললে—জুটেচে ওটা আবার এসে?

অনঙ্গ-বৌ রাগের সুরে বললে—জুটেচে। তা কি হবে এখন?

—চলে যেতে বলতে পারলে না? কি খেতে দেবে শুনি?

—তুমি আমি দেবার মালিক? যিনি দেবার তিনিই দেবেন।

—হাঁ তিনি তো দিলেন দুবেলা। তাহোলে ওকেও তো তিনি দিলেই পারতেন। তোমার কন্ধে নিয়ে এসে চাপালেন কেন?

—ছিঃ, অমন বলতে নেই তাঁর নামে। তিনি ঠিক জোটাবেন। এখানে যে পাঠিয়েচেন, এও তাঁর কাজ। যোগাবেন তিনি।

—বেশ, যোগান তবে। দেখি বসে বসে।

—নাও, হাত-পা ধুয়ে—এখন নুন-চা খাবে একটু?

দুর্গা পণ্ডিত বেশ শেকড় গেড়ে বসে গেল সেদিন থেকে, মনে হোল গঙ্গাচরণের। মনে মনে বিরক্ত হলেও গঙ্গাচরণ মুখে কিছু বলতে পারে না। দেখতে দেখতে তিন দিন দিব্যি কাটিয়ে দিলে। অনঙ্গ-বৌয়ের আশ্রিত জীব, কোথা থেকে এনে যে ওকে অনঙ্গ-বৌ খাওয়ায়, কেউ বলতে পারে না।

সেদিন দুর্গা পণ্ডিতকে বসে সামনের বেড়া বাঁধতে দেখে গঙ্গাচরণ বিরক্ত হয়ে বললে—ও কাজ করতে আপনাকে কে বলেচে?

দুর্গা পণ্ডিত থতমত খেয়ে বললে—বসে বসে থাকি, বেড়াটা বাঁধি ভাবলাম।

—না. ও রাখুন। ও আপনাকে করতে হবে না। হাবু বাঁধবে এখন।

—ও ছেলেমানুষ, ও কি পারবে?

—খুব ভাল পারে। আপনার হাতে এখুনি দায়ের কোপ লেগে যাবে। এখন ও রাখুন।

দুর্গা পণ্ডিত একটু কুণ্ঠিত হয়েই থাকে। সংসারের এটা-ওটা করবার চেষ্টা করে, তাতে গঙ্গাচরণ আরও চটে যায়। এর মতলবখানা কি, তাহলে এখানেই থেকে যেতে চায় নাকি? অনঙ্গ-বৌ দিব্যি ওকে চা খাওয়াচ্চে, খাবারও যে না খাওয়াচ্চে এমন নয়। স্ত্রীকে কিছু বলতেও সাহস করে না গঙ্গাচরণ।

চালের অবস্থা ভীষণ। এর ওর মুখে শুধু শোনা যাচ্চে চাল কোথাও নেই। একদিন সাধু কাপালী সন্ধান দিলে, কুলেখালিতে এক গোয়ালা-বাড়ীতে কিছু চাল বিক্রি আছে। কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হোল না। তবুও গরজ বড় বালাই, সাধু কাপালী ও সে দুজনে সাত ক্রোশ হেঁটে কুলেখালি গ্রামে উপস্থিত হোল। এদিকে রেল-টেল নেই, বড় বাজার

গন্ধ নেই—চাল থাকতেও পারে এ বিশ্বাস হোল গঙ্গাচরণের!

খুঁজে খুঁজে সেই গোয়ালা-বাড়ী বারও হোল। ব্রাহ্মণ দেখে গৃহস্বামী ওকে যত্ন করে বসালে, তামাক সেজে নিয়ে এল।

গঙ্গাচরণ বললে—জায়গাটা তোমাদের বেশ।

আসল কথা কিছু বলতে সাহস করচে না, বুক ঢিপ ঢিপ করচে! কি বলে বসে কি জানি! চাল না পেলে উপোস শুরু হবে, সবসুদ্ধু।

গৃহস্বামী বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ম্যালেরিয়া খুব।

—সে সর্ব্বত্র।

—আপনাদের ওখানেও আছে? নতুন গাঁয়ে বাড়ী আপনার? সে তো নদীর ধারে।

—তা আছে বটে, তবু ম্যালেরিয়াও আছে।

—এদিকে যাচ্ছিলেন কোথায়?

—তোমার এখানেই আসা।

—আমার এখানেই? সে আমার ভাগ্যি। ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়লো।। তা কি মনে করে?

—ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো?

—সে কি কথা বাবাঠাকুর। আমাদের কাছে ও কথা বলতে নেই! বলুন কি জন্যে আসা?

—তোমার বাড়ী চাল আছে সন্ধান পেয়ে এসেচি। দিতেই হবে কিছু। না খেয়ে মরচি একেবারে।

গৃহস্বামী কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে বললে—আপনাকে বলেচে কে?

—আমাদের গ্রামেই শুনেচি।

—বাবাঠাকুর, চাল আমার আছে, মিথ্যে কথা বলবো না। আপনি দেবতা। কিন্তু সে চাল বিক্রি করবার নয়।

—কত আছে বলবে—

—তিন মণ। লুকিয়ে রেখেছিলাম, যেদিন গবর্ণমেন্টের লোক আসে কার ঘরে কত চাল আছে দেখতে, সেদিন মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছিলাম বলে চালগুলো একটু গুমো গন্ধ হয়ে গিয়েচে। ধান নেই, শুধু ওই চাল কটা সম্বল। ও বিক্রি করলি—আমরা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, রাগ করবেন না, অভিসম্পাত দেবেন না বাবাঠাকুর। দিতি পারলি দিতাম। ওই কটা চাল ছাড়া আমার আর কোনো সম্বল নেই। ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে বলচি।

চাল পাওয়া গেল না। ফিরে আসবার পথে গঙ্গাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে। সাধু কাপালীও সঙ্গে ছিল ওর। ক্রোশ দুই এসে ওদের বড় খিদে ও জলতেষ্টা পেলো। সাধু বললে—পণ্ডিত মশাই, আর তো হাঁটা যায় না।

—তাই তো দেখছি। কাছে কি গাঁ?

—চলুন যাই, বামুনডাঙা-শেরপুর সামনে, তার পরে ঝিকরহাটি।

বামুনডাঙা-শেরপুর গ্রামে ঢুকেই ওরা একটা বড় আটচালা ঘর দেখতে পেলে। সাধু কাপালী বললে—চলুন এখানে। ওরা একটু জল তো দেবে।

গৃহস্বামী জাতিতে সদগোপ, ওদের যত্ন করে বসালে; গাছ থেকে ডাব পেড়ে খেতে দিলে। তারপর একটা বাটিতে খানিকটা আখের গুড় নিয়ে এল, জল নিয়ে এল। বললে—এবেলা এখানে দুটো রসুই করে খেয়ে যেতে হবে।

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য্য হয়ে বললে—রসুই ?

—হঁ্যা বাবাঠাকুর। তবে চাল নেই।

গঙ্গাচরণ আরও আশ্চর্য্য হয়ে বললে—তবে ?

—বাবাঠাকুর চাল তো অনেকদিনই নেই গাঁয়ে। দিন দশেক থেকে কেউ ভাতের মুখ দেখেনি এখানে।

—তবে কি রসুই করবো ?

—বাবাঠাকুর বলতে লজ্জা করে, কলাই-সেদ্ধ খেয়ে সব দিন-গুজরান করচে। বড়-ছোট সবাই। আপনাকেও তাই দেবো। আর লাউ-ডাঁটা চচ্চড়ি। ভাতের বদলে আজকাল সবাই ওই খাচ্ছি এ গাঁয়ে।

সাধু কাপালী তাতেই রাজী। সে বেচারী দুদিন ভাত খায় নি—ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণ বললে—বাপু যা আছে বের করে দাও।

সেদ্ধ কলাই নুন আর লঙ্কা, তার সঙ্গে বেগুনপোড়া। সাধু কাপালী খেয়ে উঠে বললে—উঃ, এতও অদেষ্টে ছিল পণ্ডিত মশাই।

গঙ্গাচরণ বললে—একটা হদিস পাওয়া গেল, এ জানতাম না সত্যি বলছি। কিন্তু এ খেয়ে পেটে সইবে কদিন তাই ভাবচি। সন্ধ্যার দিকে শুধু হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরলো, কেবল সাধু কাপালী গোটাকতক বেগুন নিয়েচে। সাধু গরীব লোক নয়, তরি-তরকারি বেচে সে হাটে হাটে তিন-চার টাকা উপার্জ্জন করে, কিন্তু টাকা দিয়েও চাল মিলচে কোথায় ?

দুর্গা, অনঙ্গ-বৌ ও ছেলেদের কারো খাওয়া হয় নি। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলে গঙ্গাচরণ। ও নিজে তবুও যা হোক দুটো কলাই সেদ্ধও খেয়েছে। অনঙ্গ-বৌ স্বামীকে খালি হাতে ফিরতে দেখে চালের কথা কিছু জিজ্ঞেসই করলে না। গঙ্গাচরণ হাত-পা ধুয়ে বসলে চা করেও নিয়ে এল। দুর্গা নিজেও নাকি আজ চালের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। কোথাও সন্ধান মেলে নি। অনঙ্গ-বৌ ওকে বললে—খাবে এখন ? গঙ্গাচরণ কৌতূহলের সঙ্গে খাবার জায়গায় গিয়ে দেখলে থালের একপাশে শুধু তরকারী, ভাত নেই—খানিকটা বেশি করে মিষ্টি কুমড়ো সেদ্ধ, একটু আখের গুড়। স্ত্রী যেন অন্নপূর্ণা, এও তো কোথা থেকে জোটাতে হয়েচে ওরই !

গঙ্গাচরণ কিছু ঠিক করতে পারে না ভেবে ভেবে। রোজ রোজ এই খেয়ে মানুষ কি বাঁচে !

স্ত্রীকে বললে—আর এক খাবার দেখে এলুম বামুনডাঙা-শেরপুরে। সেখানে সবাই কলাই সেদ্ধ খাচ্চে।—খাবে এক দিন ?

অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে চেয়ে ওর মনে হোল এই কদিনে ও রোগা হয়ে পড়েচে। বোধ হয় পেট পুরে খেতে পায় না নিজে, আর ওই বুড়োটা এসে এই সময় স্কন্ধে চেপে আছে। বুড়োকে খাওয়াতে গিয়ে ওর নিজের পেটে কিছু যাচ্চে না হয় তো। নাঃ, এমন বিপদেও পড়া গিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে কে বলে উঠলো—ও বামুন-দিদি—

অনঙ্গ-বৌ বাইরে এসে দেখলে ভাতছালার মতি-মুচিনী উঠোনে দাঁড়িয়ে। শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে উলি-ঢুলি ছেঁড়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ চুল বাতাসে উড়চে।

ওকে দেখে মতি হাসতে গেল। কিন্তু শীর্ণ মুখের সব দাঁতগুলো বেরিয়ে হাসির মাধুর্য্য গেল নষ্ট হয়ে। সর্ব্বপ্রথমে অনঙ্গ-বৌ প্রশ্ন করলে—কে মতি! খাস নি কিছু ? আয়—বোস।

তারপর দু'মিনিটের মধ্যে দেখা গেল টেমি জ্বেলে উঠোনে একখানা কলার পাত পেতে মতিকে বসিয়ে দিয়ে অনঙ্গ-বৌ ওকে খেতে দিয়েচে, সেই মিঠে কুমড়ো সেদ্ধ আর লাউশাক চচ্চড়ি। মতি বললে—দুটো ভাত নেই বামুন-দিদি ? অনঙ্গ-বৌ দুঃখিত হোল।

মতি মুচিনীর মুখে নিরাশার চিহ্ন। ভাত দিতে পারলে না ওর পাতে অনঙ্গ-বৌ। একদানা চাল নেই ঘরে আজ কদিন। এই সব খেয়ে চলচে সবারই। তাও যে মেলে না। লাউশাক আর কুমড়ো কত কষ্টে যোগাড় করা।

অনঙ্গ-বৌ আদর করে বললে—আর কি নিবি মতি ?

মতি হেসে বললে—মাছ দ্যাও, মুগির ডাল দ্যাও, বড়ি-চচ্চড়ি দ্যাও—

—দেবো, তুই খা খা—হ্যাঁরে ভাত পাস্ নি কদিন রে ?

মতি চোখ নিচু করে কলার পাতার দিকে চেয়ে বললে—পনেরো-ষোল দিন আজ শুদ্ধ কচু সেদ্ধ আর পুঁইশাক সেদ্ধ খেয়ে আছি। আর পারি নে বামুন-দিদি। তাই জোটাতে পাচ্ছি নে। ভাবলাম আর তো মরেই যাবো, মরবার আগে বামুন-দিদির বাড়ীতে দুটো ভাত খেয়ে আসি।

অনঙ্গ-বৌ চোখের জল মুছে দৃপ্ত কণ্ঠে বললে—মতি, তুই থাক আজ। ভাত তোকে আমি কাল খাওয়াবোই। যেমন করে পারি।

মতি মুচিনীকে দুদিন অন্তর যাহোক দুটি ভাত দেয় অনঙ্গ-বৌ।

কোথা থেকে সে ভাত যোগাড় হয়, তা তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে না। দুর্গা বুড়ো বাড়ী গিয়েচে কামদেবপুরে, কিন্তু গঙ্গাচরণের দৃঢ়বিশ্বাস, ও ঠিক আবার এসে জুটবে। এ

বাজারে এমন নির্ভাবনায় আহার জুটবে কোথা থেকে ?

সেদিন মতি দুপুরে এসে হাজির। ওর পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়, মাথায় তেল নেই। অনঙ্গ-বৌ ওকে বললে—মতি তেল দিচ্চি, একটা ডুব দিয়ে আয় দিকি !

—পেট জ্বলচে বামুন-দিদি। কাল ভাত জোটে নি, নেয়ে এলেই পেটে আগুন জ্বলে উঠবে।

—তুই যা, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

মতি মুচিনী নির্ব্বোধ মেয়ে নয়, সে চুপ করে থেকে বললে—না, তোমাদের এখানে আর খাবো না।

—কেন রে ?

—তুমি পাবে কোথায় বামুন-দিদি যে রোজ রোজ দেবে ?

—সে ভাবনা তোর নয়, আমার। তুই যা দিকি, নেয়ে আয়—

মতি মুচিনী স্নান সেরে এল। একটা কলার পাতে আধপোয়াটাক কলাইসিদ্ধ ও কিসের চচ্চড়ি। অনঙ্গ-বৌ ধরা গলায় বললে—ওই খা মতি।

মতি অবাক হয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে বললে—তোমাদেরও এই শুরু হোয়েচে ?

—তা হয়েচে।

—চাল পেলে না ?

—পঞ্চান্ন টাকা মণ। দাম দিলে এখুনি মেলে হয়তো।

—কিন্তু এ তোমরা খেয়ো না বামুন-দিদি।

—কেন রে ?

—একি তোমাদের পেটে সহ্যি হয় ? আমাদের তাই সহ্যি হয় না।

—তুই খা খা—এত বক্তিমে দিতে হবে না তোকে।

বিকেলে মতি এসে বললে—বামুন-দিদি, এক জায়গায় মেটে আলু আর বুনো শোলা কচু হয়েচে জঙ্গলের মধ্যে। একটা সাবলটাবল দ্যাও, কেউ এখনো টের পায় নি, তুলে আনি।

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুই একলা পারবি আলু তুলতে ?

—কেন পারবো না ? দ্যাও একখানা শাবল—

—যাস নি, দুর্ব্বল শরীর, ভিরমি লেগে পড়ে যাবি। তুই আর আমি যাই—

এই সময় কাপালীদের ছোট-বৌ এসে জুটলো। বললে—কি পরামর্শ হচ্চে তোমাদের গা ? অতএব ছোট-বৌকেও ওদের সঙ্গে নিতে হোল।

গ্রামের উত্তর মাঠের নিচেই সবাইপুরের বাঁওড়। বাঁওড়ের ধারে খুব জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে একটা শিমুলগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ষাঁড়াগাছের দুর্ভেদ্য ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

ওরা এগিয়ে গিয়েচে অনেকখানি। কিন্তু অনঙ্গ-বৌ আর কাপড় ছাড়াতে পারে না কি বিশ্রী কাঁটা।

মতি মুচিনী বিরক্ত হয়ে বললে—তখুনি বললাম তুমি এসো না। এখানে আসা কি তোমার কাজ? কক্ষনো কি এসব অভ্যেস আছে তোমার? সরো দেখি—

মতি এসে কাঁটা ছাড়িয়ে দিলে।

অনঙ্গ-বৌ রাগ করে বললে—ছুঁলি তো এই সন্দেবেলা?

মতি হেসে বললে—নেয়ে মরো এখন বামুন-দিদি।

—যা যা, আর মজা দেখতে হবে না তোমার—ঢের হয়েচে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। মস্ত বড় মেটে আলু লতার গোড়া খুঁড়ে সের পাঁচ-ছয় ওজনের বড় আলুটা তুলতে ওরা সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেচে। মতি মুচিনী মাটি মেখে ভূত হয়েচে, কাপালী-বৌ লতার জঙ্গল টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাত লাল করে ফেলেচে, অনঙ্গ-বৌ একটু আনাড়ির মত আলুর একদিক ধরে বৃথা টানাটানি করচে গর্ত্ত থেকে সেটাকে তুলবার প্রচেষ্টায়।

কাপালী-বৌ হেসে বললে—রাখো, রাখো বামুন-দিদি, ও তোমার কাজ নয়। দাঁড়াও একপাশে—

বলে সে এসে দু'হাত দিয়ে টানতেই আলুটা গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এল।

অনঙ্গ-বৌ অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে—আমি পারলাম না—বাবাঃ—

—কোথা থেকে পারবে বামুন-দিদি—নরম রাঙা হাতের কাজ নয় ওসব।

—তুই যা—তোকে আর ব্যাখ্যান কত্তে হবে না মুখপুড়ী—

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো। সেই ঘন ঝোপের দূর প্রান্তে একজন দাড়িওয়ালা জোয়ান মত চেহারার লোকের আকস্মিক আবির্ভাব হোল। লোকটা সম্ভবতঃ মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে নদীতীরের ঝোপের মধ্যে নারীকণ্ঠের হাসি ও কথাবার্ত্তা শুনতে পেয়ে এদিকে এসেচে। কিন্তু তার ধরনধারণ ও চলনের ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি দেখে সর্ব্বপ্রথমে অনঙ্গ-বৌয়ের মনে সন্দেহ জাগল। ভাল নয় এ লোকটার মতলব। ঝোপের মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়েকে দেখেও ও কেন এদিকেই এগিয়ে আসচে? যে ভদ্র হবে, সে এমন অদ্ভুত আচরণ কেন করবে?

মতি এগিয়ে এসে বললে—তুমি কে গা? এদিকি মেয়েছেলে রয়েচে—এদিকি কেন আসচো?

কাপালী-বৌও জনান্তিকে বললে—ওমা, এ ক্যান্ধারা লোক গা?

লোকটার নজর কিন্তু অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে, অন্য কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই। সে হন্ হন্ করে সোজা চলে আসচে অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে। অনঙ্গ-বৌ ওর কাণ্ড দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে মতির পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। তার বুক ঢিপ ঢিপ করচে—ছুটে যে একদিকে পালাবে এ তেমন জায়গাও নয়। তখনও লোকটা থামে নি।

মতি চেঁচিয়ে উঠে বললে—কেমন নোগ গা তুমি? ঠেলে আসচো যে ইদিকে বড়ো?

কাপালী-বৌ এসময়ে আরও পিছিয়ে গিয়েছে। কারণ কাছাকাছি এসে লোকটা ওর

দিকেও একবার কট্‌মট্‌ করে চেয়েচে—মুখে কিন্তু লোকটা কোন কথা বলে নি।

এদিকে অনঙ্গ-বৌয়ের মুশকিল হয়েচে, ছুটে পালাতে গিয়ে ওর চুল জড়িয়ে গিয়েচে শেয়াকুল কাঁটায় আর কুঁচ লতায়। বসন হয়ে গেছে বিস্রস্ত। ঘামে ও পরিশ্রমে মুখ হয়েছে রাঙা। লোকটা ওর দিকে যেন অগ্নিশিখার দিকে পতঙ্গের মত ছুটে আসচে—কাছে এসে যেমন খপ্‌ করে অনঙ্গ-বৌয়ের হাত ধরতে যাবে, মতি তাকে প্রাণপণ শক্তিতে মারলে এক ঠ্যালা। সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গ-বৌ বলে উঠলো—খবরদার! কাপালী-বৌ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

লোকটা ধাক্কা খেয়ে মেটে আলুর গর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেল।

ততক্ষণ মতি এসে অনঙ্গ-বৌকে কাঁটার বাঁধন থেকে মুক্ত করবার প্রাণপণে চেষ্টা করচে। তার তখন রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। সে চেঁচিয়ে বললে—তোল্‌ তো শাবলটা কাপালী-বৌ—মিনসের মুণ্ডুটা দিই গুঁড়ো করে ভেঙে—এত বড় আস্পদ্দা!

অনঙ্গ-বৌ ঝাঁড়াঝোপের নিবিড়তম অংশে ঢুকে গিয়েচে ততক্ষণ, ও ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপচে। কারণ ঝোপ থেকে বেরুবার পথ নেই বাইরে, সে সুঁড়ি পথটাতে ওর আর মতির যুদ্ধ চলছিল। লোকটা গর্ত্ত থেকে উঠবার চেষ্টা করচে, মতি কাপালী-বৌয়ের হাত থেকে শাবলটা নিচ্চে—এই পর্য্যন্ত অনঙ্গ-বৌ দেখতে পেলে। পালাবার পথ বন্ধ। অনঙ্গ-বৌ যেখানে ঢুকেচে সেখানে মানুষ আসতে হোলে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে চার হাত-পায়ে আসতে হবে। বিষম কুঁচ কাঁটার লতাজাল। মাথার ওপর শাবল হাতে মতি মুচিনী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে।

লোকটা নিজের অবস্থা বুঝলো। মতির হাত থেকে শাবল কেড়ে নেওয়া অত সহজ হবে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে সে সে-পথেই এক-পা দু-পা করে পিছু হঠতে লাগলো।

একেবারে ঝোপের প্রান্তসীমায় পৌঁছে লোকটা হঠাৎ পিছন ফিরে দিলে দৌড়। মতি মুচিনি বললে—বেরিয়ে এসো গো বামুনদিদি—পোড়ারমুখো মিন্‌সে ভয় পেয়ে ছুট দিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ তখনও কাঁপচে, তার ভয় তখনও যায় নি। কাপালী-বৌ ভয় পেলেও অনঙ্গ-বৌয়ের মত ভয় পায় নি বা তার অতটা ভয় পাওয়ার কারণও ঘটে নি। সে হেসে ফেললে।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসি আসচে কিসে পোড়ার মুখে?—চুপ, ছুঁড়ির রঙ্গ ছাখো না—

মতি মুচিনী বললে—ওই বোঝো।

সবাই মিলে এমন ভাবটা করলে যেন সব দোষটা ওরই।

কাপালী-বৌয়ের বয়স কম, সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে কৌতুকজনক বলে মনে না হলে সে হাসে নি—হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললে—ওঃ, মতি-দিদির সে শাবল তোলার ভঙ্গি দেখে আমার তো—হি-হি-হি—

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসে!

—নাও, নাও বামুন-দিদি, রাগ কোরো না—

—হয়েচে। এখন চলো এখান থেকে বেরিয়ে—বেলা নেই।

এতক্ষণ ওদের যেন সেদিকে দৃষ্টি ছিল না—এখন হঠাৎ ঝোপ থেকে উঁকি মেরে সবাই চেয়ে দেখলে সবাইপুরের বাঁওড়ের ওপারে নোনাতলা গ্রামের বাঁশবনের আড়ালে কতক্ষণ পূর্ব্বে সূর্য্য অস্ত গিয়েচে, ঘন ছায়া নেমে এসেচে বাঁওড়ের তীরে তীরে, বাঁওড়ের জলের কচুরিপানার দামের ওপর। আবার কি উৎপাত না জানি হয়, সন্ধ্যেবেলা। মাত্র তিনটি মেয়েছেলে তেপান্তর মাঠের মধ্যে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বাবাঃ—এখন বেরোও এখান থেকে।

মতি বললে—বা রে, মেটে আলুটা ?

—কি হবে তাই ?

—অত বড় মেটে আলুটা ফেলে যাবা ? কাল থাকবে ? এই মন্বন্তরের সময়ে ?

কথাটা সকলেরই প্রাণে লাগলো। থাকবে না মেটে আলু। আজকাল গ্রামের লোক সব যেন কেমন হয়ে উঠেছে। সন্ধান পাবেই।

কাপালী-বৌ বললে - তাই করো বামুন-দিদি। আলুটা নেওয়া যাক—নোক সব হন্যে হয়ে উঠেচে না খেতি পেয়ে। বুনো কচু আলু কিছু বাদ দিচ্চে না, সব্বদা খুঁজে বেড়াচ্চে বনে জঙ্গলে। ওই আলুটা তুললে আমাদের তিন বেলা খাওয়া হবে।

আবার সবাই মিলে আলুর পিছনে লাগলো এবং যখন সকলে মিলে গর্ত্ত হতে মেটে আলুটা বের করে উপরে তুলে ধুলো ঝাড়ছে তখন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার মাঠ-বন ঘিরে ফেলেছে। মতি মুচিনী নিজেই অত বড় ভারি আলুটা বয়ে নিয়ে চললো, মধ্যে অনঙ্গ-বৌ, পেছনে শাবল হাতে কাপালী-বৌ। ওরা সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে গ্রামের মধ্যে এসে ঢুকলো।

গ্রামে ঢুকবার আগে অনঙ্গ-বৌ বললে— এই ছুঁড়ি, আজকের কথা ওই সব যেন কাউকে বলিস নে—

কাপালী-বৌ ঘাড় নেড়ে বললে—নাঃ—

—বড্ড পেট-আল্‌গা তুই, পেটে কোনো কথা থাকে না -

—কেন, কবে আমি কাকে কি বলিচি ?

—সে হিসেব এখন বসে বসে দেবার সময় নেই—মোটের ওপর একথা কারো কাছে -

—কোন্ কথা ? মেটে আলুর কথা ?

—আবার ন্যাকামি হচ্চে ? ছাখ ছুট্‌কি, তুই কিন্তু দেখবি মজা আমার হাতে আজ। তুমি বুঝতে পারচো না কোন্ কথা ? নেকু !

কাপালী-বৌ আবার হি-হি করে হেসে ফেললে—কি কারণে কে জানে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এ পাগলকে নিয়ে আমি এখন কি করি ? তুই বলবি ঠিক—না ?

কাপালী-বৌ হাসি থামিয়ে আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললে—পাগল বামুন-দিদি ? তোমায়

নিয়ে যখন কথা, তখন জেনো, কাগ পক্ষিতেও একথা টের পাবে না। মাথার ওপর চন্দ্র-স্বৃয্যি নেই ?

বাড়ী এসে আলুর ভাগ নিয়ে চলে গেল যে যার ঘরে।

গঙ্গাচরণ বেরিয়েছিল চাল যোগাড়ের চেষ্টায়। কিন্তু ন হাটার হাটে ঘোর দাঙ্গা আর লুটপাট হয়ে গিয়েচে—চালের দোকানে। পুলিস এসে অনেক লোককে ধরে নিয়ে গিয়েচে। গঙ্গাচরণ বর্ণনা করে স্ত্রীর কাছে বসে সন্ধ্যার পরে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এখন উপায় ?

—উপবাস।

অনঙ্গ-বৌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলে সে উপোস করতে ভয় খায় না, উপোস কি করে নি এর মধ্যে ? কিন্তু এই যে উনি শুকনো মুখে এত দূর থেকে এসেছেন ফিরে, ওঁকে এখন সে কি খেতে দেবে এই মেটে আলু সিদ্ধ ছাড়া ? বাধ্য হয়ে দিতে হোল তাই। শুধু মেটে আলু সিদ্ধ। এক তাল মেটে আলু সিদ্ধ। সবাইকে তাই খেতে হোল। দুর্গা পণ্ডিত সম্প্রতি বাড়ী চলে গিয়েচে। তবুও আলু সেদ্ধ খানিকটা বাঁচবে। হাবু খেতে বসে বললে—এ মুখে ভাল লাগে না মা—

অনঙ্গ বললে—এ ছেলের চাল ছাখ না ? মুখে ভাল না লাগলে করচি কি ?

মতি মুচিনী খেতে এল না, কারণ সে ভাগের ভাগ আলু নিয়ে গিয়েচে, আলাদা করে আলু সেদ্ধ বা আলু পোড়া খেয়েচে।

পরদিনও আলু সেদ্ধ চললো। এ কি তাচ্ছিল্যের দ্রব্য ? কত বিপদের সম্মুখীন হয়ে তবে ওইটুকু আলু সংগ্রহ করে আনতে হয়েচে—ছেলের মুখে ভালো লাগে না তো সে কি করবে ?

রাত্রিতে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাগা, চাল না পাও, কিছু কলাই আজ আনো। আলু ফুরিয়েচে।

—তাই বা কোথা থেকে আনি ?

—পরমাণিকদের দোকানে নেই ?

—সব সাবাড়। গুদাম সাফ।

—কি উপায় ?

—কিছু নেই ঘরে ? আলুটা ?

—সে আর কতটুকু। কাল ফুরিয়েচে। তবুও তো এবার পণ্ডিত ঠাকুর নেই—মতি নেই—নিজেরাই খেয়েচি।

—কাল থেকে কি হবে তাই ভাবচি—

—চাল কোথাও নেই ?

—আছে। পঁয়ষট্টি টাকা মণ, নেবে ? পারবে নিতে ?

অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—আমার হাতের একগাছা রুলি আছে, তাই বেচে চাল নিয়ে এসো।

তিনদিন কেটে গেল।

চাল তো দূরের কথা কোন খাবারই মেলে না। কলাইয়ের মণ ষোল টাকা, তাও পাওয়া দুষ্কর।

কাপালী-বৌ না খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েচে, তার চেহারার আগের জলুস আর নেই। সন্ধ্যাবেলা পা টিপে টিপে অনঙ্গ-বৌয়ের কাছে এসে বললে—কি করচো বামুন-দিদি?

—বসে আছি ভাই, রান্না-বান্না তো নেই।

—সে তো কারো নেই!

—কি খেয়েছিস? সত্যি বলবি?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল।

অনঙ্গ-বৌ ঘরের মধ্যে গিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজলো। কিছুই পেলে না। তার ধারণা ছিল কাল রাত্রের আধখানা নারকোল বোধ হয় ঘরের কোথাও আছে, কিন্তু খিদের জ্বালায় ছেলেরা বোধ হয় কখন শেষ করে দিয়েচে, সে দেখেনি।

কাপালী-বৌ ওর দিকে চেয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। ওকে দেখে কষ্ট হয়।

একটু কাছে ঘেঁষে এসে বললে—আজ যাবো।

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়-স্বরে বললে—কোথায় যাবি?

—ইটখোলায়।

—কোন ইটখোলায়?

—দীঘির পারের বড় ইটখোলায়—জানো না? আহা!

কাপালী-বৌ যেন ব্যঙ্গের সুরে কথা শেষ করলে। অনঙ্গ-বৌ বললে—সেখানে কেন যাবি রে?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল নিচু-চোখে। অনঙ্গ-বৌ বললে—ছুটকি!

—বলো গে তুমি বামুন-দিদি। তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি এতদিন জবাব দিই নি। আর পারি নে না খেয়ে—না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি? আমি কোনো কথা শুনবো না—চলি বামুনদিদি, পাপ হয় নরকে পচে মরবো সেও ভালো—

অনঙ্গ কোনো কথা বলবার আগে কাপালী-বৌ ততক্ষণ হন হন্ করে চলেচে বেড়ার বাইরের পথে।

অনঙ্গ-বৌ পিছনে ডাক দিলে—ও বৌ শুনে যা, যাস নি,—শোন্ ও বৌ—

পুরোনো ইটখোলার এদিকে একটা বড় শিমুল গাছের তলায় অন্ধকারে কে একজন দাঁড়িয়ে। কাপালী-বৌ আনাড়ির মত অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পথ চলে সেখানে পৌছুলো।

দাঁড়িয়ে আছে পোড়া-যদু—বাল্যে সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল, এখনও সে দাগ মেলায় নি—তাই ওর ওই নাম গ্রামের মধ্যে। পোড়া-যদুও বলে আবার যদু-পোড়াও বলে। যদু ইটখোলায় কাঠ যোগান দেওয়ার ঠিকাদার। মোটা পয়সা রোজগার করে।

যদু-পোড়া ওকে দেখতে পেয়ে বললে—এই যে ইদিকি!

কাপালী-বৌ ভেংচি কেটে বললে—ইদিকি! দেখতি পেইচি। এ অন্ধকারে আর ও ভূতের রূপ চোখ মেলে দেখতি চাইনে! আঁতকে উঠবো।

যদু-পোড়া শ্লেষের সুরে বললে—তবু ভালো। তবুও যদি—

কাপালী-বৌ বাধা দিয়ে না থামিয়ে দিলে যদু-পোড়া একটা কি অশ্লীল কথার দিকে ঝুঁকে ছিল।

থামিয়ে দিয়ে নীরস রুক্ষস্বরে বললে—কই চাল?

—আছে রে আছে—

—না, দেখি আগে। কত কটি?

—আধ পালি। তাই কত কষ্টে যোগাড় করা। শুধু তোকে কথা দিইচি বলে।

—কে তোমার কাছে কথা পেড়েছিল আগে? আমার কাছে তুমি কখন কথা দিইছিলে? বাজে কথা কেন বলো। আমি দেরি করতে পারবো না—সন্দে হয়ে গিয়েচে—দেখি চাল আগে—তোমাকে আমার বিশ্বাস নেই—

যদু-পোড়া নিজের সততার প্রতি এ রূঢ় মন্তব্যে হঠাৎ বড় অবাক হয়ে উঠে কি একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কাপালী-বৌ আবার ধমক দিয়ে বলে উঠলো—আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু। সারারাত এ শিমুল তলায় তোমার মত শ্মশানের পোড়া কাঠের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতি হবে নাকি? চললাম আমি—

যদু-পোড়া ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললে—শোন্, শোন্ যাস নে—বাবাঃ, এ দেখচি ঘোড়ায় জিন দিয়ে—আচ্ছা আচ্ছা—এই ত্যাখ চাল—এই ধামাতে -এই যে—বাপ রে কি তেজ!

কাপালী-বউ সদর্পে বললে—চুপ—!

—আচ্ছা, আচ্ছা, কিছু বলচি নে—তাই বলচি যে—

কাপালী-বৌ আধঘণ্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুলো, আঁচলে আধ পালি চাল। পেছনে পেছনে আসছে যদু-পোড়া। অন্ধকার পথের দু'ধারে আশ-সেওড়া বনে জোনাকী জ্বলচে।

কাপালী-বৌ তিরস্কারের সুরে বললে—পেছনে পেছনে কোন্ যমের বাড়ী আসচো?

—তোকে একটু এগিয়ে দি—

—ঢের হয়েচে। ফিরে যাও—

—অন্ধকারে যাবি কি করে?

—তোমার সে দরদে কাজ নেই—চলে যাও—

—গাঁয়ের লোক এ পথে আসবে না, ভয় নেই—

— সে ভয় করি নে আমি। আমাকে সবাই চেনে—তুমি যাও চলে—

তবুও যদু-পোড়া পিছু পিছু আসচে দেখে কাপালী-বৌ হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঝাঁজের সুরে বললে—যাও বলচি—কেন আসচো ?

যদু-পোড়া আদরের সুরে বললে—তুমি অমন করচো কেন হ্যাগো ? বলি আমি কি পর ?

কাপালী-বৌ নীরস কণ্ঠে বললে—ওসব কথায় দরকার নেই। তোমাকে উপকার করতে কেউ বলচে না, যাও বলচি, নইলে এ চাল সব ওই খানায় ফেলে দেবো কিন্তু।

যদু-পোড়া এবার থমকে দাঁড়ালো। বললে—যাচ্চি, যাচ্চি—একটা কথা—

—কি কথা ?

—চাল আর কিছু আমি যোগাড় করচি—পরশু সন্দেবেলা আসিস।

—যাও তুমি—

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরের দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়ে আছে, গঙ্গাচরণ কোথায় বেরিয়েচে, এখনো ফেরে নি। আধ-অন্ধকারে কে একজন দাওয়ার ধারে খুঁটি ধরে এসে দাঁড়ালো, অনঙ্গ-বৌ চমকে বলে উঠলো—কে ?

পরে ভাল করে চেয়ে দেখে বললে—আ মরণ ! মুখে কথা নেই কেন ?

কাপালী-বৌ মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল করে হাসচে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি মনে করে ?

—একটু নুন দেবা ?

—দেবো। কোত্থেকে এলি ?

—এল্যাম।

—বোস না—

—বোসবো না। খিদে পাই নি ?

—খাবি কি ?

কাপালী-বৌ আঁচল দেখিয়ে বললে—এই যে।

—কি ওতে ?

—চাল—দেখতি পাচ্চ না ? নুন দ্যাও দিনি। খাই গিয়ে—

—কোথায় পেলি চাল ?

—বলবো কেন ? তুমি দুটো রাখো বামুন-দিদি।

অনঙ্গ-বৌ গম্ভীর সুরে বললে—ছুট্‌কি তোর বড় বাড় হয়েচে। যত বড় মুখ না তত বড় কথা—

—পায়ে পড়ি বামুন-দিদি ! নাও দুটো চাল তুমি— ,

—তোর মুখে আগুন দেবো—

—আচ্ছা বামুন-দিদি আমরা নরকে পচে মরবো ঠিকই। আমাদের কথা বাদ দাও

তুমি। তুমি সতীলক্ষ্মী, পায়ের ধুলো দিও—নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতি পাই—

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখে জল এল। সে কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

কাপালী বৌ বললে—নেবা দুটো চাল?

—না, তুই যা—

—তবে মর গিয়ে। আমিই খাই গিয়ে। কই নুন দ্যাও—

নুন নিয়ে চলে গেল কাপালী-বৌ। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, ও বামুন-দিদি, আজ তুমি কি খেয়েচ?

—ভাত।

—ছাই—সত্যি বলো।

—যা খাই তোর কি? যা তুই—

কাপালী-বৌ এগিয়ে এসে বললে—পায়ের ধুলো একটু দ্যাও—গঙ্গা নাওয়ার কাজ হয়ে যায়—

বলেই সে অনঙ্গ-বৌয়ের দুই পায়ের ধুলো দুই হাতে নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে গঙ্গাচরণ এসে পড়াতে সে ছুটে পালালো।

গঙ্গাচরণ বললে—ও কে গেল গা?

—ছোট-বৌ কাপালীদের।

—কি বলছিল?

—দেখা করতে এসেছিল। চাল পেলে?

—এক জায়গায় সন্ধান পেয়েচি। যাট টাকা মণ—ভাবচি কিছু বাসন বিক্রি করি।

—তাতে যাট টাকা হবে?

—কুড়ি টাকা তো হবে। তেরো সের চাল কিনে আনি—আর না খেয়ে তো পারা যায় না, সত্যি বলচি—

—তার চেয়ে আমার সোনা-বাঁধানো শাঁখাটা বিক্রি করে এস। বাসন থাক গে—

—তোমার হাতের শাঁখা নেবো?

—না নিলে অনাহারে মরতে হবে। যা ভালো বোঝো তাই করো।

পরদিন গঙ্গাচরণ শাঁখাজোড়া গ্রামের সর্ব্ব স্যাকরার দোকানে বিক্রি করলে। সর্ব্ব স্যাকরা বললে—এ জিনিস বিক্রি করবেন কেন?

—দরকার আছে—

কিন্তু চাল পাওয়ার যে এত বিপুল বাধা তা গঙ্গাচরণ জানতো না। শঙ্করপুরের নিবারণ ঘোষের বাড়ী চালের সন্ধান একজন দিয়েছিল। খুব ভোরে পরদিন উঠে সেখানে পৌঁছে দেখলে দশজন লোক সেখানে ধামা নিয়ে বসে। বাড়ীর মালিক তখনো ওঠে নি। নিবারণ দোর খুলে বাইরে আসতেই সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরলে। সে বললে—আমার চাল নেই—

গঙ্গাচরণ বললে—সে আমি জানি। তবুও তোমার মুখে শুনবো বলে এসেছিলাম—

গঙ্গাচরণ সেখানেই বসে পড়লো। চাল না নিয়ে ফিরবে কেমন করে। বাড়ীর সকলেই আজ দু'দিন থেকে ভাত খায় নি। ছেলেদের মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। অন্য কয়েকজন লোক যারা এসেছিল, তারা একে একে সবাই ফিরে গেল। নিবারণ ঘোষ বাইরের বাড়ী আর ভেতর বাড়ীর মধ্যেকার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কতক্ষণ পরে নিবারণ ঘোষ আবার বাইরে এল। গঙ্গাচরণকে বসে থাকতে দেখে বললে—বাবাঠাকুর কি মনে করে বসে? চাল? সে দিতে পারবো না। ঘরে চাল আছে, সে তোমার কাছে অস্বীকার করতে যাচ্চি নে—শেষে কি নরকে পচে মরবো? কিন্তু সে চাল বিক্রি করলি এরপর বাচ-কাচ না খেয়ে মরবে যে!

—কত চাল আছে?

—দু মণ।

—ঠিক?

—না ঠাকুরমশাই মিথ্যে বলবো না। আর কিছু বেশী আছে। কিন্তু সে হাতছাড়া করলি বাড়ীশুদ্ধ না খেয়ে মরবে। ট্যাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? ও জিনিস পয়সা দিলি মেলবে না।

গঙ্গাচরণ উঠবার উদ্যোগ করছে দেখে নিবারণ হাত জোড় করে বললে—একটা কথা বলি বাবাঠাকুর। ব্রাহ্মণ মানুষ, এত দূর এয়েচেন চালির তেষ্টায়। আমি চাল দিচ্চি, আপনি আমার বাড়ীতে দুটো রান্না করে খান। রসুই চড়িয়ে দিন গোয়ালঘরে। মাছ পুকুর থেকে ধরিয়ে দিচ্চি, মাছের ঝোল ভাত আর গরুর দুধ আছে ঘরে। এক পয়সা দিতি হবে না আপনার।

গঙ্গাচরণ বললে—না, তা কি করে হয়? বাড়ীতে কেউ খায় নি আজ দু'দিন। ছেলেপিলে রয়েছে, তা হয় না। তুমি আমাকে রান্নার জন্যে তো চাল দিতেই, আর দুটো বেশী করে দাও। আমি দাম দিয়ে নেবো। ষাট টাকা করেই মণ দেবো, কিছু বেশি না হয় নাও।

নিবারণ কিছুতেই রাজী হোল না। তার ওপর রাগ করা যায় না, প্রতি কথাতেই সে হাত জোড় করে, এখানে বসে খাওয়ার নিমন্ত্রণ তো করে রেখেচেই। গঙ্গাচরণ চলে আসছে, নিবারণ এসে পথের ওপরে আবার তাকে হাত জোড় করে রান্না করে খাওয়ার অনুরোধ জানালে।

গঙ্গাচরণ রাগ করে বললে—আমি কি তোমার বাড়ী খেতে এসেছি? যাও যাও—ওকথা বলো না।

কিন্তু গঙ্গাচরণের মনের মধ্যে আর সে জোর নেই। হঠাৎ তার মনের চক্ষে ভেসে উঠেছে, দিব্যি ছিঙের টোপা টোপা বড়ি ভাসচে মাছের ঝোলে, আল —
মাছ আধ-ভাসা অবস্থায় দেখা যাচ্চে বাটির ওপরে। ভাবো না।

কাঁচা ঝাল একটা বেশ করে মেখে···

নিবারণ বললে—আসুন, চলুন। আমার একথা আপনাকে রাখতেই হবে। সে শোনবো না আমি। দুপুর বেলায় না খেয়ে বাড়ী থেকে ফিরে যাবেন?

হাবু ভাত খায় নি আজ দু'দিন। অনঙ্গ-বৌ খায় নি দু'দিনেরও বেশি। ও যে কি খায়-না-খায় গঙ্গাচরণ তার খবর রাখে না। নিজে না খেয়েও সবাইকে জুগিয়ে বেড়ায়। তার খাওয়া কি এখানে উচিত হবে? গঙ্গাচরণ নিবারণকে বললে, আচ্ছা যদি খাই, তবে এক কাঠা চাল দেবে?

—না বাবাঠাকুর। মিথ্যে বলে কি হবে। চাল হাতছাড়া করবো না। আপনি একা এখানে বসে আধ কাঠা চাল রেঁধে খান তা দেবো।

—তোমার জেদ দেখছি কম নয়।

—এই আকালে এমনি করেছে। ভয় ঢুকে গিয়েছে যে সবারই।

—চাল আর জোগাড় করতে পারবে না?

—কোথা থেকে করবো বলুন! কোন মহাজনের ঘরে ধান নেই। বাজারে এক দানা চাল আসে না। আমাদের গেরামের পেছনে একটা বিল আছে জানেন তো? দাসপাড়ার বিল তার নাম। এখন এই তো বেলা হয়েছে, গিয়ে দেখুন সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়েমানুষ জুটেছে এতক্ষণ। জলে পাঁকের মধ্যি নেমে পদ্ম গাছের মূল তুলছে, গেঁড়ি-গুগলি তুলছে—জল-ঝাঁঝির পাতা পর্য্যন্ত বাদ দেয় না।

—বল কি?

—এই যাবার সময় দেখবেন সত্যি না মিথ্যে। যত বেলা হবে, তত লোক বাড়বে, বিলির জল লোকের পায়ে পায়ে ঘোল দই হয়ে যাবে কাদা ঘুলিয়ে। এক-একজন কাদামাখা পেত্নীর মত চেহারা হয়েছে—তবুও সেই কাদা জলে ডুব দিয়ে পদ্মের মূল, গেঁড়ি গুগলি এসব খুঁজে বেড়াচ্চে। চেহারা দেখলি ভয় হয়। তাও কি পাচ্চে বাবাঠাকুর? বিল তো আর অফুরন্ত নয়। যা ছিল, তিন দিনের মধ্যে প্রায় সাবাড় হয়ে গিয়েচে। এখন মনকে চোখ ঠারা।

—তবে যাচ্ছে কেন?

—আর তো কোথাও কিছু খাবার নেই। যদি তবুও বিলের মধ্যি খুঁজলি পাওয়া যায়। ভেবে দেখুন বাবাঠাকুর, আপনাকে যদি চাল বেচি, তবে একদিন আমার বাড়ীর ঝি-বউদের অমনি করে পাঁক মেখে বিলের জলে নামতে হবে দুটো গেঁড়ি-গুগলি ধরে খাবার জন্যি। চলুন, বাবাঠাকুর, আসুন দুটো খেয়ে যান। পেট ভর্ত্তি চাল দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ ফিরলো। মাছের ঝোল ভাত—গেঁড়ি-গুগলি সেদ্ধ নয়। এখনো এ গ্রামের এ দিনেও ভাত খেতে পাওয়া যাচ্চে। এর পরে আর পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

দেখলে দশজন লো৲কিয়ে পুঁছে দিলে নিবারণের বিধবা বড়মেয়ে ক্ষ্যান্তমণি। কাঠ নিয়ে দোর খুলে বাইরে আসতেই সবাই৲চরণ পুকুরের জলে স্নান করে আসতেই ক্ষ্যান্তমণি তসরের

কেটে কাপড় কুঁচিয়ে হাতে দিলে। রান্নার জন্যে কুটনো বাটনা সব ঠিক করে এনে দিলে। একবার হেসে বললে—দাদাঠাকুর, অতটা নুন? পুড়ে যাবে যে বেন্নন।

—দেবো না?

—বেন্নন মুখে দিতে পারবেন না। আপনার রসুই করবার অভ্যেস নেই বুঝি?

—না।

—আপনি বসে বসে রাঁধুন, আমি দেখিয়ে দিচ্চি।

ক্ষ্যান্তমণি যে বেশ ভাল মেয়ে, গঙ্গাচরণ অল্প সময়ের মধ্যেই তা বুঝতে পারলে। কোথা থেকে একটু আখের গুড় গাওয়া ঘি যোগাড় করে নিয়ে আসে। যাতে গঙ্গাচরণের খাওয়াটা ভাল হয়, সেদিকে খুব লক্ষ্য। খেতে বসে গঙ্গাচরণের কিন্তু ভাত যেন গলা দিয়ে নামে না—আশ্চর্য্যের কথা, হাবুর জন্যে দুঃখ নয়, পটলার জন্যেও নয়—দুঃখ হোল অনঙ্গ-বৌয়ের জন্যে। সে আজ দুদিন খায় নি। তার চেয়ে হয়তো আরও বেশি দিন খায় নি। মুখ ফুটে তো কোনো দিন কিছু বলে না।

—আর একটু আখের গুড় দি?

—না। এ দুধ তো খাঁটি, গুড় দিলে সোয়াদ নষ্ট হয়ে যাবে।

এমন ঘন দুধের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সে খাচ্চে এখানে, ওখানে অনঙ্গ-বৌ হয়তো উঠোনের কাঁটানটের শাকের বনে চুবড়ি নিয়ে ঘুরচে, অখাদ্য কাঁটানটে শাক তুলবার জন্যে। নইলে বেলা হোতে না হোতে পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে জুটবে। তাদের উৎপাতে গাছের পাতাটি থাকবার জো নেই।

ক্ষ্যান্তমণি পান আনতে গেল। পাতে দুটি ভাত পড়ে আছে—গঙ্গাচরণের প্রবল লোভ হোল ভাত দুটি সে বাড়ী নিয়ে যায়। কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে? চাদরের মুড়োয় বেঁধে? ছিঃ—সবাই টের পাবে। এঁটো ভাত ব্রাহ্মণ হয়ে চাদরের মুড়োয় বেঁধে নেবে?

গঙ্গাচরণ বসে বসে মতলব ভাঁজতে লাগলো। কি করা যাবে? বলা যাবে কি এই ধরনের যে, আমাদের বাড়ী একটা কুকুর আছে তার জন্যে ভাত কটা নিয়ে যাবো! তাতে কে কি মনে করবে? বড় লজ্জা করে যে। অনেকগুলো ভাত নয় বটে, তবুও চার-পাঁচ গ্রাস হবে অনঙ্গ-বৌয়ের। বড় বড় চার-পাঁচ গ্রাস। নিয়ে যাবেই সে। কিসের লজ্জা? এমন সময়ে ক্ষ্যান্তমণি এসে পান দিতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণের সাহস চলে গিয়ে রাজ্যের লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে জুটলো। দিব্যি সুন্দরী মেয়ে, যৌবন-পুষ্ট দেহটির দিকে বার বার চেয়ে দেখেও আশ মেটে না। কালো চুল মাথায় এতকাল, নাকের ডগায় একটা ছোট্ট তিল। মুখে দু-দশটা বসন্তের দাগ আছে বটে, তবুও ক্ষ্যান্তমণির সুশ্রী মুখ।

গঙ্গাচরণ বললে—ক্ষ্যান্ত, তোমার বসন্ত হয়েছিল?

—হ্যাঁ দাদাঠাকুর। আজ তিন বছর আগে।

—ডাবের জল দিয়ে মুখ ধুলে ও দাগ কটা আর থাকতো না।

—আপনিও যেমন দাদাঠাকুর। আর কি হবে মুখের চেহারা নিয়ে বলুন। সে দিন চলে গিয়েচে, কপাল যেদিন পুড়েচে, হাতের নোয়া ঘুচেছে। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভালোয় ভালোয় যেতে পারি।

তারপর চুপি চুপি বললে—আপনি ওই পুকুরের বাঁশঝাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকুন গিয়ে।

গঙ্গাচরণ সবিস্ময়ে বললে—কেন ?

—চুপ চুপ। বাবাকে লুকিয়ে দুটো চাল দিচ্চি আপনাকে। কাউকে বলবেন না। আধ পালিটাক চাল আমি আলাদা করে রেখে দিইচি আপনার রান্নার চাল আনবার সময়। নিয়ে যান চাল কটা। আপনার মন খারাপ হয়েচে বাড়ীর জন্যি, আমি তা বুঝতে পেরেচি।

মেয়েরাই লক্ষ্মী। মেয়েরাই অন্নপূর্ণা। বুভুক্ষু জীবের অন্ন ওরাই দু'হাতে বিলোয়। ক্ষ্যান্তমণিকে আঁচলের মুড়োতে লুকিয়ে চাল আনতে দেখে দূর থেকে গঙ্গাচরণের ওই কথাই মনে হোল। ক্ষ্যান্ত গঙ্গাচরণের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—হাতে করে দুটো চাল দেবো ব্রাহ্মণকে, এ কত ভাগ্যি! কিন্তু বাবাঠাকুর, যে আকাল পড়েচে, তাতে কাউকে কিছু দেবার জো নেই। সবই অদেষ্ট। লুকিয়ে নিয়ে যান—

—লুকিয়েই নিয়ে যাচ্ছি—

—না লুকিয়ে নিয়ে গেলি নোকে চেয়ে নেবে। না দিলি কান্নাকাটি করবে, এমন মুশকিল হয়েচে।···আমাদের গাঁয়ে তো দোর বন্ধ না করে দুপুরে খেতে বসবার জো নেই। সবাই এসে বলবে, ভাত দ্যাও। দেখে দুঃখুও হয়- কিন্তু কতজনকে ভাত দেবেন আপনি ? খ্যামতা যখন নেই, তখন দোর বন্ধ করে থাকাই ভালো। একটা কথা বলি—

—কি ?

—যদি কখনো এমন হয়, না খেয়ে থাকতি হয়, তবে আমার কাছে আসবেন, আমি যা পারি দেবো। আমার নিজের সোয়ামী-পুত্তুর নেই, দেবতা ব্রাহ্মণের সেবাও যদি না করলাম, তবে জীবনে করলাম কি বলুন!

বাড়ী ফিরবার পথে নসরাপুরের বিলের ধারে একটা দোকান। বেলা পড়ে এসেছে। দোকানীকে তামাক খেতে দেখে গঙ্গাচরণ দোকানে গিয়ে উঠে বললে—তামাক খাওয়াও দিকি একবার—

দোকানী বললে—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ।

—পেরণাম হই।

—জয়স্তু।

দোকানী উঠে গিয়ে একটা কলার পাতা নিয়ে এসে ঠোঙা করে কল্কে বসিয়ে গঙ্গাচরণের হাতে দিলে—বললে—আপনার নিবাস ?

—নতুন পাড়া, চর পোলতা।

—গিয়েছিলেন কোথায় ?

—নিবারণের বাড়ী, ও গাঁয়ের নিবারণ ঘোষ।

—বাবাঠাকুরের পুঁটুলিতে কি ? চাল ?

—হ্যাঁ বাপু।

—ঢেকে রাখুন। এসব দিকে বড্ড আকাল। এখুনি এসে ঘ্যান ঘ্যান করবে সবাই।

গঙ্গাচরণ বসে থাকতে তিন-চারটি দুলে বাগদি জাতীয় স্ত্রীলোক এসে আঁচলে বেঁধে কলাই নিয়ে গেল। একজন নিয়ে গেল অপকৃষ্ট পাতা চা ও একটা ছোট্ট পাথরবাটিতে একবাটি গুড়। দোকানী বললে—বসুন ঠাকুরমশায়—

—না বাপু, আমি যাবো অনেক দূর, উঠি।

—না, একটু চা খেয়ে যেতেই হবে। আর তো কিছু দেওয়ার নেই, বসুন—

—চা খাবো আবার—

—হ্যাঁ, একটুখানি খেয়ে যান দয়া করে।

—আরও পাঁচ-ছ'টি খদ্দের দোকানে এল গেল। সকলেই নিয়ে গেল কলাই। শুধু কলাই, আর কিছু নয়।

চা একটু পরে তৈরি হয়ে এল, একটা কাঁচের গ্লাসে করে দোকানী ওকে চা দিলে। গঙ্গাচরণ লক্ষ্য করলে দোকানের মধ্যে তাকে, মেজের ওপর, নানা জায়গায় পেতল কাঁসার বাসন থরে থরে সাজানো। বেশির ভাগ থালা আর বড় বড় জাম বাটি। গঙ্গাচরণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না, এরা কি কাঁসারি ? বাসন বিক্রির জন্যে কেন এত ?

দোকানী আবার তামাক সাজলে। গঙ্গাচরণের মনের কথা বুঝতে পেরে বললে—ও বাসন অত দেখচেন, ওসব বাঁধা দিয়ে গিয়েচে লোকে। এ গাঁয়ে বেশির ভাগ দুলে বাগদি আর মালো জাতের বাস। নগদ পয়সা দিতি পারে না, ওই সব বাসন বাঁধা দিয়ে তার বদলে কলাই নিয়ে যায়।

—সবাই কলাই খায় ?

—তা ছাড়া কি মিলবে ঠাকুরমশায়। ওই খাচ্ছে—

—তোমার চাল নেই ?

—না ঠাকুরমশায়।

—আমি দাম দেবো, সত্যি কথা বলো। নগদ দাম দেবো।

—না ঠাকুরমশায়। হাত জোড় করে বলচি ও অনুরোধ করবেন না।

—তোমরা কি খাও বাড়ীতে ?

—মিথ্যে কথা বলবো না, ভাত চার আনা, কলাই বারো আনা। ডাঁটা শাক হুটো করেলাম বাড়ীতে, তা সে রাখবার উপায় নেই। দিনমানেই ক্ষেতে লোকজন মেয়েছেলে, খোকাখুকীরা ঢুকে গোছা গোছা উপড়ে নিয়ে যাচ্চে। সাবাড় করে দিয়েচে সব। কিছু রেখে খাবার জো নেই। চালকুমড়ো ফলেছিল গোটাকতক এই দোকানের চালে, কে তুলে

নিয়ে গিয়েচে।

গঙ্গাচরণ তামাক খাওয়া সেরে ওঠবার যোগাড় করলে। দোকানী বললে—ঠাকুরমশায়, কলাই নেবেন ?

—দাও।

—নিয়ে যান সেরখানেক। এর দাম আপনাকে দিতে হবে না। আর একটা জিনিস—দাঁড়ান, গোটাকতক পেয়ারা দিই নিয়ে যান, আমার গাছের ভালো পেয়ারা—তাও আর কিছু নেই, সব পেড়ে নিয়ে গেল ওরা। আমি ডাঁসা দেখে দশ-বারোটা জোর করে কেড়ে নিয়ে রেখেছিলাম।

গঙ্গাচরণ বাড়ী পৌছে দেখলে অনঙ্গ-বৌ চুপ করে শুয়ে আছে। এমন সময়ে সে কখনো শুয়ে থাকে না।

—গঙ্গাচরণ জিজ্ঞেস করলে—শুয়ে কেন ? শরীর ভালো তো ? দেখি—

অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণাকাতর হয়ে বললে—কাউকে ডাকো।

—কাকে ডাকবো ?

—কাপালীদের বড়-বৌকে ডাকো চট করে। শরীর বড্ড খারাপ।

গঙ্গাচরণ বড় ছেলেকে বললে—দৌড়ে যা কাপালী-বাড়ী—বলগে এক্ষুণি আসতে হবে। মার শরীর খারাপ—

অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগলো, কখনো ওঠে কখনো বসে। যুপবদ্ধ আর্ত্ত পশুর মত চীৎকার। গঙ্গাচরণ নিরুপায় অবস্থায় বাইরের দাওয়ায় বসে তামাক টানতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে, আকাশে পঞ্চমী তিথির এক ফালি চাঁদও উঠেচে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে লেবু-ঝোপে। গঙ্গাচরণ আর সহ্য করতে পারচে না অনঙ্গ-বৌয়ের চীৎকার। ওর চোখে প্রায় জল এল। ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে আশপাশের বাড়ীর মেয়েছেলে এসে গিয়েচে।

ওদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সীকে ডেকে গঙ্গাচরণ উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ দিদিমা, বলি ও অমন করছে কেন ?

ঠিক সেই সময় একটা যেন মৃদু গোলমাল উঠলো। একটি শিশু কণ্ঠের ট্যাঁ-ট্যাঁ কান্না শোনা গেল। বার-কয়েক শাঁক বেজে উঠলো।

সতীশ কাপালীর মেয়ে বিন্দি বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এসে বললে—ও দাদাবাবু, বৌদিদির খোকা হয়েচে—এখন সন্দেশ বের করুন আমাদের জন্যে—দিন টাকা—

গঙ্গাচরণের চোখ বেয়ে এবার সত্যিই ঝর ঝর করে জল পড়লো।

তার পর দিনকতক সে কি কষ্ট ! প্রসূতিকে খাওয়ানোর কি কষ্ট। না একটু চিনি, না আটা, না মিছরি। অনঙ্গ-বৌ শুয়ে থাকে, নবজাত শিশু ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদে, গঙ্গাচরণ

কাপালীদের বড়-বৌকে বলে—ওর খিদে পেয়েছে, মুখে একটু মধু ছাও খুড়ী—

—মধু খেয়ে বমি করেছে ছুবার। মধু পেটে রাখছে না।

—তবে কি দেবে খুড়ী, ছুধ একটু জ্বাল দিয়ে দেবো?

—অত ছোট ছেলে কি গাইয়ের ছুধ খেতে পারে? আর ইদিকি আঁতুড়ে-পোয়াতি ঘরে, তার খাবার কোনো যোগাড় নেই। হিম হয়ে বসে থাকলে চলবে না বাবাঠাকুর, এর যোগাড় কর।

গ্রামে কোনো কিছু মেলে না, হাটেবাজারেও না। আটা স্থজি বা চিনি আনতে হোলে যেতে হবে মহকুমা শহরে সাপ্লাই অফিসারের কাছে। গঙ্গাচরণ ছু-একজনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলে, মহকুমা শহরেই যেতে হবে।

সাড়ে সাত ক্রোশ পথ।

সকালে রওনা হয়ে বেলা এগারোটার সময় সেখানে পৌছলো। এখানে দোকানে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গাচরণের হাতে পয়সা নেই, জলখাবারের জন্য মাত্র ছু' আনা রেখেছিল, কিন্তু খাবে কি, চিঁড়ে পাঁচসিকে সের, মুড়িও তাই। মুড়কি চোখে দেখবার জো নেই। ছু' আনার মুড়ি একটা ছোট্ট বাটিতে ধরে।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—ও দাদাঠাকুর, এ যে ভয়ানক কাণ্ড দেখছি! খাবা কি?

গঙ্গাচরণ ও ক্ষেত্র কাপালী সাপ্লাই অফিসারের আপিসে এসে দেখলে সেখানে রথযাত্রার ভিড়। আপিসঘরের জানলা দিয়ে পারমিট বিলি করা হচ্চে, লোকে জানলার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পারমিট নিচ্চে। সে ভিড়ের মধ্যে ছত্রিশ জাতির মহাসম্মেলন। দস্তুরমত বলবান ব্যক্তি ছাড়া সে ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ অসম্ভব। ঘরের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে তাড়া শোনা যাচ্চে, লোকে জন কিছু কিছু পিছিয়ে আসচে, কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্ব্বের অবস্থা, ভিড়ের স্থিতিস্থাপকত্ব দিব্যি বেশি।

গঙ্গাচরণ হতাশভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। ভিড় কমবার নাম নেই,—বরং ক্রমবর্দ্ধমান। গরমও তেমনি, আকাশে মেঘ জমে গুমটের সৃষ্টি করেচে। এক ঘণ্টা কেটে গেল—হঠাৎ ঝুপ করে জানলা বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল হাকিম আহার করতে গেলেন, আবার কখন আসবেন তার কিছু ঠিক নেই। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এল—লোকজন কতক গিয়ে আপিসের সামনে নিমগাছের তলায় বসে বিড়ি টানতে লাগলো।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—ঠাকুরমশাই, কি করবেন?

—বসি এসো।

—চলুন, বাজারে গিয়ে খোঁজ করি। যদি দোকানে পাই। এ ভিড়ে ঢুকতি পারবেন না।

বাজারে গিয়ে প্রতি দোকানে খোঁজ করা হোল। জিনিস নেই কোনো দোকানে। পাতিরাম কুণ্ডুর বড় দোকানে গোপনে বললে—স্থজি দিতে পারি দেড় টাকা সের। লুকিয়ে নিয়ে যাবেন সন্দের পর।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—আটা আছে ?

—আছে, বারো আনা করে সের।

—মিছরি ?

—দেড় টাকা সের। সন্দের পর বিক্রি হবে।

গঙ্গাচরণ হিসেব করে দেখলে কাছে যা টাকা আছে, তাতে বিশেষ কিছু কেনা হবে না পারমিট পেলে সস্তায় কিছু বেশি জিনিস পাওয়া যেতে পারে। আবার ওরা দুজনে সাপ্লাই অফিসারের আপিসে এল, তখন ভিড় আরও বেড়েচে, কিন্তু জানলা খোলে নি।

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসে আছেন। গঙ্গাচরণ বিড়ি খাওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আপনার নিবাস কোথায় ?

—মালিপোতা।

—সে তো অনেক দূর। কি করে এলেন ?

—হেঁটে এলাম, আবার কিসে আসবো ? গরীব লোক, এ বাজারে নৌকো কি গাড়ী-ভাড়া করে আসবার ধ্যামতা আছে ?

—কি নেবেন ?

—কিছু খাবার নেই ঘরে। আমার বিধবা পিসি ঘরে, তাঁর একাদশী আসচে। দশমীর দিন রাত্তিরে দুখানা রুটি করেও তো খাবেন। তাই আটা নিতে এসেচি।

—চাল পাচ্ছেন ওদিকে ?

—পাবো না কেন, পাওয়া যায়। দু'টাকা কাঠা—তাও অনেক খুঁজে তবে নিতে হবে। খাওয়া হয় না মাঝে মাঝে।

এই সময় জানলা খোলার শব্দ হোতেই লোকের ভিড় সেই দিকেই ছুটলো। গঙ্গাচরণ বৃদ্ধের হাত ধরে বললে—শীগগির আসুন, এর পর জায়গা পাবেন না—

তাও এরা পিছিয়ে পড়ে গেল। অতগুলো মরীয়া-লোকের সঙ্গে দৌড়পাল্লায় প্রতিযোগিতা করা এদের পক্ষে সম্ভব হোল না। এদের পক্ষে বেশির ভাগ এসেচে আটা যোগাড় করতে।

একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল সে দুপুরবেলা চাল যোগাড় না করতে পেরে উপবাসে আছে, একটু আটা নিয়ে গেলে তবে তার দিনের আহার পেটে পড়বে। তারা মরীয়া হবে না তো মরীয়া হবে কে ?

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর গঙ্গাচরণ জানলার সামনে দাঁড়াবার জায়গা পেলে।

সাপ্লাই অফিসার টানা টানা কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলেন—কি ?

গঙ্গাচরণের ভরসা ছিল তার চেহারার দিকে চাইলে সাপ্লাই অফিসার ভদ্রলোক বা ব্রাহ্মণ বলে খাতির করবে। কিন্তু তাতে নিরাশ হতে হোল, কারণ হাকিম চোখ তুলে তার দিকে চাইলেনই না। তাঁর চোখ টেবিলের ওপরকার কাগজের দিকে। হাতে কলের কলম, অর্থাৎ যে কলম কালিতে ডোবানোর দরকার হয় না।

গঙ্গাচরণের গলা কেঁপে গেল, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। হাত-পা কাঁপতে লাগলো।

সে বললে—হুজুর, আমার স্ত্রী আঁতুড়ে। কিছু খাবার নেই, আঁতুড়ের পোয়াতি, কি খায়, না আছে একটু আটা—

হাকিম ধমকের সুরে বললেন—আঃ কি চাই ?

—আটা, চিনি, সুজি, একটু মিছরি—

—ওসব হবে না।

—না দিলে মরে যাবো হুজুর। একটু দয়া করে—

—হবে না। আধসের আটা হবে, একপোয়া সুজি, একপোয়া মিছরি—

বলেই খস্ খস্ করে কাগজ লিখে হাকিম গঙ্গাচরণের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—যাও—

—হুজুর, পাঁচ-ছ'কোশ দূর থেকে আসচি। এতে ক'দিন হবে হুজুর। দয়া করে কিছু বেশি করে দিন—

—আমি কি করবো ? হবে না। যাও—

গঙ্গাচরণ হাত জোড় করে বললে—গরীব ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমায়—

হাকিম বিরক্তির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি কাগজ ? যাও. এক সের আটা—যত বিরক্ত।

লোকজনের ধাক্কায় গঙ্গাচরণকে ছিটকে পড়তে হোল জানলা থেকে। পেছন থেকে দু-একজন বলে উঠলো—ওমা, দেরি করো কেন ? কেমনধারা লোক তুমি ? সরো—

চাপরাশি চেঁচিয়ে বললে—হঠ্, যাও—

বাজারে দোকান থেকে আটা কিনতে গিয়ে দেখলে আটা এবং সুজি দুই-ই খারাপ। একেবারে খাদ্যের অনুপযুক্ত নয় বটে তবে জিনিস ভালও নয়।

একটা ময়রার দোকানে ওরা খাবার খেতে গেল। ক্ষেত্র কাপালীর বড় ইচ্ছে সে গরম সিঙাড়া খায়। শহর বাজারে তো প্রায় আসা হয় না—থাকে নিতান্ত অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু খাবারের দোকানে সিঙাড়া কিনতে গিয়ে সে দেখলে পানের খিলি অপেক্ষা একটু বড় সিঙাড়া একখানার দাম দু পয়সা। জিনিসপত্রের আগুন দর। সন্দেশের সের এ অঞ্চলে চিরকাল ছিল দশ আনা বারো আনা, এখন তাই হয়েচে তিন টাকা। রসগোল্লা দু'টাকা।

ক্ষেত্র কপালী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—কোনো জিনিস কিনবার জো নেই ঠাকুরমশাই !

—তাই তো দেখচি—

—কি খাবো বলুন তো। এ তো দেখচি এক টাকার কম খেলি পেট ভরবে না। আপনি খাবা না ?

—না, আমি কি খাবো। আমার খিদে নেই।

সে হবে না ঠাকুরমশাই। আমার কাছে যা পয়সা আছে, দুজনে ভাগ করে খাই।

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—কেন মিছে মিছে বাজে কথা বলিস ? খেয়ে নিগে যা—

কিন্তু গঙ্গাচরণের বড় লোভ হোল একখানা থালায় সাজানো বড় বড় জোড়া সন্দেশ দেখে। তার নিজের জন্যে নয়, অনঙ্গ-বৌ কতকাল কোন জিনিস খায় নি। ওর জন্যে যদি দুখানাও নিয়ে যাওয়া যেতো।

ক্ষেত্র কাপালী গরম সিঙাড়া খেয়ে জল খেয়ে পানের দোকানে পান কিনতে গিয়েচে—ও তখন ময়রাকে বললে—তোমার ঐ জোড়া সন্দেশের দাম কত ?

—চার আনা করে।

—দু খানা চার আনা ?

—সেকাল নেই ঠাকুর। একখানার দাম চার আনা।

গঙ্গাচরণ অবাক হোল। ওই জোড়া সন্দেশের একখানির দাম ছিল এক আনা। সেই জায়গায় একেবারে চার আনা! সে কি কেনা ওর চলবে ? অসম্ভব। হাতে অত পয়সা নেই। গঙ্গাচরণ বার বার জোড়া সন্দেশের দিকে চাইতে লাগলো। সুন্দর সন্দেশ গড়েচে। কারিগর ভালো।

ঠোঙা থেকে বের করেই যদি অনঙ্গর হাতে দেওয়া যেতো!

—ওগো, ছাখো কি এনেচি—

—কি গা ?

—কেমন জোড়া সন্দেশ, দেখেচ ? তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

কখনো স্ত্রীর হাতে কোনো ভাল খাবার তুলে দেয় নি। পাবেই বা কোথায় ? কবে সচ্ছল পয়সার মুখ দেখেচে সে ? তার ওপর এই ভীষণ মন্বন্তর।

ক্ষেত্র কাপালীর কাছেও পয়সা নেই যে ধার করবে। সে পেটুক ব্যক্তি। বসে বসে, যা কিছু এনেছিল, জিলিপি আর সিঙাড়া কিনেই ব্যয় করেচে।

বেলা পড়ে এসেচে। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তা। দুজনে পথ হেঁটে চললো গ্রামের দিকে। ক্ষেত্র কাপালী বিড়ি টানচে আর বকবক করে বকচে। গঙ্গাচরণ চাদরের প্রান্তে দুটি মুড়ি-মুড়কি বেঁধে নিয়েচে—মাত্র দু'আনার। এত অল্প জিনিস যে কয়েক মুঠো খেলেই ফুরিয়ে যাবে। ছেলে দুটো বাড়ীতে আছে, বলবে এখন, বাবা কি এনেচ আমাদের জন্যে ? ছেলেমানুষ, তারা কি মন্বন্তর বোঝে ? তাদের জন্যে দুটো নিয়ে যেতে হবে, দুটো ও খাবে একটা ভাল পরিষ্কার জায়গায় বসে। খেয়ে নদীর জল পান করবে। সারাদিন অনাহার, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই প্রবল!

এক জায়গায় গাছতলায় বসে গঙ্গাচরণ দু'তিন মুঠো মুড়ি-মুড়কি খেয়ে নিজে জলে নামতে গিয়ে দেখলে একটা শেওলা দামের ওপারে অনেক কলমীশাক। আজকাল দুর্লভ, শাকপাতা কি লোক রাখচে? ক্ষেত্র কাপালীকে বললে—জলে নামতে পারবি? শাক নিয়ে আয় তো দিকি—

ক্ষেত্র কাপালী গামছা পরে জলে নেমে একগলা জল থেকে দাম টেনে এনে কলমীলতার ঝাঁক ডাঙার কাছে তুললে। তারপর দুজনে মিলে শাক ছিঁড়ে বড় দু'আঁটি বাঁধলে। বাড়ী

ফিরতেই অনঙ্গ-বৌ ক্ষীণস্বরে বললে—ওগো, এলে ? এদিকে এসো।

—কেমন আছ ?

—এখানে বোসো। কোথায় গিইছিলে এতক্ষণ ? কতক্ষণ যেন দেখি নি—

—টাউনে গেলাম তো। তোমাকে বলেই তো গেলাম। জিনিস-পত্র নিয়ে এলাম সব। অনঙ্গ নিস্পৃহ, উদাস স্বরে বললে—বোসো এখানে। সারাদিন টো টো করে বেড়াও কোথায় ? তোমায় একটুও দেখতে পাই নে।

গঙ্গাচরণের মনে বড় কষ্ট হোল ওকে দেখে। বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে অনঙ্গ-বৌ। এমন ধরণের কথাবার্ত্তা ও বড় একটা বলে না। এ হোল দুর্ব্বল রোগীর কথাবার্ত্তা। অনাহারে শীর্ণ, দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে, কতকাল ধরে পেট পুরে খেতে পেতো না, কাউকে কিছু মুখ ফুটে বলা ওর স্বভাব নয়, কত সময় নিজের বাড়া ভাত অপরকে খেতে দিয়েচে। শরীর সে সবের প্রতিশোধ নিচ্চে এখন।

গঙ্গাচরণ সস্নেহে বললে—তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তোমাকে জোড়া সন্দেশ এনে খাওয়াবো টাউন থেকে। হরি ময়রা যা সন্দেশ করচে ! দেখলে খেতে ইচ্ছে করে।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরিয়েচে, কিন্তু বড় দুর্ব্বল, শীর্ণদেহ। খেতেই পায় না তা সারবে কোথা থেকে। গঙ্গাচরণ প্রাণপণে চেষ্টা করে খাবারের এটা সেটা যোগাড় করতে কিন্তু পেরে ওঠে না। একটু ঘি কত কষ্টে গঙ্গানন্দপুরের শশী ঘোষের বাড়ী থেকে যোগাড় করে নিয়ে এল। তাও ঘোষমশায় আট টাকা সেরের কমে ছাড়তে চায় না। ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়ে অনেক করে ঘিটুকু যোগাড় করা।

ঘি যদি বা মেলে দূর গ্রামে, নিজ গ্রামে না মেলে একটু দুধ, না একটু মাছ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ওগো, তুমি টো টো করে অমন বেড়িও না। তোমার চেহারাটা খারাপ হয়ে গিয়েচে। আয়নায় মুখখানা একবার দেখো তো—

গঙ্গাচরণ বললে—দেখা আমার আছে। তুমি ঠাণ্ডা হও তো।

—চাল পেয়েছিলে ?

—অল্প যোগাড় করেছিলাম কাল।

—তোমরা খেয়েছ ?

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরুলেও নড়তে চড়তে পারে না—শুয়েই থাকে। রান্না করে গঙ্গাচরণ ও হাবু। পাঠশালা আজকাল সবদিন হয় না। বিশ্বাসমশায় এখান থেকে সরে যাওয়াতে পাঠশালার অবস্থা ভাল নয়। এ দুর্দ্দিনে আকস্মিক বিপৎপাতের মত দুর্গা ভট্‌চায একদিন এসে হাজির। গঙ্গাচরণ পাঠশালাতে ছেলে পড়াচ্চে।

—এই যে পণ্ডিতমশায় !

গঙ্গাচরণ চমকে গেল। বললে—আসুন, কি ব্যাপার ?

—এলাম।

—ও, কি মনে করে?

—মা ভাল আছেন?

—হুঁ।

—সন্তানাদি কিছু হোল?

—হয়েচে।

গঙ্গাচরণ তখনও ভাবচে, দুর্গা ভট্‌চাযের মতলবখানা কি। ভট্‌চায কি বাড়ী যেতে চাইবে নাকি? কি মুশকিলেই সে পড়েচে। কত বড় লোক আছে দেশে, তাদের বাড়ীতে যা না কেন বাপু। আমি নিজে পাইনে খেতে, কোনো রকমে ছেলে দুটোর আর রোগা বউটার জন্যে দুটি চাল আটা কত কষ্টে যোগাড় করে আনি, ভগবান তা জানেন। থাকে থাকে, এ ভ্যাজাল কোথা থেকে এসে জোটে তার মধ্যে।

দুর্গা একটা ছেলেকে উঠিয়ে তার কেরোসিন কাঠের বাক্সটার ওপর বসলো, তারপর গলার উড়ুনিখানা গলা থেকে খুলে হাঁটুর ওপর রেখে বললে—একটু জল খাওয়াতে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরে পটলা, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে আয় দিকি ঘটিটা মেজে।

—একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে, বলচি—জলটা খাই। তেষ্টায় জিব শুকিয়ে গিয়েচে।

জলপান করে দুর্গা পণ্ডিত একটু সুস্থ হয়ে বললে—আঃ!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর দুর্গাই প্রথম বললে—বললে—বড় বিপদে পড়েচি, পণ্ডিতমশাই—

—কি?

—এই মন্বন্তর, তার ওপর চাকরিটা গেল।

—পাঠশালার চাকরি?

—হাঁ মশাই। হয়েচে কি, আমি আজ ন'টি বছর কামদেবপুর পাঠশালায় সেকেন পণ্ডিত্তি করচি, মাইনে আগে ছিল সাড়ে তিন টাকা, এখন দেয় পাঁচ টাকা। তা মশাই গোয়ালা হোল ইস্কুলের সেক্রেটারি। আজ পাঁচ মাস হোল কোথা থেকে এক গোয়ালার ছেলে জুটিয়ে এনে তাকে দিয়েচে চাকরি। সে করলে কি মশাই দার্জ্জিলিং গেল বেড়াতে। সেখানথেকে এসে উন্মাদ পাগল হয়ে গেল—

—কেন কেন?

—তা কি করে জানবো মশাই। কোথাকার নাকি ফটোগেরাপ তুলতে গিয়েছিল, সায়েব কি খাইয়ে দেয়—এই তো শুনতে পাই। মশাই, তুমিও পাও পাঁচ টাকা মাইনে, তোমার সেই দার্জ্জিলিং—দার্জ্জিলিং-এ যাওয়ার কি দরকার? সেখানে সায়েব-সুবোদের জায়গা। বাঙালীরা সেখানে গেলে পাগল করে দেয় ওষুধ খাইয়ে। সাধে কি আর বলে—

—সে যাক, আসল কথাটা কি সংক্ষেপে বলুন—

—তারপর সে ছোকরা আজ তিন মাস পরে এসে জুটেচে। এখন আর পাগল নেই, সেরে গিয়েচে। তাকে নেবে বলে আমায় বললে—আপনি এক মাস ছুটির দরখাস্ত করুন—

—আপনি করে দিলেন ?

—দিতে হোল। হেডমাস্টার নিজে আমার টেবিলে এসে বলে লিখুন দরখাস্ত। লিখলাম। কি আর করি। তখুনি মঞ্জুর করে দিলে। এখন দেখুন বিপদ। ঘরে নেই চাল, তার ওপর নেই চাকরি। কি আমি এখন করি। বাড়ীসুদ্ধ যে না খেয়ে মরে। তাই ভাবলাম যাই আপনার কাছে। একটা পরামর্শ দ্যান। আর তো কেউ নেই যে তাকে দুঃখের কথা বলি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—দুঃখের কথা একবার ছেড়ে একশো বার বলো। কিন্তু বাড়ী যেতে চাও যদি, তবেই তো আসল মুশকিল। দুর্গা ভট্‌চাযের মতলবখানা যে কি, তা গঙ্গাচরণ ধরতে না পেরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছেলে দুটির চাল জোটানো যাচ্চে না, বউটার জন্যে কত কেঁদেককিয়ে এক সের আটা নিয়ে আসা, এই সময় দুর্গা ভট্‌চায যদি গিয়ে ঘাড়ে চাপে, তবে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে যে দেখচি। স্ত্রীও এমন নির্ব্বোধ, যদি ও গিয়ে হাজির হয় আর কাঁদুনি গায় তার সামনে, তবে আর দেখতে হবে না। মুখের ভাত বেড়ে দেবে। নিজে না খেয়ে ঐ বুড়োটাকে খাওয়াবে।

নাঃ, কি বিপদেই সে পড়েচে।

এখন মতলবখানা কি বুড়োর ?

বসে বসে গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভাবতে লাগলো।

যদি ছুটির পরে দুর্গা ভট্‌চায তার সঙ্গে তার বাড়ী যেতেই চায় তবে ?

না, ও চলবে না। একটা কিছু ফন্দি বার না করলেই চলবে না। এমন কিসের খাতির দুর্গা ভট্‌চাযের সঙ্গে যে নিজের স্ত্রী-পুত্রের মুখ বঞ্চিত করে ওকে খেতে দিতে হবে ?

দুর্গা ভট্‌চায বলে—ছুটি দেবেন কখন ?

—ছুটি ? এখনও অনেক দেরি।

—সকাল বিকেল করেন, না এক বেলাই ?

—এক বেলা।

গঙ্গাচরণ তামাক সেজে খাওয়ালে নিজের হাতে দুর্গাকে।

দুর্গা তামাক খেয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হুঁকোটি গঙ্গাচরণের হাতে দিয়ে বললে—এখন বড় যে বিপদে পড়ে গেলাম। চাকরি নেই, হাতে একটা পয়সা নেই—আপনার কাছে বলতে কি, আজ দু'দিন সপরিবারে না খেয়ে খিদের জ্বালায় ছুটে এলাম, বলি কোথায় যাই ? আর তো কেউ নেই কোথাও ? মা-ঠাকরুণ দয়া করেন, মা আমার, অন্নপুন্নো আমার। তাই--

এর অর্থ সুস্পষ্ট। দুর্গা ভট্‌চায বাড়ীই যাবে। সেজন্যেই এখনো ওঠে নি, বসে বসে তামাম খাচ্চে। দুদিন খাই নি, সে যখনই আসে, তখনই বলে দুদিন খাই নি, তিনদিন খাই নি। কে মশায় তোমাকে রোজ রোজ খাওয়ায়—আর এই দুর্দ্দিনে ? লোকের তো একটা বিবেচনা থাকা উচিত।

কি মতলব ফাঁদা যায়? বলা যাবে কি ও বাপের বাড়ী গিয়েছে? কিংবা ওর বড্ড অসুখ? উঁহু, তাহোলে ও আপদটা সেখানে দেখতে যেতে পারে।

গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভেবে কিছুই পেলে না। ছুটির সময় এল। পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ যেমন বাড়ীর দিকে চলবে, ও অমনি চলবে, গঙ্গাচরণের সঙ্গে। সোজাসুজি কথা বললে কেমন হয়? না মশাই, এবার আর সুবিধে হবে না আমার ওখানে। বাড়ীতে অসুখ, তার ওপর চালের টানাটানি।

কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদের জন্যে গঙ্গাচরণ প্রস্তুত ছিল না।

বেলা যত যায় দুর্গা ভট্‌চায মাঝে মাঝে পাঠশালা থেকে নামে আর রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে সেখহাটি-মণিরামপুরের বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখে।

দু'তিনবার এ রকম করবার পরে গঙ্গাচরণ কৌতূহলের সুরে বললে—কি দেখচেন?

—এত দেরি হচ্চে কেন, তাই দেখচি।

—কাদের দেরি হচ্চে? কারা?

—ওই যে বললাম। বাড়ীর সবাই আসচে কিনা। আমার স্ত্রী, মেয়েটা, আর দুটি ছেলে। সব না খেয়ে আছে যে। আর কোনো উপায় তো দ্যাখলাম না। বলি, চলো আমার অন্নপুন্নো মার কাছে। না খেয়ে ষোল-সতেরো বছরেব মেয়েটা বড্ড কাতর হয়ে পড়েচে। দিশেহারা মত হয়ে গিয়েছে মশাই। তা আমি দুটো কলাইসেদ্দ খেলাম মণিরাম-পুরের নিধু চক্কত্তির বাড়ী এসে। তাদেরও সেই অবস্থা। গোয়ালার বামুন, এ দুর্দ্দিনে কোনো কাজকর্ম্ম নেই, পায় কোথায় বলুন। চাল একদানা নেই তাদের ঘরে। নিধু চক্কত্তির বুড়ো মা বুঝি জ্বরে ভুগছে আজ দু মাস। ওই ঘুষঘুষে জ্বর। তারই জন্যে দুটো পুরনো চাল জোগাড় করা আছে। তিনি খান। ওরা খেতে বসেচে সিদ্ধকলাই। সব সমান অবস্থা। আমি বলি আমি এগিয়ে গিয়ে বসি পণ্ডিত মশায়ের পাঠশালায়, তোমরা এসো।

সর্ব্বনাশের মাথায় পা!

দুর্গা ভট্‌চায গুষ্টিসমেত এ দুর্দ্দিনে তারই বাড়ী এসে জুটচে তা হোলে। মতলব করেচে দেখচি ভালোই।

এখন উপায়?

সোজাসুজি বলাই ভালো। না কি?

এমন সময়ে রাস্তা থেকে বালিকা-কণ্ঠে শোনা গেল—ও বাবা—

—কে রে ময়না? বলেই দুর্গা পণ্ডিত বাইরে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে পাঠশালার সামনে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে নিয়ে অল্প একটু পরেই দুর্গা পণ্ডিত পাঠশালায় ঢুকে বললে—এই আমার মেয়ে ময়না, ভালো নাম হৈমবতী। প্রণাম করো মা—

কি বিষম মুশকিল।

হৈমবতী এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সরল ভাবে। বেশ সুন্দরী মেয়ে। ওই রোগা পটকা,

দড়ির মত চেহারা দুর্গা ভট্চাযের এমন সুন্দর মেয়ে!

দুর্গা ভট্চায বললে—ওরা সব কৈ?

হৈমবতী বললে—ওই যে বাবা গাছতলায় বসে আছে মা আর খোকারা। আমি ওদের কাছে যাই বাবা! বোঁচকা নিয়ে মা হাঁটতে পারচে না।

গঙ্গাচরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েচে। এদের তাড়ানো আর তত সহজ নয়। এরা বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে আহারের সন্ধানে দেশত্যাগ করে যখন রওনাই হয়েচে। বিশেষ করে মেয়েটিকে দেখে গঙ্গাচরণের মন নরম হয়েচে। অমন সুন্দরী মেয়ের অদৃষ্টে কি দুঃখ। খেতে পায় নি আজ দুদিন। আহা!

স্নেহে গঙ্গাচরণের মন ভরে উঠলো।

একটু পরে পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ সদলবলে বাড়ির দিকে রওনা হোল।

এরপর দিনকতক কেটে গেল। গঙ্গাচরণের বাড়ীতে দুর্গা ভট্চাযের পরিবারবর্গ পাকাপোক্তভাবে বসেচে। অনঙ্গ-বৌ নিজে খেতে না পেয়ে চিঁ চিঁ করচে অথচ সে কাউকে বাড়ী থেকে তাড়াবে না। ফলে সবাই মিলে উপোস করচে।

এর মধ্যে ময়না বড ভাল মেয়ে, গঙ্গাচরণ ক্রমে লক্ষ্য করলে। কোন খাবার জিনিস যোগাড় হলে ময়না আগে নিয়ে আসে অনঙ্গ-বৌকে খাওয়াতে। বলে—ও কাকীমা, এটুকু খেয়ে নাও তো।

ময়নার মা আবার বড় কড়া সমালোচক। সে বলে—যা, ও তোর কাকীমাকে দিতে হবে না। ওর শরীর খারাপ, ও তোমার ওই ময়দার গোলা এখন খেতে বসুক। যা, ও নিয়ে যা—

দুর্গা ভট্চায কোথায় সকালে উঠে চলে যায়। অনেক বেলা করে বাড়ী ফেরে। কিছু না কিছু খাবার জিনিস প্রায়ই আনে। চাল আনতে পারে না বটে, কিন্তু আনে হয়তো একটা নারকেল, একটা মানকচু, দুটো বিরি কলাই, নিদেন দুটো বড়ি।

এসব আনে সে ভিক্ষে করে।

আজকাল দুর্গা ভিক্ষে করতে শুরু করেছে।

তবে তার ভিক্ষেটা ঠিক আর পাঁচজন ভিক্ষুকের মত নয়, ওরই মধ্যে একটু কায়দা আছে। সেদিন দুপুরে দুর্গা গিয়ে হাজির এ গ্রামেরই কাপালীপাড়ায়। নিধু কাপালীর বাড়ীর দাওয়ায় উঠে বললে—একটু তামাক খাওয়াতে পার?

নিধু কাপালী ব্রাহ্মণ দেখে শশব্যস্ত হয়ে বললে আসুন, বসুন, ঠাকুরের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—আমার বাড়ী কমদেবপুর, আমি আছি এই গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ী।

—আপনার কেউ হন? জামাই নাকি?

- না না, আমার স্বজাতি ব্রাহ্মণ। এমনি এসে আছি ওঁর এখানে।

—আপনার কি করা হয় ?

—কিছুই না। বাড়ীতে জমিজমা আছে। দুটো গোলা ছিল ধানভর্ত্তি, তা শোনলাম ধান রাখতে দেবে না গবর্ণমেণ্টের লোক। বিশ মণ ধানের বেশী নাকি রাখতে দেবে না—সব বিক্রি করে ফেললাম।

বলা বাহুল্য এসব কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

নিধুর কিন্তু খুব শ্রদ্ধা হয়ে যায়, দু'গোলা ধানের মালিক যে ছিল এ বাজারে, সে সাধারণ লোক নয়, হতেই পারে না। আঠার টাকা করে ধানের মণ। দু' গোলায় অন্তত সাত-আট শো মণ ধান ছিল। মোটা টাকা রয়েছে ওর হাতে।

দুর্গা তামাক টানতে টানতে বলে—বাপু হে, ঘরে চিঁড়ে আছে, দুটো দিতে পার ? এ গাঁয়ে তোমাদের দেখছি খাদ্যখাদকের বড় অভাব।

—আজ্ঞে, এখানে খাদ্যখাদক মেলেই না—চিঁড়ে ঘরে নেই ঠাকুরমশায়। বড় লজ্জায় ফেললেন—

—না না, লজ্জা কি ? তোমাদের এ গ্রামে বাপু এই রকমই কাণ্ড। খাদ্যখাদক কিছু মেলে না। কদিন থেকে ভাবছি দুটো চিঁড়ে ভাজা খাব। তা এ যোগাড় করতেই পারলাম না—অথচ আমার গোলায় এক পৌটি দেড় পৌটি ধান ছিল এই সেদিন।

নিধু কাপালী কাঁচুমাচু হয়ে গেল। এত বড় লোকের সামনে কি লজ্জাতেই সে পড়ে গেল।

দুর্গা বললে—যাক গে ! আমসত্ত্ব আছে ঘরে ?

—আজ্ঞে না, তাও নেই। ছেলেপিলেরা সব খেয়ে ফেলে দিয়েচে।

– পুরনো তেঁতুল ?

—আজ্ঞে না।

—বড় অরুচি হয়ে গেছে মুখে কিনা। তাই দুটো চিঁড়ে ভাজা, পুরনো তেঁতুল একটু এই সব মুখে—বুঝলে না ? আরে মশাই, লড়াই বেধেচে বলে মুখ তো মানবে না ? এই চালকুমড়ো তোমার ?

সামনে গোলার ওপরে চালকুমড়ো লতায় বড় বড় চালকুমড়ো সাদা হয়ে গিয়েচে পেকে। সারি সারি অনেকগুলো আড় হয়ে আছে গোলার চালে। নিধু কাপালী বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে, আমারই।

—দাও একখানা ভাল দেখে। বড়ি দিতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি—

নিধু হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল এবং একটা বড় পাকা চালকুমড়ো পেড়ে নিয়ে এল গোলার চাল থেকে। দুর্গা ভট্চায সেটি হাতে ঝুলিয়ে গঙ্গাচরণের বাড়ীর দিকে রওনা হোল হৃষ্টমনে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ওটা কি হবে জ্যাঠামশাই ?

—নিয়ে এলাম মা, আনলেই কাজ দেয়। খাবার জিনিস তো? বড়ি দিও।

—কলাই খেয়ে প্রাণ বেঁচে আছে, বড়ি আর কি দিয়ে দেবো জ্যাঠামশাই?

—আচ্ছা রও, কলাইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলচি কাল থেকে।

—না, জ্যাঠামশাই আপনি আমাদের বাড়ী এসেচেন, আর বেরুতে হবে না লোকের বাড়ী চাইতে। যা জোটে তাই খাবো।

—কি জান মা, ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হোল ভিক্ষা। এতে লজ্জা নেই কিছু। আমার নেই, আমি ভিক্ষা করবো। লড়াই বেধেচে বলে পেট মানবে?

—না জ্যাঠামশাই, আপনার পায়ে পড়ি ওতে দরকার নেই।

—আচ্ছা, তুমি চুপ করে থাক। সে ব্যবস্থা হবে।

দুর্গা ভট্‌চায গঙ্গাচরণকে সন্ধ্যাবেলা বললে—একটা পরামর্শ করি। চাষাগাঁয়ে জ্যোতিষীর ব্যবসা বেশ চলে। কাল থেকে বেরুবেন? ওদেরই হাতে আজকাল পয়সা।

—সে গুড়ে বালি। আগে চলত, এখন আর চলবে না। চাল ডাল কেউ দিতে পারবে না। পয়সা হয়ত দেবে কিন্তু চাল দেবে কে? কিনবেন কোথায়?

—ধান যদি ছ্যায়?

—কোথাও নেই এদেশে। সে যার আছে, লুকিয়ে রেখেচে, বের করলে পুলিসের হাঙ্গামা। ভয়ে গাপ করে ফেলেচে সব। চাষা-গাঁয়ের হালচাল আমাকে শেখাতে হবে না।

—তাহলেও কাল দুজনে বেরুই চলুন। নয়ত না খেয়ে মরতে হবে সপরিবারে।

—যার জমি নেই এ বাজারে, তাকে উপোস করতেই হবে। জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার ওপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা।

গঙ্গাচরণ একটু দম নিয়ে আবার বললে—নাঃ, ও জ্যোতিষ-টোতিষ নয়, এবার যদি নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে চাষ করতে হয় তাও করব—একটু জমি পেলে হয়।

দুর্গা হেসে বললে—জমির অভাব নেই এদেশে। নীলকুঠির আমল থেকে বিস্তর জমি পড়ে। আমারই বাড়ীর আশেপাশে দু'বিঘে জমি জঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েচে। আমার ভিটে-জমির সামিল সে জমি।

—আপনি করেন না কেন?

কি করবো তাতে?

—যা হয়, রাঙা আলু করলেও পারতেন। তাই খেয়েও দু'মাস কাটত। আমাদের ভদ্রলোকদের কতকগুলো মস্ত দোষ আছে। পরের পরিশ্রমে আমরা খাব। আপনি আমি এমন কিছু দুশো টাকার চাকরি করিনে অথচ জমি করব না। এবার টের পাচ্ছি মজা।

দুর্গা ভট্‌চায ওসব বোঝে না। সকলেই চাষ করবে নাকি? মজার কথা। এ হোল বৈশ্যের কাজ, ব্রাহ্মণে বৈশ্যের কাজ করবে? তা কালে তাও হবে; তিনি শুনেচেন শহরে নাকি কোন বামুনের ছেলে জুতোর দোকান করেচে, জুতোর দোকান, ভেবে ছাখ।

ব্রাহ্মণের আর কি হতে বাকি ?

কাপালীদের বড়-বৌ এসে অনঙ্গ-বৌকে ফিস্ ফিস্ করে বললে—কাল থেকে ছোট-বৌকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনঙ্গ-বৌ বললে—সে কি কথা ?

—তারে তো জান বামুন-দিদি ? ক্যামন স্বভাব ছেল তার। ইটখোলার সেই এক ব্যাটার সঙ্গে—তুমি সতীনক্ষি, সেসব তোমার সঙ্গে বলব না। এ'ন কাল বিকেল থেকে আর বাড়ীতে দেখছি নে। ঘরের বৌ গেল কোথায় ? জাত যে যায় এখন !

—যাক, কারো কাছে বলো না।

—কার কাছে আর বলতে যাচ্ছি দিদি ? বলে কাটা কান চুল দে ঢাকো, তবুও তো লোকে জিজ্ঞেস করবে বৌ কোথায় গেল ? সদু জেলেনী এখুনি ঢোকবে এখন বাড়ীতে। সে রটাবে এখন সারা গাঁয়ে। কি দায়েই আমি পড়িচি।

দু'দিনের মধ্যে ছোট-বৌয়ের টিকি দেখা গেল না। খোঁজাখুঁজি যথেষ্ট করা হয়েচে। কালীচরণ নিজেও আশেপাশের গ্রামে সন্ধান করেচে।

অনঙ্গ-বৌ রাত্রে বললে—কি হোল ?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কি আর হবে। সে পালিয়েচে সেই যদু-পোড়ার সঙ্গে—সেই ঠিকেদার ব্যাটা, ভয়ানক ধড়িবাজ।

—ওমা সে কি সর্ব্বোনাশ। হ্যাঁগো কি হবে ওর ? ছুটকির ?

—ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে শখ মিটে গেলে। তখন নাম লেখাতে হবে শহরে গিয়ে, নয়ত ভিক্ষে করতে হবে।

চতুর্থ দিন অনেক রাত্রে কে এসে ডাকলে ঘরের বাইরে থেকে—

—ও বামুন-দিদি—

ময়না জেগে উঠে বললে—কে ডাকচে বাইরে, ও দিদি বলে—

সে উঠে দোর খুলে দিতে ছোট-বৌ ঘরে ঢুকল। পরনে নতুন কোরা লালপেড়ে শাড়ী, গায়ে সাদা ব্লাউজ, হাতে নতুন কাঁচের চুড়ি।

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের ও আনন্দের সুরে বললে—কি রে ছোট-বৌ ?

ছোট-বৌ মেঝের ওপর বসে পড়ল। একটুখানি চুপ করে থেকে ফিক্ করে হেসে ফেলল। ময়নার মাও ততক্ষণ উঠেচে। ছোট-বৌয়ের কাণ্ড সব শুনেছে এ ক'দিনে। ময়নার মা ছিল কামদেবপুর গাঁয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ মেয়েমানুষ। কখনো কারো কথায় থাকে না, গরীব-ঘরের বৌ—দুঃখ-ধান্দার মধ্যেই চিরকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো মানুষ করে এসেচে। সে শুধু চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। এমন অবস্থায় আবার লোকের মুখে হাসি বেরোয় ? ময়নার মা এই কথাই ভাবছিল।

অনঙ্গ-বৌ রাগের সুরে বললে—হাসি কিসের ?

ছোট-বৌ মুখ চুন করে বললে—এমনি।

—ও পুঁটুলি কিসের ?

—ওতে চাল। তোমার জন্যি এনিচি।

—ঝাঁটা মারি তোর চালের মাথায়। নিয়ে যা এখান থেকে। আমি কি করব তোর চাল ?

—রাগ কোর না বামুন-দিদি, পায়ে পড়ি। তুমি রাগ কল্লি আমি কনে যাব ?

এবার ছোট-বৌয়ের চোখ দুটো যেন জলে ভরে এল। সত্যিকার চোখের জল।

অনঙ্গ-বৌয়ের মনটা নরম হোল। খানিকটা স্নেহের সুরে বললে—বদমাইশ কোথাকার। ধাড়ি মেয়ে, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি কাজ করতে কি কাজ করে বসো তোমায় জ্ঞান হয় না ? আজ বাদে কাল কোথায় গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে সে খেয়াল হয় না তোমার ? সতের ঝাঁটা মারি তোমার মাথায় তবে যদি এ রাগ যায়।

অজ্ঞান পাপীকে ভগবান বোধ হয় এমনি সস্নেহ অনুযোগের সুরে তিরস্কার করেন। ছোট-বৌ মুখ চুন করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

এরই মধ্যে একদিন মতি মুচিনী অতি অসহায় অবস্থায় এসে পৌছলো ওদের গাঁয়ে।

সকালে হাবু এসে বললে—মতি-দিদিকে দেখে এলাম মা, কাপালীদের বাড়ী বসে আছে। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়েছে। অনঙ্গ-বৌ বললে—কি রকম দেখে এলি ?

—রোগা মত।

—জ্বর হয়েছে ?

—তা কি জানি! দেখে আসবো ?

হাবু আবার গেল, কিন্তু মতিকে সেখানে না দেখে ফিরে চলে এল।

আর দুদিন ওর কথা কারো মনে নেই, একদিন সকালে মতি হাবুদের বাড়ীর সামনে একটা আমগাছের তলায় এসে শুয়ে পড়লো। ওর হাত-পা ফুলেছে, মুখ ফুলেছে, হাতে একটা মাটির ভাঁড়। সারা দুপুর সেখানে শুয়ে জ্বরে ভুগেছে, কেউ দেখেনি, বিকেলের দিকে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরবার পথে ওকে দেখে কাছে গিয়ে বললে, কে ?

ওকে চিনবার উপায় ছিল না।

মতি অতি কষ্টে গেঙিয়ে গেঙিয়ে বললে—আমি দাদাঠাকুর—

—কে, মতি এখানে কেন ? কি হয়েছে তোর ?

—বড্ড জ্বর দাদাঠাকুর, তিন দিন খাই নি, দুটো ভাত খাবো।

—তা হয়েচে ভালো। তুই উঠে আয় দিকি, পারবি ?

উঠবার সামর্থ্য মতির নেই। গঙ্গাচরণ ওকে ছোঁবে না। সুতরাং মতি সেখানেই শুয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ শুনতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো কিন্তু সেও অত্যন্ত দুর্ব্বল। উঠে মতির

কাছে যাওয়ার শক্তি তারও নেই।

বললে—ওগো মতিকে কিছু খেতে দিয়ে এসো—

—কি দেবো?

—দুটো কলাইয়ের ডাল আছে ভিজনো। এক মুঠো দিয়ে এসো।

—ও খেয়ে কি মরবে? তার জ্বর আজ কতদিন তা কে জানে। মুখ-হাত ফুলে ঢোল হয়েচে। কেন ও খাইয়ে নিমিত্তের ভাগী হবো!

তবে কি দেবো খেতে? কি আছে বাড়ীতে?

খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো অনঙ্গ। কিন্তু অন্য কিছুই ঘরে নেই। কি খেতে দেওয়া যায়, এক টুকরো কচু ঘরে আছে বটে কিন্তু তা রোগীর খাদ্য নয়। হাবু পুব পাড়ার জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওই কচুটুকু আজ দু'দিন আগে তুলে এনেছিল, দু'দিন ধরেই এক এক টুকরো সিদ্ধ করে খেতে খেতে ওই এক ফালি অবশিষ্ট আছে।

ভেবেচিন্তে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগো, কচু বেটে জল দিয়ে সিদ্ধ করে দিলে রুগী খেতে পারে না?

—তা বোধ হয় পারে, মানকচু?

—জঙ্গলে মানকচু।

—তা দাও।

সেই অতি তুচ্ছ খাদ্য ও পথ্য একটা কলার পাতায় মুড়ে হাবু মতির সামনে নিয়ে গেল। অনঙ্গ-বৌ অতি যত্ন নিয়ে জিনিসটা তৈরী করে দিয়েছে। হাবুকে বলে দিয়েছে ওকে এখানে নিয়ে আসবি, বাইরের পৈঠেতে বিচুলি পেতে পুরু করে বিছানা করে দিলেই হবে। আমতলায় শুয়ে থাকলে কি বাঁচে?

হাবু গিয়ে ডাকলে,—ও মতি-দিদি, এটুকু নাও—

মতি ক্ষীণ স্বরে বললে—কি?

—মা খাবার পাঠিয়েচে—

—কে?

—আমার মা। আমার নাম হাবু, চিনতে পারচো না?

মতি কথা বলে না। খানিকক্ষণ কেটে গেল।

হাবু আবার বললে—ও মতি-দিদি?

—কি?

—খাবার নাও। মা দিয়েচে পাঠিয়ে।

—শালিক পাখী শালিক পাখী, ধানের জাওলায় বাস—

—ও মতি-দিদি? ওসব কি বলচো?

—কে তুমি?

—আমি হাবু। ভাতছালায় আমাদের বাড়ী ছিল, মনে পড়ে?

—বিলির ধারের পদ্মফুল,

নাকের আগায় মোতির দুল,—

—ও রকম বোলো না। খেয়ে নাও, গায়ে বল পাবে।

—কি ?

—এই খাবার খেয়ে নাও—

—কে তুমি ?

—আমি হাবু, আমার বাবার নাম গঙ্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত মশাই ছিলেন, মনে পড়ে না ?

—হুঁ।

—তবে এই নাও খাবার। মা পাঠিয়েচে।

—ওখানে রেখে যাও—

—কুকুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি খেয়ে নাও, খেয়ে আমাদের বাড়ী চলো, মা যেতে বলচে।

—কে তুমি ?

—আমি হাবু। আমার বাবার নাম—

মতি আর কথা বললে না। যেন ঘুমিয়ে পড়লো। হাবু ছেলেমানুষ, আরও দু'তিনবার ডাকাডাকি করে কোনো উত্ত.. .া পেয়ে সে কচু বাটাটুকু ওর শিয়রের কাছে রেখে চলে এলো।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কিরে, মতি কই ? নিয়ে এলি নে ?

—সে ঘুমুচ্ছে মা। কি সব কথা বলে, আবোল-তাবোল, আমার তো ভয়ই হয়ে গেল। খাবার রেখে এসেচি তার শিয়রে।

— আর একবার গিয়ে দেখে আসবি একটু পরে।

—বাবাকে একটু যেতে বোলো, বাবা ফিরলে।

—তুই আর একটু পরে গিয়ে খাবারটুকু খাইয়ে আসবি—

আরও কিছুক্ষণ পরে হাবু গিয়ে দেখে এল মতি সেই একভাবেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। উঠলোও না, বা ওর সঙ্গে কোনো কথাও বললে না। কচুবাটা সেইভাবে ওর শিয়রের কাছেই পড়ে। হাবু অনেক ডাকাডাকি করলে, ও মতি-দিদি, ও মতি-দিদি—সন্ধ্যা হয়ে এল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ দেখা দিলে, বোধ হয় জল হবে। হাবু খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো বিষ্টিতে ভিজবে এখানে বসে থাকলে। মতি-দিদিও এখানে শুয়ে থাকলে ভিজে মরবে। এখন কি করা যায় ?

মাকে এসে ও সব কথা বললে।

অনঙ্গ-বৌ বললে, ময়নাকে নিয়ে যা, দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে এসে বাইরের পৈঁঠেতে শুইয়ে রেখে দে—

ময়না হাসিখুশি-প্রিয় চঞ্চলা মেয়ে।

—সে বললে—আমরা আনতে পারবো। কি জাত কাকীমা ?

—মুচি।

ময়না নাক সিঁটকে বললে—ও, মুচিকে ছুঁতে গেলাম বই কি এই ভরসন্দে বেলা? আমি পারবো না, আমি না বামুনের মেয়ে? বলেই হাসতে হাসতে হাবুর সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল।

দুজনে গিয়ে দেখলে মতি সেইভাবেই শুয়ে আছে, সেই একই দিকে ফিরে। ওর মাথার শিয়রে সেই কচুবাটা, পাশে একটা মাটির ভাঁড়।

ময়না গিয়ে ডাকলে, ও মতি—

কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

ময়না হাবুর চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধিসুদ্ধি তার আরও একটু পেকেচে, সে আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বললে, কাকাবাবু বাড়ী থাকেন তো ডেকে নিয়ে আয় দিকি!

হাবু বললে—কেন?

—আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে হাবু, একজন কোনো বড় লোককে ডেকে নিয়ে আয় দিকি!

এমন সময়ে দেখা গেল কাপালীদের ছোট-বৌ সে পথে আসচে। ময়না বললে—ও মাসি, শোনো ইদিকে—

—কি?

—এসে দেখে যাও, মতি-দিদি কথাবার্ত্তা বলচে না, এমন করে শুয়ে আচে কেন?

ছোট-বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভাল করে দেখলে।

মতি মারা গিয়েচে। সে আর উঠে কচুবাটা খাবে না, ভাঁড়েও আর খাবে না জল। তার জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, তা পথের ধারেই ফেলে রেখে সে পরপারে চলে গিয়েচে।

ছোট-বৌ আর ময়নার মুখে সব শুনে অনঙ্গ-বৌ হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

গ্রামে থাকা মুশকিল হয়ে পড়লো মতি মুচিনীর মৃত্যু হওয়ার পরে। অনাহারে মৃত্যু এই প্রথম, এর আগে কেউ জানত না বা বিশ্বাসও করে নি যে অনাহারে আবার মানুষ মরতে পারে। এত ফল থাকতে গাছে গাছে, নদীর জলে এত মাছ থাকতে, বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ও পাশের গ্রামে, তখন মানুষ কখনো না খেয়ে মরে? কেউ না কেউ খেতে দেবেই। না খেয়ে সত্যিই কেউ মরবে না।

কিন্তু মতি মুচিনীর ব্যাপারে সকলেই বুঝলে না খেলে মানুষে তাহলে তো মরতে পারে। এতদিন যা গল্পে-কাহিনীতে শোনা যেতো, আজ তা সম্ভবের গণ্ডির মধ্যে এসে পৌছে গেল। কই, এই যে একটা লোক মারা গেল না খেয়ে, কেউ তো তাকে খেতে দিলে না? কেউ তো তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না? সকলের মনেই একটা বিষম আশঙ্কার সৃষ্টি হোল। সবাই তো তা হোলে না খেয়ে মরতে পারে।

দুর্গা ভট্‌চায সেদিন দাওয়ায় বসে মতি মুচিনীর মৃত্যুদৃশ্য দেখলে। মনে মনে ভাবলে

এবার আমার এতগুলো ছেলেমেয়েকে খেতে দেবে কে? এদের ঘরে তো খাবার নেই। কোনোদিন এক খুঁচি কলাইয়ের ডাল, কোনোদিন বা একটা কুমড়ো, তাই সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া। দুর্গা ভট্‌চায বুড়ো মানুষ, ওর তাতে পেট ভরে না। পেটে খিদে লেগেই আছে, খিদে কোনদিন ভাঙে না। দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়চে। এমন ভাবে আর কদিন এখানে চলবে?

মতির মৃতদেহ আমতলাতেই পড়ে আছে। কত লোক দেখতে আসচে। দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে চলে যাচ্ছে। আজ যা ওর হয়েচে, তা তো সকলেরই হতে পারে! ও যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। একটি মূর্ত্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েচে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত।

দুর্গা ভট্‌চায বললে—তাই তো ভায়া, এখন কি করা যায়?

গঙ্গাচরণ সন্তুষ্ট ছিল না ওর ওপর। একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে ঘাড়ে বসে খাচ্চে এই বিপদের সময়। স্ত্রীর ভয়ে কিছু বলতেও পারা যায় না।

বিরক্ত স্বরে বললে—কি আর করা যাবে, সকলের যা দশা, আমাদেরও তাই হবে—

—না খেয়ে আর কড়া দিনই বা চলবে তাই ভাবচি। একটা হিল্লে না হলি যাই বা কোথায়?

—একটা হিল্লে কি এখানে বসে হবে, চেষ্টা করে দেখতে হবে।

অনঙ্গ-বৌ কাপড়ের ছোট্ট এতটুকু একটা পুঁটলি হাতে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে বললে—এতে কি আছে বলো তো? জ্যাঠামশাই বলুন তো এতে কি?

—কি জানি কি?

—এতে আছে শসার বীজ, নাউয়ের বীজ আর শাঁক আলুর বীজ। কাপালীদের ছোট-বৌ দিয়ে গিয়েচে। এ পুঁতে দেবো আমাদের উঠানে।

গঙ্গাচরণ বললে—সে আশায় এখন বসে থাক। কবে তোমার নাউ শসা ফলবে আর তাই খেয়ে দুঃখু এবার ঘুচবে। সবাইকে মরতে হবে এবার মতির মত।

অনঙ্গ-বৌ বললে—হাঁগা, মতির দেহটা ওখানে পড়ে থাকবে আর শেয়াল কুকুরে খাবে? ওর একটা ব্যবস্থা কর!

—কি ব্যবস্থা হবে?

—ওর জাতের কেউ এ গাঁয়ে নেই?

—থাকলেও কেউ আসবে না। কেউ ছোঁবে না মড়া।

—না যদি কেউ আসে, চলো আমরা সবাই মিলে মতির সৎকার করি গে। ওকে ওভাবে ওখানে পড়ে থাকতে দেবো না। ও বড় ভালবাসতো আমায়। আমারই কাছে মরতে এলো শেষকালে। ভালবাসতো বড্ড যে হতভাগী—

অনঙ্গ-বৌ আঁচলের ভাঁজ দিয়ে চোখ মুছলে।

হৃদয় সকলের থাকে না, যার থাকে তার আনন্দও যত, কষ্টও তত। অনঙ্গ-বৌ ছটফট

করচে মতির মৃতদেহটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে। কিছুতেই ওর মনে স্বস্তি পাচ্চে না। তার নিজের যে সে অবস্থা নয়, তাহলে সে আর ময়না দুজনে মিলে মৃতদেহটার সৎকার করে আসতো।

দুর্গা ভট্‌চায বললে—চলো ভায়া আমরা দুজনে যা হোক করে ওটির ব্যবস্থা করে আসি।

গঙ্গাচরণ একটু অবাক হয়ে গেল। দুর্গা ভট্‌চাযের মুখে এত পরোপকারের কথা! কিন্তু কার মধ্যে কি থাকে বোঝা কি যায়? সত্যিই সে তা করলেও শেষ পর্য্যন্ত। দুর্গা ভট্‌চায আর গঙ্গাচরণ আর কাপালীদের ছোট-বৌ।

আরও দু'দিন কেটে গেল।

শোনা গেল গ্রাম ছেড়ে অনেক লোক পালাচ্চে।

রাত্রির মধ্যে অর্দ্ধেক লোক চলে গিয়েচে কাপালীপাড়া থেকে!

কাপালীদের ছোট-বৌ সকালে এসে জানালে অনঙ্গ-বৌকে, সেও চলে যাচ্চে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কোথায় যাবি রে?

—সবই যেখানে যাচ্চে—শহরে! সেখানে গেলে গোরমেণ্টো নাকি খেতে দেচ্চে।

—কে বললে?

—শোনলাম, সবাই বলচে।

—কার সঙ্গে যাবি? তোর স্বামী যাবে?

—সে তো বাড়ী নেই। সে আজ দিন পাঁচ-সাত বেগুন বেচতে গিয়েচে শহরের হাটে। আর আজও তো ফিরল না।

—কোথায় গেল?

—তা কি করে বলবো? তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।

—তুই যেতে পারবি নে। আমার কথা শোন্ ছুট্‌কি, তোর অল্প বয়স, নানা বিপদ পথে মেয়েমানুষের। আমার কাছে থাক তুই। আমি যদি খেতে পাই তুইও পাবি। আমার ছোট বোনের মত থাকবি। যদি না খেয়ে মরি, দুজনেই মরবো।

কাপালী-বৌ সাতপাঁচ ভেবে চুপ করে রইল। অনঙ্গ-বৌ বললে—কথা দে, যাবি নে।

—তুমি যখন বলচো দিদি, তোমার কথা ঠেলতে পারি নে। তাই হবে।

—যাবি নে তো?

—না। দাঁড়াও দিদি, আমি চট করে এক জায়গা থেকে আসি। এখুনি আসচি।

ইটখোলার পাশে অশথতলায় যদু-পোড়া অপেক্ষা করচে। বেলা আটটার বেশি নয়। ওকে দেখে বললে—এই বুঝি তোমার সকাল বেলা? ইটখোলার কুলিদের হাজরে হয়ে গেল, বেলা দুপুর হয়েচে। ওবেলা কখন গাড়ী নিয়ে আসব? সন্দের সময়?

ছোট-বৌ বললে—গাড়ী আনতে হবে না।

যদু-পোড়া আশ্চর্য্য হওয়ার সুরে বললে—আনতে হবে না গাড়ী? তার মানে কি? হেঁটে

যাবে ? পথ তো কম নয়—

ছোট-বৌ হাত নেড়ে নেড়ে বেশ ভঙ্গি করে কৌতুকের স্বরে বললে—হাঁটবোও না, যাবোও না—

—যাবে না মানে ?

—মানে, যাবো না।

যদু-পোড়া রাগের স্বরে বললে—যাবে না তবে আমাকে এমন করে নাচালে কেন ?

—বেশ করিচি।

কথা শেষ করেই কাপালী-বৌ ফিরে চলে আসবার জন্যে উদ্যত হয়েচে দেখে যদু-পোড়া দাঁত খিঁচিয়ে বললে—না খেয়ে মরছিলে বলে ব্যবস্থা করছিলাম। না যাও, মরো না খেয়ে।

কাপালী-বৌ কোনো উত্তর না দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

যদু-পোড়ো চেঁচিয়ে ডাক দিলে—শুনে যাও, একটা কথা আছে—

কাপালী-বৌ একবার দূর থেকে চেয়ে দেখলে পিছন ফিরে। একটু ইতস্তত: করলে। তারপর একেবারেই চলে গেল।

জন্ম ও মৃত্যু

যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ

আপনারা একালে যদু হাজরার নাম বোধ হয় অনেকেই শোনেন নি।

আমাদের বাল্যকালে কিন্তু যদু হাজরাকে কে না জানত? চব্বিশ-পরগণা থেকে মুরশিদাবাদ এবং ওদিকে বর্দ্ধমান থেকে খুলনার মধ্যে যেখানেই বাজারে বা গঞ্জে বড় বারোয়ারীর আসরে যাত্রা হ'ত সে সব স্থানে দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত যদু হাজরার নাম লোকের মুখে মুখে বেড়াত। কাঠের পুতুল চোখ মেলে চাইত—যদু হাজরার নাম শুনলে। আপনারা কেউ কি যদু হাজরাকে 'নল দময়ন্তী' পালাতে নলে-র পার্ট করতে দেখেন নি? তা হলে জীবনের বহু ভালো জিনিসের মধ্যে একটা সেরা ভালো জিনিস হারিয়েছেন।

আমি দেখেছি।

সে একটা অদ্ভুত দিন আমার বাল্য জীবনে। তখন আমার বয়স হবে বার কি তের। আমাদের গ্রামের একটি নববিবাহিতা বধূর বাপের বাড়ীতে কি একটা কাজ উপলক্ষে, নব বধূটিকে নৌকো করে তার বাড়ীতে আমাকেই রেখে আসতে হবে ঠিক হ'ল।

পৌষ মাস। খুব শীত পড়েছে। বধূটি গ্রাম-সম্পর্কে আমার গুরুজন, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ও বটে। দুজনে গল্পগুজবে সারাপথ কাটালুম। তাঁর বাপের বাড়ী পৌছে আমি কিন্তু পড়লুম একটু মুশকিলে। মস্ত বড় বাড়ী; উৎসব উপলক্ষে অনেক জায়গা থেকে আত্মীয়-কুটুম্বের দল এসেছে, তার মধ্যে দুটি শহর অঞ্চলের চালাক চতুর জ্যাঠা ছেলে আমার বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। আরও এত ছেলে থাকতে তারা আমাকেই অপ্রতিভ কোরে কেন যে এত আমোদ পেতে লাগল, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারি না।

একটি ছেলের বয়স বছর পনের হবে। রং ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে, সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে—নাম ছিল যতীন, নামটা এখনও মনে আছে—সে আমাকে বললে—কি পড়?

আমি বললাম—মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি।

সে বললে—বলত হাঁচি মাইনাস কাসি কত?

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক্।

বাঙ্গালা স্কুলে পড়ি, "মাইনাস্" কথার মানে তখন জানিনে। তা ছাড়া একি অদ্ভুত প্রশ্ন! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে অমনি আবার জিজ্ঞাসা করল—"হবগবলিন" মানে কি?

আমি ইংরাজী পড়ি বটে কিন্তু সে সুশীল ও সুবোধ আবদুলের গল্প, দারোয়ান ও জেলের গল্প, বড় জোর গুটিপোকা ও রেশমের কথা। সে সবের মধ্যে ঐ অদ্ভূত কথাটা নেই; লজ্জায় লাল হয়ে বললুম—পারব না।

কিন্তু তাতেও আমার রেহাই নেই। ভগবান সেদিন লোক-সমাজে আমাকে নিতান্ত হেয় প্রমাণিত করতেই বোধ হয় যতীনকে ওদের বাড়ীতে হাজির করেছিলেন। সে দু'হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত ক'রে আমার সামনে দেখিয়ে বললে—এতগুলো কলা যদি এক পয়সা

হয়—তবে পাঁচটি কলার দাম কত ?

আমি বিষণ্ন মুখে ভাবছি, ওর দু'হাতের মধ্যে কতগুলো কলা ধরতে পারে—সে খিলখিল করে হেসে উঠে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে আমার মাইনর স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে অর্জিত বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপন্ন করলে।

তারপর থেকে আমি তাকে ভংে-ভয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। বয়স তার আমার চেয়ে বেশিও বটে, শহর অঞ্চলে ইংরাজী স্কুলে পড়েও বটে, দরকার কি ওর সঙ্গে মিশে ? তা ছাড়া চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি আর কত অপমানই বা সহ্য করি !

কিন্তু সে আমায় যতই জ্বালাতন করুক, জীবনে সে আমার একটা বড় উপকার করেছিল—সে জন্যে আমি তার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ। সে যদু হাজরার অভিনয় আমাকে দেখিয়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে আমায় বললে—এই, কি নাম তোমার, রাজগঞ্জের বাজারে বারোয়ারী হবে, শুনতে যাবে ?

রাজগঞ্জ ওখান থেকে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ। হেঁটেই যেতে হবে, কিন্তু যাত্রা শুনবার নামে আমি এত উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম যে, এই দীর্ঘ পথ এর সাহচর্য্যে অতিক্রম করবার যন্ত্রণার দিকটা একেবারেই মনে পড়ল না।

তথাপি সারা পথ যতীন ও তার দলের তারই বয়সী জন-কয়েক ছোকরা অশ্লীল কথাবার্ত্তা ও গানে আমাকে নিতান্ত উত্যক্ত করে তুললে। আমি যে বাড়ীর আবহাওয়ায় মানুষ,—আমার বাবা, মা, জ্যাঠামশায় সকলেই নিতান্ত বৈষ্ণব প্রকৃতির। প্রায় আমারই বয়সী ছেলের মুখে ওরকম টপ্পা ও খেউড় শুনে আমার অনভিজ্ঞ বালক-মনের নীতিবোধ ক্রমাগত ব্যথা পেতে লাগল।

ওরা কিন্তু আমায় রাজগঞ্জের বাজারে পৌছে একেবারে রেহাই দিলে। সেই অপরিচিত জন-সমুদ্রে আমায় একা ফেলে ওরা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—আমি কোন সন্ধানই করতে পারলুম না।

যাত্রা বোধ হয় রাত্রে, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, বারোয়ারীর খুব বড় আসর, অনেক ঝাড়-লণ্ঠন টাঙিয়েছে—বাঁশের জাফরীর গায়ে লাল-নীল কাগজের মালা ও ফুল, আসরের চারিধারে রেলিং দিয়ে ঘেরা, রেলিং-এর মধ্যে বোধ হয় ভদ্রলোকদের বসবার জায়গা—বাইরে বাজে লোকদের।

রাজগঞ্জের বাজারে আমি জীবনে আরও দু'একবার বাবার সঙ্গে এর আগে না যে এসেছি এমন নয়, কিন্তু এখানে না আমি কাউকে চিনি, না আমাকে কেউ চেনে। রেলিং-এর ভিতরে জায়গা আমার মত ছোট ছেলেকে কেউ দিলে না—আমিও সাহস করে তার মধ্যে ঢুকতে পারলুম না, বাইরে বাজে লোকদের ভিড়ের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে ইট পেতে বসতে গেলুম—তাতেও নিস্তার নেই—বারোয়ারীর মুরুব্বি পক্ষের লোকেরা এসে আমাদের সে জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বিশিষ্ট লোকদের জন্যে বেঞ্চি আনিয়ে পাতিয়ে দেয়,—আবার

যেখানে গিয়ে বসি, সেখানেও কিছুক্ষণ পরে সেই অবস্থা। অতি কষ্টে আসরের কোণের দিকে দাঁড়াবার জায়গা কোন মতে খুঁজে নিলুম। অন্যান্য বাজে লোকদের কি কষ্ট! তারা প্রায়ই চাষাভূষো লোক, পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে থেকে পর্য্যন্ত অনেকে মহা আগ্রহে যাত্রা শুনতে এসেছে—এই শীতে তারা কোথায়ও বসবার জায়গা পায় না, কেউ তাদের বসবার বন্দোবস্ত করে না—স্টেশন মাস্টারবাবু, মালবাবু, কেরানীবাবু ও পোস্ট মাস্টারবাবুদের যত্ন করে বসাতে সবাই মহা ব্যস্ত।

যাত্রা আরম্ভ হ'ল। নল-দময়ন্তীর পালা। একটু পরেই যদু হাজরা "নল" সেজে আসরে ঢুকতেই—তখন হাততালির রেওয়াজ ছিল না—চারিদিকে হরিধ্বনি উঠল। অত বড় আসর মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ও নীরব হ'য়ে গেল।

আমি যদু হাজরার নাম কখনো এর আগে শুনিনি, এই প্রথম শুনলুম। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম, শ্যামবর্ণ, সুপুরুষ—বয়স তখন বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, ত্রিশও হ'তে পারে, পঞ্চাশও হ'তে পারে। কিন্তু কি কথা বলবার ভঙ্গি, কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত-পা নাড়ার ঢং। আমার এগারো বৎসরের জীবনে আর কখনো অমনটি দেখিনি। ভিড়ের কষ্ট ভুলে গেলুম, কিছু খেয়ে বেরুই নি, খিদেতে পেটের মধ্যে যেন বোল্‌তায় হুল ফোটাচ্ছে—সে কথা ভুললুম যাত্রা থেমে গেলে এত রাত্রে একা অজানা স্থানে শীতে কোথায় যাব—সে সব কথাও ভুলে গেলুম—পঞ্চ দেবতা পঞ্চ নলরূপে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় এসে বসেছেন, আসল "নল"-রূপী যদু হাজরা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে বলছেন—

এ কি হেরি চৌদিকে আমার—
মম সম রূপ নল চতুষ্টয়
মম সম সাজে সাজি বসিয়াছে
সভা মাঝে
বুঝিতে না পারি কিবা মায়াজাল
ইষ্টদেব,
পুরাও বাসনা মোর, মায়া জাল ফেল ছিন্ন করি।

এমন সময়ে বরমালা হস্তে দময়ন্তী সভায় প্রবেশ করতেই নল বলে উঠলেন—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে
আনন্দ-বারতা? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে।—

অপর চার জনও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে
আনন্দ-বারতা? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে।—

প্রকৃত নলের তখন বিমূঢ় দৃষ্টি !

তারপরে বনে-বনে ভ্রাম্যমাণ রাজ্যহীন সহায়-সম্পদহীন উন্মত্ত নলের সে কি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী চিত্র ! কতকাল তো হয়ে গেল, যদু হাজরার সে অপূর্ব্ব অভিনয় আজও ভুলিনি। চোখের জল কতবার গোপনে মুছলুম সারারাত্রির মধ্যে, পাছে আশেপাশের লোক কান্না দেখ্‌তে পায়, কতবার হাঁচি আনবার ভঙ্গীতে কাপড় দিয়ে মুখ চেপে রাখলুম। যাত্রা শেষরাত্রে ভাঙ্‌ল। কিন্তু পরদিনও আবার যাত্রা হবে শুনে আমি বাড়ী গেলুম না। একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে আবার- যাত্রা হ'লো—শিখিধ্বজের পালা। যদু হাজরা সাজলে শিখিধ্বজ। এটা নাকি তার বিখ্যাত ভূমিকা, শিখিধ্বজের ভূমিকায় যদু হাজরা আসর মাতিয়ে পাগল করে দিলে ! সেই একরাত্রের অভিনয়ের জন্যে চার পাঁচখানা সোনা ও রূপোর মেডেল পেলে যদু হাজরা। যাত্রা ভাঙ্‌ল যখন তখন রাত বেশি নেই। আসরে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে সকালে একা নিজের গ্রামে ফিরে এলুম।

তারপর কয়েক বছর কেটেছে। তখন আমি আরও একটু বড় হয়েছি--স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি। যদু হাজরার কথা প্রায় এর ওর মুখে শুনি। যেখানেই যাত্রা দলের কথা ওঠে, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যাত্রা দলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা যদু হাজরা !

আমি কিন্তু বহুদিন যদু হাজরাকে আর দেখলুম না।

এর অনেক কারণ ছিল।

আমি দূরে শহরের স্কুল-বোর্ডিং-এ গেলুম।

মন গেল লেখাপড়ার দিকে, ধরাবাঁধা রুটিনের মধ্যে জীবনের মুক্ত গতি বন্ধ হ'য়ে পড়ল। এ্যালজেব্রার আঁক, জ্যামিতির একস্ট্রা, ইংরাজী ভাষার নেশা, ফুটবল, ডিবেটিং ক্লাব, খবরের কাগজ—জীবনের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন এনে দিলে। ছেলেবেলার মতো যে যেখানে যাত্রার নাম শুনব সেখানেই দৌড়ে যাব—তা কে জানে চার ক্রোশ, কে জানে ছ' ক্রোশ—এমন মন ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। ইচ্ছে হ'লেও হয়তো স্কুলের ছুটি থাকে না, স্কুলের ছুটি থাকলেও বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাড়তে চান না—নানা উৎপাত।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলুম, থিয়েটার কাকে বলে জানতুম না। যে শহরে পড়তুম, সেখানে উকিল-মোক্তারদের একটা থিয়েটার ক্লাব ছিল, তাঁরা একবার থিয়েটার করলেন, পালাটা ঠিক মনে নেই—বোধ হয় "প্রতাপাদিত্য"। ভাষা ও ঘটনার বিন্যাসে থিয়েটারের পালা আমাকে মুগ্ধ করল—ভাবলুম যাত্রা এর চেয়ে ঢের খারাপ জিনিস। প্লটের এমন বাঁধুনী তো যাত্রার পালাতে নেই ? তারপর অনেকবার উকিলদের ক্লাব থিয়েটার দেখলুম—ছেলেবেলার মন ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে, বাজারে যাত্রা হ'ল বারোয়ারীর সময়ে, কলকাতার দল, কিন্তু তাতে আগেকার মতো আনন্দ পেলুম না।

তারপর কলকাতায় এলুম। তখন নতুন মতের অভিনয় সবে কলকাতায় শুরু হয়েছে। বড় বড় বহু বিখ্যাত নটদের অভিনয় দেখবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম ঘটল, তাদের নানা

পালাতে নানা অভিনয় দেখলুম,—বিলিতী ফিল্মে বিশ্ব-বিখ্যাত নটদের অভিনয় অনেকদিন ধরে দেখলুম—মানুষ ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়, উকিল-মোক্তারদের প্রধান অভিনেতা গুরুদাস ঘোষ—যাকে এতকাল মনে মনে কত বড় বলে ভেবে এসেছি—এখন তার কথা ভাবলে আমার হাসি পায়।

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকুরি করি। কলকাতার থিয়েটারের অভিনেতারাও তখন আমার কাছে পুরোনো ও একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে—থিয়েটার দেখাই দিয়েছি ছেড়ে। ফিল্ম্ সম্বন্ধেও তাই। খুব নামজাদা অভিনেতা না থাকলে সে ছবি দেখতে যাইনে—যাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি একদিন—এখন তাদের অনেকের সম্বন্ধেই মত বদলেছি।

এই যখন অবস্থা, তখন কি একটা ছুটিতে বাড়ী গিয়ে শুনি দেশে বারোয়ারী। শুনলুম, কলকাতা থেকে বড় যাত্রার দল আসছে—দেড়শো টাকা এক রাত্রির জন্যে নিয়েছে, এমন দল নাকি এদেশে আর কখনও আসে নি। ভালো বিলিতী ফিল্ম্ই দেখিনে, থিয়েটার দেখাই ছেড়ে দিয়েছি ভালো লাগে না ব'লে—এ অবস্থায় রাত জেগে যাত্রা দেখবার যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মনে জাগবে না—একথা বলাই বাহুল্য। যাত্রা আবার কি দেখব! নিতান্ত বাজে জিনিস—কে কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে লোকের ভিড়ে বসে যাত্রা দেখ্‌তে যাবে?

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা ছাড়লেন না। বারোয়ারীর কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ বিশেষ অনুরোধ করে গেলেন—আমার যাওয়া চাই-ই। কি করি, ভদ্রতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। খানিকটা দেখে না হয় উঠে এলেই হবে। নিতান্ত না যাওয়াটা ভালো দেখাবে না হয় তো—বিশেষ দেশে যখন তত বেশি যাতয়াত নেই।

সন্ধ্যার সময় যাত্রা বসল। যাত্রা জিনিসটা দেখিনি অনেককাল—দেখে বুঝলুম সেকালের যাত্রা আর নেই। জুড়ির গান, মেডেলধারী বেহালাদারদের দীর্ঘ কসরৎ—এ সব অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সলমা-চুমকীর কাজ করা সাজ-পোশাকও আর নেই—কলকাতার থিয়েটারের হুবহু অনুকরণ যেমন সাজ-পোশাকে, তেমনি তরুণ অভিনেতাদের অভিনয়ের ঢঙে। এমন কি কয়েকজন অভিনেতার বলবার ধরন, মুখভঙ্গি ও হাত-পা নাড়ার কায়দা, কলকাতার স্টেজের কোন কোন নামজাদা বিশিষ্ট অভিনেতার মতো। দেখলুম, আসরের শ্রোতার দলের মধ্যে যারা তরুণ বয়স্ক তাদের কাছে এরা পেলে ঘন ঘন হাততালি। কেউ কেউ বললে—ওঃ, কি চমৎকার নকলই করেছে কলকাতার স্টেজের অমুককে—বাস্তবিক দেখবার জিনিস বটে!

এমন সময়ে আসরে ঢুকলো একজন মোটা কালো ও বেঁটে লোক। কিসের পার্টে তা আমার মনে নেই। লোকটির বয়স ষাটের উপর হবে, তবে স্বাস্থ্যটা ভালো। কেউ তার বেলা একটা হাততালি দিলে না, যদিও সে দর্শকদের খুশি করার জন্যে অনেক রকম মুখভঙ্গি করলে, অনেক হাত-পা নাড়ালে। আমার সঙ্গে একদল স্কুলের ছেলে বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল—এ বুড়োটাকে আবার কোথা থেকে জুটিয়েছে? দেখতে যেন

একটা পিপে। এ্যাক্টিং করছে দেখ্‌না ঠিক যেন সঙ!

পাশের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—ও এককালে খুব নামজাদা এ্যাক্টার ছিল হে, তখন তোমরা জন্মাও নি। ওর নাম যদু হাজরা।

আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইলুম, তারপর একবার বৃদ্ধ অভিনেতাটির দিকে চাইলুম। বাল্য দিনের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। সেই কনকনে শীতের রাত্রি, সেই শহুরে ডেঁপো-ছেলেদের সঙ্গ, সেই তারা আমাকে ফেলে কোথায় পালাল—তারপর বাড়ী থেকে অনেক দূরে এক অপরিচিত গঞ্জের বারোয়ারী আসরে ময়রার দোকানে খাবার খেয়ে আমার সেই একা বিদেশে দু'দিন কাটানো! সে রাত্রে যার অভিনয় দেখে আমার বালক মন মুগ্ধ বিস্মিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—সেই যদু হাজরা এই?

এক সময়ে তার যে ধরণের মুখভঙ্গি দেখে ও কথাবার্ত্তার উচ্চারণ শুনে দর্শকেরা আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে উঠত, আজও যদু হাজরা সেই সব হুবহু করে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে—অথচ দর্শকেরা খুশি নয় কেন? খুশি তো দূরের কথা, তাদের মধ্যে অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে কেন, ব'সে ব'সে এই কথাটাই ভাবলুম।

মন যেন কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। অপর লোকের কথা কি, আমারই তো যদু হাজরার হাব-ভাব হাস্যকর ঠেকছে! কেন এমন হয়?

বাল্য দিনের সেই যাত্রার আসরে এঁকে আমি দেখেছিলুম, এঁর সেই অভিনয় এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির সঙ্গে রাজার কনিষ্ঠা পত্নী ভ্রষ্টা, রাজা একদিন দুজনকে নির্জ্জনে প্রেমালাপে নিমগ্ন দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। কি ভেবে বললেন —'মধুছন্দা, আমি প্রৌঢ়, তুমি তরুণী, এই বয়সে তোমায় বিবাহ করে ভুল করেছি। তোমায় আমি এখনও ভালোবাসি, প্রাণে মারবো না—তোমরা দুজনে আমার চোখের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাত ধরাধরি করে চলে যাও। কিন্তু আমার রাজ্যের বাইরে। আর কখনো তোমাদের মুখ না দেখি।' ওরা ধরা পড়ে দুজনে ভয়ে ও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। রাজার সামনে একাজ কেমন করে করবে? হাত ধরাধরি করে কেমন করে যাবে? রাজা তলোয়ার খুলে বললেন—'যাও, নইলে দুজনকেই কেটে ফেলব—ঠিক ওই ভাবেই যাও।'

শেষে তারা তাই করতে বাধ্য হ'ল। রাজা স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে ছিলেন—তারা যখন কিছুদূর চ'লে গিয়েছে, তখন তিনি হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুক্ত তলোয়ার হাতে 'হা—হা—হা' রবে একটা চিৎকার করে তাদের দিকে ছুটে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে তারাও আসরের বাইরে চলে গেল। মনে আছে রাজার সেই চমৎকার ভঙ্গিতে, তার হতাশ 'হা—হা' রবের মধ্যে এমন একটা ট্রাজিক সুর ছিল, আসরসুদ্ধ দর্শককে তা বিচলিত করেছিল। আমি তখন যদিও নিতান্ত বালক, কিন্তু আমার মনে সেই দৃশ্যটি এমন গভীর দাগ দিয়েছিল যে, এই এত বয়সেও তা ভুলিনি।

পরের দিন যদু হাজরার সঙ্গে দেখা হ'ল। ওদের যেখানে বাসা দিয়েছে, তার সামনে

একটা টুলের উপর বসে সে তামাক টানছে। আমি বললুম—কাল আপনার পার্ট বড় চমৎকার হয়েছে। বৃদ্ধ আগ্রহের সুরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভালো লেগেছে? বললুম—চমৎকার! এমন অনেক দিন দেখিনি!

কথাটার মধ্যে সত্যের অপলাপ ছিল। বৃদ্ধ খুব খুশি হ'ল, মনে হ'ল প্রশংসা জিনিসটা বেচারীর ভাগ্যে অনেকদিন জোটেনি। আসরে কাল যখন তরুণ অভিনেতাদের বেলায় ঘন ঘন হাততালি পড়েছে, যদু হাজরার ভাগ্যে সে জায়গায় বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি।

বৃদ্ধ বললে—আপনি বোঝেন তাই আপনার ভালো লেগেছে। আর মশায় সেদিন আছে? এখনকার সব হয়েছে আর্ট—আর্ট, সে যে কি মাথামুণ্ডু তা বুঝিনে। বৌ-মাস্টারের দলে ভৃগু সরকার ছিল। রাবণের পার্টে অমন এ্যাক্টো আর কেউ কখনও করবে না। আমি সেই ভৃগু সরকারের শাগরেদ—বুঝলেন? আমায় হাতে ধরে শিখিয়েছেন তিনি। মরবার সময় আমার হাত ধ'রে ব'লে গেলেন—যদু, তোমায় যা দিয়ে গেলাম, তোমার জীবনে আর ভাবনা থাকবে না!

আমি বললুম—এ বয়সে আপনি আর চাকুরি কেন করেন?

—না ক'রে কি করি বলুন? বড় ছেলেটি উপযুক্ত হয়েছিল, আজ বছর দুই হ'ল কলেরা হয়ে মারা গেল। তার সংসার আমারই ওপর, নাতনীটির বিয়ে দিতে হবে আর কিছুদিন পরেই। পয়সা আগে যা রোজগার করেছি হাতে রাখতে পারিনি। এখন আর তেমন মাইনেও পাইনে। দেড়শো টাকা পর্য্যন্ত মাইনে পেয়েছি এক সময়—আমার জন্যে অধিকারী আলাদা দুধ বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, যখন ভূষণ দাসের দলে থাকতাম। এখন পাই পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। আর সতীশ ব'লে ওই-যে ছোকরা কাল রামের পার্ট করলে—সে পায় আশি টাকা। ওরা নাকি আর্ট জানে। আপনিই বলুন তো, কাল ওর পার্ট ভালো লাগল আপনার, না আমার পার্ট ভালো লাগল? এখনকার আমলে ওদেরই খাতির বেশি অধিকারীর কাছে। আমাদের চাকরি বজায় রাখাই কঠিন হয়েছে।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, যদু হাজরার এতদিন বেঁচে থাকাটাই উচিত হয়নি। চল্লিশ বছর আগে তরুণ যদু হাজরাকে বৌ-মাস্টারের দলের ভৃগু সরকার যে ভাবে হাত-পা নাড়বার ভঙ্গি ও উচ্চারণের পদ্ধতি শিখিয়েছিল, বৃদ্ধ যদু হাজরা আজও যদি তা আসরে দেখতে যায়, তবে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য হবে না—একথা তাকে বলি কেমন করে? কালের পরিবর্ত্তন তো হয়েছেই, তাছাড়া তরুণ বয়সে যা মানিয়েছে এ বয়সে তা কি আর সাজে?

এই ঘটনার বছর পাঁচ ছয় পরে নেবুতলার গলি দিয়ে যাচ্ছি; একটা বেনেতি মশলার দোকানে দেখি যদু হাজরা বসে আছে। দেখেই বুঝলুম দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে সে ঠেকেছে। পরনে অর্দ্ধমলিন থান, পিঠের দিক্টা ছেঁড়া এক ময়লা জামা গায়ে। আমায় দেখে সে চিনতে পারলে না। আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বললুম—আপনি চিনতে পারুন আর না-ই পারুন, আপনাকে না চেনে কে! আগুন কি ছাই চেপে ঢেকে রাখা যায়? তা

এখন বুঝি কলকাতায় আছেন ?

বৃদ্ধের চোখে জল এল প্রশংসা শুনে। বললে, আর বাবু মশায়, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। এই দেখুন, আজ তিনটি বছর চাকুরি নেই। কোন দলে নিতে চায় না। বলে, আপনার বয়স হয়েছে হাজরা মশাই, এ বয়সে আর আপনার চাকরি করা পোষাবে না, আসল কথা আমাদের আর চায় না। ভালো জিনিসের দিন আর নেই, বাবু মশায়। এখানকার কালে সব হয়েছে মেকি। মেকির আদর এখন খাঁটি জিনিসের চেয়ে বেশি। আমার গুরু ছিলেন বৌ-মাস্টারের দলের ভৃগু সরকার, আজকালকার কোন্ ব্যাটা অ্যাক্‌টার ভৃগু সরকারের পায়ের ধুলোর যুগ্যি আছে ? 'রাই উন্মাদিনী' পালায় আয়ানঘোষের পার্টে যে একবার ভৃগু সরকারকে দেখেচে—

আরও বার কয়েক প্রশংসা ক'রে এই ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নটকে শান্ত করলুম। জিজ্ঞাসা ক'রে ক্রমশ জানলুম এই মশলার দোকানই বৃদ্ধের বর্ত্তমান আশ্রয় স্থল। কাছেই গলির মধ্যে কোন ঠাকুরবাড়ীতে এক বেলা খেতে দেয়, রাত্রে এই দোকানটাতে শুয়ে থাকে। দোকানের মালিক বোধ হয় ওর জানাশোনা।

কার্য্যোপলক্ষ্যে গলিটা দিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করি, আর ফিরবার সময়ে যদু হাজরার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করি। একদিন বৃদ্ধ বললে—বাবু মশাই, একটা কথা বলব ? একদিন একটু মাংস খাওয়াবেন ? কতকাল খাইনি।

একটা ভালো রেস্টোরেণ্টে তাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালুম। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হ'ল, বৃদ্ধ কতদিন ভালো জিনিস খেতে পায়নি। তারপর দুজনে একটা পার্কে গিয়ে বসলুম। রাত তখন নটা বেজে গিয়েছে। শীতকাল, অনেকে পার্ক থেকে চলে গিয়েছে। একটা বেঞ্চে বসে বৃদ্ধ নিজের সম্বন্ধে কত কথাই বললে। কোন্ জমিদার কবে তাকে আদর করে ডেকে নিজের হাতে সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার অভিনয় দেখে কবে কোন্ মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল, হাতীবাঁধার রাজা নিজের গায়ের শাল খুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলতে বলতে মাঝে মাঝে যেন ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েচে। পঁচিশ বৎসর আগের কোন তরুণী প্রেমিকার হাসিমাখা চাহনি ওর আবেশ-মধুর যৌবনদিনগুলির উপর স্পর্শ রেখে গিয়েচে—কে জানে সেই সব দিন, সেই সব বিস্মৃতপ্রায় মুখ ও মনে আনবার চেষ্টা করছিল কিনা। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—শিখিধ্বজ আর মধুচ্ছন্দার সেই অভিনয় আমার বড় ভালো লাগে, সেই যখন রাজা বললেন, 'তোমরা প্রেমিক প্রেমিকার মত হাত-ধরাধরি করে চলে যাও'—সেই জায়গাটা এখনও ভুলিনি।

বৃদ্ধ নট সোজা হয়ে বসল। তার চোখে যৌবন-কালের এই হারানো দীপ্তি যেন ফিরে এল। বললে—ওঃ, সে কত কালের কথা যে! ও পালা গেয়েছি প্রসন্ন নিয়োগীর দলে থাকতে। দেখবেন – করে দেখাব ?

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম—মনে আছে আপনার ? দেখান না ?

ভাগ্যে পার্কে তখন বিশেষ কেউ ছিল না। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল—আমি হলুম মধুচ্ছন্দা।

ও নিজের পার্ট ব'লে যেতে লাগল—দেখলুম কিছুই ভোলেনি। শেষে আমার দিকে ফিরে জলদ-গম্ভীর স্বরে বললে—যাও মধুছন্দা, তোমরা দুজনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাত ধরাধরি করে চলে যাও। তারপর আমি কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধ তার সেই পুরানো ট্র্যাজিক স্বরে 'হা-হা-হা-হা' করে আমার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এল। সত্যই কি অপূর্ব্ব সে স্বর! কি অপূর্ব্ব ভঙ্গি! ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নট তার জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি ওর মধ্যে ঢেলে দিলে। যেন সত্যই ও ভগ্নহৃদয় প্রৌঢ় রাজা শিখিধ্বজ, অবিশ্বাসিনী মধুছন্দা ওকে উপেক্ষা ক'রে তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে চলে গেল! অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে বৃদ্ধ যদু হাজরা ত্রিশ বছর আগেকার তরুণ নট যদু হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেল।

এই যদু হাজরার শেষ অভিনয়। এর মাস-খানেক পরে একদিন নেবুতলায় সেই মশলার দোকানটাতে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলুম সে মারা গিয়েছে।

জন্ম ও মৃত্যু

জীবনের মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ব্যাপার ঘটে। ভেবে দেখবার ও উপভোগ করবার জিনিস হিসেবে সেগুলোর মূল্য বড় কম নয়। সম্প্রতি আমার অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যেই এমনই একটা ঘটনা এসে পড়েছিল—ঠিক একটা ঘটনা না ব'লে বরং তাকে দুটো ঘটনার সমষ্টিই বলা যেতে পারে।

মধুপুরে একটা বাড়ী ভাড়া করবার দরকার ছিল—এক জায়গায় সন্ধান পেলাম—ভবানীপুরের এক ভদ্রলোকের বাড়ী আছে মধুপুরে এবং তিনি সেটা ভাড়া দেবেন। সকাল বেলা তাঁর ওখানে গেলাম, বেলা তখন দশটা। ভবানীপুরে ভদ্রলোক যে বাড়ীতে থাকেন তা বেশ বড় বাড়ী। বাইরে সুসজ্জিত বৈঠকখানা, কিন্তু তিনি তখন বৈঠকখানার পাশে একটা ছোট ঘরের তক্তাপোশের উপর ব'সে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোক বৃদ্ধ, বয়সে পঁয়ষট্টির কাছাকাছি মনে হ'ল। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর বয়সের সম্বন্ধে আমার মনে কোন কল্পনার স্থান রাখলেন না। বললেন—আসুন, আসুন, বড় ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মতিথি কি-না, তাই বাড়ীতে একটু উৎসব গোছের আছে। তা বেশ, এসেছেন যখন আপনাকেও ছাড়ছিনে—ইত্যাদি।

কারুর জন্মতিথি উৎসবে যে ভাবে তাকে মিষ্টকথা বলবার কথা—ভদ্রলোককে আমি তা বললাম। কাজের কথাটা এই উৎসবের দিনে কি ভাবে পাড়া যায়? বা কতক্ষণ ধ'রে জন্মতিথিতে মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা বলবার পরই বা কাজের কথা পাড়া সুষ্ঠু হবে—কিংবা আজকার দিনে বাড়ী ভাড়ার দরদস্তুররূপ ইতরজনোচিত কথাবার্ত্তা বলা আদৌ শোভন হবে কি-না—ইত্যাদি মনে মনে তোলা-পাড়া করছি এমন সময়ে একটি সুন্দরী তরুণী হাসিমুখে বড় একটা ফুলের তোড়া হাতে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে একটি যুবক। গৃহকর্ত্তা

ব'লে উঠলেন—এই যে অরুণা এসেছিস্ দিদি—ওঃ, পেছনে যে নির্ম্মলকে গাঁটছড়া বেঁধে এনে হাজির করেছিস্—ছেড়ে আসা যায় না বুঝি? বেশ বেশ, আমরা হয়ে গিয়েছি এখন বুড়োহুড়ো—

তরুণী ফুলের তোড়াটি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে প্রণাম ক'রে এবং হাসিমুখে বৃদ্ধের গালে ছুটি ঠোনা মেরে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল, যুবকটিও গেল পেছনে পেছনে। বৃদ্ধ বললেন—আমার নাতনী—আমার বড় ছেলের মেয়ে। আই এ পাস—ও বছর বিয়ে হয়েছে—স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, বিলেত-ফেরত, কর্পোরেশনে ভালো চাকরি পেয়েছে।

কথা তখনও ভালো ক'রে শেষ হয়নি, আর ছুটি তরুণী ঘরে ঢুকল—এদের ঘাড়ের উপর এলোখোঁপা এলিয়ে পড়েছে—পরনে জামিয়ারের মতো ছোট কল্কার কাজ করা নীল শাড়ি ও ব্লাউজ, গলায় সরু মফ্‌চেন, পায়ে সোনালী জরির কাজ করা নাগরা। দুইটিই অবিবাহিতা—একটি গৌরী, অপরটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। এরাও ফুলের তোড়া দিলে—গৌরী মেয়েটি ঝিনুকের কাজ করা একটি নস্যদানি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললে—বাবা পাঠিয়েছেন কুন্নুর থেকে—মা আসতে পারলেন না এখন—রাত্রে আবার থিয়েটারে যাবেন।

বৃদ্ধ বললেন—আজ দু'জনে বুঝি স্কুল কলেজ কামাই ক'রে ব'সে আছ? যা, ও ঘরে যা—হরিদাসকে বলে রাখ্‌ গাড়ীর কথা। আমার এর পরে মনে থাকবে না।

তরুণী ছুটি চলে যেতেই বৃদ্ধ বললেন—আমার মেজ মেয়ের মেয়ে—বাগবাজারে আমার মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। গোরাচাঁদ মল্লিকের নাম শুনেচেন তো? ওই তাদেরই বাড়ী। বনেদী বংশ—গোরাচাঁদ মল্লিক ছিলেন আমার মেয়ের শ্বশুরের···এই যে ভূধর! এসো, এসো বাবা—ব'সো।

এবার আরও গুরুতর ব্যাপার? যাঁকে সম্বোধন করা হ'ল এবং যাঁর নাম ভূধর তাঁর বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। তিনি স্থূলকায় হ'লেও সঙ্গের মহিলাটির তুলনায় তিনি নিতান্ত কৃশ। এঁদের স্বামী-স্ত্রীর পেছনে চার পাশ ঘিরে ছ' সাতটি ছেলেমেয়ে। এদের বয়স দশ থেকে উনিশের মধ্যে—আর একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে একটু পিছিয়ে ছিল—তার কোলে একটি শিশু কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে কয়টি মেয়ে এখানে দেখলুম, তার মধ্যে এই মেয়েটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী।

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে বললেন—এই যে মৃণাল, পিছিয়ে কেন—আয় আয়, খোকাকে দেখি, দে একবার ভাই আমার কোলে। নিশীথ এল না?

আমার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। ছোট ঘরে যে ফাঁকা জায়গাটুকু ছিল স্বামী-স্ত্রী তার অনেকটা অংশ জুড়ে দাঁড়িয়েছেন। বাকিটা জুড়েছে ছেলেমেয়ের দল—পেছনের মেয়েটির জন্যে তেমন জায়গা নেই, আমি সঙ্কুচিত অবস্থায় চেয়ার যতদূর সম্ভব পিছিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। জড় পদার্থকে আর সঙ্কুচিত করা সম্ভব নয়। অথচ এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলে যে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে এদের স্থানের সঙ্কুলান করবো তাও অসম্ভব। এরা আমাকে সঙ্কোচের হাত থেকে শীঘ্রই অব্যাহতি দিলেন—এই জন্যে যে,

পেছনে আর একদল এসে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে, এরা না বেরুলে তারা ঢুকতে পারে না। এরা তো প্রত্যেকে এক-একটা তোড়া দিয়ে গেল—দুটি মেয়ে আবার দুটি বেলের গোড়ে বৃদ্ধের গলায় নিজেরা পরিয়ে দিলে—বৃদ্ধ কি একটা ঠাট্টাও করলেন। আমার তখন শোনবার মতো অবস্থা ছিল না। তারা ঘর থেকে বার হয়ে গেলে বৃদ্ধ বললে—এই আমার বড় ছেলে তারক, আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করে, বালিগঞ্জে বাড়ী করেছে, সেখানেই থাকে। পিছনের দলটির মধ্যে মহিলা নেই—তিনটি ছোকরা, বয়সে ষোল থেকে একুশ, এরা এসে কিছু দিলে না, একজন অটোগ্রাফের খাতা বার করে বললে—জ্যেঠামশায়, আমার খাতায় আজকের দিনে কিছু লিখে দিন। অটোগ্রাফের খাতা ফেরত দিতে না দিতে আর দুটি ছেলে, তাদের সঙ্গে বারো তেরো বছরের একটি বেণী-দোলানো মেয়ে।

তারপরে ব্যাপারটা গণনার বাইরে চলে গেল।

কত ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যে ঘরটায় ঢুকতে বেরুতে লাগল, আমার আর তাদের হিসেব রাখা সম্ভব হ'ল না। ফুলে ফুলে তক্তাপোশটা ছেয়ে গেল, ফুলের তোড়া ক্রমশ উঁচু হ'য়ে উঠতে লাগল—আর সেখানে জায়গা দেওয়া যায় না। আর এরা সবাই আত্মীয় আত্মীয়া, বাইরের লোক কেউ নেই। সব আপনা-আপনির মধ্যে, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রী, জামাই, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভদ্রলোক ভাগ্যবান, এঁদের মতো লোকের সাহায্য না পেলে প্রজাপতির সৃষ্টি রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ত। ক্রমশ ভিড় বাড়চে দেখে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম, আমি তখন হাঁপিয়ে উঠেছি ভদ্রলোকও গোলমালের মধ্যে আমাকে তখন ভুলে গিয়েছেন। আমি তখন বাড়ীর বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। বাড়ীর সামনের গলিতে সারিবন্দী মোটর দাঁড়ানো—সেখানে ধরেনি। গলি ছাপিয়ে মোটরের সারি বড় রাস্তায় এসে পৌছেচে, বিয়ে বাড়ীতেও এত মোটর জমে কি-না সন্দেহ। গলি পার হ'য়েই বড় রাস্তার মোড়ে নিবারণ মিত্রের সঙ্গে দেখা—সে আমার পরিচিত বন্ধু, সেজেগুজে সিল্কের পাঞ্জাবি শুঁড়ওয়ালা নাগরা পরে তাকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গলিতে ঢুকতে উদ্যত দেখে বললুম, ওহে, তুমিও কি বিশ্বনাথবাবুর বাড়ী যাচ্ছো না কি?

—হ্যাঁ। কেন বলত? তুমি বিশ্বনাথবাবুকে চিনলে কি করে?

—এতক্ষণ সেখানে বসেছিলুম ভাই, দেখে শুনে মাথা ঘুরে উঠল। শহরের এক-তৃতীয়াংশ লোক দেখলুম বিশ্বনাথবাবুর আত্মীয়-আত্মীয়া, আর তাঁরা সবাই এসেছেন ওই সাতাত্তর বছরের বুড়োর জন্মদিনে ফুলের তোড়া উপহার দিতে। তোমার তোড়া কই?

বন্ধু হেসে বললে—খুব আশ্চর্য্য লাগছে? বিশ্বনাথবাবুর সাত ছেলে চার মেয়ে। এদের সকলেরই আবার ছেলেমেয়ে এবং অনেকেরই নাতি নাতনী, নাতজামাই ইত্যাদি হ'য়ে গিয়েছে। বিশ্বনাথবাবুরা তিন ভাই। তাদের ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী আছে। হিসেব ক'রে ছ্যাখো কত হয়—এবং আসল কথা কি জানো, বুড়োর হাতে হাজার পঞ্চাশ ষাট টাকা আছে, সকলেরই চোখ সেদিকে একথা যদি বলি, তবে সেটা খুব খারাপ শোনাবে হয়তো। কিন্তু কথাটা মনে না উঠে কি পারে? তুমিই বলো। আচ্ছা, আসি ভাই, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিনের সপ্তাহ দুই পরেই আমি স্বগ্রামে গেলুম। বলা আবশ্যক যে, আমার গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বেশি নয়, সেখানে বছরে একবার যাওয়াও ঘটে কি-না সন্দেহ।

বাড়ী গিয়ে শুনলুম গ্রামের বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুণ মারা গিয়েছেন। শশী-ঠাকরুণের বয়স যে কত হয়েছিল, তা বলা শক্ত। কেউ বলে নব্বুই কেউ বলে একশোর কাছাকাছি হবে। আমরা মোটের উপর তাঁকে আমাদের বাল্যকাল থেকেই অতি-বৃদ্ধাই দেখে আসছি। বয়সের যে গণ্ডী পার হ'য়ে গেলে মানুষের আকৃতির পরিবর্ত্তন আর চেনবার উপায় থাকে না, শশী-ঠাকরুণ আমাদের বাল্যেই সেগণ্ডী পার হয়েছিলেন। শশী-ঠাকরুণের চার ছেলে তিন মেয়ে। বড় ছেলেটি ছাড়া আর সকলেই বিদেশে চাকরি করে—বড় ছেলে তেমন লেখাপড়া না জানার দরুণ দেশে থেকে সামান্য কি কাজকর্ম্ম করে, তার অবস্থাও ভাল নয়, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় কষ্ট পায়। ভায়েরা পৃথক, কেউ কাউকে সাহায্য করে না। কর্ম্মস্থান থেকে দেশেও কেউ আসে না।

শশী-ঠাকরুণের কষ্টের অবধি ছিল না। একটা চালা-ঘরে ইদানীং তিনি পড়ে থাকতেন —বড় ছেলেই তাঁর ভরণ-পোষণ করতো বটে. কিন্তু তেমন আগ্রহ করে করতো না। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে এ ভাবটা জেগে রইতো যে, মা তো আমার একার নয়—সকলেরই তো কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত মাকে—তারা যদি না করে আমিই বা কেন এত দায় ঘাড়ে করতে যাই ?

শশী-ঠাকরুণের অন্য ছেলেরা কখনো সন্ধান নিত না—বুড়ী বাঁচল, কি মোলো। অথচ তাদের সকলেরই অবস্থা ভালো—মাইনে কেউই মন্দ পায় না, শহরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। বড় ভাইয়ের পত্রের জবাব দিত—তাদের নিজেদেরই অচল হয়েছে, শহরের খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাড়ীতে কি ক'রে পাঠায়। বাড়ীতে বিষয়-সম্পত্তি তো রয়েছে—তার আয় থেকে তো মায়ের চলা উচিত—ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি এমন কিছুই না যার আয় থেকে বেকার বড় ছেলের একপাল পোষ্য ও শশী-ঠাকরুণের ভরণ-পোষণ ভালো ভাবে চলে।

বুড়ী খেতেই পেত না। ইদানীং আবার তার ছেলেমানুষের মত লোভ দেখা দিয়েছিল —বিশেষ করে মিষ্টি জিনিস খাবার। আমি সেবার যখন দেশে যাই, বুড়ী দেখি একটা কঞ্চির লাঠি হাতে মুখুয্যে পাড়ার মোড়ে বেলতলায় বসে। আমায় দেখে বললে, কুঞ্জ এলি নাকি ?

—হাঁ, ঠাক্‌মা। এখানে ব'সে কেন ?

—এই বাদা বোষ্টম খাবার বেচতে যাবে, তাই ব'সে আছি তার জন্যে। বাতাসা কিনব —ভিজিয়ে খাই।

—তা বেশ, বসো। ভালো আছ তো ?

—আমাদের আবার ভালো থাকা-থাকি, তুমিও যেমন দাদা। খেতেই পাইনে। বাদার কাছে চারটে পয়সা ধার হয়েছে, আর সে ধার দিতে চায় না। সিধুর কাছে আর কত

চাইব। সে নিজের ছেলেপিলে নিয়ে আতান্তরে পড়ে আছে। আহা, বাছার আমার মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আমি তার কাছে কিছু নিই নে।—তা তুই আমাকে আনা চারেক পয়সা দিয়ে যাবি ?

বুড়ীর অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বললাম এখন রাখুন ঠাকৃমা, যখন যা দরকার হয়—আমি যতদিন বাড়ী থাকি, দিয়ে যাব আপনাকে।

বুড়ী অবাক্ হ'য়ে গেল—আনন্দে বিস্ময়ে সে যেন প্রথমটা বুঝতেই পারলে না—আমি কি তাকে সত্যি একটা গোটা টাকা দিলুম।

পরের বছর—পূজোর কিছু আগে দেশে গিয়েছি—বুড়ী দেখি আমাদের বাড়ীর সামনের বাতাবি লেবুর তলায় পথটা দিয়ে যাচ্ছে—হাতে একটা কাঁসার জামবাটি। আমায় দেখে বললে—কখন বাড়ী এলি ?

বললুম—কাল এসেচি ঠাকৃমা। বাটি হাতে কোথায় গিয়েছিলেন ?

—আর বলিস্‌নে, দাদা! বাটিটা নাপিতবাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম যদি ওরা কেনে। আমার দিন তো আর চলে না, হাতে মোটে পয়সা নেই। সিধু খুলনে গিয়েছে—আজ চার-পাঁচদিন। বাড়ী একেবারে অচল। ছেলেপিলেগুলো খেতে পায় না এমন অবস্থা।

—তা বাটিটা বিক্রি ক'রে আর ক'দিন যাবে ঠাকৃমা ?

—তবু যে ক'দিন যায়। তাও ওরা নিলে না—বলে এখন নগদ দিতে পারব না। ধারে বাটি দিলে আমার কি করে চলে ভাই বলো তো ? একটু গুড় খেতে পাচ্ছিনে, বাটিটা বেচে ভেবেছিলাম আজ হাটে আধসের ভালো আকের গুড় আনতে দেব—আর আজকের হাটটাও হবে এখন। ছেলেপিলে শুধু ঝিঙে ভাজা আর ভাত খেয়ে মারা গেল। তা নিবি দাদা বাটিটা ?—ফুল কাঁসা, এ ওদের বাটি না। আমার নিজের বাটি—বিয়ের দানে আমার বাবা দিয়েছিলেন, ত্যাখ্‌ না ?

শহরে থাকি,—অনেক সময় কাঁচা পয়সা রোজগার করি। পাড়াগাঁয়ে যে এত পয়সার কষ্ট তা ভেবে দেখি নে। আমায় অন্যমনস্ক দেখে বুড়ী ভাবলে বোধ হয় বাটি কেনবার ইচ্ছে নেই আমার। অনেকটা মিনতির স্বরে বললে—না কিনিস্, ওটা বাঁধা রেখে আমায় বরং আট আনা পয়সা দে।

এ রকম অবস্থায় বুড়ীকে আমি আরও কয়েকবার দেখেছি।

শুনলাম—বুড়ীর মরণকালে ছেলেরা কেউ আসেনি—বড় ছেলে খুব সেবা-যত্ন করেছিল। বুড়ীর গায়ে একটা লেপ ছিল, মরণের ঘণ্টা দুই আগে বুড়ী পুত্রবধূকে বলেছিল—বৌমা, লেপটা সরিয়ে নাও, চার-পাঁচ টাকা দামের লেপটা—আমি বাঁচব না, তখন ওটা আমার সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ও গেলে আর হবে না বৌমা। আহা, কোথায় পাবে সিধু যে, আবার চার-পাঁচ টাকা খরচ ক'রে লেপ বানাবে ? শীতকালে বাছারা আমার আদুড় গায়ে কাটাবে তা হ'লে।

আরও খানিক পরে বুড়ী ছেলেকে ডেকে বললে—ছাখ্ সিধু, একটা কথা বলি, শোন্। আমার শ্রাদ্ধে বেশি কিছু খরচপত্র করতে যাসনে যেন। বিধু, মণি, শরৎ ওরা কেউ কিছু হয়তো দেবে না—তুই একা পাবি কোথায় যে খরচ করবি? নমো নমো করে অমনি পাঁচটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দিবি। আর যদি ওরা কেউ কিছু পাঠায়, তাও সব টাকা করচ করিস্ নে। হাতে কিছু রাখবি,—এর পরে তোর ছেলে পিলেরা খেয়ে বাঁচবে।

শুনলাম শশী-ঠাকরুণের ছেলেরা সবাই বাড়ী এসেছে ও খুব ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধ করছে।

বেড়াতে বেড়াতে ওদের বাড়ীর দিকে গেলাম। সামনের উঠানে নারিকেলের ডাল পুঁতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে—মণ্ডপের সামনে শামিয়ানা টাঙানো। গ্রামের অনেকেই সেখানে উপস্থিত, সেজ ছেলে গোপেশ্বর কাছা গলায় গ্রামের বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আফিসে নূতন লোক ঢোকান আজকাল যে কত অসম্ভব হয়েছে—সে সম্বন্ধে কি বলচে। গোপেশ্বরের বয়েস পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়েছে, রেলের অডিট আফিসে বড় চাকুরি করে—চৌধুরী মহাশয় বোধ হয় তাকে কারো চাকুরির জন্যে ব'লে থাকবেন, কথার ভাবে তাই মনে হ'ল।

—আগে অনেক ঢুকিয়েছি কাকাবাবু, সিমসন গিয়ে পর্য্যন্ত আর সেই সুবিধে নেই। সিমসন সাহেব, আমি যা বলেছি তাই করেছে। এখন পোস্ট খালি হ'লে সব তলায় তলায় ঠিক হয়ে যায়—আপিসের আর সেদিন নেই। শুনলাম গোপেশ্বর রিটায়ার করার পরে প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের দরুণ প্রায় আঠার উনিশ হাজার টাকা পাবে, হাওড়ায় না বরানগরে জমি কিনেছে সেই খানেই বাড়ী করবে। আজ দশ-এগারো বছরের পরে সে দেশে এসেছে, মায়ের মৃত্যু না ঘটলে, আরও কতদিন আসতো না তাই বা কে জানে!

ওদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এদের বাড়ীতে যে এত ছেলে-মেয়ে, বৌ, ঝি-চাকর আছে—তা চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করবার জো ছিল না। মেজ, সেজ ও ছোট ছেলের বৌয়েরা এসেছে, তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনীতে বাড়ী ভর্ত্তি। খুব ছোট বেলায় যে মেয়েদের দেখেছিলাম, হয়তো অনেকের সঙ্গে খেলাও করেছি—তাদের বিয়ে হ'য়ে ছেলেপিলে হয়ে গিয়েছে—অনেকের স্বামীরাও এসেছে। তবু তো বুড়ীর বড় মেয়ে অনেক দূরে থাকে ব'লে আসতে পারেনি—অপর দুই মেয়ে ও তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে। সবাই ব্যস্তসমস্ত, এখানে তরকারি কোটা হচ্চে, ওখানে জিনিসের ফর্দ্দ হচ্ছে, বাড়ীময় ছেলেমেয়েদের চীৎকার, হাসি, ছোটাছুটি—মেয়েরা এ ওকে ডাকছে, মায়ের ছেলেপিলেদের বকছে, কুয়োতলায় বড় বড় পেতলের গামলা মাজার শব্দ, বাড়ীসুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত, কারো হাতে একদণ্ড সময় নেই।

—ওরে ও ঝি, রেণুর গায়ের জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে কেচে দে না বাপু, কতক্ষণ থেকে বলছি, আমার কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

—ও কমলা, হেলে দুলে বেড়াচ্ছ মা, ততক্ষণ পানগুলো তুমি আর বীনা নিয়ে মেধু কেল

না—এরপর আর সময় পাবে ?…কি—কি—আবার মরছে ডেকে ছোট বৌ—মাগো, হাড় জ্বালালে—বস্‌তে দেয় না একরত্তি—এই তো আসছি ভাঁড়ার ঘর থেকে—

একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে দালানে ঢুকবার দরজার এক পাশে একটা স্টোভ ধরাবার চেষ্টা করছে—আমি পাশ কাটিয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেজ ছেলে বীরেশ্বর ও তার বৌয়ে ঝগড়া হচ্ছে। মেজ ছেলে কোন জমিদারী স্টেটের ম্যানেজার, বয়েস পঞ্চাশের ওপর—তার স্ত্রীকে আগে কৃশাঙ্গী দেখেছি, আজ আট ন' বছর দেখিনি—এত মোটা হয়েছেন যে এরি মধ্যে প্রথমটা যেন চিনতেই পারি না। হাতে মোটা সোনার বালা ও অনন্ত, গলায় ছিকলি হার। তিনি স্বামীকে বলছেন—ও ঘরে আমি থাকতে পারব না, এই ভিড়, তাতে ও ঘরে খিল নেই। আমার মেয়ের গায়ে এক-গা গয়না, কাজের বাড়ী, লোকের ভিড়—বিশ্বাস আছে কাউকে—তাতে এই পাড়াগাঁ জায়গা ? বাবা, ভালোয় ভালোয় কাজ মিটিয়ে এখন এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। কাল সারারাত মশায় খেয়েছে।

বীরেশ্বর বলচে, তা তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে না হয় পশ্চিমের কোঠায় শুয়ো—মাথা গরম কোরো না, দোহাই তোমার—তোমার মাথা গরম আমার বরদাস্ত হয় না বাপু—

আমি ঢুকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললুম—চিনতে পারেন কাকীমা ?

তিনি কথার উত্তর দেবার পূর্ব্বেই এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে বললে—নাথ্‌নি এখনও পিণ্টুকে দুধ খাওয়ায়নি মা—সকাল থেকে তাকে নিয়ে বাইরের উঠোনে বসে আছে—বললেও শুনচে না—

বীরেশ্বর বললে—যা এখন যা, বলগে যা নাথ্‌নিকে -আমি ডাকছি। এসো কুঞ্জ বসো। ওগো তুমি কুঞ্জকে চিনতে পারলে না ?

বীরেশ্বরের স্ত্রী মৃদু হাস্যে বললে—দেখেছি বোধ হয় ওকে ছেলেবেলায়, যাতায়াত নেই—দেখাশুনো তো হয় না, না-চিনবার আর দোষ কি বল ? শাশুড়ী মারা না গেলে কি এখন আসা হ'ত ? চিঠি পেয়ে আমি বলি— না যেতে হবে বই কি, দেশে একটা মানখাতির আছে। শাশুড়ীর কাজটা ভালো করে না করলে লোকে ওঁদেরই দুষবে। বট্‌ঠাকুরের পয়সা নেই সবাই জানে। ওঁদের গাঁয়ে-ঘরে নাম রয়েছে , দেশে-বিদেশে সবাই মানে, চেনে, বলবে—অমুক বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে কিছুই করেনি, বলত বাবা, কথাটা কি শুনতে ভালো ? … তাই তো এলুম নইলে এসব জায়গায় কি মানুষ আসে ? কি মশা ! কাল রাত্তিরে একদণ্ড চক্ষের পাতা বুজতে দেয়নি।

রোয়াকের ধারে বসে মেজ ভাইয়ের ছেলে বিকাশ তাদের স্কুল কি ভাবে একটা ফুটবল-ম্যাচ্‌ জিতেছে, মহা-উৎসাহে সে গল্প করছে সেজ ভাইয়ের ছেলে বিনুর কাছে। বড় ভাইয়ের ছেলে ভোলা অবাক্‌ দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে চেয়ে এক মনে গল্প শুনছে। তার বয়েস ওদের চেয়ে যদিও বেশি, কিন্তু জীবনে কখনো সে গাঁয়ের আপার প্রাইমারী পাঠশালা ছাড়া অন্য স্কুলের মুখ দেখেনি। এদের কাছে সে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। শুধু ভোলা

নয়—ভোলার মাকেও লক্ষ্য করলুম,—জায়েদের বড়মানুষি চালচলন ও কথাবার্ত্তার মধ্যে নিতান্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে আছে। জায়েরা বড়মানুষি দেখাবার জন্যে প্রত্যেকে ঝি-চাকর এনেছে, তাদের কাছেও যেন ও-বেচারী কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত।

হঠাৎ কোথা থেকে বিকাশের ছোট দিদি আরতি ঝড়ের মত এসে বললে—এই যে এখানে বসে গল্প হচ্ছে ছেলের। ওদিকে কাকীমা, দিদি—সব ডেকে ডেকে হয়রান, চা হ'য়ে গেছে, খেয়ে এসে সবার মাথা কেনো, যাও—

ওকে দেখেই আমার একটা ছবি মনে এসে গেল। বৃদ্ধা, মাজা-বাঁকা গাল-তোবড়ানো শশী-ঠাকরুণ কাঁসার বাটি বিক্রয় করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছে নাপিত-বাড়ী থেকে। এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণী—এদের সৌন্দর্য্য, সজীবতা, আনন্দ, যৌবন—এদের সৃষ্টি করেছে সেই দরিদ্রা বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুণ—এরা তারই বংশধর—তারই পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আজ তার মৃত্যু-বাসরে এই যে চাঁদের হাট বসেছে—এতদিন এরা ছিল কোথায়? এরা থাকতে বুড়ী কেন খেতে পেত না, কেন চোখের জলে তার বুক ভেসেছে—তার কোন উত্তর নাই।

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সেই বাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ীর উৎসবের কথাও মনে পড়ে গেল। এইরকমই অগণিত পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রী দৌহিত্রের ভিড় দেখেছি সেখানেও। সবই সেইরকম—কেবল সেটা ছিল জন্মতিথি উৎসব—জন্মতিথি যার, তার বয়েস শশী-ঠাকরুণের মতই প্রায়।

সই

দুপুরে বাসায় শুইয়া আছি, এমন সময়ে উচ্ছলিত খুশি ও প্রচুর তরল হাস্যমিশ্রিত তরুণ কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইলাম, ও সই, সই লো—ও—ও, ক্যামন আছ, ও সই?

পাশের ঘর হইতে আমার ভগ্নি (বিধবা, বয়স ত্রিশের বেশি) হাসির সুরেই বলিল, এস সই, এস। ব'স, কি ভাগ্যি যে এ পথে এলে?

—এই তোমার সয়া হাট কত্তি এল। নতুন গুড়ের পাটালি সের দুই করেলো আজ বেন্ বেলা। ছোট ছেলেডার আবার জর আর ছদ্দি। তাই তোমার সুয়াকে হাটে পাঠালাম, আমি বলি সইয়ের সঙ্গে কতদিন দেখা হই নি। ছেলেডাকে নিয়ে আর হাটের ভিড়ের মধ্যে ক'নে যাব, সইয়ের বাড়ী একটু বসি।

কথার ভঙ্গিতে মনে হইল দুলে কি বাগদীদের মেয়ে। আমার বোনের সহিত সই পাতানো তাহার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়, কারণ তাহারও শ্বশুরবাড়ী নিকটবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামেই। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য শহরের বাসায় থাকে।

দুপুরের ঘুম নষ্ট হইল। বোনের নবাগতা সঙ্গীটি লেখাপড়া ভালো করিয়া শিখিলে

এ্যানি বেসাণ্ট হইতে পারিত। মুখের তাহার বিরাম নাই। অনবরত বকিয়া যাইতেছে, এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ছেদস্বরূপ বলিতেছে, সই একটা পান দেবা ?… দোক্তা খাও না ? তা ছ্যাও একটা এমনি পানও ছ্যাও। ও হাবলা, এই তোর সেই সই-মা, চিনতে পেরিলি, হ্যাঁরে বোকা ছোঁড়া ? গড় করলি নি সই-মাকে ? নে, পায়ের ধুলো আর নিতে হবে না, এমনি গড় কর।

পান খাইয়া সে আবার শুরু করিল, ঘরের কত ভাড়া ছ্যাও, হ্যাঁ সই ? তের টাকা ? ও মা, ক'নে যাব। তা কি দরকার তোমার শহরে এত টাকা-খরচ করে থাকবার, হ্যাঁ সই ? দিব্যি তোমার-ঘরডা বাড়ীডা রয়েচে গেরামে। আম কাঁঠাল গাছগুলো দেখা অবানে নষ্ট হয়ে যাবে। ন্যাও সই, মেয়ে যেন তোমায় চাকুরি করে নিয়ে খাওয়াবে লেখাপড়া শিখে, হি—হি—হি—হি—বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে আর কি!

আমার শোবার ঘরের বাহিরের রোয়াকে তাহার হাসি ও বক্তৃতা চলিতেছে, তা-ও এমন উচ্চকণ্ঠে যে, কলিকাতা শহরে হইলে ফুটপাডে ভিড় জমিয়া যাইত। আমি একে কাল রাত্রে মশার উপদ্রবে তেমন ঘুমাইতে পারি নাই, এমন বিপদও আসিয়া জুটিল ঠিক কিনা দুপুর বেলাতেই। ছোট বাসা, অন্য কোন ঘরও নাই যে সেখানে গিয়া ঘুমাই।

—ও সই ছেলেডাকে একটু জল ছ্যাও দিকিন্, অনেকক্ষণ থে খাবে বলেচে। তা ওর আবার লজ্জা দেখলে হয়ে আসে! জল চা'বি তোর সই-মার কাছে, তার আবার লজ্জা দেখ না ছেলের ?

আমার বোন জল আনিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিলে সে চুপিচুপি তাহার ছেলেকে আশ্বাসের সুরে বলিতে শুনিলাম—তোর সই-মা কি তোরে এমনি জল দেবে ? কিছু খাতি দেবে অখন দেখিস্। দেখি ? পেটটা পড়ে রয়েচে, অ মোর বাপ, সেই সকালে দুটা পান্তা খেয়োলো, আহা। পাটালি হাটে বিক্রি হলি চাল কিনে নে যাব, এ-বেলা ভাত রাঁধব অখন। এখন তোমার সই-মা যা খাতি ছ্যায়, তাই খেয়ে থাক। পয়সা নেই যে, মানিক।

এই সময় আমার বোন জল এবং বোধ হয় বাটিতে একটু গুড় লইয়া রোয়াকে গিয়া উপস্থিত হইল—কারণ শুনিলাম সে ছেলেটিকে বলিতেছে—নে, হাবলা, হাত পাত, গুড়টা খেয়ে জল খা। শুধু জল খেতে নেই।

হাবলা ও হাবলার মা যে একটু নিরাশ হইয়াছে, ইহা আমি তাহাদের গলার সুর হইতেই অনুমান করিলাম। হাবলার মা নিরুৎসাহভাবে বলিল, নে, গুড়টুকু হাতে নে। খেয়ে ফেল্। যেন রোয়াকে না পড়ে—

ঠিক দুপুরের পরই সময়টা, এখন যে কিছু খাইতে দেওয়া প্রয়োজন, এ-কথা আমার বোনের মাথায় আসে নাই বুঝিলাম। তা ছাড়া পল্লীগ্রামে এ-রকম নিয়মও নাই।

—ভালো কথা সই, তোমার জন্যি ভালো নক্কার বীজ এনেলাম। এই মোর আঁচলে বাঁধা ছেলো, তা রাস্তার মাঝখানে কোথায় পড়ে গিয়েচে। বাসায় জায়গা আছে গাছপালা দেবার ? আসচে হাটবারে আবার নিয়ে আসব।

এই সময়ে আমার ছোট ভাগ্নে স্কুল হইতে ফিরিল। টিফিনের ছুটি হইয়াছে, সে সকালে খাইতে যাইতে পারে নাই বলিয়া ভাত খাইতে আসিয়াছে।

—ও টুলু, চিনতে পার তোমার সই-মারে? হি হি, ও মা ছেলে এরি মধ্যে কত বড় হয়ে গিয়েচে মাথায়। গায়ে এটা কি, জামা? বেশ জামাটা।

আমার ভাগিনেয় এই বয়সেই একটু চালবাজ। গ্রাম হইতে আগত এই সই-মাকে দেখিয়া সে যে খুব খুশি হইয়া উঠিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। তাহার সই-মা বলিল, বেশ জামাটা টুলুর গায়ে। টুলুর আর কোন ছেঁড়া-কাটা জামা-টামা নেই, হ্যাঁ সই? ছেলেডা এই শীতি আদুড় গায়ে থাকে। তোমার সয়া এবার অসুখে পড়ে গাছ কাটতে পারে নি। মোটে দশটা গাছে যা রস হয়, তাই জাল দিয়ে সের আড়াই পাটালি হয়। হাটরা হাটে পাটালির দর নেই, তার ওপর ছ' পয়সা আট পয়সা সের। ওই থেকে চাল ডাল, ওই থেকে সব। গাছের আবার খাজনা আছে। ছেলেডাকে একখানা দোলাই কিনে দেব দেব ভাবচি আজ তিন হাটে, কোথা থে দেই বল দিকিন সই? কি রে—কি? হুঁ, উ উ? ছেলের আবার আবদার দেখ না?

আমার বোন বলিল, কি বল্‌চে হাবুল?

—ওর কথা বাদ দ্যাও সই। রাস্তা দিয়ে শুই যে মিস্সে চিনির কি বলে ও-গুলো—

হাবুল বলিল—গোলাপছড়ি।

—তা যে ছড়িই হোক, ওই ওঁকে কিনে দিতে হবে। না, ও খায় না। কি ছড়ি? গোলাপছড়ি? হি হি, নাম দেখ না?—গোলাপছড়ি!

আমার ভাগ্নের দৃষ্টিও বোধ হয় ইতিমধ্যে গোলাপছড়ির দিকে পড়িয়াছিল। সে ছুটিয়া গিয়া ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল ও আমায় সটান আসিয়া বলিল—গোলাপছড়ি কিনব, মামা। পয়সা দাও।

বোধ হইল হাবুলও কিছু ভাগ পাইয়াছে, কারণ একটু পরেই হাবুলের মায়ের খুশিভরা গলার স্বর শুনিতে পাইলাম - ন্যাও, হ'ল তো? কেমন, বেশ মিষ্টি? খাও। পাটালির চেয়ে কি বেশি মিষ্টি? দেখি দে তো একটু গালে দিয়ে? কি জানি, এ-সব কখনও দেখিও নি চক্ষে।

একটু পরে টুলুকে ভাত দিতে তাহার মা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সেই সময়ে শুনিলাম, হাবুল নাকিসুরে বলিতেছে, না, মা, হুঁ। আর তোমারে দেব না। আমি তবে কি খাব?

হাবুলের মা তাহার সইকে আর পাইল না, কারণ ছেলেকে খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া নিজে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনুপস্থিত সইয়ের উদ্দেশ্যে হাবুলের মা আপন মনে অনেক গল্প করিয়া গেল। খানিক পরে শুনিলাম বলিতেছে—ওই সই, ক'নে গেলে? ঘুমুলে না কি? মোরে আর একটা পান দেবা না?

কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না।

বেলা তিনটা বাজিয়াছে। আমি বেড়াইতে বাহির হইতে গিয়া দেখি অতি মলিন শাড়ি

পরনে এক বাইশ তেইশ বছরের কালো-কোলো মেয়ে একটা চুপড়ি পাশে রাখিয়া ঠিক পৈঠার কাছে বসিয়া আছে। তার ছেলেটিও কাছে বসিয়া তখনও গোলাপছড়ি চুষিতেছে। আমাকে দেখিয়া মেয়েটি থতমত খাইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। দুপুরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় মনটা বিরক্ত ছিল, একটু রুক্ষ স্বরেই বলিলাম—একটু সরে ব'স পথ থেকে। চুপড়িটা রাস্তার ওপর কেন ?

মেয়েটি ভয়ে ও সঙ্কোচে জড়সড় অবস্থায় চুপড়ি সরাইয়া এক পাশে রাখিয়া নিজে যেন একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু আগে উকীলদের ক্লাবে টেনিস খেলিয়া বাসায় ফিরিতেছি, দেখি বাসার পাশে বড় রাস্তার ধারে তুঁততলার শুকনো পাতার উপরে আমার বোনের সই তাহার ছেলেটিকে লইয়া বসিয়া আছে। পাশে সেই চুপড়ি ও একটা ছোট ময়লা কাপড়। সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই, তুঁতগাছের মগডালেও আর রোদ দেখা যায় না। হাবুলের বাপ এখনও পাটালি বিক্রি করিয়া হাট হইতে ফিরে নাই। মেয়েটি যেন কেমন ভরসা-হারা নিরাশ মুখে বসিয়া আছে, অন্ততঃ তেমন হাসিখুশির ভাব আর দেখিলাম না।

রামশরণ দারোগার গল্প

রামশরণবাবু আমাদের সান্ধ্য-আড্ডায় নিত্যই আসেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা বড় একটা বলেন না। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের কর্ম্মচারী, জীবনে অনেক জিনিসই দেখেছেন,—আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি দেখেছেন। কিন্তু তিনি এসেই একটা তাকিয়া আশ্রয় ক'রে সেই যে আড় হয়ে শুয়ে পড়েন, যতক্ষণ না আড্ডার শেষ লোকটি চলে যায়—ততক্ষণ তিনি চোখ বুজে এবং নিজে নির্ব্বাক থেকে অন্য সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মেয়েদের প্রেম ও তার মূল্য—এই ধরনের একটা আলোচনা চলছিল। এ সম্বন্ধে যার যা অভিজ্ঞতা সকলেই কোন-না-কোন ঘটনা বলছে। রামশরণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে চোখ বুজেই বলে উঠ্‌লেন, আমার চাকুরীজীবনে একটা ব্যাপার একবার ঘটেছিল, অনেকদিন হলেও এখনও ভুলিনি। আরও ভুলিনি এই জন্যে যে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা সমস্যার মতো চিরকাল রয়ে গিয়েছে, যদিও কত জটিল সমস্যারই মীমাংসা করে বেড়িয়েছি সারা জীবন! বলি শুনুন ঘটনাটা।

আমি তখন থাকি আলমপুর থানায়। কলকাতার অত কাছে বড় শহরের উপকণ্ঠে, চুরি জুয়াচুরির আড্ডা বেশি—একথা পুলিশ-কর্ম্মচারী মাত্রই জানেন। এক মাসের মধ্যে কলকাতা পুলিশ থেকে অন্ততঃ সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—আমাদের এলাকার কোন বাগান-বাড়ীতে একজন নোট জাল করছে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি কি না। আর সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—বাগান-বাড়ীতে বোমার কারখানা বসেছে, আমরা সে বিষয়ে

কি খবর রাখি। ফেরারী আসামী তো হরদম পালিয়ে এসে আড্ডা নিচ্ছে আমাদের এলাকায়! একবার তো মুরশিদাবাদ জেলা থেকে—কে কার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইল থানারই পাশে আমাদের নাকের কাছে—এক খোলার ঘরে। তা ছাড়া বে-আইনী কোকেন, গুম, টাকা জাল, চোরাই মালের ব্যবসা, গুণ্ডামি প্রভৃতি প্রত্যেক হাঙ্গামার সঙ্গেই কি আলমপুর থানার এলাকাভুক্ত বাগান-বাড়ী ও বস্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?...অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—শতকরা নব্বুইটা হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নয়ত আলমপুর থানার ত্রিসীমানায় উক্ত দুর্বৃত্তের দল কখনো পদার্পণ করে নি, তবুও কলকাতা পুলিশের এনকোয়ারীর স্লিপের ভিড়ে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত!

একদিন দুপুরের পর তেমন কাজকর্ম নেই, আমি রোদ পিঠে করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, শীতকাল—এমন সময় গাড়ীর শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি—একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী থেকে একজন স্ত্রীলোক থানার সামনেই নামছেন। তিনি থানার মধ্যে ঢুকে, আমাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—দারোগাবাবু কোথায়?

—বলুন—আমিই।

তখন তিনি একখানা খামের চিঠি আমার হাতে দিলেন। খাম খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে বসতে বললুম। চিঠি লিখছেন নারী-কল্যাণ-আশ্রমের বিখ্যাত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্ত্তী। যোগেশবাবু আমার পরিচিত পুরাতন বন্ধুও বটে, তাঁর দ্বারা স্ত্রীলোকঘটিত নানা ঘটনায় পুলিশের অনেক উপকারও হয়েছে বটে। তাঁর বর্ত্তমান পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নেই, মাত্র এইটুকু যে, যিনি এই পত্র নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যোগেশবাবুর পরিচিতা; তার বক্তব্য কি, তা শুনে আমি যদি তাঁকে সাহায্য করি,—তবে ভালো হয়।

আমরা পুলিশের লোক—কাউকে বিশ্বাস করা আমাদের অভ্যাস নয়! মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা এত দেখেছি যে, এতে আমাদের দোষ দেওয়া খুব বেশি চলে না। স্ত্রীলোকটিকে একবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখে নিয়ে মনে হ'ল তাঁর বয়স চল্লিশের মধ্যে হবে। এক সময়ে খুব রূপসী ছিলেন। খুব সরল চরিত্রের মেয়ে নয়—একটু খেলোয়াড় ধরনের। অবস্থাও খুব ভালো নয়।

জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি চান?

তিনি উত্তরে যা বললেন, সংক্ষেপে তার মর্ম্ম এই যে—এখানকার কোন কালী-মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় তাঁর অবস্থা খুব ভালো ছিল না বলেই ওরকম পাত্রে মেয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মেয়েটি বড়ই কষ্টে আছেন। তিনি বর্ত্তমানে মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান—তাঁর নিজের কাছে। যোগেশবাবুর সাহায্যে মেয়েটিকে কোথাও লেখাপড়া কি নার্সের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন, মোটের উপর মেয়েকে তিনি এখানে রাখতে রাজী নন, এ বিষয়ে আমাকে তাঁর সাহায্য করতে হবে।

এত সংক্ষেপে তিনি কথাটা আমায় বলেন নি! স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি খুব। তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাসও কিছু কিছু ওই সঙ্গে আমায় শুনে যেতে হ'ল। তার মধ্যে দুটো কথা প্রধান। এক সময়ে তাঁর স্বামীর কত টাকা ছিল এবং তিনিও দেখতে এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন।

আমি বললুম—পুলিশের সাহায্য চান কেন? আপনি নিজেই কেন গিয়ে জামাইকে বলুন না?

তিনি বললেন—অনেকবার বলেছি, জামাই শোনে না, মেয়ে পাঠাবার মত নেই, অথচ তার দুর্দ্দশার একশেষ করছে। আপনি নিজের চোখে গিয়ে দেখলেই সব বুঝবেন। আমি মেয়েমানুষ, আমার কোনো জোর খাটবে না তো, আমার সহায় নেই, সম্পত্তি নেই, কে আমার পক্ষ হয়ে দুটো কথা বলবে? তাই যোগেশবাবুকে ধরে আপনার কাছে আসা।

আমি বললুম—দেখুন, এতে পুলিশের কিছু করবার নেই। বিবাহিতা স্ত্রীকে রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে স্বামীর। আপনার জামাই যদি মেয়েকে না আপনার সঙ্গে দেন, আমরা তাতে কি করব?—আপনার মেয়ের মত কি?

স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—মেয়েরও মত নয় এখানে থাকা। তারপরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন—আমার এই উপকারটুকু করুন আপনি। মেয়েকে আমি নিয়ে যাবই। তার কষ্ট আর দেখতে পারিনে। আপনি একটু সহায় না হলে—আমার আর কোনো উপায় নেই—একটু দয়া করে, আপনাকে করতেই হবে। মার খেয়ে খেয়ে তার শরীরে আর কিছু নেই।

স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি আমার ভালো লাগল না। অনেক রকম লোক দেখেছি মশাই, ভালো-মন্দ সব রকম দেখে যদি একটু সিনিক হয়ে থাকি, তার জন্যে আমাদের বেশী দোষী ঠাওরাবেন না।

শেষ পর্য্যন্ত কতকটা উপরোধে পড়ে—কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে গেলাম সেই কালীবাড়ী। কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে থানায় বসিয়ে রেখে গেলাম। কালী-মন্দিরের কাছেই ছোট্ট একতলা ঘরের একটা কুঠুরীতে পূজারী-ঠাকুর থাকে, সন্ধান নিলাম। পূজারীকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হ'ল না। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, একহারা পাকশিটে চেহারা। এই বয়সেই চুলে বেশ পাক ধরেছে, দেখেই মনে হ'ল—নেশাখোর লোক। ধড়িবাজও বটে।

তাকে সব খুলে বললাম—পুলিশ দেখে সে জড়সড় হয়ে গিয়েছে। কাঁচু-মাচু ভাবে বললে—"আজ্ঞে বাড়ীতে যদি আপত্তি না করে, আপনি গিয়ে শাশুড়ী ঠাকরুণকে নিয়ে আসুন আমি পাঠিয়ে দেব। যদি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করেন দারোগাবাবু, আমার মোটেই আপত্তি নেই। একটা পেট আমার, যে-কোনো রকমে চালিয়ে নেব। বেশ, আপনি চলুন আমার বাসায়। আমার স্ত্রীকে বলুন—আমি সেখানে থাকব না।"

এর পরে আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা হ'ল, যা অতদিনের পুলিশ-জীবনে কখনো হয়নি।

পূজারী যখন তার স্ত্রীকে দোর খুলতে বললে—আমরা তখন দোরের পাশে, কিন্তু অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। দোর কে একজনে এসে খুলতেই পূজারী-ঠাকুর বললে, দুটি ভদ্রলোক এসেছেন তোমার বাপের বাড়ী থেকে,—তোমার মায়ের কাছ থেকে, ওঁরা তোমাকে কি বলবেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বল। আমি একটু জলটল খাওয়ানোর ব্যবস্থা দেখি।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে, আসুন আপনারা,—কথাবার্ত্তা বলুন।···আসচি আমি।

ঘরের মধ্যে আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে আধ-ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনে—কিন্তু অমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমি তো মশাই আমার জীবনে খুব বেশি যে দেখেছি, এমন মনে হয় না। টকটকে গৌর বর্ণ—মাথায় ঘন কালো চুলের রাশ, প্রতিমার মতো মুখশ্রী, কি সুন্দর হাত পায়ের গড়ন,- কি সুন্দর ছোট্ট কপালখানি। আর চোখ—সকলের চেয়ে দেখবার জিনিস তার চোখ, ডাগর ডাগর, ভাসা ভাসা, তুলি দিয়ে আঁকা টানা জোড়া ভুরু। কতদিন হয়ে গিয়েছে—এখনও সে চেহারা চোখের সামনে দেখছি।

ঘরে ঢুকে বললুম—'মা, আমাদের দেখে ভয় পেও না, লজ্জাও করো না। আমরা পুলিশের লোক। এখানকার থানা থেকে আসচি। তোমার মা খানিকটা আগে থানায় আসেন এবং আমাদের অনুরোধ করেন—তাঁকে সাহায্য করতে। তিনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান। তিনি থানায় বসে আছেন। তুমি যদি যাবার মত কর, তবে তাঁকে এখানে গাড়ী নিয়ে আসতে বলি। মেয়েটি একটিবার ঘাড় নেড়ে বললে—আমি যাব না।

ঘরের মধ্যে চার ধারে চেয়ে দেখি—এক কোণে একটা ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গ। তোরঙ্গটার ওপরে একটা কাঠ-বাঁধানো পুরোনো আয়না ও একটা কাঁচের তেল মাখবার বাটি ; এক কোণে কতকগুলো ছেঁড়া-খুকড়ি লেপ কাঁথা। ঘরের কড়ি থেকে টাঙানো গোটা দুই দড়ির শিকে। তাতে কলাইকরা জামবাটি বসানো। পেতল কাঁসার চিহ্ন নেই কোথাও। দারিদ্র্যের এমন রূপ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না!

মেয়েটির উত্তর শুনে বললুম—মা, যদি তোমার স্বামীর মতামতের বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, আমি বলচি তোমার মা যদি তোমায় নিয়ে যান, তোমার স্বামীর তাতে অমত নেই। আমার কাছে তিনি বলেছেন একথা। আসবার সময় সে-সব কথা হয়ে গিয়েছে।—কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে তুমি চলে আসতে পার। আর এখানে যে কষ্টে আছো দেখচি, তাতে আমার মনে হয়—তোমার যাওয়াই ভালো।

সে এবারও ঘাড় নেড়ে বললে—না, আপনি মাকে গিয়ে বলুন—আমার যাওয়া হবে না।

সে স্বরের দৃঢ়তা এমনি যে, তার ওপর আর বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবুও আর একবার বললুম—দেখ মা, বেশ করে ভেবে দেখো, তোমার মা এসেচেন অনেক আশা করে। আমাদের সাহায্য চেয়েচেন বলেই আমরা এসেচি। অবিশ্যি এটাও আমরা দেখবো তুমি

তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে, তোমার স্বামী তোমার ওপর কোনো রূঢ় আচরণ না করেন। সে বিষয়ে তুমি নির্ভয়ে থাকতে পার।

মেয়েটি মুখ নিচু করে এবারও ঠিক আগের মতো স্বরেই বললে—না আমি যাব না।

আমার কেমন একটু রাগ হ'ল—পুলিশে কাজ করে করে একটা বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—কারোর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতাম না। একটু বিরক্তির স্বরে বললুম—এই কষ্টে থাকবে, সেও ভালো? যাবে না তবুও? মেয়েটি চুপ করে রইলো। বেশ, না যাবি মরগে যা, তাতে আমার কি? বললুম—তা হ'লে একটা কাজ কর—না যাও সে তোমার ইচ্ছে। আমাদের কিছু বলবার বা জোর করবার নেই। তুমি একখানা পত্র লেখ তোমার মাকে, যে আমরা তোমাকে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম,—তুমি যেতে রাজী হওনি, আমরা থানায় গিয়ে তাঁকে দেখাব।

কাগজ কলম আমরা দিলাম। মেয়েটি মেঝের ওপর বসে চিঠি লিখতে লাগল। ওর সুগৌর হাত দুটির ওপর সেই সময় ভালো ক'রে চোখ পড়তে দেখি একজোড়া রাঙা কড় ও নোয়া ছাড়া এমন সুশ্রী সুডোল হাতে আর কিছু নেই।

আরও কষ্ট হ'ল ঘরের মেঝের অবস্থা দেখে। কি বিশ্রী সেঁতসেঁতে মেঝে, সপসপ করছে ভিজে। সদা-সর্ব্বদা যেন জল উঠছে। এই মেঝের ওপর বিনা খাটে শোয় কি করে—এ আমার বুদ্ধির অতীত। অত্যন্ত সুস্থ লোকও তিন দিন এ রকমের শুধু মেঝের ওপর যদি শুয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই একটা কঠিন অসুখে পড়বে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অবাক হয়ে চেয়ে দেখি—মেয়েটি মুখ নিচু করে, পা ছড়িয়ে মেয়েলি ধরনে বাঁ-হাতের কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একদিকে কাত হয়ে বসে চিঠি লিখছে আর তার ডাগর চোখ দুটি বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে, দু' এক ফোঁটা জল চিঠির ওপরও পড়ল।

পুলিশের চাকুরিতে মন বেশ একটু কঠিন হয়ে গিয়েছিল বটে, তবু মেয়েটির নিঃশব্দ কান্না দেখে, ওর সংসারের এই নগ্ন দারিদ্র্য, নিরাভরণ ওই হাত দু'টি, এই সেঁতসেঁতে ঘরের মেঝে, ভাঙ্গা আয়নাখানা, ওই ধুকড়ি লেপ কাঁথা দেখে, তার ওপর ওর গাঁজাখোর মূর্খ স্বামীর কথা মনে হয়ে—না মশাই আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না—স্বরটা নরম করেই বললুম—এই তো, মাকে চিঠি লিখতেই তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তবে কেন চল না, তাঁর সঙ্গে?

আমার সহানুভূতির সুর বোধ হয় ওর হৃদয় স্পর্শ করলে, বললে, সেখানে এর চেয়েও কষ্ট। ওর সেই দৃষ্টিতে হতাশা, ঔদাসীন্য, মরীয়া ভাব—সব একসঙ্গে জড়ানো।

অবাক্ হয়ে বললুম—এর চেয়েও কষ্ট! এর চেয়ে আর কি কষ্ট থাকতে পারে?

মেয়েটি শান্ত, স্থির স্বরে বললে—আপনি সব কথা জানেন না, বললুম যে আরও অনেক কথা আছে এর মধ্যে! সে সব কথা বলতে চাইনে। মাকে আমার প্রণাম জানাবেন আর বলবেন, তোমার মেয়ে মরেচে আর তার খোঁজ কোরো না—

কথাটার শেষের দিকে রুদ্ধ-কান্নায় ওর গলার সুর আটকে গেল। আমিও চিঠিখানা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলুম। পথে দেখি পূজারী-ঠাকুর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে আসছে, আমাদের দেখে দাঁত বার করে বললে—'হেঁ হেঁ, কি হ'ল দারোগাবাবু? যা বলেচি, তাই হ'ল কিনা? তা এখুনি চললেন যে··· একটু যৎসামান্য মিষ্টিমুখ—'

ওর ওপর রাগ কি হিংসে কি হ'ল জানিনে। তার সে সব আপ্যায়িতের কথা রূঢ়ভাবে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে বললুম—ওসব থাক্। একটা কথা বলি শোন ঠাকুর, কাল থানায় যেয়ো সকাল বেলা। একটা তক্তাপোশ সস্তায় নীলাম হবে। দাম তুমি যখন হয় দিও, কাল গিয়ে নিয়ে এসো সেখানা। বুঝলে?

পূজারী-ঠাকুর অবিশ্যি নিজের কাজ ভোলেনি। পরদিন সকালে এসে খাটখানা নিয়ে গিয়েছিল। এইখানেই আমার গল্পের শেষ।

আমরা এতক্ষণ একমনে শুনছিলুম। রামশরণবাবু চুপ করলে আমরা একজোটে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি আর কখনো সে মেয়েটিকে দেখতে যান নি?···

রামশরণবাবু বললেন—আর কিছুদিন আলমপুরে থাকলে হয়তো যেতুম। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যে বদলির হুকুম পেয়ে আলমপুর ছাড়তে হ'ল। তারপরে সে মেয়েটির আর কোন খবর জানি না। মেয়েটি কেন মায়ের সঙ্গে যেতে চাইল না, আমি আজও বুঝতে পারিনে।

খুড়ীমা

খুব বর্ষা নামিয়াছে।

দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি। বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিল। বর্ষা-বাদল না হইলে বিনোদমাস্টারের কাছে ছুটি পাওয়া যাইত। কিন্তু কি বাদলাই নামিয়াছে আজ তিন দিন হইতে আমার ভাগ্যে।

এমন সময়ে কোথা হইতে একটা ময়লা-কাপড়-পরা লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠানে দাঁড়াইল এবং আমার দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিল। আজও মনে আছে—লোকটার গায়ে একটা ময়লা চিটচিটে কামিজ, খালি পা, রুক্ষচুল। বয়স বুঝিবার উপায় নাই, অন্ততঃ আমার পক্ষে।

আমি লোকটাকে আর কখনও দেখি নাই, কারণ বাবা-মা এখানে থাকিলেও, দিদিমা আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া এতদিন ছিলাম মামার বাড়ীতেই। এ-গ্রামে আমি আসিয়াছি বেশী দিন নয়। যখন চলিয়া গিয়াছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র ছ-বছর।

বিনোদ-মাস্টার বলিল—কি পরেশ, কি খবর?

লোকটা উঠানে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে দেখিয়া বলিতে গেলাম—আসুন না ওপরে—

কিন্তু বিনোদ-মাস্টার আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—কি চাই পরেশ? লোকটা আর একবার কেমন এক ধরনের হাসিল। এই প্রশ্নের উত্তরে যে-ধরনের হাসা উচিত ছিল তেমন নয়—যেন নিজের প্রশংসা শুনিয়া বিনীত ও লাজুক হাসি হাসিতেছে। ছেলেমানুষ হইলেও বুঝিলাম হাসিটা অসংলগ্ন ধরনের।

বলিল—খিদে পেয়েছে।

আমার জাঠতুতো ভাই শীতল বাড়ীর ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উঠানের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে পরেশকাকা কোথা থেকে? কোথায় ছিলেন এতদিন?

লোকটি উত্তরে শুধু বলিল—খিদে পেয়েছে।

শীতল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া এক বাটি মুড়ি আনিয়া লোকটির কোঁচার কাপড়ে ঢালিয়া দিল। আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি লোকটা কে, এবং এত সম্মানসূচক সম্বোধন করিতেছে শীতল-দা অথচ বসিতে বলিতেছে না-ই বা কেন, এমন সময় লোকটা একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। শীতলদা'র দেওয়া মুড়ির এক গাল মাত্র খাইয়া বাকিগুলি একবার রাইট্-য়্যাবাউট্-টার্ণ করিয়া ঘুরপাক খাইয়া উঠানময় কাদার উপর ছড়াইয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে কি একটা দুর্ব্বোধ্য ছড়া উচ্চারণ করিল গান করার সুরে—

গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
খোদার চাল গামছায় বাঁধি
গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
গুগ্‌লি ঝিনুক—
গুগ্‌লি ঝিনুক—

তখনও সে ঘুরপাক খাইতেছে ও ছড়া বলিতেছে, এমন সময় আমার জ্যাঠামশাই দুর্লভ রায় তিনি অত্যন্ত রাশভারী ও কড়া মেজাজের লোক—বাড়ীর ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপের পাশে উঠান হইতে অন্দরে যাইবার দরজাতে দাঁড়াইয়া হাঁক দিয়া বলিলেন—কে চেঁচামেচি করে দুপুরবেলা? ও পাগ্‌লটা? মুড়িগুলো নিলে, তবে কেন ও-রকম করে ফেললে যে বড—বদমায়েশী করবার আর জায়গা পাও নি?

বলিয়া তিনি আসিয়া লোকটার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক ঘা চড় মারিলেন, পরে তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন, 'বেরোও এখান থেকে, আর কোনদিন দরজায় ঢুকেছ তো মেরে হাড় গুঁড়ো করব'—আমার বলিষ্ঠ জ্যাঠামহাশয়ের ধাক্কার বেগে রোগা ও পাতলা লোকটা খানিক দূরে ছিটকাইয়া গিয়া কাদার-পিছল উঠানের উপর পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল এবং একটু সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া মাটিতে একবার থুথু ফেলিল—রক্তে রাঙা।

ইতিমধ্যে মজা দেখিতে আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানের দরজায় জড় হইয়াছিল—লোকটা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেই তাহারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটার উপর সহানুভূতিতে আমার মনটা গলিয়া গেল।

পরেশ-কাকার সহিত এই ভাবেই আমার প্রথম পরিচয়।

ক্রমে জানিলাম পরেশ-কাকা এই গাঁয়েরই মুখুজ্যেবাড়ীর ছেলে, পশ্চিমে কোথায় যেন চাকুরি করিত, বয়স বেশি নয়—এই মাত্র পঁচিশ। হঠাৎ আজ বছর-দুই মাথা খারাপ হওয়ার দরুন চাকুরি ছাড়িয়া আসিয়া পথে-পথে পাগলামি করিয়া ঘুরিতেছে। তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সে যে-বাড়ীর ছেলে তাহাদের সকলেই বিদেশে কাজকর্ম্ম করে, এখানে কেহ থাকে না, উন্মাদ ভাইকে বাসায় লইয়া যাইবার গরজও কেহ এ-পর্য্যন্ত দেখায় নাই। পাগল পরের বাড়ী ভাত চাহিয়া খায়, সব দিন লোক দেয় না, মাঝে মাঝে মার-ধোরও খায়।

একদিন নদীর ধারে পাখির ছানা খুঁজিতে গিয়াছি একাই। আমায় একজন সন্ধান দিয়াছিল গাং-শালিকের অনেক বাসা গাঙের উঁচু পাড়ে দেখা যায়। অনেক খুঁজিয়াও পাইলাম না।

সন্ধ্যা হয়-হয়। রোদ আর গাছের উপরও দেখা যায় না। নদীর পাড়ে ঘন-ছায়া নামিয়াছে। বাড়ী ফিরিতে যাইব, দেখি নদীর ধারে চটকাতলার শ্মশানে গ্রামের প্রহ্লাদ কলুর বৌ যে ছোট টিনের চালাখানা তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহারই মধ্যে কে বসিয়া আছে।

ভয় হইল। ভূত নয় তো?

একটু আগাইয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখি ভূত নয়, পরেশ-কাকা। ঘরের মেজেতে শ্মশানের পরিত্যক্ত একখানা জীর্ণ মাদুর পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল—পয়সা আছে কাছে?

পরেশ-কাকাকে ভয় করিয়া সবাই এড়াইয়া চলে, কিন্তু আমি সাহস করিয়া কাছে গেলাম। আমি জানি পরেশ-কাকা এ-পর্য্যন্ত মার খাইয়াছে, মারে নাই কাহাকেও। আহা, পরেশ-কাকার পিঠে একটা দগ্‌দগে ঘা, ঘায়ে মাছি বসিতেছে, পাশে একটা মালসায় কতকগুলি ডালভাত, তাহাতেও মাছি বসিতেছে।

বলিলাম—এ জঙ্গলের মধ্যে আছেন কেন কাকা? আসবেন আমাদের বাড়ী? আসুন, শ্মশানে থাকে না—

পরেশ-কাকা বলিল—দূর, শ্মশান? বুঝি, এ তো আমার বৈঠকখানা। ওদিকে বাড়ী রয়েছে, দোমহলা বাড়ী। দু-হাজার টাকা জমা রেখেছি দাদার কাছে। বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা তাই দিচ্ছে না। ঝগড়া মিটে গেলেই দিয়ে দেবে। পাঁচ বছর চাকরি করে টাকা জমাই নি ভেবেছিস?

কত করিয়া খোশামোদ করিলাম, পরেশ-কাকা মড়ার মাদুর ছাড়িয়া কিছুতে উঠিল না।

ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম পরেশ-কাকার মামারা আসিয়া তাহাকে হুগলি লইয়া গিয়াছে

দুই বৎসর পরে আমার উপনয়নের দিন ভোজে পরেশ-কাকাকে ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে পরিবেশন করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে, মামারা অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছিল, এবং অনেক পয়সাকড়ি খরচ করিয়াছিল।

কি সুন্দর চেহারা হইয়াছে পরেশ-কাকার। পরেশ-কাকা যে এত সুপুরুষ, পাগল, অবস্থায় ছেঁড়া নেকড়া পরনে, গায়ে কাদা-ধূলা মাখিয়া বেড়াইত বলিয়াই আমি বুঝিতে পারি নাই। বলিষ্ঠ একহারা গড়ন, রং টকটকে গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর; দেখিয়া খুশি হইলাম।

কিছুদিন পরে ঘটা করিয়া পরেশ-কাকার বিবাহ হইল। শুনিলাম নববধূ কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ে! বৈকালে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার দরুন বর-বধূর পৌছিতে এক প্রহর রাত্রি হইয়া গেল। আলো জ্বালিয়া বরণ হইল। এসিটিলিন গ্যাসের আলোতে আমরা নববধূর মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এ-সব অঞ্চলে অমন সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখি নাই। সকলেই একবাক্যে বলিল—বৌ না পরী, পরেশের বহু জন্মের ভাগ্যে এমন বৌ মিলিয়াছে।

বিবাহের কিছুদিন পরে পরেশ-কাকার বৌ বাড়ী চলিয়া গেলেন। মাস-দুই পরে আবার আসিলেন।

সকালে পরেশ-কাকাদের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। তাহাদের বাড়ীর সকলে তখন কি-একটা ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। অনেকে আমার বয়সী ছেলেমেয়ে।

নতুন খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছেন। জরিপাড় শাড়ি পরনে, আমাদের স্কুলে সরস্বতী-প্রতিমা গড়ানো হইয়াছিল এবার, ঠিক যেন প্রতিমার মতো মুখশ্রী।

আমরা সামনে উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিলাম। পরেশ-কাকার বৌ ওখানে বসিয়া থাকাতে সেদিন আবার যেন উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল, কত কি অসম্ভব কাজ করিয়া খুড়ীমাকে খুশি করি। সে কি লাফঝাঁপ, কি দৌড়াদৌড়ি, কি চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলাম হঠাৎ! গায়ে যেন দশ জনের বল আসিল।

এমন সময় শুনিলাম পরেশ-কাকার বৌ বাড়ীর ছেলে নেপালকে বলিতেছেন—ওই ফর্সা ছেলেটি কে নেপাল? বেশ চোখ-দুটি—

নেপাল বলিল—ওপাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ীর পানু—

পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—ডাক না ওকে?

আনন্দে আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্ করিতে লাগিল। মুখ আগেই রোদে ছুটাছুটিতে রাঙা হইয়াছিল, এখন তা আরও রাঙা হইয়া উঠিল লজ্জায়। অথচ কিসের লজ্জা!

গিয়া প্রথমেই একটি প্রণাম করিলাম। পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—তোমার নাম কি? পানু? ভালো নাম কি?

লজ্জা ও সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া বলিলাম—বাণীব্রত—

তিনি বলিলেন—বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনিই নাম। পড় তো? বেশ, বেশ। এখানে এস খেলা করতে রোজ। আসবে?

সেরাত্রে আনন্দে আমার বোধ হয় ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। যেন কোন্ স্বর্গের দেবী কি রূপকথার রাজকুমারী যাচিয়া আমার সঙ্গে ভাব করিয়াছেন। অমন রূপ কি মানুষের হয়।

ইহার পরদিন হইতে পরেশ-কাকাদের বাড়ী রোজ যাইতে আরম্ভ করিলাম, দিন নাই, দুপুর নাই, সকাল নাই। কি ভাবই হইয়া গেল খুড়ীমার সঙ্গে! আমার বয়স তখন বারো, খুড়ীমার কত বয়স বুঝিতাম না, এখন মনে হয় তাঁর বয়স ছিল আঠার-উনিশ।

বিবাহের পর-বৎসর গ্রামে খবর আসিল পরেশ-কাকা বিদেশে চাকুরিস্থলে আবার পাগল হইয়া গিয়াছেন। খুড়ীমা তখন মাস-দুই হইল বাপের বাড়ী। পাগল হইবার সংবাদ শুনিয়া বাপের সঙ্গে তিনি স্বামীর কর্ম্মস্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন পরেশ-কাকাকে পাগলাগারদে পাঠান হইয়াছে। খুড়ীমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই, খুড়ীমার বাবা মেয়েকে পাগলাগারদে লইয়া গিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সব ব্যাপার মিটিয়া গেলে তিনি মেয়েকে লইয়া ফিরিলেন।

পরেশ-কাকার বড ভ্রাতৃবধূ তখন ছেলেমেয়ে লইয়া গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি পত্র লিখিয়া পরেশ-কাকার বৌকে মাস-দুই পরে আনাইলেন। খুড়ীমার আসিবার সংবাদ পাইয়া সকালে উঠিয়াই ছুটিয়া দেখা করিতে গেলাম। তাঁর মুখে ও চেহারায় দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিলাম না, তেমনই হাসি-হাসি মুখ, মুখশ্রী তেমনি সুকুমার, বিদ্যুতের মতো রং এতটুকু ম্লান হয় নাই। কি স্নেহ ও আদরের দৃষ্টি তাঁর চোখে, আমি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়া হাসিমুখে বলিলেন—এই যে পাবু, কেমন আছ? একটু রোগা দেখছি যে!

আমি উত্তরে হাসিয়া খুড়ীমার সামনে মেজের উপরে বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—আপনি ভালো ছিলেন খুড়ীমা?

খুড়ীমা বলিলেন—আমার আর ভালো থাকাথাকি, তুমিও যেমন পাবু!

পরেশ-কাকা পাগল হইয়াছেন সে-কথা ভাবিয়া খুড়ীমার জন্য দুঃখ হইল। অভাগিনী খুড়ীমা!

খুড়ীমা বলিলেন—কাছে সরে এসো ব'সো পাবু। পাবু আমাকে বড় ভালোবাস—না?

ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম খুব ভালোবাসি।

—আমিও কলকাতায় থাকতে পাবুর কথা বড় ভাবি! পাবু, এ গাঁয়ে তোর মতো ভালোবাসে না কেউ আমায়।

লজ্জায় রাঙা হইয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া থাকিতাম। তেরো বছরের ছেলে কি কথাই বা জানি!

—কলকাতা দেখেছ পাবু ?

—না, কে নিয়ে যাবে ?

—আচ্ছা, এবার আমি যখন যাব এখান থেকে, নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে। বেশ আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকবে, কেমন তো ?

—কবে যাবেন খুড়ীমা ? শ্রাবণ মাসে ? না, এখন কিছুদিন থাকুন এখানে। যাবেন না এখন।

—কেন বল তো ?

হাসিয়া তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিলাম—আপনি থাকলে বেশ লাগে।

নতুন বামুন হইয়াছি। তখনও একাদশী ছাড়ি নাই, যদিও এক বৎসরের বেশি উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে খুড়ীমা নিমন্ত্রণ করিয়া আমায় খাওয়াইতেন। নিজের হাতে আমার জন্য খাবার করিয়া রাখেন, কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন নিমকি কি কচুরি, বৈকালে বেড়াইতে গেলে কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাইতে দেন। অনেক রকম ব্রত করিতেন, তাঁর ব্রতের বামুন আমিই। পৈতে ও পয়সা কত জমা হইয়া গেল আমার টিনের ছোট বাক্সটাতে।

আমিও অবসর পাইলেই খুড়ীমার কাছে ছুটিয়া যাইতাম, ছাদের কোণে বসিয়া কত আবোল-তাবোল বকিতাম তাঁর সঙ্গে। বই পড়িয়া শোনাইতাম। খুড়ীমা বেশ ভালই লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু বলিতেন—পাবু, তুই প'ড়ে শোনা দিকি ? ভারি ভালো লাগে আমার তোর মুখে বই-পড়া শুনতে ! তোর গলার সুর ভারি মিষ্টি—

আমাদের গ্রামে সে-বার 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালা হইয়াছিল বারোয়ারিতে। পালাটার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার একটা গান চমৎকার লাগিয়াছিল বলিয়া শিখিয়া লইয়াছিলাম, এবং বেশ ভালো গাহিতে পারিতাম।

নয়নে কখনো হেরিব না নাথ,
দেখা হবে মনে মনে।
আমার নিশীথ স্বপনে এসো
এসো তন্দ্রা আবরণে।

খুড়ীমা প্রায়ই বলিতেন—পাবু, সেই গানটা গাও তো ?

গ্রামের লোকে অনেকে কিন্তু খুড়ীমাকে দেখিতে পারিত না।

আমার কানেও এ-রকম কথা গিয়াছে।

একবার রায়-বাড়ীর বড়গিন্নীকে বলিতে শুনিলাম—কি জানি বাপু জানি নে, ও সব কলকেতার কাণ্ড। সোয়ামী যার পাগলাগারদে, তার অত চুলবাঁধার ঘটাই বা কিসের, অত পাতাকাটার বাহারই বা কিসের, এত হাসিখুশিই বা আসে কোথা থেকে ! কিবে ঢং, কিবে শাড়ির রং—না বাপু, আমার তো ভালো লাগে না—তবে আমরা সেকেলে বুড়োহাবড়া, কলকেতার ফেশিয়ান তো জানি নি ?

এ-রকম কথা আমি আরও শুনিয়াছি অন্য-অন্য লোকের মুখে।

মনে হইত তাদের নাকে ঘুষি লাগাইয়া দিই, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি, তাদের বলি—না, তোমরা জান না। তোমাদের মিথ্যে কথা। তোমাদের অনেকের চেয়ে খুড়ীমা ভালো—খুব ভালো।

কিন্তু যাহারা বলে তাহারা গ্রামসম্পর্কে গুরুজন, বয়স অনেক বেশি। কাজেই চুপ করিয়া থাকিতাম।

তাঁহার চেহারা, মুখশ্রী এতকাল পরে আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে তা নয়। কেবল একদিনের তার অপূর্ব্ব কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখ গভীর ভাবে আমার মনে ছাপ দিয়াছিল। যখন সে-মুখ মনে পড়ে তখন একটি উনিশ-কুড়ি বছরের কৌতুকপ্রিয়া, হাস্যমুখী সুন্দরী তরুণীকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

সে-বার আমাদের গ্রামে কোথা হইতে এক দল পঙ্গপাল আসিয়াছিল। গাছপালা, বাঁশবন, সজনেগাছ, ঝোপঝাপ পঙ্গপালে ছাইয়া ফেলিল। খুড়ীমা ও আমি ছাদে দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিতেছিলাম—দু'জনের কেহই আর যে কখনও পঙ্গপাল দেখি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ খুড়ীমা বিস্ময়ে ও কৌতুকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিলেন—ও পাবু, ছাখ্ ছাখ্—রায়দের নিমগাছে একটা পাতাও রাখে নি, শুধু গুঁড়ি আর ডাল, এমন কাণ্ড তো কখনও দেখি নি—ও মাগো।

বলিয়াই কৌতুকে ও আনন্দে বালিকার মতো খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁর এই হাসিমুখটিই আমার মনে আছে।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িল। আমাদের নদীর দু-ধারে কাশফুল ফুটিয়া আলো করিল। আকাশ নীল, লঘু শুভ্র মেঘখণ্ড বাদামবনীর চরের দিক হইতে উড়িয়া আসে, আমাদের সায়েরের ঘাটের উপর দিয়া, গিরীশ-জ্যাঠাদের বড় আমবাগানের উপর দিয়া শুভরত্নপুরের মাঠের দিকে কোথায় উড়িয়া যায়···বড় বড় মহাজনী কিস্তী নদী বাহিয়া যাতায়াত শুরু করিয়াছে, কয়ালরা ধান মাপিতে দিনরাত বড় ব্যস্ত।

খুড়ীমা আমাদের গ্রামেই রহিয়া গেলেন। পরেশ-কাকাও পাগলাগারদ হইতে বাহির হইলেন না। খুড়ীমাদের বাড়ী তাঁর ননদের এক দেওর আসিল পূজার সময়, নাম শান্তিরাম, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখিতে চেহারাটা ভালোই। অল্প দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়া কেন যে কুটুম্ববাড়ী ছাড়িয়া আর নড়িতে চায় না, যাইলেও অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার কিছু কাল কাটাইয়া যায়—ইহার কারণ আমি কিছু বলিতে পারিব না—কেবল ইহা শুনিলাম যে গ্রামে তার নামের সঙ্গে খুড়ীমার নাম জড়াইয়া একটা কুকথা লোকে রটনা করিতেছে। একদিন দুপুরের পরে খুড়ীমাদের বাড়ী গিয়াছি। পিছনের রোয়াকে পেঁপেতলার জানলার ধারে খুড়ীমা বসিয়া আছেন, শান্তিরাম বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া খুড়ীমার সঙ্গে আস্তে আস্তে এক-মনে কি কথা বলিতেছে—আমাকে দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিল—কি পাবু, দুপুরবেলা বেড়ানো কি? পড়াশুনো

করো না? যাও এখন যাও—

আমি শান্তিরামের কাছে যাই নাই, গিয়াছি খুড়ীমার কাছে। কিন্তু আমার দুঃখ হইল যে, খুড়ীমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও বলিলেন না—আমি তখনই ওদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম। ভয়ানক অভিমান হইল খুড়ীমার উপর—তাঁর কি একটা কথাও বলা উচিত ছিল না?

ইহার পর খুড়ীমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ না করিলেও কামাইয়া দিলাম। খুড়ীমাকে আর তেমন করিয়া পাই না; শান্তিরাম আজকাল দেখি সময় নাই, অসময় নাই, ছাদে কি সিঁড়ির ঘরে বসিয়া খুড়ীমার সহিত গল্প করিতেছে—আমার যাওয়াটা সে যেন তেমন পছন্দ করে না। খুড়ীমাও যেন শান্তিরামের কথার উপর কোন কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

খুড়ীমার নামে পাড়ায় পাড়ায় যে-কথা রটনা হইতেছে, তাহা আমার কানে প্রতিদিনই যায়। লক্ষ্য করিলাম, খুড়ীমার উপর আমার ইহার জন্য কোনই রাগ নাই, যত রাগ শান্তিরামের উপর। সে দেখিতে ফর্সা, বেশ শহুরে-ধরনের গোছালো কথাবার্ত্তাও কয় বটে, শৌখীন সাজপোশাকও করে বটে, কিন্তু হয়ত তাহার ফিট্‌ফাট সাজগোজের দরুনই হোক, কিংবা তাহার শহর-অঞ্চলের বুলির জন্যই হোক, কিংবা তাহার ঘন ঘন বার্ডসাই খাওয়ার দরুনই হোক, লোকটাকে প্রথম দিন হইতেই আমি কেমন পছন্দ করি নাই। কেমন যেন মনে হইয়াছিল এ লোক ভালো না।

একদিন চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বাঁধানো-রাণায় সর্ব্ব চৌধুরী ও কালীময় বাড়ুয্যে কি কথা বলিতেছিল—আমি পুঁটি-মাছ-মারা ছিপ-হাতে মাছ ধরিতে গিয়াছি—আমাকে দেখিয়া উহারা কথা বন্ধ করিল। আমি বাঁধানো ঘাটে নামিয়া মাছ ধরিতে বসিলাম। সর্ব্ব চৌধুরী বলিল—তাই তো ছোঁড়াটা যে আবার এখানে।

কালীময় জ্যাঠা বলিলেন—বল, বল, ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না।

সর্ব্ব চৌধুরী বলিল—এখন কি করবে, এর একটা বিহিত করতে হয়। গাঁয়ের মধ্যে আমরা এমন হ'তে দিতে পারি নে। একটা মিটিং ডাকো। পরেশের বৌ সম্বন্ধে এমন হয়ে উঠেছে যে কান পাতা যায় না। নরেশকে একখানা চিঠি লিখতে হয় তার চাকুরির স্থানে, আর ওই শান্তিরাম না কি ওর—ওকেও শাসন ক'রে দিতে হয়।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন শাসন-টাসন আর কি—ওকে এ-গ্রামে থেকে চলে যেতে বলো। না যায় আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দাও। নরেশ কি চাকুরি ছেড়ে আসবে এখন কুটুম্ব শাসন করতে? সে যখন বাড়ী নেই, তখন আমরাই অভিভাবক।

সর্ব্ব চৌধুরী বলিলেন—ছুঁড়ীটাও নাকি বড্ড বাড়িয়েছে শুনতে পাই।

কালীময় জ্যাঠা বলিলেন—তাই তো শুনছি। বয়েসটা খারাপ কিনা। তাতে স্বামী ওই রকম।

কালীময়-জ্যাঠা আমাকে যতই না বোকা ভাবন আমার কিন্তু বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল

না। খুড়ীমার উপর অভিমান চলিয়া গেল, ভাবিলাম ইহারা হয়তো খুড়ীমাকে কোন একটা শক্ত কথা শুনাইবে কিংবা অপদস্থ করিবে। কথাটা খুড়ীমাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়াও দেখিলাম খুড়ীমাকে এ-কথা আমি বলিতে পারিব না, কোনমতেই নয়।

শান্তিরামের উপর ভয়ানক রাগ হইল। তুমি কেন বাপু এখানে আসিয়াছ পরের সংসারের শান্তি নষ্ট করিতে? নিজের দেশে কেন চলিয়া যাও না? এতদিন কুটুম্ববাড়ী পড়িয়া থাকিতে লজ্জাও তো হওয়া উচিত ছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আমি কাকার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিব বলিয়া গ্রাম হইতে চলিয়া গেলাম। যাইবার আগে খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মাকে ছাড়িয়া যাইতে যত কষ্ট হইতেছিল, খুড়ীমাকে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনি।

খুড়ীমা আদর করিয়া বলিলেন—পাবু, লেখাপড়া শিখে কত বিদ্বান হয়ে আসবে, কত বড় চাকুরি করবে! মনে থাকবে তো খুড়ীমার কথা?

লাজুক মুখে বলিলাম—খুব মনে থাকবে। আমি ভুলব না খুড়ীমা।

খুড়ীমা তাড়াতাড়ি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—সত্যি বলছিস্ ভুলবি নে কখনও পাবু?

জোর গলায় বলিলাম—কক্ষনো না।

বলিয়াই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি সজল চোখে কিন্তু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সত্যিই বলিতেছি চলিয়া আসিয়াছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। গ্রাম ছাড়িতে হইল বাবার কড়া হুকুমে। খুড়ীমাকে কোন ভয়ানক বিপদের মুখে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি, আমার মন যেন বলিতেছিল।

থাকিলেই বা ছেলেমানুষ কি করিতে পারিতাম? মাস ছয়-সাত পরে গরমের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, মাঘ মাসে শান্তিরাম খুড়ীমাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কেহই তাহাদের কোন সন্ধান করে নাই, কোন আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

খুড়ীমার ইতিহাসের এই শেষ। তার পর দু-একবার খুড়ীমার সংবাদ যে নিতান্ত না পাইয়াছি এমন নয়, যেমন, একবার যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি তখন শুনিয়াছিলাম আমাদের গ্রামের কাহারা চাকদায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া খুড়ীমাকে দেখিয়াছে—ভাল জামা-কাপড় পরনে, গায়ে এক-গা গহনা ইত্যাদি। আরও একবার ফার্স্ট ক্লাসে পড়িবার সময় গাঁয়ে গুজব রটিয়াছিল কাঁচরাপাড়ার বাজারে খুড়ীমার সঙ্গে আমাদের অমূল্য জেলের মা না মাসীমার দেখা হইয়াছে, খুড়ীমার সে চেহারা আর নাই, শান্তিরাম নাকি ফেলিয়া পলাইয়াছে, ইত্যাদি।

খুড়ীমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ছ-সাত বছর পরের কথা এ-সব। কিন্তু এ-সব কথার কতদূর মূল্য আছে আমি জানি না। আমার তো মনে হয় না গাঁ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে খুড়ীমাকে কখনও কেহ কোথাও দেখিয়াছে।

যাক এ অতি সাধারণ কথা। সব জায়গায় সচরাচর ঘটিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কি আছে! তা নয়। আমার মনের সঙ্গে খুড়ীমার এই ইতিহাসের সম্বন্ধ কিন্তু খুব সাধারণ নয়। আসল কথাটা সেখানেই।

বড় তো হইলাম, কলেজে পড়িলাম, কলিকাতায় আসিলাম। বাল্যের কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি ভাব, নূতন বন্ধুলাভের জোয়ারের মুখে কোথায় মিলাইয়া গেল! খুড়ীমাকে কিন্তু আমি ভুলিলাম না। এ-খবর কি কেউ জানে, কলেজের ছুটিতে দেশে ফিরিবার সময় নৈহাটী কি কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে গাড়ী আসিলেই কতবার ভাবিয়াছি এই সব জায়গায় কোথাও হয়ত খুড়ীমা আছেন। নামিয়া কখনও অনুসন্ধান করি নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই ভাবিয়াছি তাঁর কথা। কলিকাতার কোন কুপল্লীর সহিত তাঁহার কোন যোগ আমি মনেও স্থান দিতে পারি নাই কোনদিন। কেন, তাহা জানি না, বোধ হয় বাল্যে কাঁচড়াপাড়া বা চাকদহে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা হইতেই ঐ অঞ্চলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কেন নামিয়া কখনও খুঁজিয়া দেখি নাই, ইহার কারণ আছে। আমার মনে এ-কথা কে যেন বলিত খুড়ীমা বাঁচিয়া নাই। যে-ভুল তিনি না-বুঝিয়া অল্প বয়সে করিয়া ফেলিয়াছেন, সে-ভুলের বোঝা ভগবান তাঁহাকে চিরকাল বহিতে দিবেন না, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা তরুণী খুড়ীমার কাঁধ হইতে সে-বোঝা তিনি নামাইয়া লইয়াছেন।

স্কুল-কলেজের যুগও কাটিয়া গেল। বড় হইয়া সংসারী হইলাম। কত নূতন ভালোবাসা, নূতন মুখ, নূতন পরিচয়ের মধ্য দিয়া জীবন চলিল। কত পুরাতন দিনের অতি-মধুর হাসি ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইল, কত নূতন মুখের নূতন হাসিতে দিনরাত্রি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবনে এ-রকমই হয়। একদিন যাহাকে না দেখিলে বাঁচিব না মনে হইত, ধীরে ধীরে সে কোথায় তলাইয়া যায়, হঠাৎ একদিন দেখা গেল তাহার নামটাও আর মনে নাই।

মনের ইতিহাসের এই ওলটপালটের মধ্য দিয়াও খুড়ীমা কিন্তু টিকিয়া আছেন অনেক দিন। বাল্যে তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে কখনও ভুলিব না বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, বালক-হৃদয়ের সেই সরল সত্য বাণীর মান ভগবানই রাখিয়াছেন।

কিসে জানিলাম বলি। আমাদের গ্রাম হইতে খুড়ীমা কতকাল চলিয়া গিয়াছেন। পঙ্কপালও আর কখনও তার পরে আমাদের গ্রামে আসে নাই—কিন্তু রায়েদের সেই নিমগাছটি এখনও আছে। বেশি দিনের কথা নয়—বোধ হয় গত মাঘ মাসের কথা হইবে—রায়েদের বাড়ী জমাজমি সম্পর্কে একটা কাজে গিয়া সীতানাথ রায়ের সঙ্গে একখানা দরকারী দলিলের আলোচনা করিতেছি—হঠাৎ নিমগাছটায় নজর পড়াতে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেলাম। বহুদিন এদিকে আসি নাই। বাল্যের সেই নিমগাছটা। পরক্ষণে দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের এক হাস্যমুখী বালিকার কৌতুক ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুখ মনে পড়িল এবং নিজের অলক্ষ্যেতে মনটা এমন একটা অব্যক্ত দুঃখে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল যে দলিলের আলোচনার কোন উৎসাহই খুঁজিয়া পাইলাম না, দেখিলাম, খুড়ীমাকে তো

এখনও ভুলি নাই !

বয়স হইয়াছে, মনে হইল মোটে আঠার-উনিশ বছর বয়স ছিল খুড়ীমার ! কি ছেলে-মানুষই ছিলেন !

মানুষের মনে মানুষ এই রকমেই বাঁচিয়া থাকে। গত ছাব্বিশ বছরের বীথিপথ বাহিয়া কত নববধূ গ্রামে আসিয়াছেন, গিয়াছেন—কিন্তু দেখিলাম ছাব্বিশ বছর আগেকার আমাদের গ্রামের সেই বিস্মৃতা হতভাগিনী তরুণী বধূটি আজও এই গ্রামে বাঁচিয়া আছেন।

বায়ুরোগ

হাঁসখালি থেকে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তা চলে গিয়েছে, ঐ রাস্তা বেয়ে যাচ্ছিলুম আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী। বগুলা স্টেশনে নেমে সোজা পাকা রাস্তা। দুপুরের পর একাই হেঁটে চলেছি, পথে বড় একটা লোকজন নেই, বৃষ্টির দিন, আকাশ মেঘান্ধকার, জোলো হাওয়া বইছে, রাস্তার দু'ধারের বড় বড় গাছ থেকে টুপটাপ জল পড়ছে, দিনটা ঠাণ্ডা, রাস্তা হাঁটবার পক্ষে উপযুক্ত দিন বটে।

ডোমচিতি, গোয়ালবাগি ছাড়িয়েছি। রাস্তার দু'ধারে ঘন ঘন বাগান। আরও আট-দশ মাইল রাস্তা যেতে হবে। একটা বাঁধানো সাঁকোর ওপর বিশ্রাম করব বলে বসেছি, এমন সময় আর একজন পথ-চল্‌তি লোক এসে আমার সামনের সাঁকোটাতে বসল। খানিকটা বসে সে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর একটু সঙ্কোচের সুরে বল্‌লে—বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে? তারপর দেশলাই নিয়ে বললে—আমার সঙ্গে তামাক আছে। একটু তামাক সাজব, খাবেন?

বললুম—না দরকার নেই। আমি—

—লোকটা যেন একটু দুঃখিত হ'ল। বললে—না কেন বাবু, খান না? আমি সেজে দিচ্ছি। এমন সুরে বললে যে, আমার জন্যে তামাক না সাজতে পেয়ে তার মনে যেন সুখ নেই। একটু অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখলুম ওর দিকে, চিনিনে শুনিনে কোনো কালে, আমি তামাক খাই না খাই তাতে ওর কি আসে যায়?

অগত্যা বললুম—সাজ—

এইবার তাকে ভালো করে দেখলুম। বয়েস ত্রিশের মধ্যে, মুখশ্রী কাঁচা, লম্বা লম্বা চুল। গায়ে একটা খাকির সার্ট। কিন্তু ওর চোখ দু'টো এত শান্ত ও এত নিরীহ যে, দেখলেই তার ওপর কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসে না। একটা ভাঙা ছাতি আর একটা বোঁচকা ওর সম্বল, ধরন-ধারণে নিছক খাঁটি ভবঘুরে।

দু'জনে একদিকেই পথ চলতে আরম্ভ করলুম তারপর থেকে। মামুদপুরের বাজারে এসে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটি মুদীর দোকানে রাত্রের জন্যে আশ্রয় নিলুম দু'জনেই—কারণ

সবাই বললে,—এখন দুর্ভিক্ষের সময়, সন্ধ্যার পরে এ পথে হাঁটা নিরাপদ নয়। অনেক সময়, সামান্য পয়সার জন্যে মানুষ খুন করেছে।

আমার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, নদীয়া জেলাতেই কোন্ গ্রামে বাড়ী, সংসারে কেউ নেই, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। বছরখানেক পথে বিপথে ঘুরবার পরে সম্প্রতি নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

একটা স্বভাব দেখলুম তার, সাধারণের পক্ষে স্বভাবটা খুব অদ্ভুত বলতে হবে। লোকের এতটুকু উপকার করতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কাছের লোককে কি করে খুশি করবে, এই হ'ল তার জীবনে মস্ত বড় একটা নেশা!

রাত্রে সে-ই রান্না করলে। আমায় এতটুকু সাহায্য পর্য্যন্ত করতে দিলে না।

খেতে বসে আমি বুঝলুম লোকটা পাকা রাঁধুনী। পাকা রাঁধুনী বললে সবটা বলা হ'ল না। রান্নার কাজে সে একজন শিল্পী! উঁচুদরের প্রতিভাবান শিল্পী। সত্যিই অবাক্ হয়ে গেলাম তার রান্না খেয়ে।

বললাম—কোথায় শিখলে হে এমন চমৎকার রান্না?

ও বললে—কেউ শেখায় নি, এমনি হয়েচে।

—তুমি কলকাতায় কি অন্য কোথাও মোটা মাইনের চাকুরি পেতে পারো হে, রান্নার কাজে। ধরো কোনো বড়লোকের বাড়ীতে। এ রকম ক'রে বেড়াও কেন?

সে হেসে বললে—তাও করেচি। কিন্তু আমার একটা বাতিক আছে বাবু। সেজন্যে আর কোথাও চাকরি স্বীকার করতে ইচ্ছে হয় না। সে কথাটা খুলে বলি তবে। সেটাকে একরকম রোগও বলতে পারেন। হয়তো বা বায়ুরোগ।

আমি ম্যাট্রিক পাস করে ভেবেছিলুম আরও পড়বো, কিন্তু অবস্থা খারাপ ছিল ব'লে পড়ার খরচ চালানো গেল না, সুতরাং ছেড়ে দিতে হ'ল।

তারপর চাকরির সন্ধানে বেরুই। সিংভূম জেলার একটা পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় খনিসংক্রান্ত কি জরীপ হচ্চে। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে জুটলাম। মস্ত বড় মাঠে অনেকগুলো তাঁবু পড়েচে, অনেক লোক। আমি একজন ওভারসিয়ারের তাঁবুতে রাঁধুনীর কাজ পেয়ে গেলাম। লোকটির বয়েস চল্লিশের ওপর হবে। একাই থাকে, একটা ছোকরা চাকর ছিল, আমি যাবার পরে তাকে জবাব দিয়ে দিলে।

কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর মনিবের প্রতি আমার একটা অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা লক্ষ্য করলুম। কিসে সে খুশি হবে, কিসে তাকে তৃপ্তি দিতে পারব খাইয়ে, এই হ'ল আমার একমাত্র লক্ষ্য। সে জিনিসটা একটা নেশার মত আমায় পেয়ে বসল। সেই জংলী জায়গায় খাবার জিনিস মেলে না, আমি হেঁটে দূর দূর গ্রাম থেকে মাছ তরকারী বহুকষ্টে সংগ্রহ ক'রে এনে রাঁধতাম। মনিবকে সকল কথা খুলে বলতাম না যে, কোথা থেকে কি জিনিস আনি। রান্না যতদূর সম্ভব ভালো করবার চেষ্টা করতাম, যাতে খেয়ে তৃপ্তি পায়।

লোকটা যে ভালো লোক ছিল, তা নয়। মাইনে বাকি ফেলতে লাগল, বাজারের পয়সা চুরি করি, এমন সন্দেহও মাঝে মাঝে করতো। আমি সে সব গায়ে মাখিনি কোনোদিন। চার মাস এই ভাবে কাটল। এই চার মাসে আমার অন্য কোন ধ্যান-জ্ঞান ছিল না, কেবল মনিবকে ঠিক সময়ে দু'টি খেতে দেব এবং ভালো খেতে দেব।

কিরকম—দু'একটা উদাহরণ দিই।

একবার শুনলুম মুংলী বলে একটা পাহাড়ী নদীতে বাঁধ বেঁধে সাঁওতালরা বড় চিংড়ি মাছ ধরবে। মাছ জিনিসটা ওদেশে বড় দুর্লভ বস্তু। টাকা-পয়সা ফেললেই পাবার জো নেই। চিংড়ি মাছ আনবার জন্যে ভয়ানক পাথর-তাতা রৌদ্রের মধ্যে—সাত মাইল চলে গেলুম এবং মাছ নিয়ে ফিরে এসে রান্না করে খাওয়ালুম মনিবকে। সে কথা বললুমও না যে কোথা থেকে মাছ এনেছি।

চার মাস পরে রান্নার খ্যাতি ও প্রভুভক্তির কথা জরীপের তাঁবুর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সে দেশটাতে ভালো বাঙ্গালী রাঁধুনী পাওয়া যায় না, সকলেই আমার মনিবকে বেশ একটু হিংসের চোখে দেখতে লাগল, ক্রমে আমার কাছে চুপি চুপি লোক হাঁটতে শুরু করলে আমায় ভাঙ্গিয়ে নেবার জন্যে। বেশি মাইনে দিতে চায়, নানারকম সুবিধে করে দিতে চায়। আমি কিছুতেই গেলাম না। জরীপের হেড্ কানুনগো কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত মাইনে দিতে চাইলে, আমি তখন পাই মোটে সাত টাকা। কিন্তু টাকার সুবিধের কথা আমার মনেই উঠল না। আমার মনিবকে তো আমি এ সব কথা কিছুই বলতাম না।

মাস পাঁচ-ছয় পরে কি জানি কেমন কুবুদ্ধি হ'ল মনিবের, আমায় অকারণে বকুনি গালাগালি শুরু করলে। আগেও যে একেবারে না বকতো এমন নয়, কিন্তু তাতে মাত্রা থাকতো। পুরনো হওয়াতে মনিব বোধ হয় ভাবতে লাগল আমার আর যাবার জায়গা নেই—কাজেই কারণে অকারণে গাল-মন্দ ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে লাগল।

একদিন মনিব আমায় ডেকে বললে—শোন এদিকে। আলুতে বালি দিয়ে রাখোনি কেন? সব যে কল্ বেরিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েচে—

সন্ধ্যার কিছু আগে। আমি আধ মাইল দূরবর্ত্তী দোকান থেকে সবেমাত্র তেল, মশলা কিনে ফিরে এসেচি। বললাম—বালি তো দেওয়াই ছিল, বর্ষাকালে বালি দিলেও কি কল্ বেরুনো সামলানো যায় বাবু?

মনিব হঠাৎ চটে উঠে বললে—কি! পাজি, ব্যাস্কেল্, আমার সঙ্গে মুখোমুখি উত্তর?

ব'লেই আমায় মারলে দু'টো চড়। তারপর গটগট করে বাইরে চলে গেল।

আমার হাত থেকে তেলের বোতল প'ড়ে চুরমার হয়ে গেল। মারের চোটে ও অপমানে কান লাল হয়ে উঠল। সেখানে বসে পড়লুম এবং অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু শুনলে আপনি আশ্চর্য্য হবেন এবং আমিও তখন আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম যে, মনিবের ওপর রাগের পরিবর্ত্তে আমার উল্টে একটা করুণার উদ্রেক হ'ল। ভাবলুম—আহা, লোকটা জানে না যে, ওর নিজের দোষে এবার আমি হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছি। হেড্ কানুনগোর

তাঁবুতে খবর পাঠাবার অপেক্ষা মাত্র। কানুনগোর সঙ্গে যে আমার মনিবের সদ্ভাব নেই, তাও সবাই জানে। খেও কাল থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে—এখানে আর বাঙ্গালী রাঁধুনী মিলছে না।

এই কথা যতই ভাবি, ততই ওর উপর করুণা ও অনুকম্পা গভীর হয়ে উঠে। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি! ভগবান আমার বুকে এসে যেন তাঁর আসন পেতেছেন। ওকে আমি ছেড়ে গেলে ওর কত কষ্ট হবে এবং বিশেষ ক'রে লোকটা কি বোকাই বনে যাবে—এই ভেবেই আমার মন গলে গেল। নিজের অপমান ভুলেই গেলাম একেবারে।

রাত আটটা যখন বেজেচে, তখন আমি উঠে গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলুম। তার আগেই ঠিক করে ফেলেচি আমি মনিবকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

ঘোড়ার সইস্টা কিন্তু আড়াল থেকে আমার মার খাওয়াটা দেখেছিল। সে গিয়ে সবাইকে গল্প করেচে। ফলে সকাল থেকে এক হেড্ কানুনগোর কাছ থেকেই আমার কাছে পাচবার লোক এলো আমায় ভাড়িয়ে নিতে।

তিন-চার দিন ধ'রে তারা সবাই আমাকে বিরক্ত করে মারলে। মনিব কাজে বেরিয়ে গেলেই তারা আসে। হেড্ কানুনগোর লোক এবং আরও লোক। কতরকম লোভ দেখায়, মনিবের বিরুদ্ধে আমায় রাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করে।

হেড্ কানুনগো বাবুর সঙ্গে একদিন পথে দেখা। তিনি ঘোড়ায় চেপে কাজে বেরিয়েছিলেন। আমায় দেখে বললেন—ওহে শোনো, আমার লোক তোমার কাছে গিয়েছিল?

বললুম—আজ্ঞে হাঁ।

—তা তুমি আসতে রাজী হও না কেন? শুনলাম সেদিন তোমায় মেরেচে। ছিঃ ছিঃ —কি বলে তুমি সেখানকার ভাত এখনও মুখে তুলচো? চলে এস ওবেলা থেকেই আমার ওখানে! কি বল!

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলুম। স্বয়ং হেড্ কানুনগো বাবু। তাঁকে 'না' বলি বা কি করে, এ তো আর উড়ে চাকর বা আরদালির দল নয়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললুম —হুজুর, আজই যাব আপনার ওখানে। দেখুন না, মিছিমিছি সেদিন অমনি মার দিলেন—

কি, হয়েছিল কি?

—কিছু না, ওঁর সোনার বোতামের সেটটা আমি মেঝেতে কুড়িয়ে পাই। পেয়ে নিজের বাক্সে তুলে রাখি। ভেবেছিলুম এলে দিয়ে দেব। তারপর আর মনে নেই সন্ধ্যেবেলা। উনি এদিকে পরদিন সকালে বোতাম হারিয়েচে বলে খুব তোলপাড় করচেন বাসা। আমি তখন গিয়েচি দোকানে। সে সময় উনি আমার তোরঙ্গটা খুঁজে বোতাম দেখতে পেয়েছেন সেখানে। তাই আমি দোকান থেকে আসতেই বললেন—রাস্কেল, তুই চুরি ক'রে রেখেছিলি বোতাম তোর বাক্সে। এই বলেই মার। কিন্তু হুজুর বাস্তবিক আমি চুরির মতলবে—

কানুনগোর মুখের ভাবে ক্রমশ পরিবর্তন হতে লাগল, ঘুঘু লোক, বেশ বুঝলেন আমি চুরির মতলবেই সোনার বোতাম তোরঙ্গে রেখেছিলুম। এমন লোককে কে বাসায় স্থান দেবে ? তিনি 'হুঁ', 'হাঁ', 'তা বটে' বলতে বলতে সরে পড়লেন।

চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল দু'একদিনের মধ্যেই, যে আমি মনিবের সোনার বোতাম লুকিয়ে রেখেছিলুম, তাই ধরা পড়াতে মার খেয়েছি। আর আমায় কেউ ভাঙ্‌চি দিতে আসে না। জেনে শুনে চোরকে কে কাছে রাখতে চায় ?

মনিব একদিন আমায় বললে—এ কি শুনচি ? তুমি কানুনগো বাবুর কাছে বলেচ সোনার বোতাম লুকিয়ে রেখেছিলে বলে তোমায় মেরেছিলুম সেদিন ? কেন এ কথা বললে ?

বললুম সব কথা খুলে। ওরা ভাঙ্‌চি দিতে আসে, বিরক্ত করে সর্ব্বদা, না ব'লে উপায় কি ? ও কথা না বললে কি আমার নিস্তার ছিল ?

মনিব বললে—তুমি অদ্ভুত লোক। এমন লোক আমি কখনো দেখিনি। আমায় ছেড়ে যেতে হবে বলে নিজের নামে নিজেই একটা মিথ্যে অপবাদ রটালে ? এ তো নিজের ভাই করে না, ছেলে করে না। তুমি রাঁধুনীর কাজ কোরো না, সাধারণ লোক নও তুমি। তোমাকে রাঁধুনী করে রেখে দিলে আমার অপরাধ হবে।

তিনি যদিও সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যে, কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। মনিবকে কত বোঝালুম, ছেড়ে যেতে চাইলুম না। তিনি হাতজোড় করে মাপ চাইলেন, বললেন—আমায় অপরাধী করো না, তুমি আমার রাঁধুনীর কাজ করবার লোক নও। যা হয়ে গিয়েচে তার চারা নেই—আর আমি সজ্ঞানে জেনে শুনে তোমায় দিয়ে চাকরের কাজ করাতে পারব না।

সেখানে চাকরি তো গেলই, যদিও এদিকে মনিব সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা মিথ্যে, কেউ সে কথা বিশ্বাস করলে না। সবাই ভাবলে চুরির জন্যে আমার চাকরি গেল।

আসবার সময় মনিব তাঁর ঘড়ি-চেন এবং পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিলেন। এই দেখুন সেই ঘড়ি-চেন। কিন্তু সেই থেকে মনে কেমন একটা কষ্ট হ'ল, পথে পথে বেড়াই। আর কারো বাড়ী রাঁধুনীর চাকরি নিইনি। নেবও না।

অরন্ধনের নিমন্ত্রণ

এক একজন লোকের স্বভাব বড় খারাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না, শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ। তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। আপিসে যারা তার সহকর্ম্মী, শেষ পর্য্যন্ত

তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশী কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন – তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তারবাবু? যদি দু'একটা কথাই কারো সঙ্গে বলতে না পারলুম! কথা বলতে বলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হবার ফলে তিনি মারা যান - মার্টার টু দি কজ্!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এতদিন হয়েও যেত, কিন্তু রামকৃষ্ণ আশ্রমের লোকেরা এ বিষয়ে তাকে বিশেষ উৎসাহ দেন নি, হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিন রাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে। স্টেশন থেকে দশ-বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল। বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখ্‌ছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন কিন্তু যেখানে যখন পুজো করতে যেতেন, আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হ'ত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক্ ছিল এই যে, তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি, এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মানুষে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধ'রে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিল—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল।

দু'একজন বলেছিল – এবার আমসত্ত্ব সাবধানে রোদ্রে দিও, মুখুয্যে মশায় মারা গিয়েছেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল-বসতে পারত না মুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন্ জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়! নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ করবারও কারণ ঘটে নি। মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্ল্লভ বাক-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন তেরো চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ

চুল মাথায়, বড় বড় চোখ, মিষ্টি গলার স্বর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিল-খিল হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হ'ল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা যে তেতপ্পর হ'ল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেব তার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রের বাসী দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসী দুধ রোজ রাখো কি না—

বলতে বলতে একটি কিশোরী একঘটি দুধ-হাতে বাড়ীর পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে—শোন ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো?—হি—হি—

পিপিমা বললেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত-বাড়ীতে ছাগল ঢুকে নাপিত-বৌ কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এইমাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুকপূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হ'ল, চা ভিজোনো হ'ল, হালুয়া তৈরি হ'ল, পেয়ালায় ঢালা হ'ল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড়ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি।···

কুমী বিস্ময়ের স্বরে বললে—কে পিসি?

তুই চিনিস্ নে, আমার বড় জেঠতুতো ভায়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরি করবার আর এত তাড়া দিচ্ছি কি জন্যে? তুই কি কারো কথা শুনতে পাস্, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত-বাড়ীতে ছাগলের কাঁথা চিবোনোর গল্প শুনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

—সে বললে—খুকী তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ী তোমার বুঝি? ও-পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হ'ল। হীরেনের সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় হয়েও গেল। দু'জন দু'জনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ। দু'জনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখিনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ার খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্চে, কুমী শুনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বকচে তখন হীরেন মন দিয়ে শুনচে।

সেবার পাঁচ ছ'দিন পিসিমার বাড়ী থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময়ে দেখা করলে না ব'লে হীরেন খুব দুঃখিত হ'ল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দু'তিন দিন মন-মরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ী পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠ্‌ল; যে হীরেন দু'বছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এদিকে বড় একটা মাড়াতো না, সে ঘন ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করলে।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই তোরা ছাড়া। নরসুপুরের ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমার খাজনার দরুন। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দু'দিন পিসিমার বাড়ী বেড়িয়ে আম খেয়ে ফূর্ত্তি করতে। সে জষ্টি মাসের দুপুর রোদে খাজনার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসেনি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একদিন বললে···পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছু হয়েচে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্চে দেখে পিসিমা খুব খুশি।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ী ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ী থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয় তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বললে—চললুম হীরুদা।

—এখনই যাবি কেন, বোস আর একটু—

উঠানের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হ'লে ভূতে পায় আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা · হি হি-হি-হি—; তারপর সে লাফালাফি ক'রে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ামুখী মেয়ে, এই ভরা সন্ধ্যেবেলা তুমি ও করচ কি? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে!—হীরু ভালো মানুষের মতো মুখখানি ক'রে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিভের হাসি। হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তে বসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরিটা গেল, আপিসের অবস্থা ভালো নয় ব'লে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়ী আরও অন্ততঃ দশবার এল গেল এবং এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীর মতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্ত্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধ হয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হন নি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায়।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে—কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বললে হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্ন্যাসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ী চলে গেল।

হীরুর বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকুরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ী বসে কতদিন আর এভাবে চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে-বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকুরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়; কাজকর্ম্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে

টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেণ যাচ্চে আসচে। শান্টিং এঞ্জিনগুলো ঝক্ ঝক্ শব্দ করে পাহাড়ের নিচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কয়লার ধোঁয়ায় দিনরাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে—সে আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে মণি, মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলেটি বেশ, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এস্-সি দিয়েচে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতার সায়েন্স্ কলেজে অধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স্ পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মনান্তর চলচে। হীরু জানতো এসব কথা।

বৈকাল বেলাটি। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে। নীল অতসী ও বন-তুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূর্ব্ব-দিকে শৈলসানুতে, একটি বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নিচে কুলীমেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধ্‌চে—পূবদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে, পূব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে—নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ী থেকে আনা স্যাণ্ড্উইচ্, ডিমসিদ্ধ, রুটি এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপর সাজালে—থার্মো-ফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার ক'রে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বললে—এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মহুয়াগাছের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হ'ল তোমার হীরুদা ?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বৈকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্যে। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই।

মণি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে—কি ব্যাপার বল তো হীরুদা ? তোমার আজ হয়েচে কি ?

—কিছু হয় নি, বলো না মণি ? একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে দায় উদ্ধার করো না—তোমার মতো ছেলের—

—কি, তোমার কোনো আপনার লোক ? তোমার নিজের বোন নাকি ?

—বোন না হ'লেও বোনের মতই। বেশ দেখতে মেয়েটি, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। একে তো লেখা-পড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেচি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপর উঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তাহলে তো সে মোটেই ভোলে নি! নীল আকাশ, নির্জ্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সব সুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখ দুটির স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি···সে তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা কুমীর বাবাকে বিয়ের কথা গিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটা কর্ত্তব্য।

সাহসে ভর ক'রে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন; তাঁরা বললেন—মেয়ে যদি ভালো হয় তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরি উপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আসতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মতো দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পূজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জ্যাঠতুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বললে—ভালো আছিস্ কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করচি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে তো দেশে ফিরচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললে—ও আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে—ইয়ে—

—তোমার আর ঢোঁক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করছ হীরুদা?

হীরু বললে—যাও—অমন করে না ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুব ভালো লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি! আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড় ভালো হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হ'ল, মেয়ে দেখানোও হ'ল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা ক'রে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশ কোন দিকে বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরি করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সে ভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি মেয়ে দেখা শেষ ক'রেই ফিরতি নৌকোতে রেল স্টেশনে চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেনেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাবেন। যাবার সময়ে ব'লে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বললে—কি ক'রে বললে—গান গাইতে জানো না? ছিঃ, একি ছেলেমানুষি, ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশি হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুব গান বেরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ ক'রে বললে—ঘরের কোণে গান গাইবে না তো কি আসরে বসে গাইতে যাবে? পারব না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গী হ'য়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ীর ও পাড়ার সবাই এজন্য কুমীকে ভৎর্সনা করলে। গান গাও না গাও, গান গাইতে জানি একথা বলার দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভালো হয় নি।

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটি অন্তে জামালপুরে গিয়ে শুনলে, মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয় নি।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ-ছ' মাস! কাজ করতে করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচে···হাত-পা নেড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করেচে···নিমফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র-দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেচে বর্ত্তমান কর্ম্মব্যস্ত দিনগুলি···

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হ'য়ে গেল। নতুন এম্-বি পাস ক'রে জামালপুরে প্র্যাকটিস্ করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ীর অবস্থাও খুব ভালো, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায় কথায় হীরু জানতে পারলে ছোকরা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পাল্‌টি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠামশাইকে মেয়ে দেখতে যেতে রাজী করালে। মেয়ে দেখাও হ'ল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হ'ল না, তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমন গরীব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ী হাজির হ'ল। কুমীদের বাড়ীর সবাই বললে—হীরু বড় ভালো ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে।

কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এনে ও ভুল করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে ? মেয়ে পছন্দ হ'লেই বা অত টাকা দিতে পারবো কোত্থেকে ?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা। কুমী বললে—হীরুদা, তুমি কেন এসব পাগলামি করচ বল তো ? বিয়ে আমি করব না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বলল—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরা খুব ভালো লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—তুমি কি বল হীরুদা ! আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্য তোমাকে লোকে যা তা বলে তা জানো ? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হ'ল না। সে দস্তুরমতো বেঁকে বসলো।

হীরু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরি করচেন কেন ?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা ! আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি ? বারে বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক্ ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া স্বরে বললে—কুমী ওঠ্, কথা শোন্—যা চুল বাঁধগে যা—

—আমি যাব না—

—যাবি নে, চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাব—ওঠ্—দিন দিন ইয়ে হচ্চেন—না ? ওঠ্ বলচি—

কুমী দ্বিরুক্তি না ক'রে বিছানা ছেড়ে দালানে চুল বাঁধতে বসে গেল, সাজানো গোজানোও বাদ গেল না, মেয়ে দেখানোও হ'ল, কিন্তু ফল সমানই দাঁড়ালো অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবো ব'লে গেলেন।

জামালপুরের কাজে এসে যোগ দিলে হীরু। কিন্তু সে যেন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। কুমীর জন্যে এত চেষ্টা ক'রেও কিছু দাঁড়ালো না শেষ পর্য্যন্ত ! কি করা যায় ? এদিকে কুমীদের বাড়ীতেও তার পসার নষ্ট হয়েচে, তার আনা সম্বন্ধের ওপর সবাই আস্থা হারিয়েচে। হারাবারই কথা। এবার সেখানেও কথা তুলবার মুখ নেই তার। অত বড় বড় সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভুল হয়েচে। কুমীর ভালো ঘর জুটিয়ে দেবার ব্যাকুল আগ্রহে সে ভুলে গিয়েছিল যে, বড়তে ছোটতে কখনো খাপ খায় না।

লজ্জায় সে পিসিমার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিল।

বছর দুই তিন কেটে গেল।

হীরু চাকুরিতে খুব উন্নতি ক'রে ফেলেচে তার সুন্দর চরিত্রের গুণে। চিফ্ ইঞ্জিনীয়ারের আপিসে বদলি হ'ল দেড়শো টাকায় মার্চ মাস থেকে।

হীরু আর সেই হীরু নেই। এমনি হয়, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, তিলে তিলে মানুষের দেহেরও মনের পরিবর্ত্তন হচ্ছে—অবশেষে পরিবর্ত্তন এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে, বহুকাল পরে আবার সাক্ষাৎ হ'লে আগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। হীরু ধীরে ধীরে বদলেচে। অল্প অল্প ক'রে সে কুমীকে ভুলেচে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবার বাসনাও তার নেই বর্ত্তমানে। এর মূলে একটা কারণ আছে, সেটা এখানে বলি। জামালপুরে একজন বয়লার-ইন্স্পেক্টার ছিলেন, তাঁর বাড়ী হুগলী জেলায়, রুড়কীর পাস ইঞ্জিনীয়ার, বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁর ছটি মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়েচে। এখনও একটি মেয়ে বাকি।

হীরুর সঙ্গে এই পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। সুরমা হীরুর সামনে বার হয়, তাকে দাদা ব'লে ডাকে, কখনও কখনও নিজের আঁকা ছবি দেখায়, গল্প করে, গান শোনায়।

একদিন হঠাৎ হীরুর মনে হ'ল—সুরমার মুখখানা কি সুন্দর! আর চোখ দুটি—পরেই ভাবল—ছিঃ, এসব কি ভাবচি? ও ভাবতে নেই।

আর একদিন অমনি হঠাৎ মনে হ'লো—কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো—কি গায়ের রং সুরমার! তখনই নিজের এ চিন্তায় ভীত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল। না, কি ভাবনা এসব, মন থেকে এসব জোর ক'রে তাড়াতে হবে। কিন্তু জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ হ'লে আজ গেরুয়াধারী স্বামীজীদের ভিড়ে পৃথিবীটা ভর্ত্তি হ'য়ে যেতো। হীরুর বয়েস কম, মন এখনও মরে নি, শুষ্ক, শীর্ণ, এক অতীত মনোভাবের কঙ্কালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে তার নবীন ও সতেজ মন ঘোর আপত্তি জানালে। কুমীর সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে অমূল তরু শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েছে আলো-বাতাস ও পৃথিবীর স্পর্শ না পেয়ে।

সুরমাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে সুরমার বাবা বয়লার ফাটার দুর্ঘটনায় মারা গেলেন; রেল কোম্পানী হীরুর শাশুড়ীকে বেশ মোটা টাকা দিলে এজন্যে; প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাও যা পাওয়া গেল তাতে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করেও হাতে ছ'সাত হাজার টাকা রইল। সুরমার মা ও একটি নাবালক ভাইয়ের দেখাশোনার ভার পড়েছিল হীরুর উপর, কাজেই টাকাটা সব এসে পড়লো হীরুর হাতে। হীরু সে টাকায় কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করল। চাকরি প্রথমে ছাড়ে নি, কিন্তু শেষে রেল কারখানায় কয়লার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে একবার বেশ মোটা কিছু লাভ ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতে ভালো ভাবেই নামল। সুরমাকে বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে হীরু একজন বড় কণ্ট্রাক্টার হয়ে পড়ল। শাশুড়ীর টাকা বাদ দিয়েও নিজের লাভের অংশ থেকে সে তখন ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা করবারে ফেলেচে।

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে হীরুর চালচলন বদলে গিয়েচে। রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানেই সকলকে রেখেচে। রেলে

জামালপুরে যাতায়াত করে রোজ, মোটর এখনও করেনি—তবে বলতে শুরু করেচে মোটর না রাখলে আর চলে না ; ব্যবসা রাখতে গেলে ওটা নিতান্তই দরকার, বাবুগিরির জন্যে নয়। হঠাৎ এই সময় দেশ থেকে পিসিমার চিঠি এল, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না ; বহুকাল হীরুকে দেখেন নি তিনি, তাঁর বড় ইচ্ছে মুঙ্গেরে হীরুর কাছে কিছুদিন থাকেন ও দুবেলা গঙ্গাস্নান করেন।

সুরমা বললে—আসতে যখন চাইচেন, নিয়ে এস গে—আমিও তাঁকে কখনও দেখিনি—আমরা ছাড়া আর তাঁর আছেই বা কে? বুড়ো হয়েচেন—যে ক'দিন বাঁচেন এখানেই গঙ্গাতীরে থাকুন।

বাসায় আর এমন কেউ ছিল না, যাকে পাঠানো যায় পিসিমাকে আনতে, কাজেই হীরুই দেশে রওনা হলো।

ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গিয়েচে অতিবৃষ্টিতে। কোদলা নদীতে নৌকোয় ক'রে আসবার সময় দেখলে জল উঠে দুপাশের আউশ ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েচে। গোয়াল-বাসির বিলে জল এত বেড়েচে যে, নৌকোর বুড়ো মাঝি বললে সে তার জ্ঞানে কখনও এমন দেখেনি, গোয়ালবাসি ও চিত্রাঙ্গপুর গ্রাম দু'খানা প্রায় ডুবে আছে।

অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নিচে রৌদ্রভরা মাঠ, জল বাড়বার দরুণ নৌকো চললো মাঠের মধ্য দিয়ে, বড় বাব্‌লা বনের পাশ কাটিয়ে। ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেতঝোপ কড কড় ক'রে নৌকার ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠের মাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।

পিসিমাদের গ্রামে নৌকো ভিড়তে দুপুর ঘুরে গেল। এখানে নদীর পাড় খুব উঁচু বলে কূল ছাপিয়ে জল ওঠে নি ; দু-পাড়েই বন, একদিকে হ্রস্ব ছায়া পড়েচে জলে, অন্য পাড়ে খররৌদ্র। এই বনের গন্ধ···নদীজলের ছলছল শব্দ···বাঁশবনে সোনার সড়কীর মতো নতুন বাঁশের কোঁড় বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে···এই শরত দুপুরের ছায়া···এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য একটিমাত্র মুখ মনে করিয়ে দেয়···অনেকদিন আগের মুখ···হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও সেই মুখ ছাড়া আর কোনো মুখ মনে আসে না। নদীর ঘাটে নেমে, পথে চলতে চলতে সে মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে···এক ধরণের হাত-নাড়ার ভঙ্গি আর কি বকুনি, অজস্র বকুনি !···জগতে আর কেউ তেমন কথা বলতে পারে না। অনেক দূরের কোন্ অবাস্তব শূন্যে ঘুরচে সুরমা, তার আকর্ষণের বাইরে এ রাজ্য। এখানে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী আর একজন, তার একচ্ছত্র অধিকার এখানে—সুরমা কে? এখানকার বন, নদী, মাঠ, পাখি সুরমাকে চেনে না।

হীরু নিজেই অবাক্ হয়ে গেল নিজের মনের ভাবে।

পিসিমা যথারীতি কান্নাকাটি করলেন অনেকদিন পরে ওকে দেখে। আরও ঢের বেশি বুড়ী হয়ে গিয়েছেন, তবে এখনও অথর্ব্ব হন নি। বেশ চলতে ফিরতে পারেন। হীরুর জন্যে ভাত চড়াতে যাচ্ছিলেন, হীরু বললে—তোমায় কষ্ট করতে হবে না পিসিমা, আমি চিঁড়ে

খাব। ওবেলা বরং রেঁধো।

অনেকবার বলি বলি করেও কুমীর কথাটা সে কিছুতেই পিসিমাকে জিগ্যেস করতে পারলে না। একটু বিশ্রাম ক'রে বেলা পড়লে সে হাটতলার মধু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে বসল। মধু ডাক্তারের চুল-দাড়িতে পাক ধরেচে, একটি ছেলে সম্প্রতি মারা গিয়েচে—সেই গল্প করতে লাগল। গ্রামের মক্তবের সেই বুড়ো মৌলবী এখনও আছে ; এখনও সেই রকম নিজের অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রসঙ্গে সাব্-ইনস্পেক্টর মহিমবাবুর গল্প করে। মহিমবাবু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ অঞ্চলে স্কুল সাব-ইনস্পেক্টারী করতেন। এখন বোধ হয় মরে ভূত হয়ে গিয়েচেন। কিন্তু কোন্‌বার মক্তব পরিদর্শন করতে এসে নিজেই শুভঙ্করীর সারাকালির একটা অঙ্ক দিয়ে নিজেই কষে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি, সে গল্প আজও এদেশে প্রচলিত আছে। এই মৌলবী সাহেবের মুখেই হীরু এ গল্প বহুবার শুনেচে।

সন্ধ্যা হবার পূর্ব্বেই হীরু হাটতলা থেকে উঠল। মধু ডাক্তার বললে—বসো হে হীরু, সন্ধ্যেটা জ্বালি—তারপর দু-একহাত খেলা যাক। এখন না হয় বড়ই হয়েচ, পুরোনো দিনের কথা একেবারে ভুলে গেলে যে হে !

হীরু পথশ্রমের ওজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল। তার শরীর ভাল নয়, পুরোনো দিনের এই সব আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে সে ভালো করে নি।

কুমী এখানে আছে কিনা, এ কথাটা মধু ডাক্তারকেও সে জিগ্যেস করবে ভেবেছিল। ওদের একই পাড়ায় বাড়ী। কুমী মধু ডাক্তারকে কাকা বলে ডাকে। কুমীদের সম্বন্ধে মাত্র সে এইটুকু শুনেছিল যে, কুমীর জ্যাঠামশাই বছর পাঁচেক হোল মারা গিয়েচেন এবং জাঠতুতো ভাইয়েরা ওদের পৃথক করে দিয়েচে।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে সে দেখলে কখন কুমীদের পাড়াতে, একেবারে কুমীদের বাড়ীর সামনেই এসে পড়েচে। সেই জিউলি গাছটা, এই গাছটাতে একবার সাপ উঠে পাখীর ছানা খাচ্ছিল, কুমী তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে, সে এসে সাপ তাড়িয়ে দেবার জন্য ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ পাড়ার গাছে-পালায়, ঘাসে-পাতায়, সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁকের ডাকে কুমী মাখানো। এই রকম সন্ধ্যায় কুমীদের বাড়ী বসে সে কত গল্প করেচে কুমীর সঙ্গে !

চুপ করে সে জিউলিতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল।···

তার সামনের পথটা দিয়ে তেইশ চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে দুটো গরুর দড়ি ধরে নিয়ে আসচে ! কুমীদের বাড়ীর কাছে বাঁশতলাটায় যখন এল, তখন হীরু চিনতে পারলে সে কুমী।

প্রথমটা সে যেন অবাক হয়ে গেল···আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই কুমী ? এমন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে তার চোখের সামনে ! কুমীই বটে, কিন্তু কত বড় হয়ে গিয়েচে সে !

হঠাৎ হীরু এগিয়ে গিয়ে বললে—কুমী কেমন আছ ? চিনতে পারো ?

কুমী চমকে উঠল, অন্ধকারে বোধ হয় ভাল করে চিনতে পারলে না, বললে—কে ?

—আমি হীরু।

কুমী অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। তারপর এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে হীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কবে এলে হীরুদা? কোথায় ছিলে এতকাল? সেই জামালপুরে?

—আজই দুপুরে এসেচি।

আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে কেবল একদৃষ্টে কুমীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমীর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরণে একখানা আধময়লা শাড়ি—যে কুমীকে সে দেখে গিয়েছিল ছ-সাত বছর আগে, এ সে কুমী নয়। সে কৌতূহলোচ্ছল কলহাস্যময়ী কিশোরীকে এর মধ্যে চেনা যায় না। এ যেন নিরানন্দের প্রতিমা, মুখশ্রী কিন্তু আগের মতোই সুন্দর। এতদিনেও মুখের চেহারা খুব বেশী বদলায় নি।

কুমী বললে—এসো আমাদের বাড়ী হীরুদা। কত কথা যে তোমার সঙ্গে আছে, এই ক'বছরের কত কথা জমানো রয়েচে, তোমায় বলব বলব করে কতদিন রইলাম, তুমি এ পথে আর এলেই না।

হয়েচে! সেই কুমী! ওর মুখে হাসি সেই পুরোনো দিনের মতই আবার ফুটে উঠেচে; হীরু ভাবলে, আহা, ওর বকুনির শ্রোতা এতদিন পায়নি তাই ওর মুখখানা ম্লান।

—তুই আগে চল্ কুমী।

—তুমি আগে চল, হীরুদা।

চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে রোয়াকে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। কুমীকে দেখে বললে—ওই মা এসেচে!

—বসো হীরুদা, পিঁড়ি পেতে দিই! মা বাড়ী নেই, ওপাড়ায় গিয়েচে রায়-বাড়ী, কাল ওদের লক্ষ্মীপুজোর রান্না রেঁধে দিতে। আমি ছেলেটাকে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে গরু আনতে গিয়েছিলুম দীঘির-পাড় থেকে। উঃ—কতকাল পরে দেখা হীরুদা! বসো, বসো। কি খাবে বলো তো? তুমি মুড়ি আর ছোলাভাজা খেতে ভালোবাসতে। বসো, সন্দেটা দেখিয়ে খোলা চড়িয়ে গরম গরম ভেজে দিই। ঘরে ছোলাও আছে, নারকোলও আছে। দাঁড়াও, আগে পিদিমটা জ্বালি।

সেই মাটির ঘর সেই রকমই আছে। সেই কুমী সন্ধ্যা-প্রদীপ দিচ্চে পুরোনো দিনের মতো, যখন সে কত রাত পর্য্যন্ত ওদের বাড়ী বসে গল্প করতো। তবুও কত—কত পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে! কত ব্যবধান এখন তার আর কুমীর মধ্যে।

কুমী প্রদীপ দেখিয়ে চাল ভাজতে বসল। একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে সামনে বসল সেই পুরোনো দিনের মতই গল্প করতে। সেই হাত-পা নাড়া, সেই বকুনি—সবই সেই। কত কথা বলে গেল। হীরু ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর অন্য দিকে ফেরাতে পারে না। কুমীও তাই।

হীরু বললে—ইয়ে, কোথায় বিয়ে হ'ল কুমী?

কুমী লজ্জায় চোখ নামিয়ে বললে—সামটা।

—তা বেশ।

তারপর কুমী বললে, ক'দিন থাকবে এখন হীরুদা?

—থাকবার জো নেই, কাজ ফেলে এসেচি, পিসিমাকে নিয়ে কালই যাব। পিসিমা চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো তাঁকে নিতে এলাম।

—না, না হীরুদা, সে কি হয়? কাল ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজো, কাল কোথায় যাবে? থাকো এখন দু'দিন। কতকাল পরে এলে। তুমিও তো বিয়ে করেচ, বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন? দেখতাম। ছেলেমেয়ে কি?

—দুটি ছেলে একটি মেয়ে।

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?

মনে খুব পড়তো না, কিন্তু একথাও ঠিক যে, এখন এমন মনে পড়চে যে সুরমা ও জামালপুর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে। বড় লোকের মেয়ে সুরমা তার মনের মতো সঙ্গিনী নয়, তার সঙ্গে সব দিক্ থেকে মেলে—খাপ খায় এই কুমীর। অথচ সুরমার জন্য দামী মাদ্রাজী শাড়ী কিনে নিয়ে যেতে হবে কলকাতা থেকে যাবার সময়—সুরমা বলেচে, যাচ্চ যখন দেশে, ফিরবার সময় কলকাতা থেকে পূজোর কাপড়-চোপড় কিনে এনো। এখানে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, দরও বেশি।

আর কুমীর পরণে ছেঁড়া আধময়লা কাপড়।

না—দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়ে সে তার অপমান করবে না।

কুমী বকেই চলেচে। অনেক দিন পরে আজই ও আনন্দ পেয়েচে—নিরানন্দ অসচ্ছল সংসারের একঘেয়ে কর্ম্মের মধ্যে বালিকাবয়সের শত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে পুরোনো দিনগুলো হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেমন ক'রে ফিরেচে।

ঘণ্টা দুই পরে কুমীর মা এলেন। বললেন—এই যে, জুটেচ দুটিতে? আমি শুনলুম দিদির মুখে যে হীরু এসেচে। কাল লক্ষ্মীপূজো, তাই রায়েদের বাড়ী রান্না করে দিয়ে এলাম। তা ভালো আছিস্ বাবা হীরু? কুমী কত তোর কথা বলে। তোর কথা লেগেই আছে ওর মুখে; এই আজও দুপুর বেলা বলছিল, মা, হীরুদা নদীতে বন্যা দেখলে খুশি হোত; এবার তো বন্যা এসেচে, হীরুদা যদি দেখতো, খুব খুশি হোত—না মা? তা, আমি তুই এসেছিস্ শুনেই দিদির ওখানে গিয়েছিলুম। বাড়ী নেই দেখে ভাবলাম সে ঠিক আমাদের ওখানে গিয়েচে। তা ব'স বাবা, চট্ করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী। খোকার জন্য তরকারী এনেচি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই ওর বিয়ে দিয়েচি সামটায়—বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে সামান্য মাইনের খাতা-পত্র লেখা কাজ করে। তাতে চলে না। তার ওপর দজ্জাল ভাই-বৌ। খেতে পর্য্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে! এই দেখো—এখানে এসেচে আজ পাঁচ মাস, নিয়ে যাবার নামটি নেই, বৌদিদির হুকুম হবে তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। আর এদিকে তো আমার এই অবস্থা,

মেয়েটার পরণে নেই কাপড়, জামাই আসে যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি ক'রে চালাই ? তা সবই অদৃষ্ট ! নইলে—

কুমী ঝাঁজালো স্বরে বললে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না—কি বকবক শুরু করলে—

অদৃষ্ট, হাঁ অদৃষ্টই। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে। পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া আর কি ?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল। কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্য্যন্ত। বললে—আমাদের হারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা পাকাটি জ্বেলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনে বড্ড অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ী এসে ডাক দিলে—কি হচ্চে, ও হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো।

কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে ? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্চি। আজ ভাদ্রমাসের লক্ষীপুজোর অরন্ধন, তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম আমাদের বাড়ী। মা বললেন—যা গিয়ে বলে আয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুমীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই সে জানে। কুমী খানিকটা পরে বললে—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকালে সকালে এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ী গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই। কুমী বললে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে জানো তো ? আর কচুর শাক—আর একটা কি জিনিস বলো তো ?···উঁহু···তুমি বলতে পারবে না।

কুমীর মা বললেন—কাল রাত্রে তুই চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোর জন্যে নারকেল কুমড়ো রাঁধতে বসল। বললে, হীরুদা বড় ভালোবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলব, রেঁধে রাখি।

কুমী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ী পরেচে, বোধহয় এইখানাই তার একমাত্র ভালো কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যই নেই, আজ দিনের আলোয় কুমীকে দেখে ওর মনে হ'ল—কুমীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েচে, তবে ওর মুখে চোখে একটা শান্ত মাতৃত্বের ভাব ফুটে উঠেচে, যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখে নি। কুমী অনেক ধীর হয়েচে, অনেক সংযত হয়েচে। মাথায় সেই রকমের এক ঢাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেই রকম লাবণ্যময়। তবুও যেন কুমীকে চেনা যায় না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা কুমী অন্তর্হিত হয়েচে, এখন যে কুমীকে সে দেখচে তার অনেকখানিই যেন সে চেনে না।

কিন্তু খানিকটা বসবার পরে হীরুর এ ভ্রম ঘুচে গেল। বাইরের চেহারাটা যতই বদলে যাক না কেন, তার সামনে যে কুমী বার হয়ে এল, সে সেই কিশোরী কুমী। ওর যেটুকু পরিচিত তা ওর মধ্যে থেকে বা'র হয়ে এল—যেটুকু হীরুর অপরিচিত, তা নিজেকে গোপন রাখলে।

কি চমৎকার কুমীর মুখের হাসি। হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটা সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা···এ এক অদ্ভুত মনের ভাব, কুমীকে সে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে তাকে এতটুকু খুশি করবার জন্য।

কুমী কত কি বকচে বসে বসে···পুরোনো দিনের কথা তুলচে কেবল কেবল।

- মনে আছে হীরুদা, সেই একবার জেলেদের বাঁশতলায় আলেয়া জ্বলেছিল—সেও তো এই ভাদ্রমাসে···সেই চারুপাঠ মনে আছে?

হীরুর খুব মনে আছে। সবাই ভয়ে আড়ষ্ট, আলেয়া নাকি ভূত, যে দেখতে যায় তার অনিষ্ট হয়। হীরু সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল দেখতে, কুমীও পিছু পিছু গিয়েছিল।

হীরু বলেছিল—আসছিস্ কেন পোড়ার মুখী, ভূত ধরে খাবে যে—

কুমী ভেংচি কেটে বলেছিল—ইস্! ভূতে ধরে ওঁকে খাবে না—আমাকেই খাবে। আলেয়া বুঝি ভূত? ও তো একরকম বাষ্প, আমি পড়িনি বুঝি চারুপাঠে? শুনবে বলব··· অনেকের বিশ্বাস আছে আলেয়া এক প্রকার ভূতযোনি, বাস্তবিক ইহা তা নয়—

হীরু ধমক দিয়ে বলেছিল—রাখ্ তোর চারুপাঠ—আরম্ভ করে দিলেন এখন অন্ধকারের মধ্যে চারুপাঠ···বলে ভয়ে মরচি—

পরক্ষণেই কুমী খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—কি বললে হীরুদা, ভয়ে মরচো? হি হি—হি হি—এত ভয় তোমার যদি এলে কেন? চারুপাঠ পড়লে ভয় থাকতো না···চারুপাঠ তো আর পড় নি?

সেই সব পুরোনো গল্প। আলেয়া ··আলেয়াই বটে।

কুমীর যে খানিকটা পরিবর্ত্তন হয়েচে তা বোঝা গেল, যখন ও গ্রামের এক বিধবা গরীব মেয়ের কথা তুললে। আগে এসব কথা কুমী বলত না। এখন সে পরের দুঃখ বুঝতে শিখেচে। মুখুয্যে-বাড়ীর বড় পুরীপাল্লার মধ্যে হর মুখুয্যের এক বিধবা নাতনী—নিতান্ত বালিকা—কি রকম কষ্ট পাচ্চে, পুকুরঘাটে কুমীর কাছে বসে নির্জ্জনে মৃত স্বামীর রূপগুণের কত গল্প করে—এ কথা কুমী দরদ দিয়ে বলে গেল। সত্যিই মাতৃত্ব ওর মধ্যে জেগেচে, ওকে বদলে দিয়েচে অনেকখানি!

হঠাৎ কুমী বললে—অই দেখো হীরুদা বকেই যাচ্চি। তোমায় যে খেতে দেবো, সে কথা মনে নেই।

তার পরে সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসিমুখে বললে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচ্‌বে তো মুখে? নেবু কেটে দেবো এখন অনেক ক'রে, নারকোল-কুম্‌ড়ি আছে, কচুর শাক আছে।

এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায় নি। যা যা সে খেতে ভালোবাসে, কুমী তার কিছুই বাদ দেয় নি। হীরু আশ্চর্য্য হয়ে গেল—এতকাল পরেও কুমী মনে রেখেচে এ সব কথা।

খেতে বসে হীরু বললে—কুমী, ছেলেবেলা ভালো লাগে, না এখন ভালো লাগে?

—এ কথার উত্তর নেই হীরুদা। ছেলেবেলায় তোমরা সব ছিলে, সে এক দিন ছিল। এখনও তা বলে খারাপ লাগে না—জীবনে নানারকম দেখা ভালো—নয় কি ?

—কুমী, একটা কথার উত্তর দে। তোর সংসারের টানাটানি খুব ?

—কে বললে একথা ? মা বলেছিল সেই তো কাল রাত্তিরে ? ও বাজে কথা, জানো তো মা যত বাজে বকে। বুড়ো হয়ে মার আরও জিব আলগা হয়ে গেছে।

—কুমী, আমার কাছে সত্যি কথা বলবিনে ?

ঐ, তুমিও পাগলামি শুরু করলে। নাও, খেয়ে নাও—যত বাজে বকতে পারো—মা গো !···দাঁড়াও. পায়েসটা আনি—কচুর শাক পড়ে রইল কেন অতখানি ?···না সে হবে না—

—ছাখ্, কুমী, আমার কাছে বেশি চালাকি করিস্ নে। তোকে আর আমি জানি নে ? কোদলার ঘাটে পায়ে খেজুর-কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, মুখে একটু রা করিস্ নি, জানতে দিস্ নি কাউকে—

—আবার ?

হীরু চুপ করে গেল। এতখানি ব'লে সে ভালো করে নি, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেচে। কুমী যা ঢাকতে চায়, ও তা বা'র ক'রে কুমীর আত্মসম্মানে ঘা দিতে চায় কেন ? ছিঃ—

কুমী বললে—আবার কবে আসবে হীরুদা ?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চাস্, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্চে না কিন্তু।

—আবার বাজে বকতে শুরু করেচ হীরুদা। তোমার যা কিছু সব সামনে, চোখের আড়াল হ'লে আর মনে থাকে না। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত বাজে বকুনি—

—তুমি তো জানো না একটুও বাজে বকতে ? আমি ইচ্ছে করলে থাকতে পারি নে ভেবেছিস্ ?

—হাঁ, থাকো না দেখি কাজকর্ম্ম বন্ধ করে। বৌদি এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে না ?

—আচ্ছা সে যাক, একটা কথার উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমি যদি এখানে থাকি তুই খুশি হোস্ ?

—উঃ, মা গো, মুখ বুজে খেয়ে নাও দিকি ? কি বাজে বকতেই পারো !

হীরু দুঃখিত ভাবে বললে—আমার এ কথাটারও উত্তর দিবি নে কুমী ? তুই এত বদলে গিয়েছিস্ আমি এ ভাবতেই পারি নে। আচ্ছা, বেশ।

কুমী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললে—তোমার কিন্তু একটুও বদলায় নি হীরুদা, সেই রকম 'আচ্ছা, বেশ' বলা, সেই রকম কথায় কথায় রাগ করা। আচ্ছা, কি বলব বলো দিকি ? তুমি জানো না ও-কথার কি উত্তর আমি দিতে পারি ? ভেবে ছাখো তা হ'লে আমি বদলাই নি, বদলে গিয়েছ তুমি হীরুদা।

—আচ্ছা কুমী, এতটা না বকে সামান্য দু' কথায় শাদা উত্তর একটা দে না কেন? বকুনিতে আমি কি তোর সঙ্গে পারব?

—না, তা তুমি পারবে কেন? বকতে তুমি একটুও জানো না। হ্যাঁ, হই।

—মন থেকে বলচিস্?

—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করচে হীরুদা, এতটা বদলে গিয়েচ তুমি? যাও—আমি তোমার কোনো কথার আর উত্তর দেবো না, তুমি না নিজের বুদ্ধির বড় অহঙ্কার করতে?

—কুমী, রাগ করিস্ নে। অনেক কাজের মধ্যে থেকে আমার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে গিয়েচে। যাক্, বাঁচলুম কুমী!

—পায়েসটা খাও, তোমার পায়ে পড়ি। আর বকুনিটা কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষান্ত রাখো। কিছু তোমার পেটে গেল না এই অনাছিষ্টি বকুনির জন্যে।

কুমী পরদিন এসে বিছানা-বাক্স গুছিয়ে দিলে। ঘাট পর্য্যন্ত এসে ওদের নৌকোতে উঠিয়ে দিলে। নৌকো ছেড়ে যখন অনেকটা গিয়েচে তখনও কুমী ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে।

দু'পাড়ের নদীচড় নির্জ্জন। দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরণের নীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পাড়ের ছোট কালকাসুন্দি গাছের বন পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েচে। কচুরি-পানার বেগুনী ফুল চড়ার ধারে আটকে আছে। সেই সব বন-জঙ্গলময় ডাঙার পাশ দিয়ে চলেচে ওদের নৌকো। ঝোপের তলার ছায়ায় ডাহুক চরচে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের ক্ষেতের আখগাছগুলো স্রোতের বেগে থরথর করে কাঁপচে।

ছইয়ের মধ্যে পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েচেন। নিস্তব্ধ ভাদ্র অপরাহ্ন। নৌকোয় তক্তার ওপর বসে বসে হীরু কত কি ভাবছিল। এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারত! মধু ডাক্তারের মতো হাটতলায় ওষুধের ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে? ডাক্তারীটা যদি শিখতো সে!

পূজোর বাজারটা ফিরবার সময় করতে হবে কলকাতা থেকে···অন্ততঃ দেড়-শো টাকার বাজার। আসবার সময় খুব উৎসাহ করে সুরমার কাছ থেকে ফর্দ্দ করে নিয়ে এসেচে···

একটা মানুষের মধ্যে মানুষ থাকে অনেকগুলো! জামালপুরের হীরু অন্যলোক, এ হীরু আলাদা। এ বসে বসে ভাবচে, কুমীদের রান্নাঘরে অরন্ধনের নেমতন্ন খেতে বসেছিল, সেই ছবিটা। অনবরত ওই একটা ছবিই।···

কুমী বলছে—আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?···

কুমী এখনও কি ঠিক তেমনি হাত-পা নেড়ে কথা বলে···ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মতো!···আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা ব'লে অমন আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গেও তো রোজ কত কথা হয়···কই···

রেলের বাঁশির আওয়াজে হীরুর চমক ভাঙলো। ওই স্টেশনের ঘাট দেখা দিয়েচে। সিগ্‌ন্যাল নামানো, বোধ হয় ডাউন ট্রেণটা আসবার দেরি নেই···

লেখক

রবিবার। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা ক'রে একটু ঘুমুবার উদ্যোগ করবো ভাবচি—এমন সময় বাইরে কে ডাকলে—সীতানাথ বাবু বাড়ী আছেন?

কে আবার রবিবার দুপুরে বিরক্ত করতে এল?

ছেলেকে ডেকে বললুম—নিয়ে আয় এখানে, আমি আর উঠতে পারচিনে। একটু পরে ছেলের পিছু পিছু চশমা চোখে ছিপছিপে ফরসা চেহারার একটি ছোকরা ঘরে ঢুকে বিনীত ভাবে প্রণাম করে বললে—আপনারই নাম কি সীতানাথ বাবু—?

বললুম—বসুন, কোথা থেকে আসচেন?

—আজ্ঞে, এই আপনার কাছেই এলাম। আজ আপনি সকালে—ওই ডাক্তারখানায় বসে ছিলেন, আমি আর দাদা নাইতে যাচ্ছি, দাদা বললেন—আপনি একজন লেখক। তখন তেল মেখেছিলুম, সে অবস্থায় আপনার কাছে যেতে সাহস করিনি। শুনলুম, আপনি শনি-রবিবারে এখানে আসেন, আজই আবার কলকাতা চলে যাবেন ওবেলা। তাই এখন দেখা করতে এলুম।

আসার উদ্দেশ্য শুনে মনটা প্রসন্ন হ'ল না। নিশ্চয়ই লেখা চাইতে এসেচে। এ পাড়াগাঁয়ের টাউনে কোনো কাগজের উৎপাত ছিল না তো জানি—তবে কি এখানেও কাগজ বার হ'ল?

ছোকরা বিনয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, এতক্ষণ সে একবারও আমার মুখ থেকে চোখ ফেরায়নি—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটুখানি চুপ করে থেকে ছেলেটি বললে—আপনার কাছে এলাম, যদি মনে কিছু না করেন তাহ'লে বলি।

—বলুন না?

—আমাকে একটু করে লেখা শেখাবেন। আমি এবার বাংলা নিয়ে বি-এ পাস করেচি। এখানকার স্কুলে চাকরি পেয়ে এসেচি। আমার দাদা এখানকার সাবরেজিস্ট্রার। আমার বড় ইচ্ছে আমি লেখক হই। কিছু কিছু লিখেছিলামও, সেগুলো এনেচি সঙ্গে করে—আপনার সময় হবে দেখবার?

আমার সম্মতি পেয়ে ছোকরা একখানা খাতা ভয়ে ভয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—আই-এ পড়বার সময় লিখেছিলুম। চার-পাঁচটা ছোট গল্প, কতকগুলো কবিতা আর গান আছে।

ও দেখি আমার মুখের দিকে আগ্রহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমি কি মত দিই তাই শোনবার জন্যে। বললুম—মন্দ হয়নি, বেশ লাগল—তবে আপনার গানগুলো—ভালোই হয়েচে!

ছোকরা উৎসাহে ও আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে

বললে—আপনার ভালো লেগেচে ?···আচ্ছা, গল্পগুলো ? ওগুলোর মধ্যে কিছু দেখলেন ?

বিশেষ কোনো ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে বললুম—বেশ প্রমিস্ আছে। আপনার বয়েস কম, লিখতে লিখতে হবে।

ছেলেটি যেন আনন্দ কোথায় রাখবে ভেবে পেলে না। বললে, দেখুন আমার অনেকদিন থেকে সাধ আমি একজন লেখক হবো। আমি বি-এতে বাংলা নিয়েছিলুম ব'লে বাড়ীতে সবাই বকে। আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা বড় বড় চাকরি করে—তারা ভালো ইংরিজী জানে। তারা দাদার কাছে চিঠি লিখলে—ওকে এখন বাংলা ভুলতে বলো। বাংলা শিখে জীবনে কি হবে। এখন একটু ইংরিজির দিকে মন দিতে বলো, যদি কিছু উন্নতি করতে চায়। আমি এ সব লিথি ব'লে বাড়ীর কেউ সন্তুষ্ট নয়। আমি আবার বাড়ীর ছোট ছেলে কিনা। আমি যা লিথি দাদারা দেখতে চায়, লিখতে দেখলে বকাবকি করে। বলে, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েচে। ও-সব লিখে মিথ্যে সময় নষ্ট করচে।

আমি মনে মনে তাদের খুব দোষী করতে পারলাম না একথা বলার জন্যে।

ছেলেটি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল—এখানে মাস্টারিটা পেয়ে গেলাম, গেজেট যেদিন বার হ'য়েছে, সেই দিনই চাকরি হ'ল আমার। এখানে এসে একা একা বেড়াই ; একজনও এমন কেউ নেই যে, দুটো ভাল কথা বলে, কি সৎচর্চ্চা করে। সাহিত্য বিষয়ে কেউ খবরও রাখে না। বড় ব্যাক্ওয়ার্ড জায়গা। আপনার সন্ধান পেয়ে ভাবলুম ওঁর কাছে যাই, উনি আমায় লেখা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারবেন। তাই এলাম। কারো কাছে উৎসাহ না পেয়ে আমি এমন দমে গিয়েচি, আজ এক বছর লিখিই নি।

তারপর ছোকরা আমায় বেশ বোঝাবার চেষ্টা করলে, সে বর্ত্তমান সাহিত্যের খবর রাখে বা সে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ের মধ্যে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইবসেন, শ', টলস্টয়, তরুণ-সাহিত্য, বৈষ্ণব কবিতা—ইত্যাদি হু হু করে মুখস্থ বিদ্যার মতো বলে গেল।

—আচ্ছা, তরুণ-সাহিত্যবাদের মধ্যে রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

আমি বিপদে পড়ে গেলুম, তরুণ সাহিত্যবাদের বই কিছু কিছু পড়লেও রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ছেলেটি যেমন আগ্রহের সঙ্গে এ-সব কথা পেড়েচে, তাতে বেশ বোঝা যায়, অনেক দিন পরে একটু উচ্চ বিষয়ে চর্চ্চা করতে পেরে ও খুব খুশি। হয়তো এমন শ্রোতা ওর অনেকদিন জোটে নি।

এ অবস্থায় তাকে নিরুৎসাহ করতে না পেরে রামচন্দ্র সরকার সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক মত দেবার চেষ্টা করলুম। আমার কথা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে। বললে, আপনি ঠিক বলেছেন। আমার কি মনে হয় জানেন ? ইবসেন বলেছেন—তারপর সে খানিকক্ষণ ধরে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক নাম অনর্গল আবৃত্তি ক'রে, তাদের নানা মত উদ্ধৃত ক'রে নিজের একটা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলে—তার ভাবে মনে হল এ ধরনের কথা বলতেও সে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছে—কথা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে

চেয়ে দেখে—বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখে বোঝবার চেষ্টা করে আমি তার তর্কের ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে কি ভাবচি।

আমি বললাম, এখানে কত দেয় আপনাকে ?

—উনত্রিশ টাকা। এখন একরকম কুলিয়ে যায়, দাদার বাসাতে থাকি। কিন্তু দাদা বদলি হ'য়ে গেলে তখন মুশকিল হবে। আমার বাড়ীতে কিছু না দিলে তো চলবেই না—

—কেন, আপনার দাদারা রয়েচেন ?

—আমার আপনার দাদা কেউ নেই। ওঁরা সব খুড়তুতো—জ্যেঠতুতো ভাই। আমার বাবা অন্ধ, আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আর একটি বোন, আমার ছোট, তার এখনও বিয়ে হয়নি। দাদারা সব যে যার পৃথক। এক বাড়ীতে থাকলেও এক অন্নে নেই।

ও বললে—আমার ছেলেবেলা থেকে সাধ যে, আমার লেখা কাগজে বেরোয়। যখন বড় বড় লেখকের লেখা দেখতাম, আমার ইচ্ছে হত একদিন আমিও এই রকম লিখব। আমার এক ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল কান্তি বসু - কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা এই মাঘ মাসে। আমায় দেখালে "ভারতবর্ষে" তার একটা গল্প বেরিয়েছে। মনে মনে বললুম, বা রে! আমার এমন কষ্ট হ'ল. ওরা সব লেখক হ'য়ে গেল, ওদের লেখা ছাপা হচ্ছে, কত লোক পড়ছে, ভাবুন কত নাম বেরুবে!

সে খানিকক্ষণ জানালার বাইরে আকাশের দিকে কেমন একটা মুগ্ধ-আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে বিষণ্ণ মুখে বললে—আর আমার কিছুই হ'ল না।

ওর আন্তরিকতা ও আগ্রহ আমার বড় ভালো লাগল। একটু অন্য ধরনের ছেলে বটে —হয়তো বা একটু মাথা খারাপ আছে। ও যতক্ষণ বসেচে, আমি কেবল লক্ষ্য করচি ওর মুখের ভাবের নানা রকম পরিবর্ত্তন। নির্ভরতা, ভয়, শ্রদ্ধা, আশা, আগ্রহ, স্বপ্ন, বিষণ্ণতা, বিভিন্ন ভাব ওর মুখে কেমন চমৎকার ফুটে ওঠে। খুব সাধারণ ধরনের লোকের এ রকম হয় না। পাথর-গড়া মুখের মতো তাদের মুখ হয়—দৃঢ়, অপরিবর্ত্তনীয়—ভাব-প্রবণতার বালাই তাদের নেই। ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম—আপনি এর পরে নিশ্চয়ই ভালো লিখতে পারবেন। এরই মধ্যে বেশ লেখা বেরিয়েচে আপনার হাত থেকে। এখন আপনার তো বয়েস কম, সারা জীবন পড়ে রয়েছে আপনার সামনে—আমার তো মনে হয়, কালে আপনি একজন ভালো লেখক হবেন - আপনার লেখা পড়ে আমরা এক সময় আনন্দ পাব।

ছোকরা সলজ্জ হাসিমুখে আমার দিক চেয়ে বললে—কি যে বলেন! আপনারা আনন্দ পাবেন আমার লেখা থেকে!···আচ্ছা, আপনার মনে হয় সত্যি আমার কিছু হবে ?

—কেন হবে না? না হবার তো কিছু দেখলুম না—খুব হবে।

—কান্তি বসু আমারই ক্লাসফ্রেণ্ড, আমারই মতো বয়েস—ও এরই মধ্যে নাম করে ফেলেচে। আচ্ছা, নাম করতে কতদিন যায়? নাম করবার নিয়ম কি ?

আমার দুপুরের বিশ্রামটুকু একেবারেই মাটি হ'ল দেখচি। কি করব উপায় নেই—একে দু'চার কথায় বিদায় দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু এর কথা ক্রমশঃ বেড়েই চলেচে, আবার

কোথা থেকে নাম করবার নিয়ম এনে ফেললে। অথচ কেমন একটা অনুকম্পা হ'ল ওর ওপর, ভালো মনে কথার জবাব না দিয়েও পারলুম না। বললাম—তার কি কোন নিয়ম আছে, তা নেই। দু'চারটে ভালো লেখা বেরুতে বেরুতে ক্রমশঃ নাম বেরোয়! লোকে আপনার লেখা প'ড়ে যদি খুশি হয়, তবে নাম বেরুতে আর কি দেরি হবে?

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে আনন্দস্বরে বললে—অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে কোন লেখকের সঙ্গে আলাপ করি। কলকাতায় থাকতে একবার দেবব্রত মুখুয্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেবব্রত বাবুর 'অপরিণত' বইটা সবে বেরিয়েচে —সারা রাত ধরে জেগে বইখানা পড়লাম, এমন ভালো লাগল আর এমন একটা ইন্‌স্পিরেশন্ পেলাম—তার পরদিন আমিও একখানা ওই রকম নভেল লিখব ভাবলাম। আট-দশ চ্যাপ্টার লিখেও ফেললাম। কান্তিকে দেখাতে গেলাম, সে বললে এর প্লট, ভাব, ভাষা, সব নাকি দেবব্রত বাবুর বইখানার মতো হচ্চে। আমার ঐ এক দোষ—যখন যে বই পড়ি, লিখতে বসলে সেই বইখানার মতো প্লট আর ভাষা হ'য়ে যায়। তা সেদিন দেবব্রত বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, তিনি ওপর থেকে বলে পাঠালেন তিনি বড় ব্যস্ত।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে তার একটা গান আবার উল্টে পড়তে লাগলাম। সে হাসি-হাসি মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ও গানটা সম্বন্ধে আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি, অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে শুনলে—জীবনে বোধ হ'ল এই সর্ব্বপ্রথম নিজের লেখার প্রশংসা শুনচে। কথাবার্ত্তার মধ্যেও একবার ঘরের চারিধারে আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললে—আমি কোন লেখকের এত কাছে ব'সে কখনো গল্প করিনি। এত বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে কেউ কথাও বলেনি।

আর মিনিট কুড়ি পরে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতা-পত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠল—ভাবলে বোধ হয় আর বেশীক্ষণ থাকলে আমি পাছে বিরক্ত হই।

দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে কি ভেবে আবার বসল, ভয়ে ভয়ে বললে—একটা কথা বলব? কথাটা বলতে সাহস হয় না। অত কম টাকায় কি আপনি রাজী হবেন? আমি আপনাকে দশ টাকা ক'রে মাসে মাসে দিলে, আমাকে লেখা শিখিয়ে দেবেন?

ওর এই কথাটায় কেমন একটা কষ্ট হ'ল ওর জন্যে। মাত্র উনত্রিশ টাকা মাইনে থেকে আমায় দশ টাকা দিতে রাজী—বাকি উনিশ টাকাতেই এখানকার ও বাড়ীর খরচ চালাতে রাজী—লেখক হবার এতই সাধ।

আমি তাকে বললাম—তার কোন টাকাকড়ি লাগবে না। আমি সব ছুটিতে এখানে আসিনে, যখন আসব, তখন আমার দ্বারা যতদূর উপকার হয়, খুশির সঙ্গে করব।

সে মহা আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খাতা-পত্র বগলে নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল। বাইরে গিয়ে আবার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—তা হ'লে আমার হবে? না হবার কিছু দেখলেন কি?

—হবে নিশ্চয়ই, না হবার কিছুই দেখিনি। তবে সাধনা চাই।

ভগবান আমায় যেন ক্ষমা করেন—এই মিথ্যে বলবার জন্যে। আমি কেমন ক'রে ওর মুখের উপর বলবো যে, ওর লেখার মধ্যে আমি কিছুই পাইনি—ওর গল্প, কবিতা নিতান্ত বাজে হ'য়েচে, বিশেষ কোনো ক্ষমতার অঙ্কুরও তার লেখার মধ্যে কোথাও নেই! মিথ্যা যেখানে মানুষকে সুখী করে, সেখানে নিষ্ঠুর সত্য ব'লে কিইবা লাভ?

বড়বাবুর বাহাদুরি

আপিসে মাঝে মাঝে নানা পার্টি আসিয়া গোলঞ্চ লতা ও গাছ-গাছড়া বিক্রি করিয়া যাইত। ইহাদের নাম লেখা আছে বটে, কিন্তু অনেকেরই ঠিকানা কিছু লেখা থাকে না! এখানে ছোট-খাটো কাজকর্ম্ম সবই হয় নগদ—বড়বাবুর এসিস্ট্যাণ্ট, সে সব পাওনাদারকে সাহেব তো দূরের কথা, বড় বাবুর কাছে পর্য্যন্ত যাইতে দেয় না।

হরিপদ এবার নগু দালালের হাত দিয়া জিনিস না বেচিয়া নিজেই সরাসরি কোম্পানীর আপিসে লইয়া গিয়া নামাইয়াছিল।

যে পাড়াগাঁয়ে হরিপদ থাকে, গাছ-গাছড়ার সেখানে অভাব নাই। নগু দালালের পরামর্শেই সে এই সব গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। তাহাকে সে সব চিনাইয়াছিল শান্তি কবিরাজ।

মনপিছু দু'টাকা লরি ভাড়া দিয়া বার বার মাল আনিয়া পোষায় না। হরিপদ সেজন্য এক বছর ধরিয়া বিস্তর গাছপালা মজুদ করিতেছিল। নগু দালাল ইহার মধ্যে দু'তিনবার সন্ধান লইয়াছেও।

—ওহে হরিপদ, মালগুলো এবার দেখচি তুমি পচাবে। আপাং শিমূলের শেকড়, শ্বেতপর্পটি এ সব ছ'মাসের বেশি থাকে না, পচে' নষ্ট হয়ে যায়। তখন দু'খানা করেও বিক্রি হবে না। নিয়ে এসো হে, নিয়ে এসে ফেল কলকাতায়—।

কিন্তু হরিপদ খুব কাঁচা ছেলে নয়। বেলেঘাটার মুখুয্যে মশায়ের আড়তে সে আর যাইতে প্রস্তুত নয়। অবিশ্যি এ কথা ঠিক যে, তাহার থাকিবার ও খাইবার কোনো কষ্ট কলিকাতায় হয় না। আজকাল আড়তে উঠিলেই হইল। আড়তের রাঁধুনী বামুন তাহাকে চিনে, তাহাকে গিয়া বলিলেই হইল—ও কুবের ঠাকুর! এখানে দুটো খাব এ বেলা।

উহারা যতই খাতির করুক, এবার হরিপদ বেলেঘাটার আড়তে গিয়া উঠে নাই।

নগু দালাল তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে, তাহাকে সে লাভের একটা মোটা অংশ কেন দিতে যাইবে?

কলিকাতায় এবার আসিয়া সে শুনিল, হিন্দুস্থান কেমিক্যাল্ কোম্পানী শীতের মরশুমে এই রকম গাছ-গাছড়া কিনিয়া থাকে।

সে সোজা গিয়া হাজির হইল হিন্দুস্থান কেমিক্যাল্ কোম্পানীর আপিসে। প্রচণ্ড ব্যাপার। লোকজন, লিফ্‌ট্, দরওয়ান, ঘোরানো দরজা, দিনমানে ইলেক্‌ট্রিক আলো জালিয়া কাজ চলিতেছে। ঘন ঘন টেলিফোন বাজিবার শব্দ। এই জন্যেই বোধহয় নগু দালালের শরণাপন্ন হইতে হয়। এখানে জিনিস বেচা কি পাড়াগাঁয়ে লোকের কর্ম্ম? অবশেষে সন্ধান মিলিল এন্‌কোয়ারী আপিস হইতে।

জিনিস ক্রয় করিবার ভার যার উপর, তার বয়েস খুব বেশি নয়। লোকটা মাল দেখিয়া শুনিয়া যা দর বলিল, বেলেঘাটা মুখুয্যে মশায়ের আড়তের দরের তুলনায় মনপিছু অন্ততঃ আট আনা বেশি।

মাল নামাইয়া ওজন করিয়া দিতে দেরি হইয়া গেল। কেরানী বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি চেক নেবেন, না নগদ টাকা? কাল এসে টাকা নিয়ে যাবেন তবে। আজ ক্যাশ থেকে টাকা বের ক'রে রেখে দেব। একটা বিল ক'রে বড় বাবুর কাছে সই করিয়ে নিয়ে আসুন। বিলখানা এখানে দিয়ে যাবেন।

পরদিন কাউণ্টারে বেজায় ভিড়। আজ টাকা দিবার দিন, অনেক লোক টাকা লইতে আসিয়াছে। এক-একখানা খামের উপর পাওনাদারের নাম টাইপ করা।

কেরানী বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি নাম? রামশরণ পাল?—এই নিন্। পাওনাদার একখানা খাম লইয়া চলিয়া যাইতেছে—কেহ কেহ বা খাম খুলিয়া নোটগুলি দেখিয়া লইতেছে।

হরিপদর হাতে কেরানী এমনি একখানা খাম দিল। তার ওপরে লেখা আছে H.P B সামান্য চল্লিশ টাকার জন্যে খাম খুলিয়া টাকা দেখিয়া লইতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। এত কাণ্ডকারখানা যেখানে, সেখানে কি আর ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে? খামের বাহিরে টাইপ করা অক্ষরে তার নাম লেখা ঠিকই আছে।

কিন্তু শেয়ালদ' স্টেশনে আসিয়া খাম খুলিয়া নোটগুলি কি ভাবিয়া একবার দেখিয়া লইতে গিয়া হরিপদ মাথা ঘুরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। চারিদিকে সে তাড়াতাড়িই নোটের খামখানা পকেটে পুরিয়া সোজা প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিয়া ট্রেণে চড়িয়া বসিল। শীতকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সর্ব্বনাশ! সব ক'খানাই একশো টাকার নোট, সর্ব্বসুদ্ধ এগারো খানা। চল্লিশ টাকার জায়গায় এগারশো টাকা!

এ ভুল কি করিয়া হইল হরিপদ বুঝিতে পারিল না। হয়তো তাড়াতাড়িতে অন্য কোনো বড় পাওনাদারের খাম তাহাকে দিয়াছে। তাহারও নাম বোধ হয় H P B., অত ভিড়ের মধ্যে কেরানী বাবু কাহার নামের খাম কাহাকে দিয়াছে।

এগারশো টাকা তাহার নিকট অ-নে-ক টাকা। সামান্য অবস্থার মানুষ সে, গাছ-গাছড়া বেচিয়া সংসার চালায়! ভগবান দিয়া দিয়াছেন—উঃ, আর কি সময়েই দিয়াছেন—ভগবানের দান তো! সারা-জীবন গাছ-গাছড়া বিক্রয় করিয়াও সে এগারোশো টাকা জমাইতে পারিত না। আর একসঙ্গে নগদ এতগুলি টাকা হাতে পাওয়া কি সোজা কথা? কার মুখ দেখিয়াই

না সে উঠিয়াছিল !

ট্রেণে যাইতে যাইতে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া তাহার উত্তেজনা অনেকটা শান্ত হইল। কিন্তু একটা উত্তেজনা তখনও কমিল না—কতক্ষণে স্ত্রীর কাছে কথাটা বলিবে। গাড়ী যেন চলিতে চাহিতেছে না, এত বড় আনন্দের খবর কাহাকেও না জানাইতে পারিয়া, ভগবান জানেন, কি অসহ্য যন্ত্রণা যে তাহার হইতেছে !

গাড়ীর কোণে একটা প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলায় কম্ফটার জড়াইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে গিয়া কথাটা বলিবে ?

—দেখুন মশায়, বড় একটা মজা হয়েচে। একটা আপিসে চল্লিশটা টাকা পেতুম, তারা ভুল ক'রে এগারোশো টাকা দিয়েচে। এই দেখুন টাকা।

আপিসের নাম সে তো বলিতে যাইতেছে না ?

দরকার নাই, সন্দেহ করিয়া লোকটা যদি পুলিশে খবর দেয় !

আপিসের লোকে নিশ্চয়ই ভুল ধরিয়া ফেলিবে এবং তখনি তাহার সন্ধানে লোক ছুটিবে। ছুটিলেও তাহার ঠিকানা বাহির করার কোনো উপায় নাই। একশো টাকার নোটগুলি ভাঙাইয়া ফেলিতে হইবে। সিরাজগঞ্জে তাহার মামা পাটের আপিসে কাজ করেন, মামার সাহায্যে একশো টাকার নোট ভাঙাইয়া খুচরা দশ টাকার নোট সংগ্রহ করিতে হইবে। কালই সকালের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ রওনা হওয়া দরকার।

হরিপদর স্ত্রী আশালতা নোটের তাড়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। বলিল—হ্যাগা, তারা বুঝতে পারলে না, ভুল ক'রে কার টাকা কাকে দিলে !

—বড় বড় আপিসের মজাই তো তাই। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। এদিকে এক এক ডিপার্টমেণ্টে পঞ্চাশ ষাট একশো লোক খাটচে, আর ও দিকে ওই কাণ্ড। বড়বাবুর কাছে যাও, বিল সই করে নিয়ে এসো, ক্যাশে যাও, আবার সই করাও। সব মিথ্যে জাঁকজমক আর কেতা-দুরস্ত।

আশালতা বলিল, কিন্তু ওসব নোটের শুনেচি নম্বর থাকে, যদি পুলিশে হুলিয়া করে দেয়, তুমি নোট ভাঙাবে কি করে ? ওইখানেই তো ভয় !

—কিছু ভয় নেই। প্রথম তো আজকাল একশো টাকার নোটের নম্বর থাকে না শুনেচি। অত বড় আপিসে একশো টাকার যে সাধারণ নম্বর থাকে, তা টুকে রাখবে না। আর তা ছাড়া কালই সিরাজগঞ্জে গিয়ে মামার কাছ থেকে সব নোট ভাঙ্গিয়ে আনচি। আমার ঠিকানা ওদের কাছে নেই যে ধরবে। নাম দেখে ধরতে পারবে না।

হরিপদর স্ত্রী বলিল—ভালোয় ভালোয় নোটগুলো ভাঙ্গিয়ে তো আনো। সামনের পুন্নিমের দিন সত্যনারায়ণের শিন্নি দিয়ে দিই। ও টাকা ভগবান আমাদের মুখ চেয়েই দিয়েছেন।

সিরাজগঞ্জে গিয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিতে কোনো বাধা হইল না। কথা ফাঁস করিতে হয় নাই, চতুর হরিপদ মামাকে বলিল, ব্রহ্মোত্তর ধানের জমিগুলো সব বেচে দিলুম। কি

করি, একটা ব্যবসা খুলব, টাকা যোগাড় করি কোথা? সত্যনারায়ণের শিন্নি দেওয়াও ভুলিয়া গেল।

মাস খানেক কাটিয়া গিয়াছে। অন্য কোনো দিক হইতেই হাঙ্গামা বাধে নাই বটে, কিন্তু হরিপদ বড় বিপদে পড়িয়াছে, এই একমাস তাহার মনের দিক হইতে একটা বড় গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। এই টাকাটা লইয়া সে কি ভালো করিল!

আপিসের তাহারা এতদিন তাহাদের ভুল নিশ্চয়ই জানিয়া ফেলিয়াছে। তাহার খোঁজও করিয়াছে। কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার পাত্তা। সেই কেরানী বাবুর উপরে নিশ্চয়ই সব দায়িত্ব পড়িয়াছে এবং এতদিন বেচারীর চাকরি আছে কিনা সন্দেহ।

যতই দিন যাইতে লাগিল, হরিপদ ততই মনে অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল। যতদিন পুলিশের ভয় ছিল, বা আপিস হইতে তাহার টাকা কাড়িয়া লইবার ভয় ছিল, ততদিন তাহার মনে এ কথা ওঠে নাই যে, এ টাকা লওয়া অন্যায় বা পাপ। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতই সে নিজেকে নিরঙ্কুশ বোধ করিতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল এ টাকায় তাহার কোনো অধিকার নাই, এ অপরের টাকা সে চুরি করিয়া আনিয়াছে।

ছ'মাস কাটিয়া গেল; কখনো সে ভাবে, টাকাটা ফিরাইয়া দিব; আবার পরদিনই মনে হয় এই এগারোশো টাকায় একখানি মুদীর দোকান খুলিয়া গ্রামে বসিয়াই সে চমৎকার চালাইতে পারে। ভগবান তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মূলধন যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। থাক্, টাকাটা।

টাকা ফেরত দেওয়ার একটা প্রধান বাধা দাঁড়াইয়াছে হরিপদর স্ত্রী। সে যেদিন হইতে শুনিয়াছে স্বামী টাকা ফেরত দেওয়ার সংকল্প করিতেছে, সেদিন হইতে সে কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়াছে। গরীবের ঘরের মেয়ে, গরীবের ঘরের বৌ তার কাছে এগারোশো টাকা একটা খুব বড় ব্যাপার।

হরিপদ তাহাকে বুঝাইয়া বলল—গ্যাখো, ফাঁকির টাকা তো বটে! এতদিন কথাটা ভালো করে বুঝিনি, আজকাল রাত্রে আমার ঘুম হয় না ভেবে ভেবে তা জানো? কাজ নেই বাপু, এগারোশো টাকা ক'দিন খাব? ওটা তাদের দিয়েই আসি।

আশালতা বলিল—ফাঁকির টাকা হ'ল কি ক'রে? ভগবান না দিলে তাদেরই বা ভুল হবে কেন? ও যখন ঘরে এসেচে, তখন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না, আমার কথা শোনো, ও নিয়ে ভেবে মিথ্যে মাথা খারাপ কোরো না লক্ষ্মীটি। ও তো তুমি কোন একটা লোককে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসোনি, তারা ভুল করে দিয়েচে, এতে তোমার দোষ কি? কারো একজনের টাকা নয়, কোম্পানীর টাকা, বড় লোক কোম্পানী, তাদের কাছে এগারোশো টাকা কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের কাছে অনেক বেশি। সারা জীবনের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। আমি কি আমার নিজের জন্যই বলি, নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখো দিকি? বন-জঙ্গলে ঘুরে গাছপালা খুঁজে খুঁজে কি ছিরি বেরিয়েচে! ওই টাকায় একখানা দোকান করো, বসে চলবে।

কি ভয়ানক বাধা হইয়া উঠিয়াছে স্ত্রীর এই অনুরোধ। কেন ছাই এ কথা ও স্ত্রীকে বলিতে গিয়াছিল? ওর মুখের দিকে চাহিলে কষ্ট হয়, ওর কাতর অনুরোধ শুনিলে মনে হয় —দূর করো, কাজ নাই সাধুতা দেখাইয়া। ওই অভাগিনীকে জীবনে কখনো সে সুখী করিতে পারে নাই, টাকাটার একটা ব্যবসা খুলিয়া দিলে অন্নবস্ত্রের কষ্টের একটা মীমাংসা হইবে। এখানে সাধু সাজা স্বার্থপরতা, ঘোর স্বার্থপরতা।

আশালতার বয়েস কম, জীবনে কোনো সাধ ওর পূর্ণ হয় নাই। ওর মুখের দিকে চাহিয়া না হয় সে নিজের কাছে অসাধুই হইয়া রহিল।

দিনে এই সব ভাবে, কিন্তু গভীর রাত্রে যখন গ্রাম নিষুতি হইয়া যায়, আশালতা ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তার মনে হয় চুরির স্বপক্ষে কি চমৎকার যুক্তিই সে বাহির করিয়াছে। জুয়াচুরি জুয়াচুরিই, তার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নাই, তর্ক নাই। টাকা তাকে ফিরাইয়া দিতেই হইবে, নিজের কাছে চোর হইয়া সে থাকিতে পারিবে না।

নিদ্রিত আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল—ছি ছি, মেয়েমানুষ জাতটা কি ভয়ঙ্কর। ওদের মনে কি এতটুকু সৎ কিছু জানে না? কেবল টাকা-কড়ি, গহনা, চাল-ডালের দিকে নজর?

দিন যায়। হরিপদ দেখিল, সে স্ত্রীকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার কত আদরের আশালতা! যাহাকে চোখ ভরিয়া দেখিয়াও চোখের তৃপ্তি হইত না, তাহার সম্বন্ধে এ সব কি ভাবনা তার মনে?

একদিন হঠাৎ তাহাদের একটা বাছুর মরিয়া গেল।

এবার হরিপদ ভাবিল —তা যাবে না? সংসারে যখন ওর মতো মেয়ে এসেচে! তখন ওর পরামর্শেই সংসার এবার উচ্ছন্নে যাবে।

দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইতে লাগিল। আজকাল স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারটা দিন দিন রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সামান্য কথায় খিটখিট করে, সামান্য ব্যাপার লইয়া স্ত্রীকে দু'কথা শুনাইয়া দেয়। মনের মিলের জোড় ক্রমে অলক্ষিতে খুলিতে লাগিল। আশালতা ভাবিয়া কুল পায় না, তাহার অমন স্বামী কেন এমন হইয়া যাইতেছে দিন দিন? ক্রমে তাহার মনেও ভাঙন শুরু হইল। ভাবে এত হেনস্তা কিসের? কোন্ জিনিসটাতে আমার ত্রুটি হয়? উদয়াস্ত মুখে রক্ত উঠে খেটে মরি, সে কথা একবার বলা তো দূরের কথা, উল্টে আবার পান থেকে চুন খসলেই এই সব গাল-মন্দ, অপমান?

গত মাসখানেক সেই আপিসের টাকাতে হাত পড়িয়াছে। এরই মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আশালতা ভাবে—'ওর শরীরটা খারাপ হয়ে গিয়েচে রোদে রোদে সাত গাঁয়ের বন-জঙ্গলে ঘুরে। ওকে একটু সারিয়ে তুলি।' গত মাস হইতে আশালতা রাত্রে প্রায়ই লুচি ভাজিয়া স্বামীকে খাওয়ায়। মাঝে মাঝে ভালো খাবার দাবার করে। একদিন বলিল—ওগো, তোমার পায়ের দিকে একবার নজর দাও। এক জোড়া জুতো কিনো দিকি ভালো দেখে। জলে-জলে পা হেজে পাকুই ধরে গেল যে!

একদিন সন্ধ্যার পর হরিপদ খাইতে বসিয়াছে, আশালতা তাহার জন্য দুধ গরম করিয়া আনিতে গিয়াছে। হাঠাৎ হরিপদ লুচি চিবাইতে চিবাইতে বেকায়দায় জিভ কামড়াইয়া ফেলিয়া যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিল—উঃ—

ঠিক সেই সময় আশালতা দুধের বাটি লইয়া আসিয়া বলিল—কি হ'ল গা? হরিপদ বাঁ হাত দিয়া গলাটা চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

আশালতা পুনরায় উদ্বেগের সুরে বলিল—কি হয়েচে, হ্যাঁগা? অমন করে আছ কেন? হরিপদ সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—হবে আর কি, যেদিন থেকে তুমি অলক্ষ্মী ঘরে ঢুকেচ, সেদিন থেকে এ সংসারের শান্তি নেই। শুধু শুধু নইলে গরুর বাছুরটাই বা মরে যাবে কেন, আর—বলিয়া লুচির থালা হাতের ঠেলায় সজোরে দশ হাত তফাতে ছিটকাইয়া ফেলিয়া হরিপদ উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

আশালতা দুধের বাটি-হাতে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিপদ অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল। আসিয়া দেখিল, স্ত্রী বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জিভের ব্যথা কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছে—ছিঃ, অমন করে তখন বলাটা ভালো হয়নি—নাঃ, একটু বেশি বলা হয়ে গিয়েচে—তখন আর মাথার ঠিক ছিল না তো।—ছিঃ! ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে ওভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—'নাও ওঠো, রাগ করেচ নাকি? খাওয়া-দাওয়া হয়েচে?' আশালতা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কোন কথা বলিল না।

হরিপদ স্ত্রীর হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। আশালতা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, থাক্, বোসো এখানে, একটা কথা বলি।

—কি?

—দেখো সে টাকা তুমি ফেরত দিয়ে এসো। যা খরচ হয়ে গিয়েছে, আমার চুড়ি ক'গাছা বন্ধক দিয়ে হোক, বেচে হোক, সেটা পুরিয়ে দাও গিয়ে। ওই টাকা যেদিন থেকে ঘরে ঢুকেচে, সেদিন থেকে সংসারের শান্তি চলে গিয়েচে, ও আর কিছুদিন থাকলে একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি কাল যাও, টাকা ফেলে দিয়ে এসো গিয়ে।

রাত্রিটা কাটিয়া গেলে হরিপদ দেখিল, প্রায় একশো টাকা আন্দাজ খরচ হইয়া গিয়াছে সেই টাকা হইতে। স্ত্রীর গহনা লইয়া সেদিনই সে কলিকাতা রওনা হইল এবং পোদ্দারের দোকানে বেচিয়া টাকাটা সংগ্রহ করিল। কোম্পানীর আপিসে গিয়া ভাবিল, কোনো ছুটো কেরানীর কাছে টাকাটা দেব না,—হিসেবের বাইরের টাকা সে মেরে দেবে। সে একেবারে সরাসরি বড়বাবুর ঘরে গিয়া হাজির হইল।

বড়বাবু বলিলেন, কি চান?

হরিপদ সব খুলিয়া বলিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। বড়বাবু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এই টাকা লইয়া আপিসে যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছে। হরিপদ যাইবার দু'দিন পরে

ভুল ধরা পড়ে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু পারা যায় নাই। যে কেরানী ভুল করিয়াছিল, তাহার মাহিনা হইতে প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে এবং পূজার বোনাস্ সে কখনো পাইবে না, এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

আজ দু'মাস আড়াই মাস পরে সেই পলাতক লোকটি টাকা ফেরত দিতে আসিয়াছে! ব্যাপারখানা কি? বড়বাবু এমন কাণ্ড কখনো তাঁহার বাহান্ন বছর বয়সে দেখেন নাই।

জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরো টাকাই দেবেন তো? নিয়ে এসেচেন সব? তা এতদিন আসেননি কেন? হরিপদ বলিল, যখন টাকাটা এখান থেকে নিয়ে গেলুম, তখন বুঝতে পারিনি যে এত টাকা নিয়ে যাচ্ছি। ধরা পড়ল অনেক পরে বাড়ী গিয়ে। তারপর লোভ প্রবল হয়ে উঠল বড়বাবু, আমরা গরীব লোক, এতগুলো টাকার লোভ সামলানো সোজা কথা তো নয়!

বড়বাবু বলিলেন—বেশ, টাকা দিয়ে যান।

টাকা গুনিয়া দিয়া হরিপদ চলিয়া গেল। আপিসে ইতিমধ্যে অনেকেই কথাটা শুনিয়াছে, তাহারা বড়বাবুর কাছে কথাটা শুনিতে আসিল। এতদিন পরে টাকা ফেরত দিতে আসিল কি ব্যাপার?

বড়বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হুঁ-হুঁ—তোমরা তো জানো না। কোম্পানীর জন্যে কত খেটে মরি, নামও নেই এ আপিসে, যশও নেই। বাছাধন আজ এতকাল পরে এসেচেন বোধ হয় মাল বিক্রি করতে। ভেবেচেন এতদিনে আর চিনতে পারবে না। জিজ্ঞেস করলুম, আপনার নামটি কি? আপনি একবার জিনিস বেচতে এসে বেশী পেমেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলেন না? আমি ওকে বিল সই করতে দেখেচি—চেহারা দেখেই ভাবলুম, এ ঠিক সেই লোক। যেমন বলেচি, বাছাধনের মুখটি চুন। বললুম, টাকা ফেলো, নইলে পুলিশে দেব। ব্যবসাদার লোক, পাওনা টাকা আদায় করেছিল বোধ হয়। সঙ্গে টাকাও ছিল, তা থেকে ভয়ে ভয়ে আমাদের টাকাটা বের করে দিলে। যাবে কোথায়? কত বড় ফাঁদে পা দিয়েচে, জানে না।

বড়বাবুর জয়-জয়কার পড়িয়া গেল।

অন্নপ্রাশন

খোকার অবস্থা শেষ রাত হইতে ভালো নয়।

কি যে অসুখ তা-ই কি ভালো করিয়া ঠিক হইল? জস্তিপুরের সদানন্দ নাপিত এ সব গ্রামে কবিরাজী করে, ভালো কবিরাজ বলিয়া পসারও আছে। সে বলিয়াছিল, সান্নিপাতিক জ্বর। মহেশ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার একটাকা ভিজিটে রোগী দেখে, সে বলিয়াছিল,

ম্যালেরিয়া। মহেশ ডাক্তারকে আনিবার মতো সঙ্গতি থাকলে এতদিন তাহাকে আনা হইত ; কাল বৈকালে যে আনা হইয়াছিল সে নিতান্ত প্রাণের দায়ে, খোকা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া খোকার মা কান্নাকাটি করিতে লাগিল, পাড়ার সকলেই মহেশকে আনিবার পরামর্শ দিল, পরিবারের গায়ের একমাত্র সোনার অলঙ্কার মাকড়ি জোড়াটা বাঁধা দিয়া আটটা টাকা কেশব ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া ও ভিজিটেই ডাক্তারের পাদপদ্মে ঢালিয়াছে। তবুও তো ওষুধের দাম বাকি আছে, নিতান্ত কম্পাউণ্ডারবাবু এখানে ডাকডোক পান, সেই খাতিরেই টাকা-দুই আন্দাজ ওষুধের বিলটা এক হপ্তার জন্য বাকি রাখিতে রাজী হইয়াছেন।

এই তো গেল অবস্থা!

মহেশ ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, কোন আশা নাই। অসুখ আসলে নিউমোনিয়া, এতদিন যা তা চিকিৎসা হইয়াছে। রাতটা যদি বা কাটে, কাল দুপুরে 'ক্রাইসিস্' কাটাইবার সম্ভাবনা কম।

কেশব এ কথা জানিত, কিন্তু স্ত্রীকে জানায় নাই। শেষ রাত্রের দিকে যখন খোকার হিক্কা আরম্ভ হইল, খোকার মা বলিল—ওগো, খোকার হিক্কা উঠেচে, একটু ডাবের জল দিলে হিক্কাটা সেরে যাবে এখন।

জল দেওয়া হইল, হেঁচ্‌কী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কমিবার নামটিও করে না। অতটুকু কচি বালকের সে কি ভীষণ কষ্ট! এক একবার হেঁচ্‌কী তুলিতে তার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আর তার কষ্ট দেখা যায় না, তখন কেশবের মনে হইতেছিল, "হে ভগবান! তুমি হয় ওর রোগ সারিয়ে দাও, নয় তো ওকে নাও, তোমার চরণে স্থান দাও, কচি ছেলের এ কষ্ট চোখের ওপর আর দেখতে পারি নে।"

সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই খোকা মারা গেল।

কেশবের স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিতেই পাশের বাড়ী হইতে প্রৌঢ়া বাঁড়ুয্যে-গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন মেয়ে আসিল। সামনের বাড়ীর নববিবাহিতা বধূটিও আসিল। বধূটি বেশ, আজ মাস-দুই বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু খোকার অসুখের সময় দুবেলা দেখা শোনা করা, রোগীর কাছে বসিয়া খোকার মাকে স্নানাহারের অবকাশ দেওয়া, নিজের বাড়ী হইতে খাবার করিয়া আনিয়া খোকার মাকে খাওয়ানো—ছেলেমানুষ বৌয়ের কাণ্ড দেখিয়া সবাই অবাক্। এখন সে আসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। বড় নরম মনটা।

দশ মাসের ছেলে মোটে। শ্মশানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

খোকাকে কাঁথা জড়াইয়া কেশব আগে আগে চলিল, তার সঙ্গে পাড়ার আরও তিন-চারজন লোক। ঘন বাঁশবাগান ও বনের মধ্যে সুঁড়ি-পথ। এত সকালে এখনও বনের মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করে নাই, হেমন্তের শিশিরসিক্ত লতাপাতা, ঝোপঝাপ হইতে একটা আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর গন্ধ বাহির হইতেছে।

ওপাড়ার সতু বলিল—আর বেশীদূর গিয়ে কি হবে, কি বলো রজনী খুড়ো? এখানেই—

কেশব বলিল—আর একটু চল বিলের ধারে—

বিলের ধারে ঘন বাঁশবনের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া কাঁথা-জড়ানো শিশুকে পুঁতিয়া ফেলা হইল। দশ মাসের দিব্যি ফুটফুটে শিশু, কাঁথা হইতে গোলাপ ফুলের মতো ছোট মুখখানি বাহির হইয়া আছে। মুখখানিতে ছোট্ট একটুখানি হাঁ, মনে হইতেছে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেশবের কোলেই ছেলে, গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিবার সময় সে বলিল—গা এখনও গরম রয়েচে।

রজনী খুড়ো ইহাদের মধ্যে প্রবীণ, তিনি বলিলেন—আহা-হা, ওসব ভেব না। সতু, নাও না ওর কোল থেকে, ওর কোলে কি বলে রেখে দিয়েচ ?

গর্ত্তে মাটি চাপান হইল। কেশব অবাক্ নয়নে গর্ত্তের মধ্যে যতক্ষণ দেখা যায়, চাহিয়া রহিল। ছোট্ট মুঠাবাঁধা হাত দুটি মাটি চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা শেষ হইয়া গেল।

রজনী খুড়ো বলিলেন—চল হে বাবাজী, ওদিকে আর চেও না। ·সংসার তবে আর বলেচে কেন ? আমারও একদিন এমন দিন গিয়েচে, আমার সেই মেয়েটা—জান তো সবই। আজ আবার তোমার মনিব-বাড়ীর কাজ, তোমারও তো সেখানে থাকতে হবে। দেখ তো দিন বুঝে আজই—

কাজটা সাঙ্গ হইয়া গেল খুব সকালেই। বাড়ী যখন ইহারা ফিরিল, তখন সবে রৌদ্র উঠিয়াছে।

একটু পরে সান্ন্যাল-বাড়ী হইতে লোক আসিল কেশবকে ডাকিতে। বলিল—আসুন মুহুরী মশায়, বাবু ডাকচেন। তিনি সব শুনেচেন, কাজকর্ম্ম করলে মনটাকে ভুলে থাকবেন, সেই জন্যে ডেকে নিয়ে যেতে বলে দিলেন।

আজ সান্ন্যাল-বাড়ীর মেজবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন। সান্ন্যালেরা গ্রামের জমিদার না হইলেও খুব সম্পন্ন গৃহস্থ বটে। পয়সাওয়ালা ও বর্দ্ধিষ্ণু। এ অঞ্চলে প্রতিপত্তিও খুব। তেজারতিতেও ষাট সত্তর হাজার টাকা খাটে। পাশাপাশি আট দশখানা গ্রামে এমন চাষী প্রায় নাই, যে সান্ন্যালদের কাছে হাত পাতে নাই।

কেশব বলিল, চল যাচ্চি, ইয়ে···বাড়ীতে একটু শান্ত করে যাই। মেয়েমানুষ, বড্ড কান্নাকাটি করচে।

সান্ন্যালেরা লোক খুব ভাল। বৃদ্ধ সান্ন্যাল মশায় কেশবকে দেখিয়া বলিলেন, আরে এস, এস কেশব। আহা, শুনলাম সবই। তা কি করবে বল। ও দেবকুমার, শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছিল, কি রূপ, তোমার অদৃষ্টে থাকবে কেন ? যেখানকার জিনিস সেখানে চলে গিয়েচে ! তা ও আর ভেব না, কাজকর্ম্মে থাক, তবুও অনেকটা অন্যমনস্ক থাকবে। দেখ গিয়ে বাড়ীর মধ্যে ভাতের উনুনগুলো কাটা হচ্চে কি না। বৌমাকেও আনতে পাঠাচ্চি, তিনিও এসে দেখাশুনো করুন, কাজের বাড়ী ব্যস্ত থাকবেন।

মোটরে করিয়া একদল মেয়ে-পুরুষ কুটুম্ব আসিল।

শহরের লোক। মেয়েদের গহনার বাহার নাই, সে সব বালাই উঠিয়া গিয়াছে, শাড়ির

রঙচঙে চোখ ধাঁধিয়া গেল। মেয়েরা ঠিকই কলিকাতার চাল শিখিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু এ সব পাড়াগাঁয়ের শহরে পুরুষদের বেশভূষা নিজের নিজের ইচ্ছামত - ধুতির সঙ্গে কোট পরা এখানকার নিয়ম, কেউ তাতে কিছু মনে করে না।

চারিধারে হাসিখুশি, উৎসবের ধুম। কেশবের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড বড় ফাঁকা, এদের হাসিখুশির সঙ্গে তার মিল খাইতেছে না। আচ্ছা, এদের মধ্যে কেউই বোধ হয় জানে না, তার আজ সকালে কি হইয়া গিয়াছে··

একটি ভদ্রলোক চার বছরের একটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। বেশ সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, গায়ে রাঙা সিল্কের জামা, কোঁচান ধুতি পরনে এতটুকু ছেলের, পায়ে রাঙা মখমলের উপর জরির কাজ করা জুতো। কি সুন্দর মানাইয়াছে।

কেশবের ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ভদ্রলোকটিকে বলে—শুনুন মশায়, আমারও একটি ছেলে ছিল, অবিকল এমনিটি দেখতে। আজ সকালে মারা গেল। আপনার ছেলের মতোই তার গায়ের রং।

মহিমপুরের নিকারীরা মাছ আনিয়া ফেলিল। গোমস্তা নবীন সরকার ডাকিয়া বলিল—ওহে কেশব, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেক না, চট্ করে মাছগুলোর ওজনটা একবার দেখে নিয়ে ওদের হাতচিঠেখানা সই করে দাও—দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই—কাতলা আধ মনের বেশি হলে ফেরত দিও—শুধু রুইয়ের বায়না আছে।

নবীন সরকার জানে না তাহার খোকা আজ সকালে মারা গিয়াছে। কি করিয়া জানিবে, ভিন গাঁয়ের লোক, তাতে এই ব্যস্ত কাজের বাড়ীতে ; সে খবর তাকে দেওয়ার গরজ কার ?

কেশব একবার নবীন সরকারকে গিয়া বলিবে—গোমস্তা মশায়, আমার খোকাটি মারা গিয়েচে আজ সকাল বেলা। ফুটফুটে খোকাটি ! বড় কষ্ট দিয়ে গিয়েচে।

নবীন সরকার নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। বল কি কেশব ! তোমার ছেলে আজ সকালে মারা গিয়েচে, আর তুমি ছুটোছুটি করে কাজ করে বেড়াচ্ছ ! আহা-হা, তোমার ছেলে ! আহা, তাই তো !

কিন্তু কেউ কিছু জানে না। কেশব তো কাহাকেও কিছু বলিবে না।

মাছ ওজন করিয়া লইবার পরে দুধ-দই আসিয়া উপস্থিত। তারপর আসিল বাজার হইতে হরি ময়রার ছেলে, দু'মন-আড়াই মন সন্দেশ ও আড়াই মন পান্তুয়া লইয়া। দই-সন্দেশ ওজন করিবার হিড়িকে কেশব সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সপ বিছান, সামিয়ানা খাটান প্রভৃতি কাজ তদারক করিবার ভারও পড়িল তাহার উপর।

ইতিমধ্যে সকলেই সব ভুলিয়া গেল, একটা বড় গ্রাম্য দলাদলির গোলমালের মধ্যে। সকলেই জানিত, আজ হারাণ চক্রবর্ত্তীর বিধবা মেয়ের কথা এ সভায় উঠিবেই উঠিবে। সকলে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। প্রথমে কথাটা তুলিলেন নায়েব মশায়—তারপরে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও পরিশেষে ওপাড়ার কুমার চক্রবর্ত্তী রাগ করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে কাজের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—অমন দলে আমি থাকি নে ! যেখানে একটা বাঁধন নেই, বিচার

নেই—সে সমাজ আবার সমাজ ? যে খায় খাক, একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে নিয়ে আমি বা আমার বাড়ীর কেউ খাবে না—আমার টাকা নেই বটে, কিন্তু তেমন বাপের—ইত্যাদি।

তিন-চারজন ছুটিল কুমার চক্রবর্ত্তীকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফিরাইয়া আনিতে। কুমার চক্রবর্ত্তী যে একরোখা, চড়ামেজাজের মানুষ সবাই তা জানে। কিন্তু, ইহাও জানে যে, সে রাগ তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নায়েব মশায় বলিলেন—তুমি যেও না হরি খুড়ো—তোমার মুখ ভালো না, আরও চটিয়ে দেবে। কার্ত্তিক যাক, আর শ্যামলাল যাক—

হারাণ চক্রবর্ত্তীর যে মেয়েটিকে লইয়া ঘোঁট চলিতেছে, সে মেয়েটি কাজের বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই।

পাশের বাড়ীর গোলার নিচে সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, আজই একটা মিটিং হইয়া তাহার সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত সামাজিক নিষ্পত্তি কিছু হইবে, তাহা সে জানিত এবং তাহারই ফল কি হয় জানিবার জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনিয়া সে ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারই নাম কুমার চক্রবর্ত্তীর মুখে ওভাবে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া পাঁচিলের ঘুলঘুলি দিয়া দুরু দুরু বক্ষে ব্যাপারটা কি দেখিবার চেষ্টা পাইল।

পাঁচিলের ওপাশে নিকটেই কেশবকে দেখিতে পাইয়া সে ডাকিল—কাকা, ও কাকা—

কেশব কাকাকে সে ছেলেবেলা হইতে জানে, কেশব কাকার মতো নিপাট ভালোমানুষ এ গাঁয়ে দুটি নাই।

আহা, সে শুনিয়াছে যে, আজই সকালে কেশব কাকার খোকাটি মারা গিয়াছে, অথচ নিজের দুর্ভাবনায় আজ সকাল হইতে সে এতই ব্যস্ত যে, কাকাদের বাড়ী গিয়া একবার দেখা করিয়া আসিতে পর্য্যন্ত পারে নাই।

কেশব বলিল—কে ডাকে ? কে, বিদ্যুৎ ? কি বলচ মা ? তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

হারাণ চক্রবর্ত্তীর মেয়েটির নাম বিদ্যুৎ। খুব সুন্দরী না হইলেও বিদ্যুতের রূপের চটক আছে সন্দেহ নাই, বয়স এই সবে উনিশ।

বিদ্যুৎ ম্লানমুখে গলার সুমিষ্ট স্বরে অনেকখানি খাটী মেয়েলী সহানুভূতি জানাইয়া বলিল—কাকা, খোকামণি না কি নেই ? আমি সব শুনেছি সকালে। কিন্তু কোথাও বেরুতে পারিনি সকাল থেকে, একবার ভেবেছিলুম যাব।

কেশব উত্তর দিতে গিয়া চাহিয়া দেখে বিদ্যুতের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। এতক্ষণ এই একটি লোকের নিকট হইতে সে সত্যকার সহানুভূতি পাইল। কেশব একবার গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—তা যা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে—যা। ও ঘোঁটের কথা শুনে আর কি হবে, তুই বাড়ী যা। কুমার চক্কোত্তি রাগারাগি করে চলে গিয়েচে, ওকে সবাই গিয়েচে ফিরিয়ে আনতে। তোর ওপর খুব রাগ কুমারের। তবে ও তো আর সমাজের কর্ত্তা নয়, ওর রাগে কি-ই বা এসে যাবে !

—কি বলছিল ওরা ?

—তুই নাকি এখনও গাঙ্গুলী বাড়ী যাস্, তোকে ওদের টিউবকলে জল তুলতে যেতে দেখেছে কুমারের স্ত্রী। কোন্‌দিন নাকি ওদের নারকোল তলায়—ইয়ে, সুশীলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলি, তাও কুমারের স্ত্রী দেখেছে—এই সব কথা।

বিদ্যুৎ বলিল—আমি যাইনি কাকা, সেবার সেই বারণ করে দেওয়ার পর থেকে আর কখনো যাইনি।

এ কথাটি বিদ্যুৎ মিথ্যা বলিল। সুশীলের সঙ্গে তার ছেলেবেলা হইতেই আলাপ। সুশীল যখন কলেজে পড়িত, তখন বিদ্যুৎ বার তের বছরের মেয়ে। সুশীলদা'র দেখা পাইলে তখন হইতেই সে আর কোথাও যাইতে চায় না।

সুশীলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তাহারা বৈদিক আর সুশীলেরা রাঢ়ীশ্রেণী। বিদ্যুতের বিবাহ হইয়াছিল পাশের গ্রামের শ্রীগোপাল আচার্য্যের সঙ্গে। বিদ্যুৎ বিধবা হইয়াছে বিবাহের দু' বছর পরেই। শ্বশুরবাড়ী মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু বেশির ভাগ এখানেই থাকে। সুশীলের সঙ্গে তাহার ছেলেবেলার মাখামাখি লইয়া একটা অপবাদ গ্রামের মাঝে রটিয়াছিল। এই অপবাদের দরুণই তাহারা এখন গ্রামে একঘরে হইয়া আছে, এ বাড়ীতে তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই।

ইতিমধ্যে ঝুমুর গানের দল আসিয়া হাজির হইল। সামিয়ানার একধারে ইহাদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা, দল আসিতেই সেখানে গিয়া জায়গা দখল করিয়া বসিবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইয়া দিল। কেশব ছুটিয়া গেল গোলমাল থামাইতে। দলের অধিকারী বলিল—ও সরকার মশাই, আমাদের একটু তামাক-টামাকের যোগাড় করে দিন, আর দু-পাঁচ-খিলি পান। রোদ্দুরে বামুনগাঁতির বিল পার হতে যা নাকালটা হয়েচে সবাই মিলে!

বেলা বারোটার সময় কেশব একবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। স্ত্রীর জন্য তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আহা, বেচারী এ বাড়ী আসিয়াছে তো,—না খালি বাড়ীতে একা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে?

না, দেখিয়া আশ্বস্ত হইল স্ত্রী আসিয়াছে ও ইঁদারার পাড়ে একরাশ পুরোনো বাসন ঝিয়ের সঙ্গে বসিয়া মাজিতেছে, তাহাদের আজ মরণাশৌচ, বাহিরের কাজকর্ম্ম ছাড়া অন্য কাজ করিবার জো নাই।

মেজবাবুর যে-খোকার অন্নপ্রাশন, দালানে খাটের উপর সুন্দর বিছানাতে চারিদিকে উঁচু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া তাহাকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ন' মাসের হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি শিশু, গায়ে একগা গহনা, সামনের গদীতে একখানা থালে যে সব বিভিন্ন অলঙ্কার আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবে দিয়াছে, সেগুলি সাজানো। তিন-চার ছড়া হার, সোনার ঝিনুক, পদক, তাগা, বালা, রূপার কাজললতা। চারিধারে ঘিরিয়া মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে, ইহারা কেউ কেউ এ গ্রামের বৌ-ঝি, কিন্তু বেশির ভাগই নবাগতা কুটুম্বিনীর দল। সকাল হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত আপ্-ডাউন যে তিনখানা ট্রেন যায়, প্রত্যেক ট্রেনের সময়ে দু' তিনখানা

ট্যাক্সি বোঝাই হইয়া ইহারা কোন দল কলিকাতা হইতে, কোন দল বা রাণাঘাট, কি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, কি শান্তিপুর হইতে আসিয়াছে। শহরের মেয়ে, কি সব গহনা ও শাড়ির বাহার, কি রূপ, কি মুখশ্রী, যেন এক একজন এক একখানি ছবি !

খোকাটি কেমন চমৎকার হাসিতেছে। কেমন সুন্দর মানাইয়াছে ওই বেগুনী রংয়ের জামাটাতে। তাহার খোকারও অন্নপ্রাশন দিবার কথা ছিল এই মাসে।

গরীবের সংসার, খোকার যখন চার মাস বয়স, তখন হইতে ধীরে ধীরে সব যোগাড় করা হইতেছিল। কাপালীরা মুসুরি ও ছোলা দিয়াছিল প্রায় আধ মন, নাড়ুর চালের জন্য ধান যোগাড় করা হইয়াছিল, সাত-আটখানা খেজুরের গুড় দিয়াছিল বাগদীপাড়ার সকলে মিলিয়া। বৃদ্ধ ভুবন মণ্ডল বলিয়াছিল—মুহুরী মশায়, যত তরিতরকারি দরকার হবে, আমার ক্ষেত থেকে নিয়ে যাবেন খোকার ভাতের সময়। এক পয়সা দিতে হবে না। কেবল বামুন-বাড়ীর দুটো পেরসাদ যেন পাই। শূদ্র-ভদ্র সবাই খোকাকে ভালবাসিত।

মেজবাবুর খোকার গায়ের রং অনেক কালো তার খোকার তুলনায়। মেজবাবু নিজে কালো, খোকার খুব ফরসা হইবার কথাও নয়। সুতরাং এদের মানানো শুধু জামায় গহনায়। তাহার খোকা গরীবের ঘরে আসিয়াছিল। এক জোড়া রূপার মল ছাড়া আর কোন-কিছু খোকার গায়ে ওঠে নাই।

আজ শেষ রাত্রে খোকার সেই হেঁচ্‌কীর কষ্টে কাতর কচি মুখখানি, অবাক্ দৃষ্টি, নিষ্পাপ, কাচের চোখের মতো নির্মল ব্যথাক্লিষ্ট চোখদুটি ··আহা, মানিক রে !

—ও কেশব, বলি গাদ্দেখ্যে এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ যে ! বেশ লোক যা হোক। ব্রাহ্মণদের পাতা করবার সময় হ'ল, সামিয়ানা খাটাবার ব্যবস্থা কর গে। আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি চোদ্দভুবন, আর তুমি এখানে, বেশ নম্বরী নোটখানি বাবা ! পা চালিয়ে দেখ গিয়ে—

নবীন সরকার।

কিন্তু, নবীন সরকার তো জানে না···

সে কি একবার বলিবে ?···ও গোমস্তা মশায়, এই আমার খোকা আজ সকালে···ও রকম ক'রে আমায় ডাকবেন না···আমার মনটা আজ ভাল না···

দলে দলে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে নানা গ্রাম হইতে। এগারোখানা গাঁ লইয়া সমাজ, সমাজের সকলেই নিমন্ত্রিত। বড় বৈঠকখানায় লোক ধরিল না, শেষে লিচু-তলায় প্রকাণ্ড শতরঞ্চ পাতিয়া দেওয়া হইল। আসনের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেউলে সরাবপুরের বরদা বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—একটা কথা আমার আছে। এ গাঁয়ে হারাণ চক্কোত্তি সমাজে একঘরে. তাদের বাড়ীর কারুর কি নেমন্তন্ন হয়েচে আজ কাজের বাড়ীতে ? যদি হয়ে থাকে বা তাদের বাড়ীর কেউ যদি এ বাড়ীতে আজ এসে থাকেন, তবে আমি অন্ততঃ দেউলে সরাবপুরের ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে বলচি যে. আমরা এখানে কেউ জলস্পর্শ করব না।

আরও দু' পাঁচখানা গ্রামের লোকেরা সমস্বরে এ কথা সমর্থন করিল। অনেকে আবার

হারাণ চক্রবর্ত্তীর আসল ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিল। ছেলে-ছোকরার দল না বুঝিয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

এ বাড়ীর বৃদ্ধ কর্তা সান্ন্যাল মশায়ের ডাক পড়িল। তিনি কাজের বাড়ীতে কোথাও ব্যস্ত ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ গাঁয়ের সমাজ বড় গোলমেলে, তাহা তিনি জানিতেন। পান হইতে চুন খসিলেই এই তিনশো নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এখনই হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিবে, খাইব না বলিয়া শুভকার্য্য পণ্ড করিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইবে। প্রাচীন, বিচক্ষণ ব্যক্তি সব, কিন্তু সামাজিক ঘোঁটের ব্যাপারে ইহাদের না আছে বিচার-বুদ্ধি, না আছে কাণ্ডজ্ঞান।

তবুও সান্ন্যাল মশায় সভার মধ্যে খুব সাহসের পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আপনাদের সকলকেই জানাচ্চি যে হারাণ চক্কোত্তির বাড়ীর একটি প্রাণীও আমার বাড়ী নিমন্ত্রিত নয়, তাদের কেউ এ বাড়ীতে আসেনও নি! কিন্তু, আমার আজ অনুরোধ, এই সভাতেই সে ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া দরকার। হারাণ আমার প্রতিবেশী, আমার বাড়ীর পাশেই তার বাড়ী। তার ছেলে-মেয়ে আমার নাতি-নাতনীর বয়সী। আজ আমার বাড়ীর কাজ, আর তারা মুখ চুন করে বাড়ী ব'সে থাকবে, এ বাড়ীতে আসতে পারবে না, খুদ-কুঁড়ো যা দুটো রান্না হয়েচে তা মুখে দিতে পারবে না, এতে আমার মন ভালো নেয় না। আপনারা বিচার করুন তার কি দোষ—আমাদের গাঁয়ের লোক মিলে আজ সকালে একটা মিটিং আমরা এ নিয়ে করেছিলাম, কিন্তু সকলে উপস্থিত না হ'লে ব্যাপারটা উত্থাপন করা ভালো নয় ব'লে আমরা বন্ধ রেখেছি। আমার যদি মত শোনেন, আমি বলি হারাণ চক্কোত্তির মেয়ে নির্দ্দোষ, তাকে সমাজে নিতে কোন দোষ নেই।

ইহার পর ঘণ্টা-দুই-ব্যাপী তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হইল, আজ সকাল বেলার মতোই। এই সভায় সবাই বক্তা, শ্রোতা কেহ নাই। চড়া গলায় সকলেই কথা বলে, কথার মধ্যে যুক্তি-তর্কের বালাই নাই। দেখা গেল, এ গাঁয়ের হারাণ চক্রবর্ত্তীর ব্যাপার লইয়া দুটো দল, একদল তাহাকে ও তাহার মেয়েকে একঘরে করিয়া রাখিবার পক্ষে মত দিল। অপর পক্ষ ইহার বিরুদ্ধে। হারাণ চক্রবর্ত্তীর ডাক পড়িল, তাঁর বয়স যদিও খুব বেশি নয়, কিন্তু কানে একেবারে শুনিতে পান না। টাইফয়েড হইয়া অল্প বয়স হইতেই কান দুটি গিয়াছে। তিনি হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিলেন, তাঁহার মেয়েকে তিনি ভালো রকমই জানেন, তার স্বভাব-চরিত্র সৎ। যে ছেলেটিকে লইয়া এ কথা উঠিয়াছে, গাঙ্গুলীবাড়ীর সেই ছেলেটি কলেজের পাস, উঁচু নজরে কাহারও দিকে চায় না। ছেলেবেলা হইতেই বিদ্যুতের সঙ্গে তার ভাইবোনের মতো মেশামেশি, এর মধ্যে কেউ যে কিছু দোষ ধরিতে পারে—ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে বিরুদ্ধ দলের কর্তা কুমার চক্রবর্ত্তী রাগিয়া উঠিয়া যাহা বলিলেন, তাহ আমাদের মনে আছে, কিন্তু সে সব কথা পাড়াগাঁয়ের দলাদলি-সভায় উচ্চারিত হইতে পারিলেও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়।

অনেক করিয়াও হারাণ চক্রবর্ত্তীর হিতাকাঙ্ক্ষী দল কিছু করিতে পারিল না। কুমার

চক্রবর্তীর দলই প্রবল হইল। আসলে বিদ্যুৎ যে খুব ভালো মেয়ে, বিদ্যুতের মনটি বড় নরম, পাড়ার আপদ-বিপদে ডাকিলেই ছুটিয়া আসে এবং বুক দিয়া পড়িয়া উপকার করে, তাহার উপর সে ছেলেমানুষ, এখনও তত বুঝিবার বয়স হয় নাই, বৃদ্ধের দলের আসল যুক্তি এই। কিন্তু, এ সত্য কথা সভায় দাঁড়াইয়া বলা যায় না।

কুমার চক্রবর্তীর দলের লোকেরা বলিল—সেবার সুরেনের মেয়ের বিয়ের সময় আমরা তো ব'লে দিয়েছিলাম, বিদ্যুৎ সুশীলদের বাড়ী যাতায়াত বা সুশীলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করুক। এক বছর আমরা যদি দেখি, সে আমাদের কথা মেনে চলেচে, তবে আমরা তাদের দলে তুলে নেব—কিন্তু সে কি তা শুনেচে?

হারাণ চক্রবর্তী বলিলেন—কৈ কে দেখেচে—বলুক কবে আমার মেয়ে এই এক বছরের মধ্যে—

কিন্তু এমন ক্ষেত্রে পাড়াগাঁয়ে দেখিবার লোকের অভাব হয় না।

দেখিয়াছে বৈ কি! বহু লোক দেখিয়াছে। পরের বাড়ী কোথায় কি হইতেছে দেখিবার জন্য যাহারা ওত পাতিয়া থাকে, তাদের চোখে অত সহজে ধূলা দেওয়া চলে না।

অবশেষে কে বলিল—আচ্ছা, কাউকে দিয়ে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হোক না—সে যদি আমাদের সামনে স্বীকার করে, সে ওখানে যাতায়াত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাট স্বীকার করে, কথা দেয় যে, আর কখনও এ কাজ সে করবে না, তবে না হয়—

বিদ্যুৎ পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে চোখ দিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল।

কেশব গিয়া বলিল—মা আছিস? রাজী হয়ে যা না, ওরা যা যা বলচে। কেন মিছে মিছে—

বিদ্যুৎ কাঁদিয়া বলিল—আপনি ওদের বলুন আমি সব তাতে রাজী আছি কাকা।

সভার মধ্যে বাপকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া লজ্জায়, দুঃখে সে মরিয়া যাইতেছিল···তার জন্যই তার নিরীহ পিতার এ দুর্দ্দশা···তা ছাড়া তার দাদা শ্রীগোপালের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আজ পাঁচ ছ' দিন হইতে যজ্ঞিবাড়ীর নিমন্ত্রণ খাইবার লোভে অধীর হইয়া আছে, ছেলেমানুষ তারা কি বোঝে—অথচ আজ তাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই, এবাড়ীতে আসিতে না পাইয়া মুখ চুন করিয়া বেড়াইতেছে—ইহা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছে।

ছোট মেয়ে সুবু তো কেবলই জিজ্ঞাসা করিতেছে—পিছিমা, ওদের বালি থেকে ডাকতে আছবে কখন? পায়েছ খাব, ছন্দেছ খাব, না পিছি? আমি যাব, ওবু যাবে, দাদা যাবে, মা যাবে—

তার মা ধমক দিয়া থামাইয়া রাখিয়াছে—থাম্, এখন চুপ কর্। যখন যাবি তখন যাবি। তা না এখন থেকে—এখন বরং একটু ঘুমো দিকি। ঘুমিয়ে উঠে আমরা সেই বিকেলে তখন সবাই যাব।

ঘরে বাহিরে বিদ্যুতের আর মুখ দেখাইবার জো নাই।

কিন্তু, কেশবের কথায় কি হইবে। এক আধটি বাজে লোকের প্রস্তাবেই বা কি হইবে। বরদা বাঁড়ুয্যে ও কুমার চক্রবর্তী এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। একবার যে শর্ত্ত ভঙ্গ

করিয়াছে, তাহার সঙ্গে আর শর্ত্ত করিয়া ফল নাই। আর এ শর্ত্তের ব্যাপার নয়। একটা স্ত্রীলোককে সামাজিক শাসন করা হইতেছে ইহার মধ্যে শর্ত্তই বা কিসের? মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া যে গ্রাম হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় নাই এতদিন, ইহাই যথেষ্ট।

সুতরাং হারাণ চক্রবর্ত্তী যেমন একঘরে ছিলেন, তেমনই রহিয়া গেলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজনের পালা। কেশবের মরণাশৌচ, সে পরিবেশন করিবে না, ভিখারী বিদায়ের ভার পড়িল তার উপর। দু'তিন দফা ব্রাহ্মণ খাওয়ান ও ভিখারী বিদায় করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে শূদ্রভোজন, সে চলিল রাত দশটা পর্য্যন্ত।

কেশব সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন খাইতে বসিল, তখন রাত এগারটা। আয়োজন ভালই হইয়াছিল, কিন্তু এত রাত্রে জিনিসপত্র বেশি কিছু ছিল না। কেবল দই ও মিষ্টি এবং দু'তিন রকমের টক তরকারি দিয়া কেশব পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুই জনের আহার একা করিল। পরে স্ত্রীকে লইয়া অন্ধকারেই নিজের বাড়ী রওনা হইল।

কেশবের স্ত্রীও খুব খাইয়াছে। কেশবের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—তা গিন্নীর বড় মেয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালে। নিজের হাতে আমার পাতে সন্দেশ দিয়ে গেল। খুব যত্ন করেচে। রান্নাবান্না কি চমৎকার হয়েচে, না?

কেশব বলিল—তা বড়লোকের ব্যাপার, চমৎকার হবে না? নয় তো এমন অসময়ে কপি কোথা থেকে এই পাড়াগাঁয়ে আসে বল দিকি? পেয়েছিলে কপির তরকারি?

—তা আর পাইনি? দু' দুবার দিয়েচে আমার পাতে। হ্যাঁ গা, এখন কপি কোত্থেকে আনালে? কলকাতায় কি বারমাস কপি মেলে?

বাড়ীর উঠানে তুলসীতলায় একটা মাটির প্রদীপ তখনও টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছে। কেশবের স্ত্রী বলিল—ও বাড়ীর ছোট-বৌ জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েচে, আহা বড় ভালো মেয়ে! আজ সকালে কেঁদে একেবারে আকুল।

সকালে যে ভাবে ইহারা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ঘরবাড়ী সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। কারো সাড়া-শব্দ নাই,—নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। বাড়িখানা খাঁ খাঁ করিতেছে। আশে পাশে ঘন অন্ধকার, কেবল তুলসীতলায় ওই মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলোটুকু ছাড়া।

কেশব শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে কেশব স্বপ্ন দেখিতেছিল, বিদ্যুৎ আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিতেছে—কাকা, আজই বুঝি···একবার ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু যে দুর্ভাবনা আমার ওপর দিয়ে আজ সারাদিন···

বাহিরে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল—সর্ব্বনাশ! ভয়ানক বৃষ্টি আসিয়াছে! খোকা, কচি ছেলে, নিউমোনিয়া রোগী, বাঁশতলায় তার ঠাণ্ডা লাগিতেছে যে!···পরক্ষণেই ঘুমের ঘোরটুকু ছুটিয়া যাইতেই নিজের ভুল বুঝিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভাবিল—আহা, যখন পুঁতি, তখনও ওর গা গরম, বেশ গরম ছিল···হঠাৎ দেখিল সে কাঁদিতেছে, অঝোর ধারে কাঁদিতেছে···বাহিরে ঐ বৃষ্টিধারার মতো অঝোর ধারে···বার বার তার মনে হইতে লাগিল—তখনও ওর গা গরম ছিল···বেশ গরম ছিল···

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই। রাস্তায় পুরোনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্ত্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ীর গায়ে টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—তারানাথ জ্যোতির্ব্বিনোদ—

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়।
গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি।
আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন।
বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ী।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত, তার এই বাড়ী?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষী-মশায় বাড়ী আছেন?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখচি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ ক'রে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েচে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে।

এবার ডেকে নিয়ে যাবে। আমার কথা ঠিক হইল একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথায় চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ত্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না, আপনার হ'ল কেমন ক'রে, এরকম তো দেখি নি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্ত্তার কোন অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্ত্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল—বর্ত্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মনিব্যাগটি খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফাট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মারোয়াড়ীর মোটর গাড়ীর ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ীর গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ত্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই ?

আমার মতো গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাই নি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও ? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুল দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে। ভালো ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।' তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন - পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিক-শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর তো বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেচে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েচে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর ততক্ষণ কার্য্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপ্‌নটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখচি আশ্চর্য্য হয়ে পড়লে, তবুও তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখ নি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চর্চ্চা যে

না করেচি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেচ। সালফিউরিক্ এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তন্ত্রচর্চ্চার শক্তি, ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেচি।

কি হ'ল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ী এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস্। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম—চন্দ্রদর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরনের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ীর পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামত নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম, —সব দিন ঘটে উঠ্‌ত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাস-তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিক্‌লিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়ীতে আর মন টেকে না, ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয় নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলেচে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু-হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু তো কতই দেখি। চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ী কোথায়?

আমি বল্‌লাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর? তারপর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেচ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ী-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেচি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শুনি নি! সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে

বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি ক'রে! খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েচে কোন্‌কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরোনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্যালদেরই কোন পূর্ব্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন?

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখচি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধপিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলেমানুষি কথার জন্য। সত্যি বলচি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারি নি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষে হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ী থেকে বেরিয়েচিস্ কেন? ধর্ম্মকর্ম্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বল্‌লেন—বাড়ী ফিরে যা, সংসারধর্ম্ম করগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেচি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস্ নি, ছাড়তে পারবিও নে। তুই ছেলেমানুষ, নির্ব্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয় নি। যা বাড়ী যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্ নে।

কথা শেষ ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি ক'রে জানলেন বলবেন না? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূর গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন—কেন আসছিস্?

—আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্ব্বাদ করচি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েচেন বা কোন্‌দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে

খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোন হদিস মেলাতে পারলাম না। সান্ন্যালদের বাড়ীর ছেলে-ছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ী এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেচি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক-পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি। অন্ততঃ দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন ?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল। বড় বড কিস্তি চলত। কোন্ নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে ব'লে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম—খেয়াঘাট ?

তিনি অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেচি, বাবার মুখে শুনেচি, তা ছাড়া আমাদের পুরোনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল ? বই-টই লিখচ না কি ?

ওদের কাছে কোন কথা বলি নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ী থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরুই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেচে তোকে এখানে আসতে ?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন্, অনেক দূর থেকে এসেচি, দয়া করুন আমার ওপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি—

আঙ্গুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জ্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্ত্তি দেখে, কি জানি মারবে টারবে নাকি—পাগল মানুষকে

বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগল বললে—আবার কেন এলি ?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস, তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখচি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখ আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেচে না রে ? তা রাগ করিস্‌ নে, কাল যাস্‌ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ও মা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে, পাগলী আমায় দেখে মারমূর্ত্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া-কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরিয়া হয়েচি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে ? তুমিই তো আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে। তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেচে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানচে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্‌ এখানে।

আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মতো—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যে উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস্‌ বল্‌ ত ? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েচে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি ? আমার এখানে যখন এসেচিস্‌, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার। বল কি খাবি ?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেচি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধ-বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেচি, সে আমার ততটা আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয় নি। বললাম—খাব অমৃতি, জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্ত্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য্য ব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি ত অবাক্! ইতস্ততঃ করচি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি এক রকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখচি পুরো পাগল, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েচি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেচে। কি বোকামি করেচি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েচে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললে—খেলি রাবড়ি, মর্ত্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেচে শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বলচে—রাগ করিস্ নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্য্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম?

যা হোক্ জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাদু করলে না কি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্ত্তি ভারী প্রসন্ন। বললে—আবার এসেচিস্ দেখচি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে? দিনে অপমান ক'রে বিদেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ রকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে - আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম ব'লে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা দিবি। ভোর-রাত পর্য্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যা হবেই, প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে পার। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্তে মরবে কেন ?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে। বললাম—রাগ করচ কেন ? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা ? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে ?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে! ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেচিস্ কেন রে, ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে হৌসে চাকরি কর্ গিয়ে—বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবচ না। আমি যখন ফাঁসি যাব, তখন ঠেকাবে কে ?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেচি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেচি, তন্ত্রের কথা শুনেচি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী ব'লে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম, তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেলা গালাগাল দিয়েচি, কিছু মনে করিস্ নে। ভালোই হয়েচে, তুই সাধনা করতে চাস্ নি। ও সব নিম্ন-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয় ? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েচ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক্ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনচি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই

কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দুচার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েচে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা!

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া ব'লে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মতো মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে, তাই রাগ করিস্।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহ'লে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের কোন লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেচে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েচি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েচি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েচে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই কি না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল্ না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েচে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢ'লে পড়ে আর কি। বললে—এস না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব'লে মনে হ'ল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি, বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস, ব'স।

বললাম—তুমি ও-রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকচে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলচি, আমায় কোন ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা ব'লে ডেকেচি।

পাগলী বললে—শোন তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর্। কিন্তু যা ব'লে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেচি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোন কালেই, তবুও কখনও মড়ার উপরে ব'সে সাধনা করব এ-কল্পনাও করি নি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েচি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েচে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েচে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন্ ঘাট থেকে ভেসে এসেচে বোধ হয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে

গিয়েচে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? ভয় পেয়েচ কি মরেচ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েচে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোন তফাত নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরচিস্ কেন, ও আপদ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েচে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখচি। গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখন আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জ্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিগবিদিক্ লুকিয়েচে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একটা টাটকা মড়ার ওপর ব'সে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল শ্মশানের নিচে নদীজল থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসচে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করচি। ভাবচি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব কবুরা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই বল! হরি হরি! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষও হয়নি—পরক্ষণে আমার চারপাশে মেয়ে-গলায় কারা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবাই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।···আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেক-গুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েচে, কোনটার মাথার খুলি ফুটো, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধ'রে দাঁড় করিয়ে রেখেচে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেচে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে।' অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? যা হোক্, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেচি অনেক সাধনা ক'রেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি···বললাম—আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেচেন···আমার জীবন ধন্য হ'ল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করচ কেন?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েচে, তেমনি করচি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। যখন দেখা দিয়েচি তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা···তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর ক'রে বললাম—সাধনা ক'রে আপনাদের আনতে হয় শুনেচি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমার মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেচি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিযেচে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েচি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।···যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেচি কেন জিজ্ঞেস করচ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোননি তন্ত্রে? পাষণ্ড-দলনের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘ পথে সাড়া জেগেচে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেচি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে···অত ভয় কিসের? আমি না তোকে লাথি মেরেচি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেচি। তোকে পরীক্ষা না ক'রে কি সাধনার নিয়ম ব'লে দিয়েচি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েচি, বলে কি?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্ব্বশরীর কেমন হয়ে গেল।

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাত নেই! একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখচিস্ কি?

আমি কথার কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ ক'রে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলীও না কি?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কালগুলো হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকে বেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালের হাড়, কোনটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলচে- এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ!

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মতো, আর সেই ছিদ্রপথে

যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুথালু বেশে নেমে আসচে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা-মেঘে ছেয়ে গেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়চে সেই গভীর রাত্রে! শেয়ালের চিৎকার ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসচে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জলন্ত দু-চোখ ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে কি ভীষণ ক্রুর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েচে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেচে ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে! ছাপ্পান্ন বছর···কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পুবে ফরসা হয়ে এসেচে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী ব'সে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসচে···সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েচে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করচে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেচি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস্ না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা। তুই তার জানিস্ কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধস্বরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকটমূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেচি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস্, তিনি

মহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন ?

তারপরে সে হঠাৎ হি হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েচি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই ? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে এলি ? এই তো সবে সন্ধ্যে— !

—অ্যাঁ !

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেচি ঠিক বিকেল ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক,—সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে ? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে ?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম্ম নয়, তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন ? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন ?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্ব্বজন্মও এমনি কেটেচে—এ-জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাই নি, ভয়েই যায় নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না সে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত- তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝব ? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও ? এস চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

ডাকগাড়ী

এক এক সময় রাধা ভাবে কোথাও বেড়াইয়া আসিতে পারিলে ভালো হইত। আজ ছ' বছরের মধ্যে সে একখানা দুর্গা প্রতিমার মুখ পর্য্যন্ত দেখে নাই। এ গাঁয়ে সবাই গরীব, দুর্গোৎসব তো দূরের কথা, তেমন একটা জাঁকের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পর্য্যন্ত হয় না। অবশ্য এ গাঁয়েরই সে মেয়ে, এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ হইয়াছে, বাল্যে সে ভাবিত সর্ব্বত্রই বুঝি এই রকম ব্যাপার। কিন্তু বিয়ের পর বাসুদেবপুর গিয়া রাধা প্রথম বুঝিল, তাদের গাঁ অতি হীন অবস্থার গাঁ। গরীব আর বড়লোকে তফাত কি, বুঝিল। বাসুদেবপুর এমন কিছু শহর বাজার নয়, গঙ্গার ধারে একখানা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম এই পর্য্যন্ত। সেখানে মুস্তফিরা বড় লোক, এমন পূজা নাই যে, তাদের বাড়ী হইত না—দুর্গোৎসব বল, শ্যামা পূজা বল, জগদ্ধাত্রী পূজা বল, এমন কি রথ পর্য্যন্ত।

বছর তিনেক বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল—সব দিক দিয়াই।

তারপর তাহার স্বামী মারা গেল যকৃতের রোগে। শাশুড়ীর সঙ্গে রাধার বনিল না, দিনকতক উভয়ের মধ্যে যে সব বাক্যাবলীর আদান-প্রদান চলিল, তাহাকে ঠিক সদয় ও ভদ্রবাক্য বলা চলে না। রাধা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইল, তাহার বাবা এত দরিদ্র আজও হন নাই যে, তাহাকে একবেলা এক মুষ্টি আতপ চালের ভাত দিয়া পুষিতে পারিবেন না। ফলে একদিন একটি মাত্র পুঁটুলি সম্বল করিয়া রাধা তাহার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী আসিয়া পৌছিল। ভাইটিকে সে-ই পত্র লিখিয়া আনিয়াছিল। তাহার তোরঙ্গ ও ক্যাশবাক্স শাশুড়ী আটকাইয়া রাখিলেন।

ছ' বছর তারপর কাটিয়া গিয়াছে।

সেই যে বিধবা হইয়া আসিয়া বাপের বাড়ী ঢুকিয়াছে, আর সে গ্রাম হইতে বাহির হয় নাই।

এই ছ' বছরে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল তাহাদের সংসারে। বাবা লেখাপড়া ভালো জানেন না, বিশ্বাসদের পাটের আড়তে কাজ করিয়া সামান্য কয়েকটি টাকা পাইতেন। বাবার সে চাকুরিটা গেল। রাধার ছোট একটা ভাই গেল মারা। বাবা বাত হইয়া কিছুদিন শয্যাগত থাকিলেন। বাবার সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে সামান্য কথায় ঝগড়া বিবাদ হইতে লাগিল। জমিদার নালিশ করিয়া তাহাদের বড় জমা ক্রোক করিয়া লইল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে দিনগুলি, সেই সংসারের কাজ, সেই গরুর সেবা, সেই রাঁধাবাড়া বাবার হাতে পায়ে তেল মালিশ করা, মায়ের দোক্তার পাতা পুড়াইয়া তামাক তৈরি করা, কলের মতো একটানা একঘেয়ে ভাবে চলিতেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

আজ সকালে ডোবার ধারে বাসন মাজিতে বসিয়া তাই সে ভাবিতেছিল, একবার কোথাও বেড়াইয়া আসিবে।

ছোট ডোবাটা। চারি পাড়ে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঝুপসি অন্ধকার হইয়া আছে। দুপুর বেলাতেও রোদ পড়ে না। এইটুকু তো ডোবা, এর আবার চারিদিকে চারিটা ঘাট। বাঁধান নয়, কাঁচা ঘাট। দক্ষিণ দিকের জামতলায় জেলে পাড়ার ঘাট, পশ্চিম পাড়ের বেলতলায় নাপিতদের ঘাট, পূবদিকে বামুন-পাড়ার ঘাট, উত্তর পাড়ে যাদের জমিতে ডোবাটা তাঁদের ঘাট। তাঁরাও ব্রাহ্মণ, নিজেদের জন্যে একটা ঘাট আলাদা রাখিয়াছেন, কাহাকেও সে ঘাটে যাইতে দেন না।

সেই বাড়ীরই মেয়ে সুবি, ভালো নাম সুবিনীতা—তাদের ঘাটে চায়ের পাত্র ধুইতে নামিল। গ্রামের মধ্যে ওরা ওরই মধ্যে একটু শৌখীন, চা খাওয়ার অভ্যাস রাখে, সুবি কিছুদিন কলিকাতায় কাকার বাসায় থাকিয়া পড়িত। ক্লাস এইট্ পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়া আজ বছর খানেক বাড়িতে বসিয়া আছে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই বেশি, কারণ গ্রামের মধ্যে সে-ই একমাত্র মেয়ে, যে স্কুলের মুখ দেখিয়াছে—তাও আবার কলিকাতায়। সুঁবি দেখিতে মোটামুটি ভালোই, রং উজ্জ্বল শ্যাম, বড় বড় চোখ, একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সর্ব্বদা ফিটফাট হইয়া থাকে, একটু চালবাজ। যোল বছর বয়েস, বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। রাধা সুবি বলিতে অজ্ঞান, কিন্তু সুবি তাকে বড় একটা আমল দেয় না। গরীব ঘরের মেয়ে, বাইশ তেইশ বছর বয়েস, তার ওপরে বিধবা এবং লেখাপড়াও তেমন কিছু জানে না—এ অবস্থায় রাধা কি করিয়া আশা করিতে পারে যে, সে কলিকাতার স্কুলের ক্লাস এইট্ পর্য্যন্ত পড়া মেয়ে সুবির অন্তরঙ্গ মণ্ডলীতে স্থান পাইবে। তা সে পারে না—বা সে আশা করা তার উচিতও নয়।

সুবিকে জলে নামিতে দেখিয়া রাধার মুখ ঠিক আগ্রহে ও আশায় উজ্জ্বল দেখাইল।

সে বলিল—ও সুবি ভাই, তোদের চা খাওয়া হয়ে গেল?

সুবি কচুর ঝাড়ের গোড়া হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া জল বুলাইতে বুলাইতে বলিল—হয় নি। মার তো আজ সোমবার, মা খাবে না—শুধু আমি আর যাদু। তাড়াতাড়ি নেই, একবার গিয়ে জল চড়াব।

সুবি নিজে থেকে কোনো কথা বড় একটা রাধার সঙ্গে বলে না—তবে রাধা যে কথা জিজ্ঞাসা করে, ভদ্রভাবে তার উত্তর দেয়।

রাধা জানে সুবি সাংসারিক কথাবার্ত্তা বলিতে ভালবাসে না। পড়াশুনা, গান, ফিল্ম, কবিতা প্রভৃতি তাহার কাথাবার্ত্তার বিষয়। কলিকাতায় থাকিয়া তাহার রুচি বদলাইয়া গিয়াছে।

রাধা তাহার মন যোগাইয়া চলিবার চেষ্টায় বলিল—কাল সন্ধ্যেবেলা তুই এলিনে ভাই, আমি কতক্ষণ বসে বসে একটা কবিতা মুখে মুখে বানালাম। তোকে শোনাব আজ দুপুরে।

—কি কবিতা?

—আসিস, এখন না। শোনাব। মুখস্থ নেই, ভাই।

স্থবি আর কোন আগ্রহ দেখাইল না। শুধু বলিল—দুপুরে মা কাঁথা সেলাই করবে, আমাকে কাছে বসে স্থঁচে স্থতো পরাতে হবে। আমার যাওয়া তো হবে না।

রাধা বলিল সেই গানটা একটু গা না স্থবি?

স্থবি চায়ের পাত্রগুলি হাতে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত অবস্থায় বলিল—এখন সময় নেই। অনেক কাজ। চলি।

রাধা অতি করুণ মিনতির স্থরে বলিল—গা না ভাই, দুটো লাইন গা। বলচি এত করে'—

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি পাড়াগাঁয়ের মেয়ের তুলনায় স্থবি গান গাহিতে পারে মন্দ নয়। কলিকাতায় থাকিবার সময় নিধুদা'র কাছে সে অনেক গান শিখিয়াছিল। নিধুদা তার কাকীমার পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে। কলেজে পড়ে, বেশ গান গাহিতে পারে, চেহারাও ভালো। স্থবিকে দিনকতক সে গান শিখাইতে ঘন ঘন আসিত।

স্থবি গুন্ গুন্ করিয়া মাত্র দু' কলি গাহিল—

যৌবন সরসী-নীরে
মিলন শতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল!

ঠিক এই সময় নাপিতদের ঘাটে নাপিত-বৌ এক কাঁড়ি বাসন লইয়া মাজিতে আসিল। নাপিত-বৌ শ্যামবর্ণ, বয়স উনিশ কুড়ি, খুব স্থন্দর নিটোল গড়ন, স্বাস্থ্যবতী, মুখশ্রীর মধ্যে একটা স্থলভ ও সহজ সৌন্দর্য্য আছে—অর্থাৎ যে শ্রীটা এই বয়সেই থাকে, পাঁচ বছর পরে যাহার আর বিশেষ কিছু অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু এখন যখন সেটা আছে, তখন খুব জমকালো ভাবেই আসর মাতাইয়া রাখিয়াছে।

নাপিত-বৌ স্থবিকে প্রায় পূজা করিয়া থাকে মনে মনে। তাহার জীবনে এমন মেয়ে সে দেখে নাই। অমন রূপ, অমন কথাবার্ত্তা, অমন লেখাপড়া, অমন গান—সকল দিকেই স্থবি নাপিত-বৌয়ের মন হরণ করিয়া লইয়াছে। যে পাড়াগাঁয়ে নাপিত-বৌয়ের বাপের বাড়ী, সে গাঁয়ে এমন একটি মেয়ের কল্পনাও করা শক্ত। ইহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের স্থযোগ পাইয়া সে ধন্য হইয়া গিয়াছে। নাপিত-বৌ আঁচলের চাবিটা শক্ত করিয়া গেরো দিতে দিতে স্থবির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল।

বলিল—ভারি চমৎকার গলা দিদিমণি আপনার। কখনো এমন শুনিনি, কি গানটা দিদিমণি?

স্থবি পদগুলি আবৃত্তি করিয়া গানটি বলিয়া গেল।

নাপিত-বৌ গানের ভাষা বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। স্থবির মন যোগাইবার জন্য একমনে শুনিবার ভান করিয়া মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

স্থবি ভাবিতেছিল, এ বর্ব্বরদের গান শুনাইয়া লাভ কি? আজকাল তাহার গলা সত্যিই ভালো হইয়াছে। নিধুদা যদি শুনিত!···

আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না······নিধুদা'র সঙ্গে দেখাও আর হইবে না। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ খোঁজা চলিতেছে, স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে রাখা হইয়াছে। বয়স যোল ছাড়াইতে চলিল কি না! আর বাড়ীর বাহির হইবার হুকুম নাই। কলিকাতা···চিত্রা··· রূপবাণী কেতকী শোভা, নিধুদা···সব স্বপ্ন···এ জন্মের মত সব ফুরাইয়াছে···সোনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য নয় যে, তেইশ বছরের বিধবা রাধার ঘনিষ্ঠতা তাহার ভালো লাগে না। নাপিত-বৌ তাহার পায়ের তলায় পোষা কুকুরের মতো পড়িয়া থাকে, কোনো রকমে সহ্য করিয়া থাকিতে হয়। ঝি-চাকরকেও তো লোকে সহ্য করে।

রাধা বলিল—ভাই স্থবি, তোর গলাখানা যদি একবার পেতাম! হিংসে হয় সত্যি।

স্থবি নাপিত-বৌয়ের খোসামোদ ও রাধার গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা ঠেলিয়া ফেলিয়া চায়ের পাত্র লইয়া চলিয়া গেল। সে মরিতেছে নিজের জ্বালায়, এমন সময়ে এ-সব স্থাকা স্থাকা কথা তাহার ভালো লাগে না।

জেলেপাড়ার ঘাটে ছিপছিপে, ফরসা, থান-পরা জেলে-বৌ কাপড় কাচিতে নামিল।

রাধা বলিল—ও রামুর মা, রামুর কোনো খবর পেলে?

জেলে-বৌ বলিল—কোথায় দিদিঠাকরুণ—আজ পাঁচ মাস ছেলে গিয়েচে, একখানা পত্তর নয়—টাকা পাঠানো চুলোয় যাক—তার টাকা পাঠাতে হবে না। আমি ধান ভেনে, ক্ষার কেচে, গতর খাটিয়ে যেমন চালাচ্চি, এমনি চালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। ছেলের রোজগার খেতে চাইনে, সে ভালো থাকুক, নিজের খরচ নিজে করুক, তাতেই আমি খুশি। কিন্তু বলো তো দিদিঠাকরুণ, একখানা চিঠি নেই আজ পাঁচ মাস, আমি কি ক'রে ঘরে থাকি?

রামু লালমণিরহাটের রেলে কি একটা চাকরি পাইয়া গিয়াছে। মাকে একবার পাঁচটি টাকা পাঠাইয়াছিল—তারপর এখন লেখে যে, সামান্য মাইনেতে তাহার কুলায় না, মাকে এখন আর টাকা পাঠাতে পারিবে না। মা যেন কষ্ট করিয়া পূজা পর্য্যন্ত কোনো রকমে চালাইয়া লয়। ছেলের কষ্ট হইবার ভয়ে মাও আর টাকা চায় না। কষ্টে-স্বষ্টেই চালায়।

রাধার জেলে-বৌকে ভালো লাগে বড়।

এমন ধরনের মেয়ে এ গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরেও নাই। এত স্থন্দর মন ওর, পরের উপকারে প্রাণ ঢালিয়া দিতে এমন লোক সত্যিই গাঁয়ে আর নাই। শুধু রাধাদের বলিয়া নয়, লোকের চিঁড়ে কুটিতে জেলে-বৌ, ধান ভানিতে জেলে-বৌ, যাহাদের বাড়ীতে পুরুষ মানুষেরা বিদেশে থাকে, শুধু বাড়ীতে মেয়েরা আছে—এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাজার হইতে তাদের হাট-বাজার করিয়া দিতে জেলে-বৌ, কুটুম্ব বাড়ীতে তত্ত্বতাবাস পাঠাইতে কিংবা নব-বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাইতে জেলে-বৌ—জেলে-বৌ না হইলে এ গাঁয়ের লোকের চলে না। অথচ এ সবের জন্যে জেলে-বৌ কারো কাছে একটি পয়সা প্রত্যাশা করে না পাড়ার পাঁচজনের বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়া বেড়ানোই তার অভ্যাস।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধার মনে আছে—আমবাগানের পথ দিয়া সে ঘাটে যাইতেছে—জেলে-বৌ আম কুড়াইতেছে বাগানে।

রাধা বলিল—রামুর মা, আম কুড়ুচ্চ? দেখি কোন্ কোন্ গাছের, ও গুয়োথলীর আম পেয়েচ যে দেখচি!···ও বাবা, ও তো বড় একটা পাওয়া যায় না। আমি কত খুঁজি, একটাও পাইনে একদিনও। তোমার ভাগ্যি ভালো। ভারি বোঁটা-শক্ত আম, তলায় পড়েই না।

অত মিষ্টি গাছের আম, আর পাওয়া অত শক্ত, মাত্র তিনটি আম পাইয়াছিল জেলে-বৌ, অমনি হাসিমুখে বলিল,—তা নিয়ে যান দিদিঠাকরুণ, আম ক'টা আপনি সেবা করবেন। দয়া ক'রে নিয়ে যান আপনি। জেলে-বৌ-এর গুণ আছে, অত সহজে ত্যাগ স্বীকার করিতে ওর জুড়ি নাই এ গাঁয়ে।

রাধা আম লইয়াছিল এই জন্য যে, না লইলে জেলে-বৌ ভাবিবে, ছোট জাতের দান বলিয়া ব্রাহ্মণের মেয়ে সকালবেলা গ্রহণ করিল না। লইয়া সে ভাবিল—জেলে-বৌ-এর আপন-পর জ্ঞান থাকতো যদি, এ গাঁয়ে হাঙ্গামা পোয়াতে হ'ত তা হ'লে।

রাধা বলিল—জেলে-বৌ, আমার সঙ্গে একবার শ্বশুরবাড়ী চল না? অনেক দিন কোথাও বেরুই নি, ভাবচি দিনকতক ঘুরে আসি।

জেলে-বৌ বলিল—যান না দিদিঠাকরুণ। আপনাদের যাবার জায়গা আছে কেন যাবেন না। শ্বশুরবাড়ী যানও নি তো অনেকদিন। তাঁরা দেখলে খুশী হবেন।

সে বিষয়ে রাধার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শাশুড়ী তাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, তা রাধার জানিতে বাকী নাই। তবুও যাইতে হইবে, তোরঙ্গ আর ক্যাশ বাক্সটা সেখানে ছাড়িয়া আসায় লাভ কি? সেগুলো আনা দরকাব। অমন ভালো তোরঙ্গটা।

পরদিন বাবা-মাকে কথাটা বলিতেই বাড়ীতে একপালা ঝগড়া শুরু হইল। রাধার বাবার আদৌ মত নাই সেখানে মেয়ে পাঠাইতে, রাধার মা কিন্তু রাধার দিকে। দু'জনে এই লইয়া বাধিল ঘোরতর দ্বন্দ্ব।

রাধা বাবাকে বলিল, আমি ঘুরে আসব তো বলচি সাত দিনের মধ্যে। নবুকে সঙ্গে নিয়ে যাই—না থাকতে দেয়, আসা তো আমার হাতের মুঠোয়। একঘেয়ে ভালো লাগে না এখানে।

রাধার বাবা বলিলেন—এ অপমান সাধ ক'রে কুড়ুবার কি দরকার তোর? তারা কি এই ছ'বছরের মধ্যে একখানা পত্তর দিয়ে খোঁজ নিয়েচে যে তুমি কেমন আছ?

অনেক কষ্টে অবশেষে বাবাকে নিমরাজী গোছের করাইয়া ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া রাধা আসিয়া গাংনাপুর স্টেশনে গাড়ী চাপিল।

রেলগাড়ীতে চাপিয়া রাধার মনে হইল সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে বহুদিন পরে। কেবল বাবা মায়ের একঘেয়ে ঝগড়া অশান্তি, কেবল 'নাই নাই' শুনিতে শুনিতে তাহার তরুণ মন অকালে প্রৌঢ়ত্বের দিকে চলিয়াছে। সংসারে আলো নাই, বাতাস নাই, এতটুকু আনন্দ নাই —শুধুই শোনো চাল নাই, কাঠ নাই, একাদশীর আটা কোথা হইতে আসিবে, নবুর কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নতুন একটা ইজের ছ' আনা হইলে পাওয়া যায়, তা যেন ছ'টি মোহর। নবুর পাঁচ মাসের স্কুলের মাইনে বাকি, দুবেলা মাস্টারে শাসায়, মুখুয্যেদের বাড়ীর ঠাকুমার

দেনার টাকার সুদের তাগাদা—আর বাবার যত মিথ্যে কথা বানাইয়া বলা পাওনাদার বিদায় করিতে। আজ সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া মুর্শিদাবাদ লাইনের গাড়ীতে চাপিতে হইল। মুড়াগাছায় নামিয়া ক্রোশখানেক হাঁটিয়া বৈকাল তিনটার সময় সে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া পৌছিল।

শাশুড়ী বৌকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে নবাবের মেয়ে, তা এতদিন পরে কি মনে ক'রে? সঙ্গে কে? ছোট ভাই—ও, সেই নব্ না? এসো এসো বাবা, সুখে থাকো, চিরজীবী হও। তা বেশ ছেলেটি।

কিন্তু শাশুড়ীর অমায়িকতা তিনদিনের মধ্যেই ঘুচিয়া গেল। রাধার বিধবা বড় ননদ ভ্রাতৃবধূকে পুনরায় এ বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। রাধার গলার ছ'ভরির হার সেবার শাশুড়ী কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হারছড়া ভাঙিয়া ননদের মেয়ের বিয়ের সময় হাতের রুলি আর বালা গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় ননদ ভাবিয়াছিলেন, আজ ছ'বছর যে বৌ এ বাড়ী আসে নাই, সে আর আসিবে না। কিন্তু আপদ আবার আসিয়া যখন জুটিল, তখন তো হারের দাবি করিয়া বসিবে। হইলও তাই। রাধা শাশুড়ীর কাছে হার চাহিল। শাশুড়ী বলিলেন—তোমার বাবা যে টাকা বিয়েতে দেবেন বলেছিলেন, তা দেন নি—দুশো টাকা বাকি ছিল। তার দরুণ হার রেখে দিই। সে টাকা নিয়ে এসো আগে, হার এখুনি বার ক'রে দিচ্ছি।

বড় ননদও এই কথায় সায় দিলেন।

রাধা বলিল—বারে, আমার বাবার গড়িয়ে দেওয়া, তোমরা তো আর দাও নি? বাবা টাকা দিয়েছেন কিনা সে তোমরা বোঝ গিয়ে তাঁর সঙ্গে। আমার হার কেন তোমরা দেবে না?

কিন্তু টাকাকড়ির কথা আর কি অত সহজে মেটে!

রাধা বলিল, আমার বাবার দেওয়া তোরঙ্গ, তাই বা তোমরা কেন আটকে রাখবে? আর তোরঙ্গের চাবি ভেঙ্গে তোমরা জিনিসপত্র বার করে নিয়েচ কেন?

শাশুড়ী ও ননদ দুজনে মিলিয়া বলিলেন, চাবি কেহ ভাঙ্গে নাই, ভাঙ্গাই ছিল।

রাধা বলিল, আমার নতুন তোরঙ্গ, চাবি ভাঙ্গা থাকলেই হ'ল? তোমরা ভেঙ্গেচ। যত চোরের ঝাড়, দাও আমার হারছড়া—

শাশুড়ী বলিলেন, মুখ সামলে কথা বলো বৌমা, বলচি—

উভয়পক্ষে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। ননদ মারিতে আসিলেন ভ্রাতৃবধূকে। নবুকে সেদিন আর কেহ খাইতে ডাকিল না। রাধার তো কথাই নাই, তাহাকে কে আদর করিয়া খাওয়াইবে, সে যখন তার বিবাহের হার ও তোরঙ্গ চাহিতে আসিয়াছে?

দুপুরের পরে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া নবুকে সঙ্গে লইয়া রাধা ধর্ম্মদহ গ্রাম হইতে মুড়াগাছা স্টেশনে হাঁটিয়া আসিল। দুজনেরই অনাহার! মনে পড়িল এই শ্রাবণ মাস, এই শ্রাবণ

মাসেই সে ওই পথেই একদিন পালকি করিয়া নববধূরূপে আসিয়াছিল। কথাটা মনে আসিতেই রাধার চোখে জল বাধা মানিল না। স্টেশনে আসিবার সারা পথটাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল।

ট্রেনটি আসিলে তাহাতে কলের পুতুলের মতো বসিয়া রাধা কত কথা ভাবিতে লাগিল। মিছামিছি প্রায় তিনটি টাকা খরচ হইয়া গেল। এ টাকা অবশ্য তাহার বাপের বাড়ীর নয়—তাহার নিজেরই জমানো টাকা। টাকাটা হাতে থাকিলে টানাটানির সংসারে কত কাজ দিত। বাবার অমতে আসা হইয়াছে, শুধু-হাতে ফিরিলে বাবার বকুনি খাইতে হইবে, মা মুখ ভার করিয়া থাকিবে। ছ'ভরির হারছড়া—লইয়া যাইতে পারিবার আশা করিয়াই সে আসিয়াছিল। বাবা-মায়েরও সে আশা যে একেবারে না ছিল তা নয়। এবার সকলে রাগ করিবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে শ্বশুরবাড়ী আসিবার পথও গেল। শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া না করিলেই হইত। না হয় গিয়াছেই হারছড়াটা! বাপ মায়ের অবর্ত্তমানে শ্বশুরবাড়ীতে একটু দাঁড়াইবার স্থানও তো হইত! তাহার জীবনে কোন সুখ নাই। বাড়ী গিয়া তো সেই একঘেয়ে ব্যাপার। সেই ডোবার ধারে সকালে বাসন মাজা, সেই গোয়াল পরিষ্কার, সেই রাঁধাবাড়া। সুবি—তা সে-ও তেমন মন খুলিয়া কথা কয় না। সে অনেক কিছু ভুলিতে পারিত, যদি সুবি তাহার সঙ্গে হাসিয়া আলাপ করিত, প্রাণ খুলিয়া মিশিত। তা করে না—কত করিয়া সাধিয়া কত ভাবে মন যোগাইয়া রাধা দেখিয়াছে।

সত্যি, জীবন সব দিক দিয়াই অন্ধকার। বাঁচিয়া কি সুখ?

কাল সকালে কি হইবে সে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। রাত্রে আজ সে বাড়ী ফিরিলেই বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া বাধিবে। অর্থাৎ সে হার আদায় করিতে না পারিয়া ফিরিলেই বাবার আশাভঙ্গের রাগটা গিয়া পড়িবে মা'র উপর, দুজনে ধুন্ধুমার বাধিয়া যাইবে। কাল সকালে ডোবাতে বাসন মাজিবার সময় মুখুয্যে পাড়ার ঘাট, জেলে পাড়ার ঘাটের সবাই জানিতে চাহিবে সে এত শীঘ্র শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিল কেন। শাশুড়ী কি করিল, কি বলিল—এই কৈফিয়ত দিতে দিতে আর মিথ্যে কথা বানাইয়া বলিতে বলিতে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। কারণ, সত্যকথা তো সে বলিতে পারিবে না! রায়-বাড়ীর কুচুটে মেজ বৌ মুখ টিপিয়া হাসিবে। সুবি নামিবে ওদের নিজেদের ঘাটের কচুতলায় চায়ের বাসন ধুইতে। নিজে হইতে একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিবে না যে, রাধা কবে আসিল বা কিছু। রাধাকে প্রথমে কথা বলিতে হইবে। সুবি দু'একটা 'হাঁ' 'না' গোছের দায়সারা উত্তর দিয়া চায়ের পেয়ালা পিরিচ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবে, যেন বেশীক্ষণ ডোবার ঘাটে দাঁড়াইয়া ওর সঙ্গে কথা বলিলে তার আভিজাত্য খর্ব্ব হইয়া যাইবে। বাসন-মাজার পরে ঘাটে যাওয়া, রান্না, খাওয়ানো দাওয়ানো, দুপুরে পান মুখে দিয়াই ছুটিতে হইবে ঘাটে, গরুকে জল খাওয়াইতে সেই নদীর ধারের মাঠে, যেখানে গরুকে গোঁজ পুঁতিয়া রাখিয়া আসা হইয়াছে। সেই সময়টা যা একটু ভালো লাগে—নীল আকাশ, নদীর ধারে কাশ ফুল দোলে, সমস্ত জিউলি গাছের গা বাহিয়া সাদা সাদা মোম-বাতি-ঝরা মোমের মতো আটা ঝরিয়া পড়ে, হু হু খোলা হাওয়া বয় ওপারের

দেয়াড়ের চর হইতে, পাট-বোঝাই গরুর গাড়ীর দল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে ঘাটের পথের রাস্তা দিয়া কোথায় যেন যায়। গরুকে জল খাওয়াইয়া আসিয়া তাহার বড় ইচ্ছা করে সুবিদের বাড়ীতে সুবির সঙ্গে বসিয়া একটু আধটু গল্প-গুজব করে' দু' একখানা বর্ণস্থচি পড়িয়া শোনায়—(কারণ সে বই পড়িতে জানে না) গান শোনায়—কিন্তু হায় রে দুরাশা! গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইতে গেলে সুবি গভীর ঔদাস্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ, যাই রাধাদি। কত কাজ পড়ে রয়েচে, বিল্লুর সেই মোজা জোড়াটা বুনতে বুনতে ফেলে রেখেচি, সেটা সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলি গিয়ে। বসো তুমি—মা'র সঙ্গে কথা বলো।

তার পর বেলা পড়িয়া যাইবে। রোয়াকে কাস্তে বঁটি পাতিয়া একরাশ বিচুলি কাটিতে হইবে, গরুকে জাব খাওয়াইতে। মাঠ হইতে গরু অবশ্য মা-ই আনে, কারণ এ সময়টা সে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে, নদীর ধারের মাঠ হইতে গরু আনিবার সময় তার বড় একটা হয় না। তারপর বাইরের বেড়ায় গা হইতে শুকনো কাপড় তুলিতে হইবে, ঘর ঝাঁট দিতে হইবে, লণ্ঠনে তেল পুরিয়া কাঁচ মুছিয়া রাখিতে হইবে, গা ধুইয়া আসিতে হইবে, পাতকুয়া তলায় সাঁজ জ্বালিয়াই বাবার মিছরি মরিচ গরম করিয়া দিয়া রাত্রের ভাত চড়াইতে হইবে। সকলের খাওয়া দাওয়া সারা হইলে সে নিজে এক মুঠা চালভাজা তেল-নুন মাখিয়া এক ঘটি জল খাইয়া বাবার পায়ে বাতের তেল মালিশ করিতে বসিবে। এই সব সারিতে রাত সাড়ে দশটার গাড়ী গড় গড় করিয়া মাত্‌লার বিলের পুলের উপর দিয়া যাইবার শব্দ পাওয়া যাইবে।

তবে দিনের মতো ছুটি। এই চলিবে দিনের পর দিন, তিন শো ত্রিশ দিন।

হঠাৎ নবু জানালার বাহিরে হাত বাড়াইয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—উই রাণাঘাটের ইস্টশান দেখা যাচ্ছে দিদি—

রাধার চমক ভাঙিল।

সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, প্রকাণ্ড ট্রেনটা অজগর সাপের মতো বাঁকিয়ে রেল স্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। যেখানে তার ইঞ্জিন, সেখানে দূরে একটা বড় বাড়ী ও টিনের ছাদ দেওয়া দালান-মতো দেখা যাইতেছে। রাণাঘাট পৌঁছিয়া গেল এর মধ্যে!

প্লাটফর্মে নামিয়াই নবু বলিল—একখানা পাউরুটি কিনে দ্যাওনা দিদি! কি খিদেই পেয়েছে—ডাক্‌ব?

আঁচলের গেরো খুলিয়া তিনটি পয়সা বাহির করিয়া রাধা ভাইকে একখানা পাউরুটি কিনিয়া দিল। তাহার নিজেরও খুব ক্ষুধা পাইয়াছে—সেও তো সারাদিন কিছু খায় নাই। ভাইকে বলিল—আর কিছু খাবি? এক কাজ কর বরং, চল বাইরের দোকান থেকে আলুর দম কিনে দিই এক পয়সার। পাউরুটি দিয়ে খা, পেট ভরবে এখন।

নবু বলিল—তুমি কিছু খাবে না, দিদি?

—আমি রেলের কাপড়ে কি খাব? চা খেতে পারি, ওতে দোষ নেই—যা দিকি ঐ চা বিক্রি করচে, জেনে আয় কত করে নেবে এক পেয়ালার দাম।

নবু জানিয়া আসিয়া বলিল—এক পেয়ালা চা চার পয়সা, দিদি।

—উঃ বাবা, চার পয়সা। তবে থাক্ গে। মোটে আর ন'টি পয়সা আছে। বাবার জন্য একখানা পাঁউরুটি কিনে নিতে হবে। দুধ দিয়ে পাঁউরুটি খেতে ভালোবাসেন বাবা। মা'র জন্য কি নেব বল্ তো?

রাণাঘাট স্টেশনে দাঁড়াইয়া রাধার মনের দুঃখ অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। কত লোক-জন, গাড়ী-ঘোড়া, দোকান, পসার—দেখিলে মনে শান্তি পাওয়া যায়।

এমন সময়ে প্লাটফর্ম্মে একটা শব্দ উত্থিত হইল—লোক-জন, পানওয়ালা, পাঁউরুটিওয়ালারা, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। লোক যে যেখানে ছিল দাঁড়াইয়া উঠিল। রাধা একটি কুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ডাক-গাড়ী আসিতেছে। দার্জ্জিলিং মেল।

অল্পক্ষণ পরেই সশব্দে বিশাল ট্রেণখানা প্লাটফর্ম্মের ওপ্রান্তে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়, হাঁকাহাঁকি, লোক-জনের দৌড়াদৌড়ি, পুরি-তরকারি, পান-বিড়ি-সিগারেট, 'কুলি কুলি, ইধার আও', হৈ-হৈ ব্যাপার। স্টেশন সরগরম হইয়া উঠিল; রাধা আর নবু যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তারই সামনে ডাক-গাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী কামরাগুলি থামিল।

রাধা অবাক্ হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। ঝকঝক তকতক করিতেছে কামরাগুলি। কি রকম পুরু চামড়ার গদি-আঁটা বেঞ্চি। সাহেব, মেম, মোমের পুতুলের মতো তাদের ছেলেমেয়েরা, দামী শাড়ি-পরা সুন্দরী বাঙালী বড়লোকের মেয়েরা···সুবি কোথায় লাগে এদের কাছে? বেহারারা ট্রের উপর চায়ের জিনিস বসাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে···একটি অতি সুন্দর ছ'সাত বছরের ফ্রক্-পরা সাহেবদের মেয়ে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া লাফাইতেছিল—তার মা আসিয়া তার হাত ধরিয়া গাড়ীর মধ্যে উঠাইয়া লইতে লইতে কি বলিল—হিট্ হিট্ প্রিং প্রিং —কেমন মজার কথা ওদের?···হাসি পায় শুনিলে। সত্যি কি চমৎকার দেখিতে খুকিটা!

নবু বলিল—এই দিকে এসে দ্যাখো দিদি, খাবার গাড়ী।

একখানা খুব বড় লম্বা গাড়ির মধ্যে সারি সারি টেবিল পাতা, টেবিলের উপর ধপ্ধপে চাদর, কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজানো, চকচকে সব কাঁচের বাসন। মেলা সাহেব-মেম খাইতে বসিয়াছে। বাঙালীর মেয়েও আছে তাদের মধ্যে। তবে বেশি নয়—দু'একজন। আঠারো উনিশ বছরের একটি বাঙালীর মেয়ে বেশি দামের টিকিটের কামরা হইতে নামিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ফল কিনিতেছে।

রাধা কি দেখিল, কি পাইল জানি না কিন্তু ডাকগাড়ীখানা তার সুশ্রী সুবেশ আরোহীদল ও সুসজ্জিত ঝকঝকে তকতকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি লইয়া তাহার মনে একটি অপূর্ব্ব আনন্দ, উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সমস্ত দার্জ্জিলিং মেলখানা যেন একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা—কিংবা কোনো প্রতিভাবান গায়কের মুখে শোনা সঙ্গীত। রাধার মনে হইল, এই ভালো কাপড়-চোপড়-পরা সুন্দর চেহারার মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকাদের সে দেখিতে পাইতে পারে—যদি মাত্র ছ' আনা পয়সা খরচ করিয়া রাণাঘাট স্টেশনে আসে। যে পৃথিবীতে এরা আছে, সেখানে তার বাবার বাতের বেদনা, সুবির হৃদয়হীনতা, মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবা-মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর ব্যবহার সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কি তার

ছ'ভরির হারছড়ার লোকসানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়। কি চমৎকার! দেখিলে জীবন সার্থক হয় বটে, মন ভরিয়া ওঠে বটে। সংসারে এত সুখ, এত রূপ, এত আনন্দও আছে!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না—কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, মেল গাড়ীখানা ছাড়িয়া গেলে রাধা দেখিল যে, সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে পায়ে নতুন বল, চোখে নতুন ধরনের দৃষ্টি। সে যেন রাধা নয়—যে সংসারে অসহায়, অনাহূত, উপেক্ষিত, অবলম্বনহীন এবং যার শেষ সম্বল ছ'ভরির হারছড়াটা পর্য্যন্ত শাশুড়ী ঘুচাইয়া দিয়াছে। একটুখানি সহানুভূতির কথা ও মিষ্টি হাসির লোভে তাকে কালই ডোবার ঘাটে সুবির অজস্র খোশামোদ করিতে হইবে।

নবুকে বলিল—ওদের কাছ থেকে এক পেয়ালা চা নিয়েই আয় নবু, তুই আর আমি ভাগ করে খাই। যাক গে চার পয়সা। আমাদের ট্রেনের এখন অনেক দেরি। ততক্ষণ এক পেয়ালা চা খেয়ে নেওয়া যাক। বাড়ী গিয়ে যেন মা'র কাছে বলিস্ নে।

অকারণ

মনটা ভালো ছিল না। এক একদিন এ রকম হয়।

কিছু পড়তে ভালো লাগে না, কিছু ভাবতে ভালো লাগে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগে না। মনে হয়, যেন মনের চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েচে—'অয়েল' না ক'রে নিলে চাকা আর চলবে না, ক্রমে মরচে পড়ে আসবে। তারপর কবে একদিন ফুট্ করে বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলেপাড়া লেনে এক পুরোনো তাসের আড্ডায় গেলুম। সেই সব পুরোনো বন্ধুরা এসে জুটেচে—তাস কিন্তু ভাল লাগল না। তাস খেলে জিতব, অন্যদিন এতে কত উৎসাহ, আনন্দ পাই। আজ মনে হ'ল, না হয় জিতলামই, তাতেই বা কি? এদের গল্প-গুজব ভালো লাগল না। অর্থহীন—অর্থহীন—এই নিচু বৈঠকখানা ঘর, চূণ-বালিখসা দেওয়াল, সেই সব একঘেয়ে সস্তা ওলিওগ্রাফ্ ছবি—কালীয়দমন, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, কি একটা মাথামুণ্ডু ল্যাণ্ডস্কেপ্—একঘেয়ে কথাবার্ত্তা, চিরকাল যা শুনে আসচি—হঠাৎ মন বিরস ও বিরূপ হয়ে উঠল—সব বাজে, সব অর্থহীন, পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার বেশ ভালো লাগচে? মনে কোনো রকম—

সে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বললে—কেন, ভালো লাগচে না কেন? কেন বলুন তো?—

মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল। কাজের ছুতোয় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেলা চারটে বাজে। ফিরিওয়ালারা গলির মধ্যে হাঁকচে—ছেলেরা বই দপ্তর নিয়ে স্কুল থেকে

ফিরচে—কলে জল পড়বার শব্দ পাওয়া যাচ্চে—গলির মোড়ে রোয়াকে-রোয়াকে এরই মধ্যে আড্ডা বসে গিয়েচে—।

একটা নিতান্ত সরু অন্ধকার গলি, পাশেই একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গা। এই গলিটা দিয়ে যাতায়াত প্রায়ই করি—মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গাটার পাশে একটা খোলার ঘর—এই ঘরখানা ও তার অধিবাসীরা আমার কাছে বড় কৌতূহলের জিনিস। হাত পাঁচেক লম্বা, চওড়াতে ওই রকমই হবে, এই তো ঘরখানা। এরই মধ্যে একটি পরিবার থাকে, স্বামী-স্ত্রী ও দুটি শিশু-সন্তান। না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা শক্ত, এইটুকু ঘরে কি ভাবে এতগুলি প্রাণী থাকে—তাদের জিনিস-পত্র নিয়ে। কিন্তু সকলের-চেয়ে অবিশ্বাসের বিষয় এই যে, ওই পাঁচ বর্গ-হাত ঘরের এক কোণেই ওদের রান্নাঘর। আমি যখন ওখান দিয়ে যাই প্রায়ই দেখতে পাই—উনুনে কিছু-না-কিছু একটা চাপানো আছে। বৌটি ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে রাঁধচে, না-হয় দুধ জ্বাল দিচ্চে। তার বয়েস দেখলে বোঝা যায় না। তেইশও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে—চল্লিশও হতে পারে। ঘোমটার কাছে ছেঁড়া, আধ ময়লা শাড়ি পরনে। হাতে রাঙা কড় কি রুলি। চোখ মুখ নিষ্প্রভ, নির্বুদ্ধিতার ছায়া মাখানো, স্বামী বোধ হয় কোনো কারখানাতে মিস্ত্রীর কাজ করে, দু'একদিন সন্ধ্যার আগে ফেরবার সময় দেখেচি লোকটা কালি-ঝুলি মেখে ছোট্ট বালতি হাতে পাশের নাইবার জায়গায় ঢুকচে।

আজও ওদের দেখলুম। দোরের কাছে বৌটি ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে, ছেলেকে আদর করচে। নির্ব্বোধের মতো আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলে। সেই পায়রার খোপের মতো ঘরটা, ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটি লেপা, তার ওপরে পুরোনো খবরের কাগজ আঁটা, কাগজগুলো হল্‌দে বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে—দড়ির আলনায় ময়লা কাপড়-চোপড় ঝুলচে।

মনটা আরও দমে গেল। কি ক'রে এরা এ থেকে আনন্দ পায়? কি ক'রে আছে? কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কেন আছে? আচ্ছা, ও ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে? ওই রকম মিস্ত্রী হবে তো, ওই রকমই খোলার ঘরে ছেলে বউ নিয়ে ওই ভাবেই মলিন, কুশ্রী, অন্ধকার, অর্থহীন জীবনের দিনগুলো একে একে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে চলবে, ততোধিক দীন হীন মরণের দিকে। অথচ মা কত আগ্রহে খোকাকে বুকে আঁকড়ে আদর করচে, কত আশা, কত মধুর স্বপ্ন হয়তো—কিন্তু এখানেও আমার সন্দেহ এল। স্বপ্ন দেখবার মতো বুদ্ধিও বৌটির আছে কি? কল্পনা আছে? নিজেকে এমন অবস্থায় ভাবতে পারে যা বর্ত্তমানে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে ব'লে ওর বিশ্বাস? মনের গোপন সাধ-আশাকে মনে রূপ দিতে পারে? নিজের সংকীর্ণ, অসুন্দর বর্ত্তমানকে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারে?

বড় রাস্তার মোড়ে বই-এর দোকানগুলো দেখে বেড়ালুম। রাশি রাশি পুরোনো বই, ম্যাগাজিন। অধিকাংশই বাজে। অলস অপরিণত মনের তৈরী জিনিস। চটকদার

মলাটওয়ালা অসার বিলিতী নভেল, সিনেমার ম্যাগাজিন ইত্যাদি। অন্যদিনে এখানে বেছে বেছে দেখি, যদি ভালো কিছু পাওয়া যায়। আজ আর বাছবার মতো ধৈর্য্য ছিল না। মনের আকাশের চেহারা আজ ঘসা পয়সার মতো, নীলিমার সৌন্দর্য্য তো নেই-ই, মেঘভরা বাদল দিনের রূপও নেই—নিতান্তই ঘসা-পয়সার মতো চেহারা।

সিনেমা দেখতে যাব? উট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাব? কোথাও বসে খুব গরম চা খাব? লেকের দিকে যাব?—

ধর্ম্মতলার গির্জার সামনে এক জায়গায় লোকের ভিড় জমেচে। একটা সাহেবী পোশাক-পরা লোক ফুটপাতে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে, ধড়টা ও মাথাটা পরস্পরের সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে যে মনে হচ্চে লোকটা মারা গিয়েচে। দুজন সার্জেণ্ট এলো। লোকে বললে, সামনের বাড়ীর নিচের তলায় ওই বাথ-রুমের মধ্যে পড়েছিল এই অবস্থায়, বাড়ীর দারোয়ান ধরাধরি ক'রে তার সংজ্ঞাহীন নিঃসাড় দেহটা একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে কোথায় গেল।

লোকটার ওপর সহানুভূতি হ'ল আমার। সেই নির্ব্বোধ বধূটার ওপর যা হয়নি, এ বেহুঁশ মাতালের ওপর তা হ'ল। বেচারা আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছিল, পথও যা হয় একটা করেছিল, হয় তো ভুল পথ, হয় তো সত্যি পথ···আনন্দের সত্যতা তার মাপকাঠি—কে বলবে ওর কি অভিজ্ঞতা, কি তার মূল্য? ওই জানে। কিন্তু ও তো বেহুঁশ!

কার্জন-পার্কের সামনে এলুম। অনেকগুলো চাকর ও আয়া সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বৃষ্টির ভয়ে গাড়ী-বারান্দার নীচে ফুটপাথের উপরে বসে আছে। বৃষ্টি একটু একটু করে বাড়চে, আমিও সেখানে দাঁড়ালুম। একটা ছোট্ট ছেলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুল, নীল চোখ, বছর দেড় কি দুই বয়েস—সে তার চাকরের টুপিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে টলতে টলতে উঠে অতি কষ্টে নাগাল পেয়ে চাকরের মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিচ্চে। আর যেমন পরানো যাচ্চে, অমনি হাত নেড়ে, ঘাড় দুলিয়ে দন্তহীন মুখে হেসে কুটি-কুটি হচ্চে। কিন্তু টুপিটা ভালো করে মাথায় বসাতে পারচে না, একটু পরেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্চে, আবার খোকা অতি কষ্টে টুপিটা মাথায় তুলে দিচ্ছে···আবার সেই হাসি, সেই হাত-পা নাড়া, সেই নাচ!···তাকে কেউ দেখচে না, কারুর দেখবার সে অপেক্ষাও রাখচে না, তার চাকর পার্শ্ববর্ত্তিনী আয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এমন অন্যমনস্ক, খোকা কি করচে না করচে সেদিকে তার আদৌ খেয়াল নেই, নিকটের অন্য অন্য ছেলেমেয়েরাও নিতান্ত শিশু—ওই খোকাটি আপন মনে বার বার টুপি পরানো খেলা করচে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলুম। নরম-নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশ—ভঙ্গির কি সজীবতা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য!···খুশির আতিশয্যে খোকা আবার সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়চে, একগাল হাসচে, ছোট ছোট মুঠি-বাঁধা হাত দুটো একবার তুলচে, একবার নামাচ্চে···শিশুমনের আগ্রহভরা উল্লাসের সে কি বিচিত্র, কি সুস্পষ্ট, ভাষাহীন বার্ত্তা!······

আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যের সামনে পড়ে গিয়েচি যেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ চাকরটার হুঁশ হ'ল—সে আমার সঙ্গে গল্প বন্ধ করে খোকার দিকে ফিরে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাশে একটা পিরাম্বু-লেটারের মধ্যে রেখে দিলে। খোকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে টলতে টলতে পিরাম্বু-লেটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু বড্ড উঁচু—তার ছোট্ট হাত দুটি সেখানে পৌঁছয় না। সে একবার অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাইলে, তারপর থপ্ করে বসে পড়ল। চাকরটা আমার সঙ্গে গল্পে মত্ত।

কার্জন-পার্কের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলুম। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। গঙ্গার অপর পারে আকাশ রাঙা হয়ে এসেচে।

খোকার মনের সে অর্থহীন আনন্দ আমার মনে অলক্ষিতে কখন সংক্রামিত হয়েচে দেখলুম। খোলার ঘরের সেই মেয়েটিকে আর নির্ব্বোধ মনে হ'ল না।

বনে-পাহাড়ে

সিংভূম জেলার বন-জঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণী ভারতবর্ষের মধ্যে সত্যিই অতি অপূর্ব্ব। বেঙ্গল নাগপুর-রেলপথ হওয়ার আগে এই অঞ্চলে যাবার কোন সহজ উপায় ছিল না, কেউ যেতোও না সে সময়ে—যা একটু আধটু যেতো—এবং যে ভাবে যেতো—তার কিছুটা আমরা বুঝতে পারি সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' পড়ে। সিংভূম জেলার ভেতরকার পাহাড়-জঙ্গলের কথা ছেড়ে দিই—বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থান জনহীন অরণ্যসঙ্কুল থাকার দরুণ 'ঝাড়খণ্ড' অর্থাৎ বনময় দেশ বলে অভিহিত হোত। লোকে প্রাণ হাতে করে যেতো ঐ সব বনের দেশে। কিন্তু না গিয়ে উপায় ছিল না—যেতেই হোত।

ওই দেশের মধ্যে দিয়ে ছিল পুরী যাওয়ার রাস্তা। মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যে দিয়ে এই পুরোনো পথ এখনও বর্ত্তমান আছে। শ্রীচৈতন্য সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এই পথে একদিন পুরী গিয়েছিলেন। কত লোকে যেতো সেকালে। সাধু ঈশ্বরপুরী একা এই পথে পুরী রওনা হন।

ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ীর সামনে দিয়ে এই পথ আজও আছে, আজকাল জেলা-বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে। রাজবাড়ী থেকে পাঁচ মাইল কিংবা তার কিছু বেশি গেলেই বম্বে রোডের সঙ্গে এই রাস্তা মিশে গিয়েচে এবং তারপর সোজা চলেচে উড়িষ্যার দিকে, ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে। এই রাস্তাকে কেন যে বম্বে-রোড বলা হয় তা জানি নে—কারণ বম্বের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক চর্ম্মচক্ষে আবিষ্কার করা যায় না। তবে যদি কেউ বলে, এ রাস্তা দিয়ে কি মশাই তবে বম্বে যাওয়া যায় না? আমায় বলতে হবে—বিশেষ করে বম্বে যাবার জন্যে এ রাস্তা নয়। ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে এ রাস্তা সোজা চলে গেল সমুদ্রতীরের দিকে। তবে এ রাস্তা থেকে অন্য একটা রাস্তা বেরিয়েচে ময়ূরভঞ্জের বাঙ্গিপোস নামক জায়গায়। সে রাস্তায় বেঁকে গেলে কি হয় বলা যায় না—হয়তো বম্বে যাওয়া যেতে পারে, সে রকম দেখতে গেলে তো যে কোনো রাস্তা দিয়েই বম্বে যাওয়া যায়। যে কোনো জেলার যে কোনো রাস্তাকে তবে বম্বে-রোড কেন বলা হবে না?

চিরকাল পথে পথে বেরিয়ে অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েচে খারাপ। পথ যেন ডাকে, হাতছানি দেয়।

সেদিন ছিল অষ্টমী তিথি।

সন্ধ্যার পরেই কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। ঝাড়গ্রামে আমার এক আত্মীয়-বাড়ীতে গিয়ে দিন দুই আছি—হঠাৎ ইচ্ছে হলো এমন জ্যোৎস্নায় একটুখানি বেড়িয়ে আসি।

জায়গাটা রাজবাড়ীর পাশে—পুরোনো ঝাড়গ্রাম। স্টেশনের কাছে হয়েচে নতুন কলোনি, কলকাতার অনেক ভদ্রলোক বাড়ী করেচেন সেখানে, কিন্তু পুরোনো ঝাড়গ্রামের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। এখানে পুরোনো দিনের রাজাদের গড়খাই ও দুর্গা প্রাচীরের চিহ্ন আজও দেখা যায়, আর আছে শালবন, আগাছার জঙ্গল, পুরোনো দেউল, দীঘি। দিব্যি রোম্যান্টিক পরিবেশ। পুরোনো দীঘির ধারে হাট বসে, তার আগে সাবিত্রী-মন্দির।

সাবিত্রী-মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেল গ্রামের বাইরে মাঠ ও বনের দিকে। .একাই চলেচি, শালবনের কচি পাতা গজিয়েচে, কুসুম-গাছের রঙিন কচি পাতার সম্ভার দূর থেকে ফুল বলে ভুল হয়। গ্রাম ছাড়িয়ে পায়ে-চলা মাঠের পথ শালবনের মধ্যে দিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে অদৃশ্য হয়েচে—সুঁড়ি পথের দু ধারে শালবন।

একাই চলেচি। এ পথে কখনো আসি নি, কোথায় কি আছে জানি নে। ভালুক বেরুবে না তো? শুকনো শালপাতার ওপরে খস্‌খস্‌ শব্দ হোলেই ভাবচি এইবার বোধ হয় ভালুকের দর্শনলাভ ঘটলো। আরও এগিয়ে চলেচি—একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী ঝির্‌ঝির্‌ করে বয়ে চলেচে পথের ওপর দিয়ে। হাঁটুখানেক জল, এমনি পার হয়ে ওপারের পাডে উঠলাম—উঁচু কাঁকর-মাটির পাড়।

শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল চলে এসেচি। জ্যোৎস্নাস্নাত উদার বন-প্রান্তর আমার সামনে। ফিরবার ইচ্ছা নেই। আরও খানিক গিয়ে শালবন পাতলা হয়ে এল—মাঠের মধ্যে দূরে একটা আলো জলচে দেখে সেদিক গেলাম। ছোট্ট একখানা খড়ের ঘর, ফাঁকা মাঠের মধ্যে—একটু দূরে একটা গ্রাম আছে বলে মনে হোল। ঘরখানার চারিদিকে বাঁশকঞ্চির বেড়া, আমার স্বর শুনে গেরুয়া পরা একটি সন্ন্যাসী ঘর থেকে বার হয়ে এসে বললেন—কোথা থেকে আসচেন?

আমি বললাম, ঝাড়গ্রাম থেকে। এটা কি আপনার আশ্রম?

—হ্যাঁ, আসুন বসুন।

সন্ন্যাসী একখানা দড়ির খাটিয়া ঘরের সামনে মাঠে জ্যোৎস্নায় পেতে দিলেন। বেশ চমৎকার লাগছিল আমার, একদিকে অস্পষ্ট বনরেখা, অন্য দিকে ধূ ধূ করচে জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তর। শহরের পথ চিনে ফিরতে পারবো কি না এই রাত্রে, তাই বা কে জানে? পায়ে-চলা সরু আঁকা-বাঁকা মাটির পথের সন্ধান যদি না-ই মেলে ফেরবার মুখে?

সন্ন্যাসী বললেন—রাতে বেরিয়েচেন একা?

—কেন, কোনো ভয়-ভীত আছে নাকি?

—নাঃ, কিসের ভয়। তবে ভালুক-টালুক দু একটা—

—ওর জন্যে ভাবনা নেই। হাট থেকে হরদম লোক যাতায়াত করচে এপথে—মানুষের সাড়া পেলে ভালুক থাকে না।

আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই জ্যোৎস্নায় অপরিচিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি, ওঁর জীবনের কাহিনী সব জেনে নিই। কোথায় বাড়ী, কোথায় দেশ, এসব শুনি। একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ আশ্রমের বেড়ার গায়েই মাটিতে পড়ে আছে—অথচ তাতে অনেক ফুলও ধরেচে।

বললাম—গত আশ্বিনের ঝড়েই বুঝি গাছটা পড়েচে?

হ্যাঁ, এদিকে ততটা হয় নি, তবুও দু-দশটা গাছ পড়েচে বৈকি।

—মেদিনীপুরের ওই দিকটার সর্ব্বনাশ করে দিয়ে গেল, অথচ পশ্চিম মেদিনীপুর বিশেষ

কিছু হয় নি দেখছি। এই গ্রামের নামটা কি ?

—খানাকুই।

—কত দিনের আশ্রম আপনার ? আছেন কতদিন এখানে ?

—তা প্রায় আট-ন বছর। শিষ্য আছে জন-দুই কলকাতায়—তারাই আশ্রমের ঘর তৈরী করে দিয়েচে—মাসিক কিছু সাহায্যও করে।

—এ বনের মধ্যে ভাল লাগে ?

—আছি বেশ। গ্রামের লোকের বড় জলকষ্ট। শিষ্যদের বলে আশ্রমে একটা পাতকুয়ো করে দিয়েচি, গ্রামের সবাই জল নিয়ে যায়। তবে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট. কিছু মেলে না এ সব গাঁয়ে। কপি আর টোমাটোর ক্ষেত করেচি ঐ দেখুন। ঐ ভরসা। তাও গরমকালে জলাভাবে সব শুকিয়ে যায়। দারুন জলাভাব।

বসে গল্প করচি, গেরুয়া কাপড় পরা একজন সন্ন্যাসিনী এসে এক পেয়ালা চা দিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, মা ঠাকরুণ।

বললাম—ও, আপনার মা ?

—না, আমার শিষ্যা। ওঁরও কেউ নেই। বাঁকুড়া জেলার বাড়ী। ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। আমি কাছে নিয়ে এসে রেখে দিয়েচি আজ পাঁচ বছর। আমার রান্না করে দেন। আশ্রমের কাজকর্ম্ম করেন।

—কেউ নেই ? — প্রশ্নটা যেন আপন মনেই জিজ্ঞেস করি। সংসারে যার কেউ নেই, এই ভাবেই কোথাও না কোথাও তার আশ্রয় জুটে যায় বৈ-কি। ভগবানই জুটিয়ে দেন।

সন্ন্যাসী বলছিলেন—আমার পাশে জমি কিনে রেখেচে কলকাতার একজন নার্স। তারও কেউ নেই। সে আমার শিষ্যাও নয়। অথচ এই আশ্রম দেখে আর মা ঠাকরুণকে দেখে বলেচে, এইখানেই আমার থাকা সুবিধে হবে। এইবার বোমার হাঙ্গামার সময়ে এসে আমার এখানে কিছুদিন ছিল।

—জমি পাওয়া যায় ?

—কেন যাবে না, নেবেন ?

আমার একটা খারাপ অভ্যেস, যেখানে যত ভাল জায়গা দেখবো, সেখানেই আমার ইচ্ছে হবে যে বাড়ী তৈরি করি। সুতরাং অন্যমনস্কভাবে বলেই ফেললাম ইচ্ছে তো আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন না ! জমি আমিই দিচ্ছি। ঘরদোর আপাততঃ আমার আশ্রমের মত খড়েরই করুন, সস্তায় হবে।

—বেশ, তবে ঘর তৈরির দেখাশুনো আপনাকে করতে হবে। আমি তো কালই চলে যাচ্ছি, টাকা পাঠিয়ে দেবো।

সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তরের মধ্যে বসে আমি যেন ক্ষণকালের জন্য সেখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েচি মনে হলো। কি সুন্দর হবে যখন এখানে নিজের ঘরের সামনে বসে থাকবো এমনি নির্জ্জন রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে।

একটু পরেই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আজ পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে সেখানে আর যাওয়া ঘটে নি—যেমন ঘটে নি আরও কত ওর চেয়েও ভাল জায়গায় যাওয়া—যেখানে যেখানে বাড়ী করবার অদম্য ইচ্ছা একদিন মনে হঠাৎ জেগেছিল এবং হঠাৎই মিলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মধ্যে আমার ঝাড়গ্রামের সেই আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—তুমি কি কোনো সাধুকে জমি কেনার কথা বলেছিলে? একদিন হাটে আমার সঙ্গে এক সাধুর দেখা। আমায় বললেন, আপনাদের বাড়ীতে এসেছিলেন কলকাতার একটি বাবু, তিনি জমি নেবেন বলেছিলেন। জমি সব ঠিক করে ফেলেচি, তিনি যদি আসেন তবে জমিটা লেখাপড়া করিয়ে দিই! ভাবে বুঝলাম, তুমি।

মনে পড়লো আরও অনেক জায়গায় অমন জমি নেবো বলেছিলাম। তখন সৌন্দর্য্য দেখে ভুলে যাই যে অত জায়গায় বাড়ী করবার মত পয়সা নেই আমার হাতে। সেবার দার্জ্জিলিঙ গিয়ে ভাবলাম ঘুমে একটা বাড়ী না করলে আর জীবনে ঘুম নেই! কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করে জানা গেল অন্ততঃ ছয় হাজার টাকার কমে ঘুম শহরে বাড়ী হবার জো নেই—তখনই—শত হস্তেন বাজিনাম্।

ঝাড়গ্রামের আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়। ব্ল্যাক-আউটের কলকাতায় বসে ক্ষণকালের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠলো খানাকুই গ্রামের প্রান্তে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তর; বনে-ঝোপে অজস্র ফোটা ল্যাণ্টানা ফুল, নানা রং বেরং-এর। এই ফুলটা ওখানকার জঙ্গলে যত দেখেচি তত বাংলাদেশের এ অঞ্চলে কোথাও দেখি নি। তবে আজকাল কিছু কিছু আমদানি হয়েচে, বিশেষতঃ রেললাইনের ঢালুতে। রেললাইনের ঢালুতে অনেক বিদেশী ফুল দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো রেলগাড়ীর সাহায্যে ঐ সব বীজ দেশবিদেশে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে—এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে আমি জানি নে।

জানুয়ারী মাস! আমি ঘাটশিলা আছি সে সময়। পাশের স্টেশন হোল গালুডি। কয়েকটি বন্ধু সেখানে ইংরিজি নববর্ষের উৎসব করবেন, আমাকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেচেন।

হেঁটেই রওনা হই। বেশি নয়, ছ মাইল রাস্তা। কিন্তু পথের দৃশ্য আমার কাছে বেশ ভালই লাগে। উঁচু রেলপথের বাঁধ দিয়ে হেঁটে যাচ্চি, ডাইনে মাইল দুই আড়াই দূরে এবং বাঁয়ে মাইল চারেক দূরে রেলপথের সঙ্গে সমান্তরাল শৈলমালা চলেচে বরাবর। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলমালা, বাঁদিকে কালাঝোড়।

বেলা পড়ে এসেচে। একস্থানে রেলওয়ে কাটিং, অর্থাৎ সেখানে উঁচু ডাঙার কঠিন পাথরের মধ্যে দিয়ে রেললাইন কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েচে। বড় বড় চূণাপাথর ও ঝাজিপাথরের চাঁই পড়ে আছে, খুব উঁচু পাথরের স্তূপ দেখাচ্চে অনুচ্চ পাহাড়ের মত।

একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জায়গাটাতে একটু বসে নিলাম। সূর্য্য হেলে পড়েচে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশের মাথায়। কিছু দূরে জগন্নাথপুর বলে সাঁওতালী গ্রাম।

একটা মাদার গাছ। ধূ ধূ করচে সিংভূমের উন্মুক্ত প্রান্তর। শীতের হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্চে বলে আলোয়ানটা মুড়িসুড়ি দিয়েচি।

হঠাৎ একটা লোক বাংলা গান গাইতে গাইতে যাচ্চে "হরি দুখ দাও যে জনারে।"

বাংলাদেশ থেকে এত দূরে নীলকণ্ঠের গান কে গাইতে গাইতে যায়? ছেলেবেলায় বাবার মুখে শোনা গান—এখন এসব গানের চলন আর কোথাও নেই। সিনেমার গানে দেশ গিয়েচে ভরে!

আমার ডাকে লোকটা কাছে এল। মলিন তালি-দেওয়া নীল প্যাণ্ট ও শার্ট পরা একজন সাঁওতাল যুবক। বললাম—বাড়ী কোথায় রে?

—বনকাটি।

—মৌ-ভাণ্ডারে কাজ করিস্?

—হাঁ বাবু।

—এ গান শিখলি কোথায়?

—বুঢ়া লোকদের মুখে শেখা বাবু।

—সবটা জানিস্? গা' দিকি—

—বাবু, তোমাদের সামনে কি আমরা গান গাইতে পারি? উশ্চারণ হয় না—

—ঠিক হবে, তুই গা। কি কাজ করিস্?

—স্মিলোটে (অর্থাৎ, স্মেলটিং বিভাগে)—

—হপ্তা কত পাস্?

—চার টাকা সাত আনা বাবু—

—আচ্ছা গান গা—

গান গেয়ে ছোকরা চলে গেল। আমিও উঠে কাঁদোড় নামে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য ঝর্ণা পার হয়ে গালুডি এসে পৌছলুম। বড় বড় পাহাড়ে তখন ছায়া পড়ে এসেচে—দূব থেকে বেশ দেখাচ্চে পাহাড়ের গাগুলো। কাঁদোড় নদীতে সাঁওতাল মেয়েরা মাছ ধরচে, কুলিরা মাঠ থেকে ঘুটিং পাথর কুড়ুচ্চে গালুডির মাড়োয়ারী মহাজনদের জন্যে।

গালুডিতে পৌছুতে বন্ধুরা খুব খুশী হলেন। নববর্ষের উৎসবে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটা অভিনয় করলে, যথেষ্ট খাওয়া দাওয়া গেল। ঘাটশিলাতে ফিরলাম সেই রাত্রেই, জনৈক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মোটরে। বাড়ী আসতেই শুনলাম, চাঁইবাসা থেকে মোটর নিয়ে লোক এসেছিল, সেখানে সভা করতে যেতে হবে। বললাম—তারা গেল কোথায়?

—তুমি গালুডি গিয়েচ শুনে, ওরা মোটর নিয়ে সেখানে গেল খুঁজতে।

—পথে তো কোনো মোটরের সঙ্গে দেখা হয় নি, তবে আমরা মোড় ঘুরলে হয়তো ওরা পৌচেচে, এ হতে পারে।

আমার ভাবনা হোল বিদেশী লোক রাত্রে থাকবে কোথায়? তাদের তো গালুডি যাবার

কোনো দরকারই ছিল না। সে রাতে কেউ এল না, খুব সকালে দেখি একখানা মোটর বাড়ীর পাশে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে গেলুম, চাঁইবাসার তারাই বটে।

—কাল গ্যালুডি গিয়েছিলেন কখন ?

—আর মশাই কি কষ্ট ! তখন রাত দশটা।

—তারপর ?

—খুঁজে তো বাড়ী বের করলাম, তাঁরা বললেন, এইমাত্র মোটরে ওঁরা চলে গিয়েচেন।

—রইলেন কোথায় ?

—সেখানকার ডাকবাংলোয়।

যাহোক, খেয়ে-দেয়ে চাঁইবাসা রওনা হই। স্বুবর্ণরেখার ক্ষীণ জলধারা কংক্রিটের নীচু সাঁকোর উপর দিয়ে ঝির ঝির করে বইচে—আমরা মোটরে সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম—কিন্তু বর্ষাকালে সাঁকো ডুবে যায়, ডোঙা ছাড়া পার হওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

মুসাবনীর রাস্তা আরও দু মাইল দূরে। চওড়া মোটর-রোড, একদিকে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলশ্রেণী, অন্যদিকে বন। টাটা-কোম্পানী এক জায়গায় পাহাড়ের গা থেকে schist পাথর কেটে নিয়ে যাচ্চে ; সেখানটাতে পাহাড়ের গায়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত যেন একটা দগদগে ঘা।

রাখা-মাইন্‌স্ পার হয়ে বন পাতলা হয়ে এল। চষা ক্ষেত, সাঁওতালী গ্রাম ডাইনে। বাঁদিকে কিন্তু সেই যে পাহাড় চলেচে, তো চলেচেই। শীতকালে পত্রবিরল দীর্ঘ দীর্ঘ শালের গাছগুলো দেখে মনে হচ্চে কারা যেন পাহাড়ের ওপরে শালের খুঁটি পুঁতে রেখেচে।

বাঁদিকে এক জায়গায় একটা নাবাল মত উপত্যকা। সংকীর্ণ গিরিপথের বাঁ দিকের পাথরে সিঁদুরের দাগ লেপা। এখনকার নাম কাপড়গাদি ঘাট। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় এই পর্য্যন্ত এসে আর নাকি এগোন নি (পাণ্ডবেরা যান নি দুনিয়ার হেন জায়গা দেখি নি ! পাণ্ডবদের পদচিহ্ন সর্ব্বত্র), অতএব এরও আগের ভূভাগ হোল পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ। আর এখানে কবে তাঁরা নাকি ময়লা কাপড় সাবান সোডা দিয়ে কেচে পরিষ্কার করেছিলেন। তাই এর নাম কাপড়গাদি ঘাট। বেচারী পাণ্ডবেরা ! বনে জঙ্গলে টো টো করে ঘুরে বেড়ালে কাঁহাতক কাপড় পরিষ্কার রাখা যায় ? আরও এগিয়ে গেলুম মাইল বারো—সবসুদ্ধ যেতে হবে ৪৭ মাইল রাস্তা এই রকম শোভাময় বনপথ দিয়ে।

একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়িয়ে একটা রেল লাইন আমাদের রাস্তার ওপর দিয়ে কোথায় যেন গেল। শুনলাম, এটা টাটা-বাদামপাহাড় লাইন। এর পরই দিগন্তপ্রসারী মাঠের মধ্যে তিরিন্ বলে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বাড়ীঘরগুলো বিশাল প্রান্তরে দিক্‌হারা হয়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে যেন পরস্পর জড়াজড়ি করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

এক পাশে একটা ডাকবাংলোর মত ঘর। সেখানে গিয়ে মোটর থামাতেই একটি বাঙালী

বাবু এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাকে একবার নামতে হচ্চে।

—কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাবে, চাইবাসা পৌছুতে।

—তা হোক্, সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা—

কি করি, নামতেই হোল! মাঝারি আকারের বাংলো, চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা। ভদ্রলোকটির বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়; এখানে পি. ডব্লিউ. ডি-তে চাকুরী করেন।

—কতদিন আছেন?

—তা প্রায় দু বছর—

—কেমন লাগে?

—আমি এক রকম যা হয় করে থাকি, কাজে পাঁচ জায়গায় ঘুরি, কিন্তু বাড়ীব মেয়েদের বড় কষ্ট।

—এ গ্রামে—

—এ গ্রামের কথা বাদ দিন। এখানকার মেয়েদের সঙ্গে খাপ খায় না—বাঙালীর মেয়ে অন্য বাঙালী মেয়ের মুখ না দেখলে হাঁপিয়ে ওঠে, তাদের হয়েচে সত্যিকারের বনবাস।

—কিন্তু সিনারি বেশ, কি বলেন?

—সে আপনাদের চোখে হয়তো লাগতে পারে। আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে—

মেয়েদের হাতে যত্নে সাজানো রেকাবে জলখাবার ও চা এল। আমরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাবুটির কথা শুনে গৃহলক্ষ্মীদের জন্যে সত্যিই মনে কষ্ট অনুভব করছিলুম, এ যেন সেই আরিজোনার মরুভূমির মত রুক্ষদর্শন ভূভাগ—কালো কালো অনাবৃত পাহাড়, টিলা, উন্মুক্ত দিকচক্রবাল, এখানে মেয়েদের মন হাঁপিয়ে ওঠবার কথা বটে।

ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর আতিথেয়তার জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠলুম। আরও মাইল দশ-বারো গিয়ে খড়কাই নদী। নদী পার হয়ে মোটর থামিয়ে সেই নির্জ্জন বালুকাস্তৃত নদীচরে অস্পষ্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। দূরে একটা পাহাড়, সামনে কটা রংএর বালুরাশির মধ্যে নাতিগভীর খাত সৃষ্টি করে ক্ষীণকায়া খড়কাই বয়ে চলেচে। কেমন একটি উদাস শোভা এই জনহীন প্রান্তরের, এই পার্ব্বত্য তটিনীর, রহস্যময়ী সন্ধ্যার।

চাইবাসা পৌচে গেলাম রাত আটটার মধ্যে।

সভার কাজকর্ম্ম পরদিন মিটে গেল। ওখানকার বন্ধুরা তখনও ছাড়তে চান না। দুজন ফরেস্ট-অফিসারের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়ে গেল। তাঁরা বললেন—আপনি বনের কথা লিখেচেন অনেক, কিন্তু সিংভূমের বন আপনি দেখেন নি—

আমি বললাম—কেন, অনেক বন তো দেখা গেল—

তাঁরা মৃদু মৃদু হাসলেন। বললেন—আমরা ফরেস্ট-অফিসার হয়ে বন দেখি নি, আর আপনি বন দেখেচেন? হোতেই পারে না।

—কোন্ বনের কথা বলচেন?

—আপনি বাঝিয়াচুর দেখেন নি, চিটিমিটি দেখেন নি, জাতে দেখেন নি—

—জাতে? সে আবার কি রকম নাম? চিটিমিটিই বা কি নাম—

—হো-ভাষার নাম। ও অঞ্চলের বনের বাসিন্দা সবই হো—যেমন রাঁচীর ওদিকে সব মুণ্ডা। চলুন আপনাকে ওদিকটা দেখিয়ে আনি—

আমার আসল বন ভ্রমণ এইভাবে শুরু।

৩রা জানুয়ারী। বন্ধুরা মোটর নিয়ে এলেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হোল। রোরো নদী পার হয়ে আমাদের গাড়ী সোজা চললো রাঁচী-রোড বেয়ে প্রায় মাইল দশেক। তারপরেই বাঁদিকের ফরেস্ট-রোড ধরে বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললো।

চাইবাসা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের বড় শোভা। রাঙা মাটি, উচ্চাবচ ভূমিভাগ, ছবির মত দেখতে সমস্তটা। মুশকিল হয়েচে, যারা সেখানে অনেকদিন আছে, তারা সেখানকার সৌন্দর্য্য ভালো ধরতে পারে না। চাঁইবাসার বাসিন্দাদের অনেকের মতে এসব এমন আর কি?

এখানে একটা কথা মনে পড়লো। ঘাটশিলা থেকে সাত আট মাইল দূরে বেশ একটি নির্জ্জন বনভূমি ও ক্ষুদ্র একটি ঝর্ণা আছে। তার প্রবেশপথটি সত্যই অতি সুদৃশ্য। শরৎ-কালে, পর্ব্বতসানুর বনে অজস্র বনশিউলি ফুল ফুটে ঝরেচে শিলাতল বিচিয়ে, শিশিরার্দ্র বনস্থলীর সুগন্ধ মনে শান্তি আনে, তৃপ্তি আনে, নব নব কল্পনা জাগায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন আমাদের সঙ্গে এক বড়ঘরের বধূ ছিলেন, তিনি সারা পথ কেবল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগলেন—এ কি আর এমন। কাশ্মীরে যা দেখেচি তার তুলনায় এ—

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করচি নে। কাশ্মীর ভালো নয় কেউ বলচে না—তা বলে, যে একবার কাশ্মীর দেখেচে তার কাছে সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিস্বাদ হয়ে যাবে, আর কিছু থেকে সে আনন্দ পাবে না, গাছপালা নদী প্রান্তরের সৌন্দর্য্য দেখবার সহজ চোখ সে হারিয়ে ফেলবে? এ যদি হয় তবে কাশ্মীর না দেখাই মঙ্গলজনক।

বরকেলা শৈলশ্রেণীর মধ্যে বনপথে অনেকখানি গিয়ে সৈদবা নামে একটি বন্যগ্রাম আছে। সেখানে বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের জন্য একটি বাংলো আছে। বেলা প্রায় বারোটা। রান্নাবান্না করে খেয়ে নিতে হবে এখান থেকে। আমরা চা খেয়ে বাংলোর আরাম-কেদারায় গল্প করি কিছুক্ষণ।

মিঃ সিংহ বললেন—আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন বলে ভাববেন না এ বড় আরামের জায়গা।

—কেন?

—রাত্রে এই বাংলোর বারান্দাতেই আমি বাঘ চরতে দেখেচি।

—গ্রাম তো রয়েচে নিকটে।

—গ্রাম থেকে ছাগল ভেড়া ধরে নিয়ে যায় বাঘে।

—মানুষও নাকি ?

—সুবিধে পেলে ছাড়ে না।

ঘরের বাইরে এসে চারিদিকটা ভালো করে দেখে নিলাম।

বাংলোর পিছনে বোধহয় একশো হাতের মধ্যে উঁচু পাহাড়। ঠিক এ রকমই পাহাড় ও বাংলোর সম্মেলন এইবার আর একজায়গায় দেখেছিলুম সে কথা পরে বলব। সেটা হোল মানভূম জেলায়। পাহাড়ের ঢালু থেকে বনানী নেমে এসে বাংলোর হাতায় মিশেচে; লোকজন তত চোখে পড়ে না।

একটা ছোট খড়ের ঘরের সামনে এসে মোটর দাঁড়ালো। বস্তি-নয়, অন্ততঃ আশে পাশে লোকজনের বাস দেখলাম না। শুনলাম ঘরটা গবর্নমেণ্টের বাংলো, বনবিভাগের লোকজন সেখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতে পারে।

এখান থেকে বামিয়াবুরু প্রায় এগারো মাইল দূরে। এই এগারো মাইলের মধ্যে লোক-জনের বাস নেই—ঘন বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকে পড়ল ক্রমশঃ—মোটর রোড ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর উঠলো- বড় বড় গাছ দুধারে, শাল আর প্রায়ই মহুয়া।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটু ফাঁকা—চেয়ে দেখি আকাশ যেন অনেকখানি নীচে, বুঝলাম অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েচি।

মিঃ সিংহ বললেন—মুখ বার করে চেয়ে দেখুন, ওই ওপারে ফরেস্ট-বাংলো।

সত্যই অনেক উঁচুতে বাংলোটা। যে পাহাড়ে উঠচি, এই পাহাড়ের মাথায় সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটা বাংলোঘরের লাল টালির ছাদ একটু একটু চোখে পড়চে।

অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের মোড় ঘুরে মোটরটা অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে একটা প্রকাণ্ড বাংলোর সামনে এসে থেমে গেল। তখন শীতের সন্ধ্যার রাঙা রোদ নিকটে দূরে ছোট বড় পর্ব্বতশিখর সোনার পাতে মুড়ে দিয়েচে।

স্থানটির গম্ভীর দৃশ্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। যেদিকে চোখ যায়, শুধুই বনাবৃত পর্ব্বতশিখর, ছোট বড়—নানা আকারের পর্ব্বতচূড়া, কোনোটা গোল কোনোটা মোচাকৃতি, কোনোটা সমতল, ঘন বনে ভরা, আবার কোনো কোনো পর্ব্বত-গাত্র অনাবৃত, কালো ব্যাসাল্ট পাথরের স্তর সাজানো, রাঙা রোদ পড়ে সোনার পাহাড়ের মত দেখা যাচ্চে।

বললুম—নিকটে কোনো লোকালয় নেই ?

—নিকটতম লোকালয় সেই কুইরা গ্রাম। এগারো মাইল দূর এখান থেকে—

—বড্ড নির্জ্জন জায়গা। এখানে কি কেউ থাকে ?

—বাংলোর চৌকীদার ফ্যামিলি নিয়ে বাস করে পাহাড়ের নীচের দিকে।

—অদ্ভুত বনের দৃশ্য বটে। বাঘ ভালুক আছে ?

—বুনো হাতী যথেষ্ট। বাঘও আছে, ভালুকও আছে—

চায়ের টেবিল পাতা হোল আমি প্রস্তাব করলাম, টেবিল টেনে বাংলোর সামনে সমতল জায়গায় পাতা হোক্। রাঙা রোদ মাখানো অরণ্য ও পর্ব্বতশিখরের দিকে চোখ রেখে বসে চা খাওয়া যাক। সত্যিই এমন গম্ভীর অরণ্য-দৃশ্যের মধ্যে চা খাওয়া হয় নি কতকাল। এই বাংলোর সামনে দিয়ে গভীর রাত্রে কত বন্য হাতী, বাঘ ভালুক চলে বেড়ায়—গবর্নমেণ্টের নোটিশ টাঙানো আছে বেশি রাত্রে বাংলোর বারান্দায় কেউ না আসে—এমন নির্জ্জন বন্য পরিবেশের মধ্যে রুটি, মাখন, চা প্রভৃতি সভ্য খাদ্য খাওয়ার নূতনত্ব আছে বই কি।

চা খাওয়ার পরে মিঃ সিংহ বললেন—অন্ধকার হওয়ার দেরি আছে এখনও। চলুন আপনাকে মাছ ধরার বাঁধ দেখাই—

আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে এলুম, চারিধারে নির্জ্জন ঘন অরণ্যানীর স্তব্ধতা; কয়েকটি হো-কুলি-মেয়ে লতাপাতা নিয়ে তৈরী কুঁড়েঘরের সামনে বসে বুনো খেজুর পাতার চেটাই বুনচে।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাদের কি হাসি! আমি হো-ভাষা জানি না, মিঃ সিংহ তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথাবার্ত্তা বললেন।

আমি বললুম—কি বলচে ওরা?

—বলচে, বাবু এখানে কি দেখতে এসেচ!

—জিজ্ঞেস করুন ওদের নাম কি।

—একজনের নাম সামান্ কুই, একজনের নাম বুধন্ কুই—কুই অর্থাৎ মেয়ে।

—বেশ নাম। ওরা কি খায়?

—শুধু ভাত। না ডাল, না তরকারী, ও সব খেতে জানে না এদেশে।

—সারাদিনে কি রোজগার করে?

—চার আনা।

—এতেই সন্তুষ্ট থাকে?

—খুব। একটু পরে দেখবেন গান করবে সবাই এক সঙ্গে। ওদের মত অল্পে সন্তুষ্ট জাত নেই। মিথ্যা কথা বলতে জানে না, অত্যন্ত সরল। সভ্যতার সম্পর্কে যারা এসেচে, তারা সবাই দুষ্টু, বদমাইশ হয়ে গিয়েচে। কোনো টাউন বা কারখানার নিকটে যে সব হো বা ওঁরাও বাস করে, প্রায়ই সব খারাপ! কিন্তু এ বনের মধ্যে এরা অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সৎ।

ওদের মুখের দিকে চাইলেই সে কথা বোঝা যায়। ছেলেমানুষের মত পবিত্র সরল নিষ্পাপ মুখশ্রী। সরলতা ও নির্লোভতা ওদের মুখে সুকুমার রেখার অক্ষরে লেখা রয়েচে।

মিঃ সিংহ বললেন—আর একটা মজা, এরা বেশী রোজগার করতে চায় না। দিনের সামান্য মজুরি হাতে পেলেই খুশী। আর কিছুতেই কোনো প্রলোভনেই সেদিন খাটতে চাইবে না। এক জায়গায় সবাই গোল হয়ে বসে চেটাই বুনবে, গান গাইবে। কিন্তু রাঁচী শহরে গিয়ে এদের দেখুন, অন্যরকম দেখবেন।

আমরা এগিয়ে গিয়ে একটা বড় ঝর্ণার কাছে এলাম। ঝর্ণার এক দিকে বাঁধ বাঁধা।

বর্ষাকালে এখানে একটা পুকুরের সৃষ্টি হয়। মিঃ সিংহের মুখে শুনলাম, এটাই মাছ ধরার বাঁধ। কোথা থেকে মাছ আসে একথা আমি জিজ্ঞেস করি নি।

তখন সে সব তুচ্ছ প্রশ্নের অবকাশও ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে অরণ্যের অলি-গলিতে, সুঁড়ি পথে ঘন হয়ে নামচে। যেখানটাতে মাছের বাঁধ তার চারিধারে বড় বড় শালগাছ উঁচু হয়ে আকাশকে ঢেকেচে—শুধু অন্ধকার আর জলপতনধ্বনি আর নির্জ্জনতা আর মনের মধ্যে এক রকমের গা-ছমছম্-করা ভয়ের বিচিত্র অনুভূতি। মাছের বাঁধ ছেড়ে আরও প্রায় দু রশি গিয়েচি তখন। দু রশি কি তিন রশি, কিন্তু চারিদিকে চেয়ে আমার মনে হোল এ পৃথিবীতে আমি আর এই দুই বন-বিভাগের কর্ম্মচারী ছাড়া (দুজনেই মিঃ সিংহ—হরদয়াল সিং ও যোগীন্দ্র সিংহ) আর বুঝি কেউ নেই—আফ্রিকার ঘন অরণ্যে নর-খাদক অসভ্য জাতিদের দেশে যেন এসে আটক পড়ে গিয়েচি। যেমন ঘন বনানী তেমনি ঘন অন্ধকার চারিপাশে।

হরদয়াল সিং হঠাৎ বললেন—এইখানটা একটু সাবধান, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানকার ওই সুঁড়ি পথটা দিয়ে জল খেতে নামে ঝর্ণায়।

জঙ্গলের একপাশ দিয়ে একটুখানি সরু পথরেখা অন্ধকারেও যেন বিভীষিকার সৃষ্টি করে রেখেচে মনে হোল। বললুম—তা গিয়ে—এবার ফিরলে ভালো হোত না? বাংলো থেকে প্রায় মাইল দেড়েক তো এসে গিয়েচি।

ফিরবার পথে আবার সেই হো-মেয়েদের আস্তানা। বাঘের, হাতীর, বুনো ভালুকের দেশের মেয়ে এরা। দিব্যি সেই অরণ্য মধ্যে দরজাহীন, অর্গলহীন পাতার কুঁড়ের মধ্যে বসে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করচে। কেউ কেউ কুঁড়ের সামনে বসে চেটাই বুনচে, গল্প করচে, গান করচে।

আমাদের দেখে আবার ওরা হাসতে লাগলো—অথচ হাসবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ছেলেমানুষের মত সম্পূর্ণ অকারণে উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবাহ।

আমাদের আপ্যায়ন করে বললে—জোম্ পে—জোম্ পে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কি বলে?

—বলচে, ভাত তৈরি—খাও।

—চলুন দেখা যাক—কি খাচ্চে।

বড় বড় মেটে হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হয়েচে অথচ কোনো দিকে কিছু দেখা গেল না। ওরা বড় কাঁসার উঁচু থালাতে এক রাশ ভাত ঢেলেচে এক একজনের জন্য। শুধুই ভাত—নুনই বা কৈ! আশ্চর্য্য এই যে, ওই নিটোল স্বাস্থ্য শুধু এই উপাদানবিহীন ভাত খেয়ে। আমি মিঃ সিংহকে বললুম—ওদের জিজ্ঞেস করুন, ওরা ডাল তরকারী খায় না কেন? আমার প্রশ্নের অর্থ যখন তাদের বোধগম্য হোল, তখন তারা আর এক প্রস্থ হেসে উঠলো—যেন আমি খুব একটা হাসির কথা বলেচি। উত্তর দিলে—এই খাই।

কারণ নেই, যুক্তি নেই, কথার বাহুল্য নেই। শুধু উত্তর দিলে—এই খাই।

অনেক ঘেঁটু গাছ বনের প্রান্তে, পাহাড়ী ঢালুর সীমানায়। তবে কিনা এখন ফুল নেই গাছে, তবুও আনন্দ হোল গাছগুলো দেখে, এতদূর পাহাড়ী দেশে বাংলাদেশের নিজস্ব বন্যপুষ্পের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটলো।

অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানটি, দূরে সৈদবা গ্রাম, কিন্তু বাংলো থেকে গ্রামের ঘরবাড়ী নজরে আসে না। আমরা কিছু দূরে একটি উপত্যকায় সাবাই ঘাসের চাষ দেখতে গেলুম, একটি পাহাড়ী ঝর্ণা পার হয়ে মোটর গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে, সে স্থানটি চারিদিকে বনে ঘেরা, মাঝখানে খানিকটা সমতল ফাঁকা মাঠ। গাঁট বাঁধা কলে হো-কুলিরা সাবাই ঘাসের আঁটি একত্র করে গাঁট বাঁধচে। নিকটেই গাছতলায় একজন কেরাণী বসে কুলিদের হিসেব রাখচে।

কেরাণী সর্ব্বত্রই বাঙালী। কাছে গিয়ে বললুম—মশাইকে বাঙালী বলে মনে হচ্চে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি এখানে ক্লার্ক? কতদিন আছেন?

—তা সাত বছর হোল।

—এ সাবাই ঘাসের ব্যবসা কাদের?

—আজ্ঞে দেবীপ্রসাদবাবুর, সম্বুয়া স্টেশনের কাছে আপিস আর আড়ৎ—মাড়োয়ারী।

—মাড়োয়ারী তো নিশ্চয়ই। সে আপনি বলবার আগেই বুঝেচি। জায়গা কেমন এটা?

—ভালো। তবে বড্ড জঙ্গল—মানুষের মুখ দেখার জো নেই।

—থাকেন কোথায়?

—সৈদবা গ্রামেই বাবুদের বাসা আছে কর্ম্মচারীদের জন্যে, সেখানে রেঁধে খাই।

—ভাল লাগে?

—নাঃ। তবে কি করি বলুন, চাকরীর খাতিরে সবই করতে হয়। এই বাজারে চাকরীটুকু গেলে—

—সে তো বটেই।

বনবিভাগের দু জন বড় কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে। তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের ওপরে যেখানে সাবাই ঘাসের চাষ চলচে। পাহাড়ের ঢালু জমিতে বড় বড় ট্রেঞ্চ কাটা হয়েচে পাহাড় ঘিরে। তার আশে পাশে গোছা গোছা উলু ঘাসের মত সবুজ সাবাই ঘাসের গোছা—আমন ধানের গোছার মত।

বললুম—ট্রেঞ্চ কিসের?

দু জন বনবিভাগীয় কর্ম্মচারীই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বললেন—জানেন না, ওর নাম কন্‌টুর ট্রেঞ্চ—ওই খালের মত কাটা আছে বলে পাহাড়ের মাটি সরস হয়ে উঠচে। ও জিনিসটা নতুন বেরিয়েচে, আগে ও থিওরিটা ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে, কন্‌টুর ট্রেঞ্চের হাওয়া যতদূর যায়, ততদূর সরস হয়ে ওঠে মাটি আর বাতাস।

এ কথা এদের মুখে আরও অনেকবার শুনেচি। কন্‌টুর ট্রেঞ্চ থিওরির বড় ভক্ত এঁদের

মত আর দেখি নি। সেই ভীষণ শুষ্ক পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করা শক্ত যে কোনোদিন আবার এখানকার মাটি-বাতাস সরস হবে।

বললুম—আপনারা ইজারা দেন দেবীপ্রসাদ মাড়োয়ারীকে ?

—ন বছর লিজ আছে ওর সঙ্গে। চার হাজার টাকা বছরে—

– তিনি কোথায় ঘাস বিক্রি করেন ?

—বামার লরি কোম্পানীর কনট্রাক্ট আছে—তারা সনুয়া স্টেশন থেকে মাল নিয়ে যায়।

—বেশ লাভ আছে, কি বলুন ?

—খরচ-খরচা বাদে পাঁচ-ছ হাজার টাকা থাকে দেবীপ্রসাদবাবুর। নইলে কি কেউ ভূতের বেগার খাটে !

মনে ভাবলুম, ভূতের বেগার দেবীপ্রসাদবাবু খাটতে যাবেন কেন, সে যদি কাউকে খাটতে হয় তবে খাটচে ওই বেচারী বাঙালী কেরাণীবাবু। এই নির্ব্বান্ধব স্থানে জঙ্গলের মধ্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খেটে হয়তো মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়—তাও পায় কিনা। ধনিক যিনি, তিনি প্রকাণ্ড অষ্টিন-গাড়ীতে চেপে এসে একবার এক ঘণ্টার জন্যে হয়তো এসে তদারক করেন।

সেই বনাবৃত উপত্যকার এক প্রান্তে সেই ঝর্ণাটির কুলুকুলু ধ্বনি বনপত্র-মর্ম্মরের সঙ্গে মিশে এক মধুর সঙ্গীত রচনা করে চলেচে। আমরা তিনজনেই বটবৃক্ষের ছায়ায় শুকনো ছড়ানো সাবাই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, আকাশ দেখি, বিহঙ্গ-কাকলী কান পেতে শুনি, খোশগল্প করি।

বেলা দুটোর পর বাংলোতে গিয়ে আহারাদি সেরে নিলুম। গরম গরম খিচুড়ি খেতে সেই বনের মধ্যে খুব মিষ্টি লাগলো।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথযাত্রা। দু পাশের ঘন বন, একদিকের পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যেকার চওড়া রাস্তা দিয়ে মোটর ছুটেচে। বন ক্রমশঃ ঘন হতে ঘনতর হয়ে উঠেচে। যেতে যেতে এক জায়গায় মনুষ্যকণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীত কানে এল। ব্যাপার কি ? গান গায় কে ?

মিঃ সিংহ বললেন—দেখবেন ? এখানে কাইনাইটের খনি আছে—

—জঙ্গলের মধ্যে—

—বেশী দূর নয়, পথের ধারে।

মোটর থামিয়ে আমরা গাছপালা ঠেলে বনের মধ্যে ঢুকি। আমাদের সামনে একটা ধাওড়া চালাঘর, জংলীঘাসে ছাওয়া। ত্রিশ চল্লিশ জন তরুণী স্বাস্থ্যবতী হো-কুলিরমণী সেখানে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে লোহার দুরমুশ দিয়ে পাথুরে কয়লার মত কি জিনিস চূর্ণ করচে আর এক সঙ্গে গান গাইচে হো ভাষায়।

মিঃ সিংহ বললে—ঐ কালো কয়লার মত জিনিসটাই কাইনাইট্।

—খনি কোথায় ?

—আরও জঙ্গলের মধ্যে।

—এর মালিক কে ?

—এও দেবীপ্রসাদ মাড়োয়ারীর। বনের মধ্যে খনির কাছেই এঁর বাসা আর আপিস আছে। সেখানে দু-তিন জন বাঙালীবাবু—

—খাতা লিখচে

—হ্যাঁ।

আবার মোটরে এসে উঠলুম। বন ছাড়িয়ে উঁচুনীচু মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে আবার ছোটো-খাটো বন, আবার মাঠ, মাঝে মাঝে পাথর ছড়ানো হো-গ্রাম। ফিল্মের ছবির মত সুন্দর এই বন্য গ্রামগুলি। কালো মাটির দেওয়াল দেওয়া ছোট নীচু ঘরগুলি, চালায় চালায় বসতি। এরা ফাঁকা ফাঁকা ভাবে বাড়ী তৈরী করতে জানে না, এক বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে অন্য গৃহস্থ চালা বসিয়েচে অন্যদিকে। বড় বড় পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে—বোধহয় সেগুলো পারিবারিক সমাধি বা দেবদেবীর স্থান। প্রত্যেক হো বন্য গ্রামেই এমন পাথর ছড়ানো দেখেচি—মোটা মোটা পাথর ডালমেন্ বা মেনহিরের ধরণে খাড়া করে পোঁতা—তাদের গায়ে হিন্দিতে কি লেখাও আছে।

একখানা পাথরের গায়ে লেখা—

বনটু মালাইয়ের পুত্র অম্বিক মালাই।
ঘর—বনটুডি
জিলা—সিংভূম

জিজ্ঞেস করলুম—কাকে অমর করবার ব্যবস্থা এ ?

মিঃ সিংহ বললেন—কেন বনটু মালাইয়ের পুত্র অম্বিক মালাইকে।

—তার কি হয়েচে ?

—সে মারা গিয়েচে।

আবার ফিরলাম বামিয়াবুরু বাংলোতে। সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

পরদিন বামিয়াবুরু বনের মধ্যে বেড়াতে বার হওয়া ঠিক হয়েচে, আমরা একটু বেশী রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম।

অন্ধকার রাত্রি ; আমার চক্ষে ঘুম নেই, এমন বিশাল অরণ্যের মধ্যে কখনো রাত কাটাই নি। বসে বসে দেখছিলাম বাংলোকে ঘিরে চারিধারে শুধু বন আর পাহাড়, পনেরশো ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের এই বাংলো, সুতরাং এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্চে ছোট বড় পর্ব্বতশিখর, আবছায়া অন্ধকারে ঘেরা।

যোগীন্দ্র সিংহ বন বিভাগের কর্ম্মচারী বলেই যে বনশ্রী ভালোবাসেন তা নয়—তেমন যোগাযোগটি সব সময় ঘটে না—ভাবুক লোক। অন্ধকারময়ী রজনীর রূপ দেখবার জন্যে তিনিও আমার সঙ্গে জেগে বসে আছেন বাইরে।

কিসের একটা সুগন্ধ বাতাসে। সিংহ বললেন—পাচ্ছেন গন্ধটা ?

—ভারি চমৎকার গন্ধ বটে। কিসের ?

—কোনো অজানা বনফুলের—

আমি একটা ভয়ানক ভুল অনেকক্ষণ থেকে করছিলাম। বামিয়াবুরু এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্যে একপ্রকার গাছকে আমি বারবার কনকচাঁপার গাছ বলে আসচি এবং এই দুই বন-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীর সঙ্গে তর্ক করেচি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায়—কারণ ওঁরা বলচেন, চাঁপাগাছ নয়। ও হোল ভেড্‌লেণ্ডিয়া—আর চম্পক হোল মাইকেলিয়া। চম্পক ; তার পাতা হবে কালো কালো লম্বা লম্বা।

আমি বলে আসচি, না তা নয়। স্বর্ণচাঁপার পাতা অমন হবে না। এই যাকে বলচেন ভেড্‌লেণ্ডিয়া এই হোল স্বর্ণচাঁপা। ওঁরা আমার জেদ দেখে বলেছিলেন—তা হতে পারে হয়তো। কিন্তু ও গাছকে আমরা আগাছা স্বরূপ বিবেচনা করি।

এ ভুল আমার কি ভাবে ভেঙেছিল, সে পরে বলচি—এখন আমার হঠাৎ মনে হোল বনের সেই স্বর্ণচাঁপার সুগন্ধ নয় তো ? কিন্তু এখন তো চাঁপাফুল ফোটবার সময়ও নয়।

বড় সুগন্ধ ফুলটার—যে অজানা ফুলই-হোক বনের,—অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্ম-নিবেদন নিশ্চয় ব্যর্থ নয়। বিশ্বের বড় গেরস্থালিতে এতটুকু জিনিসের অপচয় হবার জো নেই !

অদ্ভুত গম্ভীর শোভা এই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যানীর। মাথার ওপরে ঝক্‌ঝকে তারা ছিটানো আকাশ, চারিধারে শৈলশ্রেণী, তাদের ছোট বড় চূড়া যেন আকাশের গায়ে ঠেকেচে —মাঝে মাঝে দু-একটা রাত-জাগা পাখীর ডাক, সর্ব্বোপরি একটা গহন গভীর রহস্য যেন এই রাত্রে এই বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। শোওয়া কি যায় ? এমন রাত্রি নিদ্রার জন্যে তৈরী হয় নি।

—আমরা জেগে বসে থাকি, কি বলেন মিঃ সিংহ ?

—খুব ভালো।

মনে হোল এমন বিরাট অরণ্য কখনো দেখি নি জীবনে। এমন বিরাট বনস্পতি শ্রেণীর সমাবেশ, সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত-দর্শন শৈলশ্রেণী—দুইয়ের এই যোগাযোগই এই অরণ্যকে সুন্দরতর, অধিকতর রহস্যময় করচে ; এ দেখবার সুযোগ বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ? রেল-পথের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অনেকে সহজেই যেতে পারেন বটে, যেমন মধুপুর, শিমুলতলা ইত্যাদি, কিন্তু সে সব স্থানে মানুষের ভিড়, ছোট বড ঘরবাড়ীর ভিড়। দূরে বা নিকটে এমন ধরণের অরণ্য নেই।

দেওঘর থেকে ১৪।১৫ মাইল দূরে এক বিরাট জঙ্গল আছে বটে, কানিবেলের জঙ্গল ; সেটা লছমীপুর গাড়োয়ালি স্টেটের অন্তর্ভুক্ত। আমি একবার ভাগলপুর থেকে দেওঘর পর্য্যন্ত পদব্রজে আসি সেই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। সে বন বড় একটা মালভূমির ওপর, তার শেষ প্রান্ত থেকে দূরস্থিত ত্রিকূট পাহাড় নীলমেঘের মত দেখা যায়, কিন্তু সে এমন শৈলমালা-বেষ্টিত নয়, এত বড় বনস্পতির সমাবেশও নেই সেখানে। স্টেটের লোক কাঠ বেচে জঙ্গল

অনেক নষ্ট করে ফেলেচে। দেওঘর থেকে সেখানে যাবার এক হাঁটা পথ ছাড়া উপায় নেই, কাজেই ইচ্ছে থাকলেও যাওয়ার সুবিধা কোথায়?

হঠাৎ মিঃ সিংহ বললেন—ওই আলোটা দেখচেন আকাশে, কিসের বলুন তো?

একটা পাহাড়ের চূড়ার ওপরকার আকাশে কিসের আলো বটে। যেন দূরের কোনো অগ্নিস্রাবী আগ্নেয় পর্ব্বতের আভা আকাশপটে প্রতিকল্পিত হয়েচে। আমি বুঝলাম না।

মিঃ সিংহ বললেন—ওটা টাটার আলো।

—এতদূর থেকে?

—খুব দূর কোথায়! সোজা ধরলে ত্রিশ মাইল—

একটু পরেই আলোটা মিলিয়ে যেতে আমার আর কোন অবিশ্বাস রইল না।

কিন্তু ঘন বনের দিকে কুকুর ডাকে কোথায়?

বললাম—কোনো বস্তি আছে না কি ও পাহাড়ের মধ্যে?

মিঃ সিংহ বললেন—ও হোল একরকম হরিণের ডাক; বার্কিং-ডিয়ার ঠিক কুকুরের মত ডাকে; যদি জেগে থাকেন, এ বনে আরও অনেক রকম জানোয়ারের আওয়াজ শুনতে পাবেন। হাতীর ডাক, বাঘের ডাক—

বেশি রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে থাকা আমাদের অদৃষ্টে ছিল না। বাংলোর মধ্যে থেকে হরদয়াল সিং ডাকাডাকি করতে লাগলেন, এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকা ঠিক নয় এসব জায়গায়। বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লেগে অসুখও তো হতে পারে।

পরদিন সকালে উঠে মিঃ সিংহ আমাকে এক অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় দেখালেন। সম্মুখের শৈলচূড়ার অন্তরাল থেকে বালসূর্য্য নিজের মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। আগে সমস্ত বড় বড় শিখরগুলোতে কে যেন সিন্দূর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিলে। যে-দিকে চাই সেই অজানা আকাশ-পরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল। ধীরে ধীরে রোদ ফুটে বেরুলো, শৈলশিখরবাসী সামান্য কুয়াশা দিনের আলোর সামনে মিলিয়ে গেল—কি সুন্দর স্নিগ্ধ প্রভাত।

আমরা চা পান করে বন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। চা খেতে একটু বেলা হোল; এখানে জঙ্গলে কোথায় দুধ মিলবে! দশমাইল দূরবর্ত্তী সেই কুইরী গ্রাম থেকে বনবিভাগের লোকে সাইকেল যোগে দুধ নিয়ে এল।

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী পথ—খানিকদূর নেমে এসে রাস্তায় উঠলাম আমরা চার-পাঁজচন লোক; দুজন বনবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী, দুজন ফরেস্ট গার্ড, আমার স্ত্রী ছিলেন সঙ্গে, আরও কয়েকটি লোক।

রাস্তার পাশের একটা সরু পায়ে চলার পথ নিস্তব্ধ, ঈষৎ অন্ধকার, ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করেচে। একটা সংকীর্ণ পাহাড়ী নালা বনের মধ্যে কুল্-কুল্ করে বয়ে চলেচে। এই নালার হো-নাম হচ্চে পোগা-মারো-গাঢ়া। বনের মধ্যে ঢুকেই মনে হলো এতক্ষণ অরণ্যানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি নি, যা দেখছিলাম তা বাইরে থেকে। এ যেন একটা ভিন্ন জগৎ—সুউচ্চ

সোজা, খাড়া শাল, কেঁদ, বারম প্রভৃতি বনস্পতিশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দিনের আলোক আটকেচে। সারাদিনের মধ্যে এখানে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ, সুতরাং বনভূমি ঈষৎ আর্দ্র, একটু বেশি শীতল, কাছে কাছে কত সুদর্শন অর্কিড, নিম্নে আগাছার জঙ্গলও বেশ ঘন।

এক জায়গায় ছোট-এলাচের গাছ হয়েচে, মিঃ সিংহ দেখালেন খুব বড় হলুদ গাছের মত পাতায় ছোট এলাচের গন্ধ। এদিক-ওদিক থেকে ক্ষীণ জলধারা আমাদের পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেচে, তার ওপর প্রস্তর-সঙ্কুল পথ, সুতরাং আমাদের যেতে হচ্ছিল খুব সন্তর্পণে।

একটা মাঝারি গোছের গাছ দেখে ওঁরা বিজয়ের হাস্যে বলে উঠলেন—এই। এই হলো মাইকেলিয়া চম্পক, চম্পক ফুলের গাছ।

আমি বললাম—এ চম্পক গাছ হতে পারে, স্বর্ণচাঁপা নয়।

—আমরা অন্য চাঁপাগাছ চিনি নে—এ গাছে চম্পক ফুল হয়।

—হতে পারে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর চাঁপা আপনারা যাকে ভেড্‌লেণ্ডিয়া বলচেন ওই হোল স্বর্ণচাঁপা। এ গাছের পাতা আমাদের দেশের নোনাগাছের মত দেখতে—এ স্বর্ণচাঁপা গাছ নয় কখনো। তবে এ চম্পক ফুল আমি কখনো দেখি নি, সে আমি স্বীকার করচি।

বড় বড় গাছ বেয়ে এক ধরণের লতা উঠেচে। ওঁরা বলেন—বুনো মেটে আলু হয় এর তলায়। এদেশের হো-মেয়েরা বন থেকে এগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

ঘন অরণ্যশীর্ষে প্রভাতের সূর্য্যালোক, কচিৎ কোন বনপুষ্প সুবাস, এ বড় বনানীর একটা গভীর রহস্যের ভাব আমার মনে এনে দিয়েচে; ভুলতে পারচি নে অরণ্য-সমাকুল সিংভূমের যে অংশে বিচরণ করচি, এটি ব্যাঘ্র ও অন্যান্য শ্বাপদঅধ্যুষিত এক মহাবন; ঠিক শৌখীন কোন পার্কে বেড়ানো নয় এটি—যে কোন সময়ে মত্ত হস্তীযুথ বা মহাকায় ব্যাঘ্রের সামনে এসে পড়তে পারি, আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—ফরেস্ট গার্ডের স্কন্ধস্থ কুড়ুল তখন কি কোনো কাজে আসবে?

হরদয়াল সিং বললেন—এখান থেকে টাইগার হিলে যাবেন?

—সে কোথায়?

—মাইল পাঁচেক দূরে এই বনের নিবিড়তম অংশে। বিহারের গবর্নর একবার কনজার-ভেটরকে না কি বলেছিলেন—তোমাদের বনের খুব wild জায়গাটি একবার দেখতে চাই। তাই বনবিভাগ থেকে এই স্থানটি নির্ব্বাচিত করা হয়। অবিশ্যি এর মধ্যে লাটসাহেবের সুখ সুবিধের দিকে কিছু দৃষ্টি রাখা হয়েছিল বই কি!

—কেমন জায়গাটি?

—খানিকটা পাহাড়ের উপর উঠতে হবে। একটা পাহাড়ের ওপরে সমতলভূমি টেবিলের মত। সেখান থেকে চারিদিকে চাইলে মনে হবে পৃথিবীতে ঘন বন ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই। দৃশ্য বড় চমৎকার। সত্যিকার বনের সৌন্দর্য্য দেখবেন—

যাবার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু পাঁচ মাইল কি যাওয়া যাবে হেঁটে সস্ত্রীক? উনি সঙ্গে না থাকলে কোন কথা ছিল না। দেখি কত দূর কি হয়।

যে নালার ধার দিয়ে দিয়ে আমরা যাচ্চি, সে নালাটির কালো জলে বিশাল বনস্পতি-শ্রেণীর ছায়া। এক জায়গায় খুব বড় কনটুর ট্রেঞ্চ, এখন জল নেই—বর্ষাকালে এর মধ্যে জল জমে বনভূমিকে আর্দ্র করে, মাটিকে সরস করে। বর্ত্তমান অবস্থা দেখলে সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

এইবার আমরা বনের উঁচুদিকে যাচ্চি মনে হোল। কারণ লম্বা লম্বা ঘাস দেখা গেল এবার। ভূমি যেখানে অপেক্ষাকৃত নীরস ও পাষাণময়, সেখানে নাকি ঘাস দেখা যায় বনে। এ ধরণের ঘাস আর কোথাও জন্মায় না।

একজন ফরেস্ট গার্ড কি ধরণের এক পাতা তুলে নিয়ে এল। শুনলাম, এ পাতা দিয়ে বনের লোকেরা দিব্যি চাটনি তৈরী করে খায়।

আমার স্ত্রী বললেন—কি করে চাটনি তৈরি হয়?

—শুধু বেটে একটু নুন দিয়ে খেলেই হোল। পুদিনার মত।

বেলা প্রায় দশটা। ঘড়ি দেখে সেটা বোঝা গেল বটে, কিন্তু এই বনের মধ্যে থেকে তা কিছুই বোঝবার জো নেই। রোদ্দুর পড়ে নি মাটিতে বিশেষ কোথাও। ঘাস পাতা এখনও শিশিরার্দ্র।

আমি বললাম—আপনারা বাঘের ভয় করেন না?

মিঃ সিংহ বললেন—করলে আমাদের কাজ চলে না।

—বাঘের সামনে পড়েচেন কখনো?

—দু-তিন বার। একবার মোটর ড্রাইভ করে ফিরচি পাটনা থেকে, গভীর রাত্রে কোডার্মার জঙ্গলে প্রকাণ্ড রয়েল-বেঙ্গল-টাইগার একেবারে গাড়ীর পাশে।

—পাশে?

—হ্যাঁ, রাস্তার পাশে। একটা প্রকাণ্ড সম্বর হরিণ মেরে তাকে খাচ্চে।

—আপনি কি করলেন?

—কি আর করব। হেড লাইটের আলো পড়তে আমি ওটাকে দেখতে পেলাম, তারপর ভয় হোল গাড়ীর ওপর লাফিয়ে না পড়ে।

হরদয়াল সিং বললেন—আমি একবার বুনো হাতীর পাল্লায় পড়েছিলাম। একটা পাহাড়ের ঢালু দিয়ে সাইকেলে নামচি, একদল বুনো হাতী বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান নাড়চে। বাঘের চেয়ে বুনো হাতী বেশী বিপজ্জনক—সোজা সাইকেল চালিয়ে দিলাম, পেছন দিকে আর চাইলাম না।

আমার স্ত্রী বললেন—এ বনে বাঘ আছে?

—বড় বাঘ বিশেষ নেই। অন্য সব জানোয়ারই আছে। তবে বনকে বিশ্বাস নেই জানবেন।

পথের পাশে একটা বড় গাছের ছাল ওপর থেকে খুলে ঝুলে পড়েচে। সেটা দেখিয়ে হরদয়াল সিং বললেন – বলুন তো এরকম কেন হয়েচে ?

প্রশ্নটা আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম আগেই। বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে বনস্পতির এই দশা।

মিঃ সিংহ বললেন—টাটকা করেচে। এই দেখুন পায়ের দাগ। কাল রাতের ব্যাপার।

সত্যই বটে। মাটির ওপরে হাতীর পায়ের দাগ এবং একটু দূরে হাতীর নাদ। বেশ বোঝা গেল সন্ধ্যার পরে এসব পথে যাতায়াত করা খুব সুবিধাজনক নয়।

এমন একটা জায়গায় এসেচি যেখানে রাস্তার পাশে অনেক নীচে একটা বনাবৃত উপত্যকা দেখা যাচ্চে। অর্থাৎ যে বনের মধ্যে আমরা বেড়াচ্চি, সেটা যে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপরকার বন, নিম্নের উপত্যকা দেখে সেটা ভালোই বোঝা গেল।

হরদয়াল সিং বললেন—কেমন, যাবেন টাইগার হিলে ?

—আর কতদূর ?

—চার মাইল কিংবা সাড়ে তিন মাইল—

—ফিরতে তা হলে বেলা একটা বাজবে।

সেখান থেকেই বাংলোতে ফিরবার কথা হোল। আমার স্ত্রী আর যেতেই চাইলেন না।

এইবার যেখানে আমরা ধূমপান ও বিশ্রামের জন্যে বসলাম, সে স্থানটিকে বেমালুম আফ্রিকা বলে চালিয়ে দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এদিকে গভীর পাহাড়ী খাদ, অনেক নিচে অগণ্য বনস্পতির শীর্ষদেশ দেখা যাচ্চে, দুপুরের রোদ এসে পড়েচে তাদের ওপরে।

বনের প্রকৃতিও অন্য রকম।

হরদয়াল সিং বললেন—ঐ হোল আমাদের মিসেলেনিয়াস ফরেস্ট। শাল ছাড়া আরও অনেক গাছ ওতে আছে।

—ওখানে নেমে চলুন দেখি না।

—পথের ধারে ওরকম একটা বিরাট area পড়বে অন্য জায়গায়। নীচে নেমে কষ্ট পেতে হবে না। ওখানে কিন্তু বিপদ আছে—

—কেন ?

—সাপের ভয়। অনেক সময় বড় বড় বিষাক্ত সাপ থাকে। একটু সাবধান হয়ে যাওয়া দরকার।

বাংলোতে যখন পৌঁচেচি, তখন বেলা একটার কম নয়। আমি স্নান করতে চাইলুম নীচেকার সেই ঝর্ণার জলে, কেমন চমৎকার কুলুকুলুনাদিনী স্বচ্ছসলিলা ঝর্ণাটি, বনের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে আসচে—দুধারে কলের চিমনির মত কেঁদ আর শালের ভিড়। সেইখানেই স্নান করে আসি।

মিঃ সিংহ বললেন—না যাওয়াই ভালো। এসব ঝর্ণার জল অনেক সময় খারাপ থাকে।

হরদয়াল সিং বললেন—একবার লোহারডগা না নেতারহাট এমনি কোনো একটা জায়গার কাছাকাছি বনে তিনি একটা ঝর্ণায় স্নান করেছিলেন বনের মধ্যে। তারপর সব শরীরে চাকা চাকা কি বেরিয়ে ফুলে গেল। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া জ্বর হোতে পারে।

অতএব ঝর্ণায় স্নানের আশা ছেড়ে আমরা বাথরুমের টবের জলেই স্নানপর্ব্ব সমাধা করলাম। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দেখা গেল বনের মধ্যে ছায়া পড়ে আসচে। চারিদিকেই বড় বড় শৈলচূড়া, জায়গাটাতে তাড়াতাড়ি ছায়া নেমে আসে।

বনের মধ্যে সেই ঝর্ণার কাছে গিয়ে আমরা সবাই বসলুম সেই অপরাহ্নে।

এর নাম দিয়েচে এরা মাছের বাঁধ। বন-বিভাগ থেকে একটা বাঁধ মত গেঁথে দিয়েচে বেগবতী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর বুকে। তাতে তার গতিরোধ হয় নি, আরও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে আবেগে কংক্রিটের বাঁধ ডিঙিয়ে এপারে ঝাঁপিয়ে পডচে। এই স্থানটি এত সুন্দর, একবার বসলে উঠে আসতে ইচ্ছেই করবে না।

এর সামনের দিকে সুউচ্চ পাহাড়, তার ঢালুতে বড় বড শালগাছের বন, এখানে বসে শুধুই দেখা যায় শালগাছের গুঁড়িগুলো নীচে থেকে ভিড় করে ওপংের দিকে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েচে। আমাদের ডানদিকে চওড়া মোটর-রোড বনবিভাগের নির্ম্মিত, কিন্তু এ পথে মোটর অপেক্ষা বাঘ-ভালুকের যাতায়াত বেশি। যখন কন্‌ট্রাক্টরের দল বনের মধ্যে থেকে কাঠ কাটিয়ে নিয়ে যায়, তখন বছরের মধ্যে দিন-কয়েক ওদের মোটর লরি বা মোটর যাতায়াত করে—কচিৎ বন-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী মোটরে সফর করতে আসেন—মিটে গেল। মোটরগাড়ী তো দূরের কথা, সারা বছরে এ পথে আর লোকজন বড় বেশি যাতায়াত করে না।

অতিরিক্ত নির্জ্জন স্থান। চেয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা লোক কোনো দিকে চোখে পড়ে না—শুধু যা আমরাই আছি। ঋষিদের তপোবন এমনি নির্জ্জন জায়গাতেই ছিল। ভারতের সভ্যতার জন্মস্থান এই বনানী, এখানেই বেদ, উপনিষদ, বেদান্তের জন্ম হয়েছিল—হৈ-হট্টগোল-মুক্ত শহরের বুকে নয়।

পাশের পথ বেয়ে দুজন লোক পুটলি কাঁধে কোথায় চলেচে। তাদের ডাকা হোল হো-ভাষায়, অবিশ্যি আমি ডাকি নি। আমি মিঃ সিংহকে বল্‌লুম—জিজ্ঞেস করুন ওরা কোথায় যাচ্চে।

—সৌলবোরা যাব।

—এখান থেকে কতদূর ?

—সতের মাইল।

—সেখানে কেন ?

—সেখান থেকে টাকা আনবো—মাড়োয়ারীর গদী থেকে। আমরা কুলি। জঙ্গলে কাঠ কেটেছিলাম, তার মজুরি।

—সন্দেবেলা যাচ্ছিস, ভয় করবে না ?

—কুইরা গ্রামে গিয়ে রাত কাটাবো!

হরদয়াল সিং সম্মুখের ছায়াচ্ছন্ন শৈলসানুর দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে বললেন—ঐরকম ঢালু জায়গায় আমাকে বুনো হাতীতে তাড়া করেছিল। সাইকেল না থাকলে সেদিন মারা পড়তাম।

আমার স্ত্রী বললেন—তাহলে আজ ওঠা যাক এখান থেকে—

সেই সময় বন-বিভাগের দুইজন উচ্চ কর্মচারী আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। বললেন- আচ্ছা, বলুন তো এ কংক্রিটের বাঁধটার আর কি উন্নতি করা যায়?

হরদয়াল সিং এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উঁচু অফিসার। তিনি বললেন—আপনাদের পরামর্শটা একবার নিয়ে দেখি। আমি তো একরকম ভেবে রেখেচি, দেখি আপনারা কি রকম বলেন।

'আপনারা' অর্থাৎ আমি এবং আমার স্ত্রী—এ যেন ডাক্তার বিধান রায় পরামর্শ চাইচেন পাশের বাড়ীর স্কুলমাস্টার বন্ধুর কাছে—বলুন তো মশাই, এ রোগীটির সম্বন্ধে এখন কি ওষুধ দেওয়া যায়? আপনার কি মত!

কিন্তু বিজ্ঞ ভেবেই তো পরামর্শ চাইচেন। খেলো হয়ে যাওয়াটা কিছু নয়। তাহলে লোকে মানে না। সুতরাং মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে কিছুক্ষণ চিন্তা করবার ভান করলুম। যেন সক্কর বাঁধ কিংবা নতুন হাওড়া ব্রীজের প্ল্যান করবার ভার আমার ওপর পড়েচে।

হঠাৎ ভেবে দেখলুম, বাঁধটা এমন করে কেন যে বেঁধেচে, ওখানটাতে অমন নালা কেন করেচে, ওই জায়গাটাতে কংক্রিটের দেওয়ালের কাছে কয়েকটা ফোঁকর কেন—এইগুলো এখনো পর্য্যন্ত ভাল করে বুঝি নি। দু-একটা ইন্‌টেলিজেন্ট প্রশ্ন করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে এ ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতই পরিষ্কার।

সুতরাং বললুম—আচ্ছা, এ বাঁধ এখানে কি জন্যে দেওয়া হয়েচে?

হরদয়াল আমার মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—কেন, মাছ ধরার জন্যে!

আমি বললাম—ও।

তাঁর মুখের ভাব দেখে আমার আর কোন ইন্‌টেলিজেন্ট প্রশ্ন করতে সাহস হোল না। কিন্তু আমার মনের সন্দেহ তখনও ঘোচে নি। এতে কি করে মাছ ধরা হবে, তা তখনও আমার মাথায় ঢোকে নি। বললুম – আচ্ছা বর্ষার সময় জল এতে আটকায় কি করে? জল তো উপচে পড়বে। মাছ দাঁড়াবে কোথায়?

হরদয়াল সিং প্রায় চীৎকার করেই বলে উঠলেন – ওই! ওই তো সমস্যা! ওই কথাই তো বলছিলাম—

যাক! অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে বাঁশঝাড়ের একটা বাঁশেও লাগবে না? লেগেচে।

আমার স্ত্রী বললেন—চলো, বেলা প্রায় পড়ে এল। এসব জায়গা ভালো নয়। ওঠা যাক।

এ যাত্রা ভগবান মুখ রক্ষে করলেন। আমার স্ত্রী উঠে পড়তে সবাই উঠলাম সেখানে থেকে।

বেলা পড়ে এসেচে। চারিধারের বনে এরই মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসবার উপক্রম করচে। সুতরাং বেশীক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক হবে না।

আমি বললাম—এ জঙ্গলে আমাদের বন্দুক না নিয়ে বেরোনো উচিত নয় কিন্তু।

মিঃ সিংহ বললেন—বন্দুক আমাদের আছে, তবে আমরা নিয়ে বেড়াই নে। ও একটা ঝঞ্ঝাট।

হরদয়াল সিং বললেন—আমরা ডিপার্টমেন্টের অফিসার মশাই, বাঘ-ভালুকে আমাদের কিছু বলবে না।

কয়েকটি হো-মেয়ে পাহাড়ের নীচে ভাত রেঁধে খাচ্চে আজও। এরা সারাদিন জঙ্গলে কাজ করে, বাঘ-ভালুকের মুখে। সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে দুটি নিরুপকরণ তণ্ডুল সিদ্ধ খেয়ে মহানন্দে দিন কাটায়। এতেই ওদের খুশি উপচে পড়েচে। আমরা ওদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম। কি সুন্দর জীবন এদের তাই ভাবি। এই যে বাইরের সভ্য জগতে এত যুদ্ধ, খাদ্যাভাব, লোকের দুঃখকষ্ট—তার কোন আঁচ এসে এখানে পৌঁছোয় নি। কেরোসিন তেল না পাওয়া গেলেই বা এদের কি, চিনির দাম চালের দাম চড়লেই বা এদের কি, কাপড়ের দাম বাড়লেই বা এদের কি। এরা ওসব কোনো জিনিসের ধার ধারে না। বনে বাস করে, বন-প্রকৃতিই এদের সমস্ত জিনিস জোগায়!

ওদের জিজ্ঞেস করা হোল—চাল যখন না পাওয়া যায়, তখন কি খাবি?

একটি মেয়ের নাম বুধ্‌নি কুই, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হোল তার কথাবার্ত্তা শুনে। কুই হো-জাতির কুমারী মেয়েদের নামের শেষে ব্যবহার হয়।

সে বললে—কেন, বনে খাওয়ার জিনিসের অভাব আছে না কি?

—কি খাবার পাওয়া যায়?

—কন্দমূল। কত রকমের কন্দ পাওয়া যায় বনে। যারা জানে তারা তুলে আনে। বর্ষা-কালে আমাদের দু-তিন মাস কন্দ খেয়েই চলে যায়।

কন্দ কথাটা সংস্কৃত হলেও বেমালুম ঢুকে পড়েচে হো-ভাষার মধ্যে, 'কান্দা' রূপে। বাংলা দেশের মেটে আলু জাতীয় একপ্রকার মূল এ জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ল্যাটিন নাম 'ডায়াস্ কোরিয়া', খেতেও বেশ সুস্বাদু। এ জাতীয় লতা এই সব বনে সাধারণতঃ শৈল-সানুর অরণ্যে জন্মায়, নিম্নের উপত্যকাতেও কিছু কিছু আছে।

আমি হিন্দীতে প্রশ্ন করলুম—তোরা জঙ্গলে কন্দ তুলতে যাস, বাঘের ভয় করিস নে?

বুধ্‌নি কুই কিছু বুঝতে পারে না, শুধুই হাসে। এরা বাংলা তো দূরের কথা হিন্দীও বোঝে না, বিহারে বাস করে। কারণ এদের কাছে বাংলাও নেই, বিহারও নেই—ওসব কথার কোন অর্থ নেই এদের কাছে। এই অরণ্যভূমি এদের মা; নিজের ক্রোড়ে আশৈশব এদের লালন-

পালন করেচে, ক্ষুধায় অন্ন—তৃষ্ণায় জল জুগিয়ে। একেই চেনে এরা।

হরদয়াল সিং হো-ভাষায় আবার আমার প্রশ্নটি ওদের করলেন। আর বুধ্‌নির উত্তর আমায় বুঝিয়ে দিলেন।

বুধ্‌নি বললে—আমরা দল বেঁধে যাই, চার-পাঁচজন এক সঙ্গে।

—বাঘ-ভালুক দেখিস নে?

—মাঝে মাঝে দেখি বই কি।

—ভয় করে না?

—ভয় করলে কি চলে আমাদের! সঙ্গে তীর ধনুক থাকে। তবে বাঘ বেশী মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়। হাতী বেশী খারাপ। হাতী তাড়া করে আসে।

—বাঘ কখনো তাড়া করে নি?

—না বাবু, বাঘ কিছু বলে না।

—আর কি জানোয়ার দেখেচিস?

—ভালুক আছে, ভালুকও বড় খারাপ। কখন যে ঘাড়ে এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া সাপ আছে।

—কি সাপ?

—শঙ্খচূড় সাপ আছে, মানুষকে তেড়ে কামড়াবে। ময়াল সাপ আছে, খুব মোটা, সেও মানুষকে ধরে। আমরা ময়াল সাপের মাংস খাই, বেশ ভালো মাংস।

সেই বনানীর মধ্যে বসে বনের দুলালী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে আমাদের এত ভালো লাগছিলো যে কিছুতেই সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। ভাত হয়ে গেল, বড় বড় শাল পাতার পাত্রে ফেনসুদ্ধ ঢেলে বিনা নুনে বিনা তরকারীতে দিব্যি খেতে লাগল। বিলাসিতার সর্ব্ব উপকরণ-শূন্য এই সকল অনাড়ম্বর জীবন-ধারা আমার কাছে এত নূতন, এত অপরিচিত যে শুধু এই দেখবার জন্যে আমি সমস্ত রাত এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ে আসচে, এসময় বাইরে বসে থাকা স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ নয়। কাজেই আমরা বাংলোর মধ্যে গিয়ে আগুনের ধারে বসলাম।

হরদয়াল সিং বললেন—আমি একটা বড় সাপের কথা জানি।

আমি বললুম—কি সাপ?

—পাইথন। আমার অধীনস্থ এক কর্ম্মচারী একবার পাহাড়ী ঝর্ণায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, শুনলেন জঙ্গলের মধ্যে সড় সড় করে শব্দ হচ্চে, জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে দেখলেন একটা প্রকাণ্ড পাইথন সাপ। একটা ছোট হরিণকে প্রায় অর্দ্ধেক গিলে ফেলেচে।

—তারপর?

—তারপর তিনি বনের মোটা লতা দিয়ে সাবধানে সাপটাকে বাঁধলেন। স্নান সেরে তাঁবুতে ফিরে সকলকে সংবাদ দিতেই কুলি ও ফরেস্ট গার্ডের দল হৈ হৈ করে গিয়ে সাপটাকে জখম করলে। তখন কিন্তু তারা ভেবেছিল যে সাপটা মরেই গেল বিকেলের দিকে

নিকটবর্ত্তী বন্যগ্রাম থেকে হো-অধিবাসীরা সাপের মাংস নিতে এসে দেখে মৃতপ্রায় সাপটা সেখান থেকে দৌড় মেরেচে। ওদের জান বড্ড কড়া। সাপটা লম্বায় প্রায় দশ ফুট ছিল।

—আপনি কত বড় সাপ দেখেচেন ?

—পালামৌ-এর জঙ্গলে একবার আঠার ফুট লম্বা একটা পাইথন সাপ এক পাহাড়ী জঙ্গলের ঝর্ণার ধারে গাছের গায়ে জড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। পাইথন সাপরা সাধারণতঃ ঐ জায়গাতেই থাকে। হরিণ বা খরগোস জল খেতে এলে ঝপ্ করে তাদের উপরে পড়ে জড়িয়ে ফেলে একেবারে হাড়গোড় চূর্ণ করে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে গিলতে থাকে। অনেক সময় সম্বর হরিণকেও রেহাই দেয় না।

—মানুষ দেখলে কিছু বলে ?

—সাবধান না থাকলে একা মানুষকেও ছাড়ে না। আমি জানি উড়িষ্যার জঙ্গলে একবার একজন কাঠুরে একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি কাটতে গিয়েছিল, গুঁড়িটার চারপাশে বড় বড় বন ছিল, বাইরের থেকে কিছু দেখা যায় না। কাঠুরেটা যেমন সেখানে গিয়েচে অমনি একটা প্রকাণ্ড পাইথন ওর একখানা পা জড়িয়ে ধরে ওকে ফেলে দিলে, তারপর লেজের প্রান্ত দিয়ে গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ওর সর্ব্বদেহে কুণ্ডলীর আকারে জড়াতে লাগল। ভাগ্যে ওর সঙ্গে আরও লোক ছিল কিছুদূরে। ওর চীৎকারে তারা এসে পড়ে সাপটাকে মেরে ফেলে। দু-তিন মাস ভোগবার পরে লোকটা বেঁচে যায়। আমি শুনেচি চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত সাপ এ জঙ্গলে দেখা গিয়েচে। ঝর্ণার ধারে গাছের উপরেই এ জাতীয় সাপ সাধারণতঃ বাস করে, কারণ ওখানেই ওদের শিকারের সুবিধা।

ক্রমে রাত্রি গভীর হলো, নানা প্রকার সাপ ও বাঘের গল্প শুনে আমাদের মনে একপ্রকার অস্পষ্ট রহস্যময় ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। আমরা সভ্য জগতের অধিবাসী, অন্ধকারময় বনানীর দৃশ্যও আমাদের নিকট গম্ভীর ও সুন্দর বটে, কিন্তু এ অনুভূতিও জাগিয়ে দেয় যে এ আমাদের পক্ষে বিদেশ। এখানে বুধ্নি কুই-এর মত হো মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে বিচরণ করতে পারে, বন্য কার্পাস থেকে মোটা কাপড় বুনতে পারে, এরা কন্দমূল ফল আহরণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে, এরা করন্জা মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ সংগ্রহ করে তেল তৈরি করতে পারে, কিন্তু আমরা সঙ্গে করে সভ্য খাদ্য না আনলে এখানে তিন দিনও বাঁচবো না। তাছাড়া এসব বনে পাহাড়ী ঝর্ণার জলে স্নান করা বা ঝর্ণার জল পান করা আদৌ নিরাপদ নয়। ম্যালেরিয়ার ভয় যথেষ্টই আছে। বন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা বাঁধা নিয়মে পাঁচ গ্রেন করে কুইনাইন প্রত্যহ খান, তবুও ম্যালেরিয়ায় ভোগার কথা ওঁদের কাছেই শুনেচি। অথচ এই সবের মধ্যেও নরনারীর সুন্দর স্বাস্থ্য, উচ্ছল জীবনানন্দ দেখে হিংসা হয়। জ্বর-জাড়ির নামও ওরা শোনে নি। কুইনাইন চক্ষেও দেখে নি। বিনা নুনে ও বিনা তরকারিতে মোটা চালের ভাত ও জঙ্গলের কন্দমূল খেয়ে অমন স্বাস্থ্য কি করে হয় তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অরণ্যের রহস্য, অরণ্যের গোপন অন্তরালেই প্রচ্ছন্ন থাকুক—আমরা শীতের রাতের শয্যা আশ্রয় করি।

পরদিন সকালে উঠে আমরা আবার মাছ-ধরার বাঁধে গিয়ে বসলাম। কত কি বন্যপক্ষীর কূজন, বনপুষ্পের সুবাস এই স্থানটিতে, সত্যই বড় ভালো লাগে। কাল রাত্রে হয়তো আমরা যেখানে বসে আছি, সেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার জল খেতে এসেছিল। কংক্রিট বাঁধানো না হলে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের চিহ্ন থাকতো। আমাদের সাড়া পেয়ে একটা বনমোরগ কক্ কক্ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের ঝিলিক খেলে উড়ে গভীর বনান্তরালে অদৃশ্য হোল।

আমি আবার বললুম—এখানে নাইবো?

মিঃ সিংহ বললেন—নাইলেই জ্বর হবে। এসব জল দেখতে ভালো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য। হিমালয়ের যে কোন ঝর্ণার জল সুপেয় ও নিরাপদ—কিন্তু এখানে তা নয়। আমি যখন প্রথম বনবিভাগের কাজ করতে আসি, অনভিজ্ঞতার দরুন এই সব বন্য নদীর স্বচ্ছ জল নির্ব্বিচারে পান করতাম। ফলে ম্যালেরিয়া প্রায়ই হোত। পোড়াহাট ও সারেণ্ডা ফরেস্ট ম্যালেরিয়ার জন্য বিখ্যাত।

আমি বললাম— আপনি কবে বন-বিভাগের চাকরীতে যোগ দেন?

—১৯২৫ সালে। প্রথম যেদিন জঙ্গলে চাকরী করতে আসি, আমি তখন অনভিজ্ঞ যুবক। সবে বি.এস্-সি পাশ করেচি পাটনা কলেজ থেকে। আরা জেলায় আমার বাড়ী, বনের কোন ধারণাই নেই, আমাদের দেশে দু-দশটা আম গাছ ও মহুয়া গাছের সমষ্টিকে বন বলে। বিন্ধ্যাচলে একবার গিয়েছিলাম দাদার সঙ্গে, সেখানে সামান্য কিছু বন দেখি—তখন তাই আমার নিবিড়তম অরণ্য।

আমি কখনো বিন্ধ্যাচল যাই নি, আমার বন্ধু বিভূতি মুখুয্যে সেখানে গিয়ে মাসখানেক ছিলেন। তাঁরই মুখে শুনেছিলাম বিন্ধ্যাচলের মাথায় খুব জঙ্গল, সেখানে হরিণ ইত্যাদি চরে। সুতরাং আমি বললাম—কেন, শুনেচি সেখানেও বেশ বন আছে।

মিঃ সিংহ বললেন—সে এক ধরণের বন। এর তুলনায় কিছুই নয়। আমি প্রথম চাকুরী নিয়ে যাই সারেণ্ডা ফরেস্টে। সে বন এর চেয়েও ভীষণ। ৪০০ বর্গ মাইল অরণ্যানী তার মধ্যে খানকয়েক বন্যগ্রাম আছে। বন-বিভাগের কাজকর্ম্মের মজুরের জন্যে গবর্নমেণ্ট জমি দিয়ে লোক বসিয়েচে। না দেখলে সে বিরাট অরণ্যের ধারণা হয় না।

—তারপর, আপনার অভিজ্ঞতা বলুন শুনি।

—সে এক গল্প। এখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিই চলুন। আজ আমাদের চিটিমিটি যেতে হবে। বৌদিদি তৈরি হয়ে নিন।

—চিটিমিটি কতদূর?

—এখান থেকে ৪০।৪৫ মাইল পাহাড় ও বনের পথ। সকাল সকাল বেরুতে হবে। পথে আমার প্রথম চাকুরী জীবনের গল্প করতে করতে যাবো—আপনাদের লেখার খোরাক হবে।

বেলা দুটোর পরেই আমরা জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে মোটরে উঠিয়ে রওনা হোলাম।

চিটিমিটি যাবার পথে মোটর পাহাড়-জঙ্গলের পথে এঁকে বেঁকে নামতে লাগলো বামিয়াবুরু থেকে। আমরা চলেচি—চলেচি—ক্রমাগত চড়াই-উতরাইয়ের পথে।

এক জায়গায় পাহাড়ের নীচে বাঁ-দিকের উপত্যকায় বন-বিভাগের 'রক্ষিত ভূমি'—এর রহস্য হচ্চে এই যে, এই জায়গাতে প্রকৃতিকে সুযোগ দেওয়া হয়েচে ইচ্ছামত বাড়তে। প্রকৃতির উপর কলম চালানো হয় নি। তাই এখানে বড় বড় ৮।১০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট শালগাছ যথেষ্ট—মোটা মোটা লতায় লতায় জড়াজড়ি, গাছপালার নীচেও দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছোট গাছগাছালির।

আমরা পাহাড়ের গায়ে আবার দেখলুম খনিজ লবণের স্তর, বন্য জানোয়ার ছাড়া এ নুন কেউ ব্যবহার-করে না। হরিণ, ভালুক, বাঘ, এই তিনটি জন্তু বিশেষ করে। হাতীরা নুন খাওয়া দরকার বিবেচনা করে না নাকি, কেন তা জানি না। অস্তগামী সূর্য্যের রাঙা আলো যখন বাঁকাভাবে এসে পড়ে এই খনিজ লবণের স্তরে, শাল অরণ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে, তখন দলে দলে মৃগযূথ আসে নির্জ্জনে লবণের স্তর চাটতে, তাদের সে আনন্দলীলার ছবি হয়তো কবি ভবভূতি আঁকতে পারতেন যিনি প্রস্রবণ-পর্ব্বতের গম্ভীর মহিমা বর্ণনা করেচেন উত্তর রামচরিতে। অতীত দিনের ভারতবর্ষের কি অদ্ভুত রূপ কল্পনায় ভেসে ওঠে এই পর্ব্বতারণ্যের মধ্যে দাঁড়ালে।

হরদয়াল সিংকে বললাম—আপনারা এখান থেকে নুন বিক্রী করেন না?

—না। ওটা বন্যজন্তুদের ব্যবহারের জন্যেই।

—গবর্নমেণ্টের বন্দোবস্ত?

—নিশ্চয়। এখানে শিকার করা নিষেধ।

—কি রকম?

—পূর্ব্বে এরকম হয়েচে। হরিণ নুন খেতে এসেচে দলে দলে, শিকারীদের মাহেন্দ্রসুযোগ। লুকিয়ে থেকে গুলি করেচে।

—নিষ্ঠুরতার কাজ বই কি।

—এখন বনের সমস্ত salt lick-এ গবর্নমেণ্টের খরদৃষ্টি। বন্দুক নিয়ে যাবার জো নেই।

মোটর থামানো হোল। মিঃ সিং বললেন—চলুন, দেখবেন কত জানোয়ারের পায়ের দাগ—

যেখানে পাহাড়ের গায়ে salt lick তার নীচে জানোয়ারদের চরবার সুবিধের জন্যে বা দাঁড়িয়ে নুনের স্তর চাটবার জন্যে বন-বিভাগ থেকে পাথর কেটে সমতল করে দেওয়া হয়েচে। সেখানে নরম সাদা মাটিতে সত্যিই অনেক জন্তুর পদচিহ্ন।

হো-জাতীয় ফরেস্ট গার্ড বললেন—হরিণের পায়ের দাগই বেশি, ভালুকেরও আছে—কোঙরার আছে—

আমি বললাম—কোঙরা কি?

মিঃ সিং বললেন—বার্কিং ডিয়ার—

—কত বড় ?

—একটা বড় খাসি ছাগলের মত। বামিয়াবুরুতে সেদিন রাত্রে যার ডাক শুনেছিলেন—

ফরেস্ট গার্ড বললে—বাঘের পায়ের দাগ একদম দেখচি না হুজুর।

আরও মাইল সাতেক গিয়ে আমাদের গাড়ী সমতলভূমিতে নামলো। সেখানকার আরও মনোহারী শোভা—বাঁ-দিকে একটা পাহাড় চলেচে—বন সেখানে তত ঘন না হোলেও বড় বড় শুভ্রকাণ্ড শিবরৃক্ষ ও গোলগোলি ফুলের গাছে সমস্ত পাহাড়ের সানুদেশ ভর্ত্তি। এই ফুলের গাছ দেখতে আমাদের দেশের আমড়া গাছের মত—অথচ প্রথম বসন্তে সম্পূর্ণ নিষ্পত্র শ্বেতাভ বৃক্ষগুলিতে যখন সূর্য্যমুখী ফুলের মত বড় বড় ফুল ফোটে—কালো কোয়ার্ট জাইট পাথরের পটভূমিতে, মেঘশূন্য নীল আকাশের তলায়, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে কোন্ সৌন্দর্য্যের মায়ালোকের মধ্যে মনকে একেবারে তলিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে যায় যেন!

যতদূর যাই, সমতলের শোভা আর একরকম। ধরণীর উচ্চাবচ ভূমিরেখা এখানে সুপরিস্ফুট, বন তাদেব ঢাকে নি, কোথাও দু-এক ঝাড় পাহাড়ী বাঁশ, কোথাও অদূরের শৈলশ্রেণী থেকে নেমে নদী চলেচে বন্ধুর উপলাস্তৃত পথে ; কোথাও দু-একটি বন্যগ্রাম—

আমার স্ত্রী ক্রমাগত বলচেন—আহা, বেশ জায়গা, ছাখো ছাখো কেমন ঐ গাঁ-খানা পাহাড়ের কোলে—এখানে একটা বাড়ী করলে হয় না ?

আবার কিছুদূর গিয়ে—

—ছাখো ছাখো কি সুন্দর ঝর্ণাটি। বাঁশবন—এখানে একটা বাড়ী করলে হয়—

ডজন খানেক জায়গায় বাড়ী তৈরি করবার পরামর্শ শুনে শুনে মিঃ সিং বললেন—কিন্তু একটা ব্যাপার মিসেস ব্যানার্জ্জি—বাড়ী তো অনেকগুলো করবার প্রস্তাব করলেন—এসব জায়গায় বাস করতে পারবেন ?

আমার স্ত্রী বললেন—কেন ?

—খাবেন কি ? রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে এ সব গাঁয়ে শুধু হো-জাতীয় লোকেরা বাস করে—দোকান টোকান নেই—

—ওরা জিনিস কোথায় পায় ?

—কোনো জিনিসের দরকার নেই ওদের—দেখেই তো এলেন বামিয়াবুরুতে—

কিন্তু আমার স্ত্রীর দোষ নেই, সত্যিই মনে হয় এখানে নানা জায়গায় শুধু বাড়ী করি আর বাস করি। কতবার আমার নিজের মনেও কি উদয় হয়নি সে কথা ? বড় বাড়ী নয়, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর। পাহাড়ী বেণুবনের ছায়ায়, নৈশ বাতাসে কীচকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বাঁশি বাজবে, পর্ণকুটীরে শুয়ে শুয়ে নিস্তব্ধ নিশীথে তা শুধু শুনবো আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে!

একটা গ্রামে পাহাড়ের নীচে হাট বসেচে।

বললাম—এটা কি গ্রাম!

মিঃ সিং বললেন—ম্যাপ দেখে বলে দিচ্চি—

মোটর থামানো হোল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম—এই বন পাহাড়ের মধ্যে

ক্ষুদ্র হাটটি কেমন, কি জিনিস এখানে কেনাবেচা হচ্চে দেখতে হবে বৈকি। আমরা সবাই হাটের মধ্যে বেড়াচ্চি, একটা মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি হো-তরুণী আমাদের দিকে চেয়ে হাসচে দেখে আমরা এগিয়ে গেলুম তাদের কাছে।

আমার স্ত্রী বললেন— ঐ তো কালকের সেই মেয়েটি— সেই বুধ্‌নি কুই—

মিঃ সিং হো-ভাষায় ওদের কি বললেন। ওরাও কি উত্তর দিলে হেসে হেসে।

আমি বললাম—কি বলচে ওরা ?

—বলচে, বাবুরা হাট দেখতে এলি ?

—মেয়েগুলি কোত্থেকে এসেচে !

—ওরা বুধ্‌নি কুইয়ের বন্ধুবান্ধব। হাট দেখতে এসেচে। জিনিসপত্র কিনুক না কিনুক, ভাল সাজগোজ করে এদেশে সবাই হাটে আসবেই। হাট ওদের উৎসবের জায়গা। এখানেই সাত দিন পরে পরে পাঁচ গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, গল্পগুজব হয়—হাটের দিন ওদের কাছে একটা আমোদের দিন—

আমরা সকলে হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ি। অনেক হো-নরনারী জড় হয়েচে। মেয়েদের চুলে প্রচুর করন্‌জার তেল, খোঁপা ঢিলে ও বাঁকা, তাতে বন্যফুল গোঁজা। পুরুষদের প্রায় সকলেরই হাতে তীর ধনুক। তীর ধনুক না নিয়ে কোনো হো-যুবক বা বৃদ্ধ পথ চলে না।

বিক্রী হচ্চে যা গোটা সিংভূমের হাটে সাধারণত বিক্রী হয়ে থাকে। বীচিওয়ালা বেগুন, টোম্যাটো ও পেঁয়াজ, শুট্‌কি মাছ, জোঁদা অর্থাৎ নাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম, বাখর অর্থাৎ মহুয়ার মদ তৈরী করবার মশলা—দেখতে কদমার মত; সুন্দর সরু সীতাশাল চাল, মাটির হাঁড়িকুড়ি, মহুয়ার তেল, করন্‌জার তেল এবং তাঁতে তৈরী মোটা কাপড় ও গামছা। এদেশে মোটা চাল তত বেশী দেখা যায় না, যত দেখা যায় সরু সাদা ধবধবে সীতাশাল চাল। পাহাড়ী পাথুরে জমি নাকি সরু ধানের পক্ষে অনুকূল।

বুধ্‌নি কুইকে জিজ্ঞেস করা হোল—কি কিনবি রে হাটে ?

সে হাসতে হাসতে বললে—কিছুই না।

—তবে কেন এসেচিস্ ?

—মুরগীর লড়াই দেখতে।

হ্যাঁ—এই একটা আকর্ষণের বস্তু বটে এদের জীবনে। দশক্রোশ হেঁটে এরা আসতে পারে মুরগীর লড়াই দেখতে।

—কোথায় মুরগীর লড়াই হচ্চে রে !

—হয় নি। ওই গাছের তলায় হবে। হাট ভেঙে গেলে হবে, নয়তো মুরগীর লড়াই আরম্ভ হোলে হাটে কে থাকবে ?

কথাটা সত্যি বলেচে বুধ্‌নি। কেনা-বেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা রোজগার—এসব জীবনের অতি তুচ্ছ জিনিস। এর কি দাম আছে জীবনে ? আসল জিনিস হোল মুরগীর লড়াই। গাছের তলায় মাদল বাজচে, গোলাকারে উৎসুক নরনারী ঠ্যাঙে-ছুরি-বাঁধা দুটো

লড়াইয়ে মোরগের ঝটাপটি দেখচে, টুপটাপ মহুয়ার ফুল ঝরে পড়চে ওদের মাথার আশে পাশে, সামনে দূরে নীল শৈলমালা···

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ-মুহূর্ত্ত।

এদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও আমোদপ্রিয়তা লক্ষ্য করবার বিষয় বটে।

কি জানি হয়তো চক্রধরপুরের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে শৃঙ্গানপুরের গিরিগুহার চিত্রাবলী এদের পূর্ব্বপুরুষেরা এঁকেছিল কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে!

আমার স্ত্রী নারীসুলভ বস্তুপ্রিয়তা প্রদর্শন করে বললেন—একখানা নকশা করা চাদর কিনবো—

আমি চাদর ক্রয়ের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখালুম অবিশ্যি, কিন্তু কিছুই খাটলো না।

আবার আমরা পথে বেরুই। এবার কি বেজায় ধূলো শুরু হোল। ষ্টীয়ারিংয়ের তলাকার কোন্ ফাঁক দিয়ে ফোয়ারা থেকে জল বেরুবার মত ধূলো ঢুকতে লাগলো।

আর একটা বন্যগ্রাম ও পথের পাশে তাদের মৃতদের উদ্দেশে প্রোথিত প্রস্তররাজি। এইগুলো যেখানেই দেখি, সেখানে প্রায়ই থাকে একটা প্রাচীন বট বা মহুয়া গাছ। পাহাড়ের পাশে যদি হয় মনে কেমন এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া ভাব নিয়ে আসে।

এমনি এক সমাধি স্থানের বর্ণনা করেচি আমার লেখা 'আরণ্যক'-এ। সে স্থান গয়া জেলার প্রান্তে, দক্ষিণ-বিহারের শৈলমালার নিবিড়তম অভ্যন্তরে অবস্থিত—অথচ আজ সেই সব দৃশ্যের কথাই আমার মনে আবার নিয়ে আসে এই বন্যগ্রাম ও এদের সমাধি প্রস্তরের চৌরস সারি।

তিনটি বন্যগ্রাম পার হয়ে তবে চিটিমিটি। গ্রামগুলির নাম ও ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আমার স্ত্রী একটি ছড়া তৈরী করলেন—

আগে হোল পেটাপেটি
বাঁকে, রুয়াউলি, করজুলি
তারপর চিটিমিটি—

এর কবিত্ব প্রশংসনীয় না হোলেও, নামগুলো মনে রাখার সুবিধে হয়। যেমন মুখস্থ করেছিলুম কোন ছেলেবেলায়—

ষোলশ সাতাশ অব্দে জাহাঙ্গীর ম'ল
সাজাহান ভারতের বাদশাহ হোল—

এখন কত উপকার দেয়!

বেলা চলে যাচ্চে, এমন সময় উপরোক্ত ছড়ার প্রথম গ্রামটির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। এবার ধূলো-ভরা রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের পথে উঠচি, একটা পাহাড়ের ওপারেই পেটাপেটি গ্রাম। এখানে যদি বা বাড়ী করে বাস করবার লোভ সম্বরণ করা চলে, কিন্তু পরবর্ত্তী তিনখানি গ্রামের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষকে সভ্য জগতের কথা একেবারে ভুলিয়ে দেয়।

আমি এই সময় মিঃ সিংহকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার চাকরী জীবনের প্রথম দিনের

সেই অভিজ্ঞতাটার কথা বললেন না?

—চলুন, চিটিমিটি বাংলোতে বসে চা খেতে খেতে আরাম করে শুনবেন। সে সত্যিই শোনবার মত বটে—

—কোনো বন্যজন্তুর হাতে পড়েছিলেন?

—ঠিক সে ভাবের নয়, তবে পড়লে বিস্মিত হবার কারণ ছিল না।

এমন একটা উঁচু জায়গা দিয়ে আমাদের মোটর যাচ্চে যে আমরা আমাদের সামনে সাপের মত আঁকা বাঁকা সমস্ত পথটা দেখতে পাচ্চি—কখনও শৈলগাত্র বেয়ে, কখনও সংকীর্ণ উপত্যকায় নেমে, আবার কখনও দূর দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে পথটা বরাবর চলেচে আগে আগে।

বাঁকে গ্রামখানির দুদিকে পাহাড, সামনে ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেচে কুলুকুলু শব্দে। পাহাড়ের ওপরে বন্যবাঁশের বন, শালবন, শুভ্রকাণ্ড শিববৃক্ষ। যার কোথাও বাড়ী করবার প্রবৃত্তি হয় না—নিতান্ত আরব বেদুইনের মত যে ছন্নছাড়া ও ভ্রাম্যমাণ—তারও অভিলাষ জাগবে মনে, ঐ পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে কিছুদিন বাস করি!

রুয়াউলি।

সাদা কোয়াৎর্জ পাথরের ridge একদিকে ঢেউ-খেলানো পাহাড়—অধিত্যকায় মাঝে মাঝে শালবন' পাহাডের গায়ে রোদ পড়ে বেশ দেখাচ্চে।

করজুলি।

দূরে একটা গ্রাম দেখচি থাকে থাকে পাহাডের গা বেয়ে উঠেচে। করজুলিতে হো-অধিবাসীদের ঘরগুলি শালপাতার ছাওয়া, রাঙামাটির দেওয়াল, পাহাড়ের গম্বুজ উঠেচে দূরের কালো বনরেখার ওপরে; জ্যোৎস্নারাত্রে এই গ্রামগুলি মায়াময় হয়ে উঠবে বেশ বুঝতে পারচি।

বেলা যাবার দেরি নেই—পশ্চিম দিগন্তে দূর বরকেলা শৈলশ্রেণীর ওপরে সূর্য্য ঝুঁকে পড়েচে। এমন সময় মোটর আবার পাহাড়ের ওপরে উঠতে শুরু করলে।

মিঃ সিংহ বললেন—ওই দেখুন চিটিমিটি বাংলো দেখা যাচ্চে পাহাড়ের মাথায়—ওখান থেকে ওপারের সমতলভূমির দৃশ্য বড় চমৎকার দেখায়—

একটু পরে বনপথে উঠে আমাদের গাড়ী একটা ছোট বাংলোর সামনে দাঁড়ালো।

চিটিমিটি বাংলোটি বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট বাংলো, অনেক নীচে সমতল ভূমি, সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট। কার্সিয়াং থেকে নীচের দিকে যেমন সমতল-ভূমি দেখা যায়, অনেকটা তেমনি দৃশ্য। পেছন দিকে পাহাড়ের নীচে উপত্যকায় বনের আড়ালে করজুলি গ্রামের হো-অধিবাসীরা মাদল বাজিয়ে গান ধরেচে। বাংলোর মধ্যে ঢুকে দেখা গেল অনেকদিন এখানে কেউ না আসার দরুন আসবাবপত্র ভাল অবস্থায় নেই। দুটি মাত্র ছোট ঘর। রাত্রে এখানে থাকার বিশেষ অসুবিধা।

হরদয়াল সিং প্রস্তাব করলেন, এই রাত্রেই চাঁইবাসা ফেরা যাক।

এই বরকেলা শৈলমালার বিপজ্জনক নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে মোটর রোড ঘুরে ঘুরে নীচের সমতলভূমিতে নেমেচে। অন্ধকারের মধ্যে সে পথে মোটরে যাওয়া এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। অগণন জোনাকীপুঞ্জ জলচে গাছের ডালে পাতায় পাতায়। দশ-বিশ হাত অন্তর ফাঁকা। একপাশে গভীর খাদ। তার পরেই বনাবৃত উপত্যকা। ওপরে একটা বেজায় উঁচু পাহাড় খাড়া উঠেচে। মোটর খুব জোরে চলতে পারচে না।

আমি বললুম—কোন বিপদ নেই তো?

হরদয়াল সিং বললেন—বুনো হাতী ছাড়া।

—বুনো হাতীর হাতে পড়েচেন এমন অবস্থায়?

—একবার পড়েছিলুম। এই সংকীর্ণ পথে এমন অন্ধকারে।

—বলেন কি?

—মোটরে যাচ্চি, হাতী সামনে এসে দাঁড়ালো—আর নড়ে না। মোটর ফেরাবার জায়গা নেই। অগত্যা মোটর থামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতী পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়তে লাগলো। তারপর অনেকক্ষণ পরে কেন যে চলে গেল তার কারণ কিছু বলতে পারবো না। সমস্ত রাতও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো।

মিঃ সিংহ বললেন—এই সব পথে বিশ্বাস নেই। পরের বাঁকেই হাতী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বরকেলা পাহাড়ে হাতীর বড় উপদ্রব।

আমরা পাহাড়ের পথে নামছিলুম। আশে পাশে ঘনীভূত অন্ধকার। নির্জ্জন অরণ্যপথ—গাড়ীতে অন্ধকারের মধ্যে আমরা চার পাঁচটি প্রাণী, কোনো দিকে লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না, দূরে বা নিকটে একটা আলো কোথাও জ্বলে না—কেবল নৈশ আকাশে অগণন ঝক্‌ঝকে নক্ষত্ররাজি, গাছের ডালে ডালে জোনাকীর ঝাঁক, গাড়ীর মধ্যে দু-একটা জ্বলন্ত সিগারেটের ক্ষীণ দীপ্তি।

গল্প যদি শুনতে হয় তবে এই সময়।

আমি বললুম—চা আছে ফ্লাস্কে?

মিঃ সিংহের আরদালি বললে—আছে হুজুর।

আমি প্রস্তাব করলাম—গাড়ী একটা ভাল জায়গা দেখে থামিয়ে চা খাওয়া এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক্। এই সময়ে মিঃ সিংহ তাঁর প্রথম চাকরী জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। গল্পটা মুলতুবী রয়েচে অনেকক্ষণ থেকে।

আরও পনেরো মিনিট পরে বাঁদিকে একটা বড় শিলাখণ্ড পাওয়া গেল, যেন সান বাঁধানো চাতাল। এর পাশে আমাদের গাড়ী থামানো হোল। বেশ আরামে বসে চা খাওয়া গেল পাথরের চাতালে বসে। পাশের খাদে যেন একরাশ নিবিড় অন্ধকার জমে। দু-একটা নৈশ পাখির ডাক বনের মধ্যে। মিঃ সিংহ বললেন—সে হোল ১৯২২ সালের কথা। সে বারে আমি প্রথম বন-বিভাগে ট্রেনিং-এ গেলাম। অর্ডার পেলাম, পোংসাতে গিয়ে বন-বিভাগের কর্ম্মচারীর কাছে কাজ শিখতে হবে।

পোংসা কোথায় ?

—যখনকার কথা বলচি, তখন আমিও জানতাম না। শুধু এইটুকু আমায় বলে দেওয়া হয়েছিল, বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের মনোহরপুর স্টেশনে নেমে সেখানে যেতে হয়।

—কত মাইল ?

—ষোল-সতেরো মাইল।

—রাস্তা ভালো ?

—সেইটাই আমার গল্পের বিষয়। এ গল্প প্রধানত রাস্তার গল্প। আজ এই অন্ধকার রাত্রে বনের পথে সে কথা বড় বেশি করে মনে হচ্চে। শুনুন তারপর। মনোহরপুর স্টেশনে নেমে ওখানকার বন-বিভাগের বাংলোতে লোকজনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাদেরই মুখে শুনলাম আমার গন্তব্যস্থান এখান থেকে ১৫।১৬ মাইল দূর। বেলা তিনটা। আমার সঙ্গে সাইকেল ছিল, দেশ থেকে এক পাচক ঠাকুরও এনেছিলাম। আমি ভাবলাম, এ আর এমন বেশি দূর কি! সাইকেলে চট করে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম বাধা হোল পাচক ঠাকুর। সে পথ চেনে না। একা এ পথে যেতে পারবে না। অগত্যা আমরা কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে পদব্রজে কইনা নদী পার হয়ে ওপারে গেলাম। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্চে, প্রাকৃতিক দৃশ্য চিরকালই ভালবাসি, নীল পাহাড়শ্রেণী দেখে মনে বড় আনন্দ হোল। ওখান থেকে যেতে পথের ধারে ধারে দু-দশটি শালগাছ, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়, তার ওপর গাছপালা। আমার বন সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই পূর্ব্বেই বলেচি। বিন্ধ্যাচলে বন দেখে ভেবেছিলাম এই বুঝি নিবিড় অরণ্য। এর চেয়ে আর কি বড় বন হতে পারে ? আমার দেশ আরা জেলায়, বন বলে কোনো জিনিস নেই, শুধু ক্ষেত-খামার আর চষা জমি। জমির বড় দাম, এতটুকু পড়তে পায় না।

আমি বললাম—কত দাম জমির ?

—পাঁচ-ছশো টাকা বিঘে। তাও ভাববেন না খুব ভাল জমি।

—তারপর ?

—তারপর মাইল পাঁচেক পথ এসে কোল-বোংসা বলে একটা ছোট গ্রাম। হো-জাতীয় অধিবাসীদের বাস। সেখানে এসে কুলিরা আর যেতে চাইল না। তারা বললে সে গ্রামেই তাদের বাড়ী। আর এক পাও তারা নড়বে না, তাদের মজুরি চুকিয়ে দেওয়া হোক। অগত্যা আমাদের সেখানে রাত কাটাতে হোল গ্রামের প্রান্তে বন-বিভাগের একটা ছোট খড়ের ঘরে। ঘরটাতে কেউ থাকে না, ঘরের চারিদিকে বড় বড় শাল গাছ, সারা রাত্রি ধরে শিশির পড়তে লাগলো, যেন মনে হচ্চিল টুপ টুপ করে বৃষ্টি পড়চে। সময়টা ছিল কার্ত্তিক মাস।

—খেলেন কি ?

—আমার পাচক ঠাকুর দুটি ভাত রান্না করলে, তাই খেয়ে শুয়ে পড়ি। পরদিন সকালে উঠে জিজ্ঞেস করে জানলাম পোংসা সেখান থেকে দশ মাইল রাস্তা। পাচককে বললাম, কুলি

জোগাড় করে আমার পরে পোংসা রওনা হতে। আমি তখনই সাইকেলে চললাম। ঠাকুর বারণ করলে তখন যেতে। আমি বললাম—বন তো ফুরিয়ে গিয়েচে। এ রাস্তা বিশেষ খারাপ হবে না। বন যে আরম্ভ হয় নি তখন কি তা জানি?

মিঃ হরদয়াল সিং বললেন—পোংসাতে আমিও ছিলাম ট্রেনিং-এর সময়। দেরাদুনে ফরেস্ট কলেজে যাওয়ার পূর্ব্বে। ওখানে বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানীর আপিস ছিল সে সময়।

মিঃ সিংহ বললেন—কোল-বোংসা থেকে মাইল খানেক রাস্তা বেশ বন পেলাম। কিন্তু নিকটেই গ্রামের গরু মহিষ চরচে, কাঠুরে কাঠ কাটচে, সুতরাং তত ভয় হবার কথা নয়। তারপরে মহাদেবশাল বলে একটা ঝর্ণা পার হলাম, নিবিড় বনের মধ্যে ঝির ঝির করে বইচে পাথরের ওপর দিয়ে। ভাবলাম, বন আর কতদূর হবে? এই শেষ হয়ে গেল। ক্রমে পাহাড়ের ওপর রাস্তা উঠতে লাগলো, উঠচে, উঠচে, সাইকেলে যেতে যেতে পা ভেঙে পড়চে, বুকের মধ্যে কেমন অস্বস্তি হচ্চে, এদিকে বন ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তম হতে লাগলো। জনমানবহীন সুনির্জ্জন সুনিবিড় বনানী সেই ক্রমোচ্চ পাহাড়ী পথের পাশে। আরা জেলার অধিবাসী আমি, অমনতর বনের ধারণাই নেই আমার। ভয়ে বিস্ময়ে আমি কেমন হয়ে গেলাম। একটা মানুষ কি নেই সেই পথে? যত যাই পথেরও কি শেষ নেই? অত বেলা হয়েচে কিন্তু সে বনে ভালো করে তখনও সূর্য্যের কিরণ পড়ে নি। এ রকম আবার বন হয়!

আমরা যেখানে পাথরের চাতালে বসে গল্পটা শুনছিলাম, বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সানু-প্রদেশের বনানীর মধ্যে সেখানে অন্ধকারে চারিদিকে যেন মিঃ সিংহের এ অভিজ্ঞতা নিজেদের কাছেই বাস্তব হয়ে উঠেছিল। এ গল্প শুনতে হয় এমন জায়গাতে বসেই বটে।

মিঃ সিংহ বললেন—তারপর এক জায়গায় আমার সত্যিই মনে হোল পোংসা নামক জায়গাতে বেঁচে থাকতে আর বোধ হয় পৌছবো না। তখন নতুন বিয়ে করেচি। মনে হোল এখানে বসে পকেটের কাগজ নিয়ে একটা উইল লিখে রাখি। এই যেন হাতী কি বাঘ এসে ঘাড়ে পড়লো বলে। আর কোন আশাই নেই। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে মনের জোরে পথ চললাম। অবশেষে বন ক্রমে যেন একটু পাতলা হয়ে এল। একটা পাহাড়ের ওপর একটা ছোট বাংলো পাওয়া গেল। লোকালয় দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তখন বেলা তিনটে। জিজ্ঞেস করে জানলাম আমার গন্তব্যস্থান এখান থেকে আরও মাইল ছয়েক। কোল-বোংসায় যে বলেছিল দশ মাইল, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। আবার বন। তবে আমার মনে অনেকখানি ভরসা হয়েচে।

আমি বললাম—কখন পৌছুলেন—

—প্রায় সন্ধ্যার সময়। ওপরওয়ালা কর্ম্মচারী ছিলেন এক পাঞ্জাবী, তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি বাসা দিলেন প্রায় আধ মাইল দূরে এক ছোট্ট খড়ের ঘরে। সারাদিন সাইকেল চড়ার পরিশ্রমের পরে সেই ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর বিনা বিছানাতে বিনা লেপে

শুয়ে রইলাম। দুর্দান্ত শীত। অনেক রাত্রে পাঞ্জাবী কর্ম্মচারীর চাকর আমায় খানকতক রুটি আর একটু ডাল দিয়ে গেল। পরদিন দুপুরের সময় আমার পাচক এসে পৌছুল আমার জিনিসপত্র নিয়ে। সে না কি ঐ রাস্তায় একটা বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। বিচিত্র নয়!

মিঃ সিংহ গল্প শেষ করলেন। আমরা আবার মোটরে উঠে সৈদবার পথে বরকেলা পাহাড়শ্রেণী থেকে নেমে এসে রঁাচি চক্রধরপুর-রোড ধরলাম। রাত দশটায় চাঁইবাসা।

আমি বললাম—পোংসায় আর কিছু ঘটে নি আপনার চাকরীর প্রথম দিনে?

মিঃ সিংহ বললেন—আর বিশেষ কিছু নয়, তবে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। কেবল ভাবি, যেমন বন-জঙ্গল দেখচি, হয়তো বাঘ-ভালুক ঢুকেই পড়বে ঘরের মধ্যে। তার উপর ভীষণ শীত, আমার সঙ্গে একখানা মাত্র আলোয়ান এবং সেই একমাত্র শীতবস্ত্র। এত অসুবিধের মধ্যে ঘুম যতটা হওয়া সম্ভব ততটা হয়েছিল।

—কোথায় শোবার জায়গা দিয়েছিল?

—একটা ছোট্ট ঘরে। তার একদিকে জঙ্গল ও ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী ঝর্ণা। গ্রাম থেকে সিকি মাইল দূরে।

এ সব প্রশ্ন সেদিন অত খুঁটিনাটি ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলুম এবং তার উত্তর এত আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলুম যে, গৃহ ও পরিবারবর্গের অঙ্ক থেকে সদ্যবিচ্যুত একটি অনভিজ্ঞ যুবকের সেই দিন ও রাত্রির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং পথের পাশে অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় চা পানের পরের বৎসর আমি নিজে যখন মিঃ সিংহের সঙ্গে মোটরে মনোহরপুর থেকে কোল-বোংসা হয়ে পোংসা এলুম এমন কি ছোটনাগ্‌রা গ্রামের সেই কুঁড়েঘর দেখলুম যেখানে মিঃ সিংহ রাত কাটিয়েছিলেন —তখন আমার কল্পনায় অঙ্কিত সব ছবির সঙ্গে এত গরমিল হোল, যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলুম।

গত ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আমি মিঃ সিংহের সঙ্গে সিংভূমের বিখ্যাত সারাণ্ডা ফরেস্ট ভ্রমণ করি। মিঃ সিংহ তিন মাসের জন্যে সারাণ্ডা বিভাগে বদলি হয়েছিলেন,' আমিও ঐ দুই মাসের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে ওঁর সঙ্গে সারাণ্ডা ভ্রমণে বের হই।

মনোহরপুর থেকে মোটর ছেড়েই আমরা কইনা বলে একটি পর্ব্বত্য নদী পার হলুম।

তারপর রাঙা মাটির আঁকা-বাঁকা পথ, এঁকে বেঁকে যেতে যেতে সাত-আট মাইল দূরবর্ত্তী সপ্তশত শৈলযুক্ত সারাণ্ডা (Saranda of seven hundred hills) অরণ্যপ্রান্তরের নীল রেখার সঙ্গে মিশে গিয়েচে, পথের পাশে এখানে একটা ডুংরি (অনুচ্চ পাহাড়), ওখানে একটা ছোট শালবন, কোথাও বা একটা হো-অধিবাসীদের গ্রাম।

মিঃ সিংহ বললেন—এই সেই পথ, মনে আছে আমার গল্প?

আমি তখনও পর্য্যন্ত বন দেখি নি সে পথে। বললাম—কেন এ পথ মন্দ নয় তো?

মাইল ছ-সাত পরে কোল-বোংসা গ্রামে পৌছে গেলাম। উনি বললেন—চলুন, এ গ্রামে যেখানে রাত্রি যাপন করেছিলাম দেখিয়ে আনি।

মোটর থেকে নেমে আমরা একটা পাহাড়ের ওপর উঠলাম। সেই পাহাড়ের মাথার ওপর ক্ষুদ্র একটি কুটিরের সামনে এক বৃদ্ধ লোক খামারে ধান ঝাড়চে, কুমড়োর লতা উঠেচে কুটিরের খড়-ছাওয়া চালের ওপর, কুটিরের দাওয়া থেকে সম্মুখের সারাণ্ডা-বনকান্তারের শৈল-শ্রেণীর গম্ভীর দৃশ্য হিমালয়ের পার্ব্বত্যভূমির সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হিংসে হোল বৃদ্ধ ব্যক্তিটির ওপর, এমন সুন্দর জায়গায় ওর বাড়ী!

মিঃ সিংহ তাকে বললেন—কি জাত?

লোকটা বললে—'গোসাঁই'। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। এ দেশে ব্রাহ্মণকে বলে 'গোসাঁই'। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি ওর গলায় মলিন পৈতে ঝুলচে বটে।

সে পাহাড় থেকে আমরা ওপারের সমতলভূমিতে নেমে আসল গ্রামে পৌছুলাম।

গ্রামের প্রান্তে একটা ভাঙা কুঁড়েঘর দেখিয়ে মিঃ সিংহ বললেন—এই ঘরে সেদিন রাত কাটিয়েছিলাম।

কুটিরটির চারধারে বড় বড় শালগাছ, একটু দূরে একটা কালো পাথরের ডুংরি অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। সে পাহাড়ের উপর শালগাছের সঙ্গে লতা-পলাশের (Butea superba) জড়াজড়ি। বসন্তকালে রক্ত পলাশের মেলা যখন শুরু হয়ে যাবে বনে বনে, তখন যে কোনো কবি, সাহিত্যিক, ভাবুকের পক্ষে কিংবা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন সাধুর পক্ষে এই নিভৃত বনকুঞ্জবর্ত্তী কুটিরটি অতি লোভনীয় হবে সন্দেহ নেই।

কোল-বোংসা গ্রামে বাস করে হো-জাতীয় অধিবাসীরা, ঘরদোর তাদের অত্যন্ত খারাপ —নিতান্ত দীনহীন, কিন্তু তারা এক রমণীয় পার্ব্বত্য দৃশ্যের মধ্যে সর্ব্বদা থাকে, ওদের কুটিরের দাওয়ায় বসলে নীল শৈলমালা ও বনকান্তারের কি শোভন রূপটিই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। অনেক বড়লোকের বাড়ী হয়তো কোনো এঁদো গলির মধ্যে এক ইটের স্তূপ মাত্র, দরজার একপাশে দেখা যাবে ডাস্টবিন; গোটাকতক কাক আর খেঁকিকুকুর আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্চে—এমন নীল বনানীর শোভা, এমন রক্তপলাশের উৎসব সেখানে কোথায়?

কোল-বোংসা গ্রাম ছেড়ে মহাদেবশাল বলে একটি পার্ব্বত্য নদী নিবিড় বনের মধ্যে বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে কুলুকুলু শব্দ করে বয়ে চলেচে। নিভৃত ছায়াবিতান রচনা করেচে সারাণ্ডা অরণ্যপ্রান্ত। এখান থেকেই চড়াইয়ের পথে মোটর উঠতে লাগলো। পরক্ষণেই কি নিবিড় বন শুরু হোল রাস্তার দুদিকে, কি দূর সমতল ভূমির দৃশ্য! ওই দূরে মনোহরপুর ইস্টিশান, ওই ট্রেনের ধোঁয়া উড়চে, ওই সেই কোল-বোংসা গ্রামে ছোট্ট পাহাড়ের ওপর গোসাঁইয়ের কুটির ও খামার।

এক এক জায়গায় বনের গম্ভীর দৃশ্য মনে ভয়ের সঞ্চার করে, তবুও আমরা মোটরে চলচি, সঙ্গে এতগুলো-লোক। কিন্তু একটি অনভিজ্ঞ যুবক যেদিন এই বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে একা সাইকেলে গিয়েছিল, তার সেদিনকার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারলাম।

মিঃ সিংহ বললেন—এই সেই পথ, দাদা।

—বেশ বুঝতে পারচি।

—এখনও কিছু দেখেন নি। আরও আগে চলুন।

চৈতন্যদেবের সেই "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"! বন কি নিবিড় হয়ে উঠচে, কাছির মত মোটা মোটা চীহড় লতা (Bonhivia Vallai) বিশাল বনস্পতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে দুর্ভেদ্য ও অন্ধকার লতাকুঞ্জের সৃষ্টি করেচে পদে পদে, অত বেলাতেও সূর্য্যের আলো পড়ে নি।

একটা জায়গা দেখিয়ে মিঃ সিংহ বললেন, এখানে এসে এমন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে ভাবলুম একটা উইল লিখি ও পকেটে একখানা পরিচয় রাখি।

আমি বললাম—বন্যজন্তু আছে এখানে?

—সারাণ্ডাতে বন্যজন্তু নেই? বাঘ বলুন, বুনো হাতী বলুন, ভালুক বলুন—অভাব কি; বাইসন, সম্বর হরিণ পর্য্যন্ত। বাদ নেই কিছু।

দেড় ঘণ্টা মোটর চালানোর পর বন একটু পরিষ্কার হোল। দূরে দেখা গেল লাল টালির দু-চারখানা ঘরবাড়ী। মিঃ সিংহ বললেন—ওই হোল পোংসা—

পোংসাতে বি.টি.টি. কোম্পানীর (ব্রিটিশ টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানী) বড় আড্ডা। এই কোম্পানীর অংশীদারেরা হচ্চে বিলাতের বড় লোকেরা, এমন কি পার্লামেণ্টের মেম্বার পর্য্যন্ত আছে এদের মধ্যে। বিদেশীর স্বার্থে আমাদের দেশের বন্যসম্পদ সব লুণ্ঠিত হচ্চে। গত ত্রিশ বৎসরে সিংভূমের এই অপূর্ব্ব অরণ্যভূমি অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করচে বিলাতের বড় মানুষেরা, আর বনভূমির আদিম অধিবাসী হো ও মুণ্ডারা কুলিগিরি করে দাসত্বের অন্ন ভোজন করচে মাত্র।

সেই বনাবৃত স্থানে ছোট্ট একটি গ্রাম। একখানা সাহেবী ফ্যাসানের খড়ের বাংলো-ঘরের মধ্য থেকে একজন সাহেব বার হয়ে এল আমাদের মোটরের শব্দ শুনে।

মিঃ সিংহ বললেন—শুনি বি.টি.টি. কোম্পানীর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার মিঃ লক্‌নার ভালো লোক।

একদিকে একটা লম্বা খড়ের ব্যারাক-মত বাড়ী। একটি বাঙালী বিধবা মহিলা একখানা ঘর থেকে বার হয়ে এলেন মোটরের আওয়াজ পেয়ে। শুনলাম ও বাড়ীখানা কেরাণীদের থাকবার জায়গা। এতদূরে এই বনের মধ্যে দু-একটি বাঙালী পরিবার কি ভাবে নির্জ্জন জীবন যাপন করচেন চাকুরীর খাতিরে—ভাবতে ভালো লাগে।

মিঃ লক্‌নারের মোটর আছে, তিনি মোটরে মনোহরপুর যেতে পারেন মানুষের মুখ দেখতে, কিংবা যেতে পারেন একশ মাইল দূরবর্ত্তী দুধিয়া ও চিড়িয়া খনিতে, সেখানে শ্বেতকায় ম্যানেজার আছেন। কিন্তু এই বাঙালী কেরাণীদের বাড়ীর মেয়েছেলেরা জেলে আবদ্ধ অবস্থায় এখানে কিভাবে দিন কাটান, কি করে বলবো?

আমার বড় ইচ্ছা হচ্চিল এই মুহূর্ত্তে গাড়ী থেকে নেমে ওই বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ীতে

চলে যাই, ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে ওদের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে দিই—ঠিক বলতে পারি ওরাও খুব খুশী হবে আমাকে পেয়ে।

পোংসা থেকে কিছুদূর এসে আবার আমরা ঘন বনের পথে ঢুকে পড়লুম, বাঙালী বাবুদের বাসা ও সাহেবদের বাংলো অনেক পেছনে পড়ে রইল।

মিঃ সিংহের সঙ্গে পোংসা থেকে বার হয়ে কিছু দূরে বনপ্রান্তে এসেচি, একটা লোককে খাটিয়াতে শুইয়ে চারজন কুলি কাঁধে খাটিয়াসুদ্ধ মানুষটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্চে। লোকটা বালিশে মাথা দিয়ে খাটিয়াতে শুয়ে পড়ে আছে অচৈতন্যভাবে। আমি জিজ্ঞেস করলুম কুলিদের—কে এ বাবু?

—বি. টি. টি. কোম্পানীর লোক।

—কি হয়েচে?

—বেমার।

—কোত্থেকে আসচে?

—জঙ্গলের মধ্যে কাজ করছিল।

—কোথায় নিয়ে যাচ্চ?

—পোংসা। সেথান থেকে মনোহরপুর হাসপাতালে।

—বাঙালী?

—হাঁ বাবুজী।

—নাম জানো?

—চক্কটি বাবু।

বড় ইচ্চে হোল এই রোগগ্রস্ত প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোককে নিজে একবার দেখি, দুটো কথা ওঁর সঙ্গে বলি, কিন্তু তিনিও জ্বরে বেহুঁশ, আমারও সময় নেই।

মিঃ সিংহ বললেন—ভীষণ ম্যালেরিয়া মশাই, সারাণ্ডার ভেতরে।

—লোক থাকে না?

—হো যারা, তারা ভোগে না, ভোগে বিদেশীরা।

সারাণ্ডা ফরেস্টে পক্ষপাতিত্ব আছে বেশ।

—শুধু ম্যালেরিয়া?

—ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার।

খাটিয়াসুদ্ধ রোগী পোংসার দিকে বাহিত হয়ে চলে গেল। আমরা আরও কিছুদূর এসে উম্বুরিয়া নামে একটা পার্ব্বত্য ঝর্ণা বা ক্ষুদ্র নদী পার হলুম। মিঃ সিংহ বললেন—অনেকদিন আগে গ্রেগরি বলে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাস করতো উম্বুরিয়া ঝর্ণার ধারে একটা বাংলোতে—আমাকে মাঝে মাঝে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতো তার বাংলোতে। চলুন সে জায়গাটা দেখে আসি।

১৯২৫ সালে গ্রেগরি ওখানে থাকতো।

উস্থরিয়া পাহাড়ী নদী। খুব শব্দ করে বয়ে যাচ্চে বনের মধ্যে দিয়ে—দুদিকে পাষাণময় উঁচু তীর। শিলাতটে প্রতিহত হচ্চে উস্থরিয়া ঝর্ণার নির্ম্মল জলধারা। অপরাহ্ণের ছায়া পড়ে এসেচে, হল্‌দে রোদ উঠেচে গগনচুম্বী তরুশ্রেণীর শীর্ষদেশে।

কতক্ষণ নদীর তীরে শিলাসনে বসে রইলুম। উস্থরিয়ার কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গীত।

মিঃ সিংহ দেখে এসে বললেন—গ্রেগরির বাংলোর চিহ্ন নেই, সেখানে ঘোর বন।

—গ্রেগরি কি করতো এখানে?

কোম্পানীর করাতের কারখানা ছিল উস্থরিয়ার পাড়ে। সাহেব ছিল কারখানার ম্যানেজার।

—কারখানা উঠে গেল কেন?

—ঠিক জানি নে। শুধু সাহেবের বাংলো নয়, কুলিদের ব্যারাক ছিল, কারখানা ঘর ছিল। দেখচি কিছুরই চিহ্ন নেই।

—১৯২৫ সালের পর এই প্রথম এলেন ১৯৪৩ সালে?

—তাই। উনিশ বছর পরে।

—"পুরা যত্র স্রোতঃ" কালিদাসের সেই শ্লোক জানেন তো? নগরী হচ্চে বন, বন হচ্চে নগরী। কালিদাসের কালেও তো এমন ধারাই ঘটতো। আজ দেখচেন পোংসায় বি. টি. টি. কোম্পানীর আপিস, মিঃ লক্‌নার তার বড় সাহেব। দু-দিন পরে সব জঙ্গল হয়ে যাবে, বুনো হাতীর ভয়ে দিনমানে মোটর চালানো দুষ্কর হবে।

এইভাবে সেদিন আমি মিঃ সিংহের গল্পে বর্ণিত পথ নিজের চোখে দেখেছিলুম। কিন্তু আমি সারাণ্ডা ফরেস্টের গল্প বলতে বসি নি, বলছিলাম চিটিমিটি থেকে আমাদের চাঁইবাসা ফিরবার গল্প। সেই গল্পই আবার আরম্ভ করি।

গাছতলা থেকে চা খেয়ে ও মিঃ সিংহের গল্প শুনে উঠে দেখি রাত অন্ধকার, গভীর অন্ধকার। বন্যহস্তীর ভয়ে সেই পার্ব্বত্যপথে সাবধানে গাড়ী চালিয়ে আমরা বরকেলা শৈলমালা থেকে ধীরে ধীরে নেমে সমতলভূমির পথে নামলুম। সৈদবা কলি আমাদের ডানদিকে। এবার আর পথের ধারে গভীর খাদ নেই, সুতরাং নিরাপদ পথে দ্রুত ছুটলো মোটর।

মিঃ হরদয়াল সিং বললেন—ঐ সামনেই রাঁচি রোড—

একটু পরেই আমরা পিচ-ঢালা চওড়া রাঁচি রোডে এসে উঠলাম। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে রোরো নদীর সেতু পার হয়ে চাঁইবাসা টাউনে প্রবেশ করলুম—রাত তখন দশটা—এ কথা আগেই বলেচি।

চাঁইবাসা ফিরে ঠিক করা গেল পরদিনই আমরা জয়ন্তগড় ও চম্পুয়া যাবো এবং বৈতরণী নদীর ধারে মাঠে ও বনে হবে আমাদের নিক্‌পিক্! প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, যে বনভোজনে বাড়ী থেকে তৈরি খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়া হয় তার নাম হোল নিক্‌পিক্—

আর যেখানে রান্না করে খাওয়া হয় সেটা পিক্‌নিক্‌। নিক্‌পিকের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন বৌমা, সুবোধের স্ত্রী। তাঁর নিপুণ ও শিল্পীহস্তের তৈরি অনেক কিছু সুখাদ্য এলুমিনিয়ম্‌ সম্পুটকে ভর্ত্তি হোল, তবে চা নাকি তৈরি হবে বৈতরণী নদী-তীরের চমৎকার মাঠে ও বনের ধারে—তাই চায়ের সাজসরঞ্জাম নেওয়া হোল সঙ্গে।

আমরা জন-পাঁচেক একটা মোটরে। হাট-গামারিয়ার রাস্তায় মোটর হু হু চললো। দুধারে গ্রানাইটের অনুচ্চ পাহাড়, চাঁইবাসার আশে পাশে দক্ষিণ ধলভূমের সর্ব্বত্র এই ধরণের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় কালো পাথুরে কয়লার একটি স্তূপ। পাথরগুলোও অনেক জায়গাতেই অমনিতর ছোট ছোট ও আল্‌গা। পাহাড়ের ওপর শিশুগাছ (Dalbergia Sishu) অনেক দেখলুম এ অঞ্চলে। শিশুগাছ সাধারণতঃ পাহাড়ে দেখা যায় না, বনে পাওয়াও কঠিন। বাংলাদেশে যা শিশুগাছ বলে চলে, তা হোল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানি রেইন ট্রি। অনেক জেলা-বোর্ডের পথের ধারে বাংলাদেশে এই জাতীয় গাছ যথেষ্ট দেখা যায়।

মিঃ সিংহ বললেন—কাছেই একটা ভালো ঝর্ণা আছে।

—কতদূর ?

—রাস্তা থেকে এক মাইল। বনের মধ্যে।

—এখন যাওয়া যাবে ?

—ফিরবার পথে সুবিধা হবে, এখন থাক।

এ পথে হাট-গামারিয়া একটি ভালো জায়গা। মহারাজা শ্রীশ নন্দীর চীনামাটির খনি আছে এখানে। আর একটা আছে কিছুদূরে, সেটার মালিক জনৈক ধনী মারোয়াড়ী মহাজন। ধূ ধূ মাঠ ও রুক্ষ গ্রানাইট পাথরের অনুচ্চ টিলার মধ্যে ক্ষুদ্র একটা লোকালয়, বাজার, চায়ের দোকান, খোলার চালার দোকান-ঘর, একটি ডাকবাংলো—এই নিয়ে হাট-গামারিয়া। তারপর আবার চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তা সীমাহীন অনুর্ব্বর প্রান্তরের বুক চিরে সোজা চলেচে বহুদূরস্থ কেউনঝর স্টেটের শৈলমালা ও অরণ্যানীর দিকে। মাঝে মাঝে ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী নদী ঝিরঝির করে বইচে। আর একটা কি গ্রাম পড়লো, শুনলুম অনেক সমৃদ্ধিশালী মুসলমানের বাস সে গ্রামে। একটা মসজিদও দেখা গেল। বন কোথা নেই—দু-একটা শাল মহুয়া গাছ মাঠের মাঝে মাঝে।

অনেক দূর গিয়ে সামনে পড়ল একটা বড় নদী, তার ওপর বাঁদিকে একটা ভাঙ্গা পুল। রাস্তা বেঁকে চলে গেল নদী পার হয়ে একটা নতুন-তৈরী পুলের ওপর দিয়ে। নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল গাড়ী। সুবোধবাবু বললেন—বৈতরণী পার হলেন এবার।

—বলেন কি ? এত সহজে ?

—তাই।

এখন কোথায় যেতে হবে ?

—তিন মাইল দূরে চম্পুয়াতে যাবো।

—সে তো কেউনঝর রাজ্যে ?

—বৈতরণী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে কেউনঝর রাজ্যে পা দিয়েচেন।

—সীমান্ত রক্ষী-টক্ষী নেই ?

—ও সবের বালাই নেই এদিকে।

আমরা একটি দৃশ্য দেখলুম—কেউনঝর-স্টেট থেকে লুকিয়ে চাল এনে বিক্রি করচে গরীব চাষীরা। বৈতরণীর এপারের ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথম গ্রামে গাছতলায় চোরাই চালের হাট। খরিদ-বিক্রি বেশ জোর চলচে। ক্রেতা বেশির ভাগ মারোয়াড়ী মহাজন।

দূরে মাঠের মধ্যে বেশ সুন্দর একটি অট্টালিকা দেখা গেল।

মিঃ সিংহ বললেন—ওই হল চম্পুয়া ফরেস্টার্স ট্রেনিং একাডেমি।

—কেউনঝর-স্টেটের ?

—আমাদের গভর্নমেণ্টের।

স্কুলটা আমরা দেখতে গেলুম। সাহাবাদ জেলার একটি মুসলমান ভদ্রলোক স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। তিনি অত্যন্ত যত্ন করে মেয়েদের নিয়ে ক্লাসরুম, মিউজিয়ম, বোর্ডিংঘর ইত্যাদি দেখালেন। বড় বড় ব্ল্যাক্‌বোর্ড টাঙ্গানো ক্লাসে ক্লাসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি। নূতন পালিশ করা 'চেয়ার বেঞ্চ'। বেশ ভালো ব্যবস্থা পড়াশুনোর।

মিউজিয়ম—সিংভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের বনের বিভিন্ন শ্রেণীর টিম্বার, লতা, বীজ, বনজাত দ্রব্যাদি দিয়ে সাজানো। এখানে প্রথম গিলে বীজ দেখলুম—গিলের সাহায্যে ধুতি পাঞ্জাবি কোঁচাতে দেখেচি, কিন্তু জিনিসটা কি জানতাম না। মহিষের সিং-এর মত প্রকাণ্ড এক প্রকার ফলের মধ্যে যে বীজ থাকে তাই হোল গিলে। একটা ফলের মধ্যে আটটা করে বীজ থাকে। নানা রকমের আঁশ—যা থেকে নাকি রেশমের চেয়েও ভাল কাপড় হতে পারে, তবে হয় না। মিউজিয়মের বাইরে ওসব আর কোথাও দেখা যায় না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন—আপনাদের একটু চা—

আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—না না থাক, তার আর দরকার নেই। বেলা গিয়েচে।

একটু পরে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম জয়ন্তগড়। বৈতরণী-তীরে সুন্দর ডাকবাংলো ও মাঠ। বৈতরণীর একটা ছোট খাল, ডাকবাংলোর মাঠের এক ধার বেষ্টন করে রেখেচে। খালে এখন জল নেই। খালের ধারে জলজ ঘাস। স্থানটি বেশ নির্জ্জন ও মনোরম।

সঙ্গে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল, ওরা ছুটোছুটি করে খেলা করতে লাগলো মাঠে। মেয়েরা চায়ের জল চড়াবার ব্যবস্থা দেখতে গেলেন। নিকৃপিকের আয়োজন পুরোদমে চললো।

আমরা তিনটি পুরুষ-মানুষ নদীর ধার ঘেঁষে চেয়ার পেতে বসে যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের চর্চ্চা করি। একটি ছেলে এসে বললে—মা বলে দিলে কাঠ নেই—

আমি অবাক হয়ে বলি—কাঠ ?

—হুঁ।

মিঃ সিংহের দিকে চেয়ে বলি—কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে ?

মিঃ সিংহ স্থবোধের দিকে চেয়ে বললেন—কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে ?

স্থবোধ ছেলেটির দিকে চেয়ে কড়া স্থরে হেঁকে বললে—কাঠ নেই বলে দিগে যা—

আমি বললায়—তা হোলে চা-ও থাকবে পড়ে। মেয়েরা কাঠ যোগাড় করবে কোথেকে ?

একটু পরে ছেলেটি আবার ফিরে এসে বললে—মা বললে কাঠ না পেলে চা হবে না—

আমি সংক্ষেপে বললাম—খুব লজিক্যাল কথা।

স্থবোধ চটে উঠে বললে—তবে ব্যবস্থা করুন।

—সবাই মিলে কাঠ কুড়ুতে যাই চলুন।

মিঃ সিংহ বললেন—খুব ন্যায্য কথা।

স্থবোধ নিরুপায় হয়ে বললে—ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিই কাঠ আনতে।

আমি বলি—অভাবে শুকনো খড।

চমৎকার নিকৃপিক্ ঘটে গেল জয়ন্তগড়ের ডাকবাংলোর সামনের মাঠে বৈতরণীর তীরে। প্রচুর জলখাবার, তার সঙ্গে গরম চা। শীত পড়েছিল, আমরা বেলা সাড়ে চারটের সময় মোটরে উঠলুম আবার। বেশী দেরি করা উচিত হবে না। মাইল সাতেক গিয়ে একটা চীনেমাটির খনি। ধনী মালিকের প্রাসাদোপম বাসগৃহ কারখানা ও আপিস ঘরের হাতায়। আমরা গিয়েচি শুনে ম্যানেজার নিজে এসে কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে পরীক্ষাগারে নিয়ে গেলেন। এই মাটি দিয়ে চায়ের ডিশ পেয়ালা তৈরির পরীক্ষা চলচে সেখানে।

আমি বললাম—মালিক কোথায় থাকেন ?

—ওঁর দেশ গোয়ালিয়র, তবে চাঁইবাসাতে বাড়ী আছে।

—ভাল কাজ চলচে ?

—কাজ দশগুণ বেড়ে গিয়েচে যুদ্ধের দরুন। গভর্নমেণ্ট থেকে বহু চায়ের ডিশ পেয়ালার অর্ডার পেয়েচি।

—ডিশ পেয়ালা হচ্চে ভালো ?

—পরীক্ষা চলচে, এখন যা হচ্চে তা ভেঙ্গে যায় সহজে।

—এ মাটিতে টেকসই হবে ?

—নিশ্চয়ই। মাস দুইয়ের মধ্যে আমরা গভর্নমেণ্টের অর্ডারে হাত দিতে পারবো।

তাঁর অনুরোধে আমরা মালিকের প্রাসাদের ছাদে উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্চে দূরে গুয়া আর নোয়ামুণ্ডি পাহাড়-জঙ্গলের পেছনে। পশ্চিম দিগন্তের রক্তাভ আকাশপটে এই নীল অরণ্যানীর দৃশ্য যেন ছবির মত আঁকা। সেই মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ধনী মালিকের শ্বেত প্রাসাদটি যেন অবাস্তব বলে মনে হচ্চিল। যেখানে আশেপাশে

বহুদূরের মধ্যে শুধু গ্রানাইট পাথরের গণ্ডশৈল ও মুণ্ডারি অধিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির।

আমরা বললাম—এ বাড়ীতে মালিক থাকেন কখন?

ম্যানেজার হেসে বললেন—যখন তাঁর মর্জ্জি হয়। বাড়ী তৈরি শেষ হয়েচে অল্পদিন।

—এর মধ্যে আসেন নি?

—না। তবে দেখতে আসবেন জানিয়েচেন।

—কত টাকা খরচ হোল বাড়ীতে?

—চল্লিশ হাজারের ওপর খরচ হয়ে গিয়েচে।

ম্যানেজার আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে চাইলেন—কিন্তু আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। হাট-গামারিয়া চীনেমাটির খনিতে পরেশ সান্যাল কাজ করেন। তিনি অনুবাদ-সাহিত্যে হাত পাকিয়েচেন। আমাদের ইচ্ছে হোল ঘোরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হাট-গামারিয়া এসে ডাকবাংলোর পেছনে বাসা খুঁজে বার করা গেল। কিন্তু একটি ছোট মেয়ে ভেতর থেকে এসে জানালো কাকা তো বাড়ীতে নেই—বাজারের দিকে গিয়েচেন। বাজারে এসে খোঁজাখুঁজি করতে পরেশবাবুর দেখা পাওয়া গেল। সেই তেপান্তর মাঠের মধ্যেকার ক্ষুদ্র গ্রামে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকেন এঁরা, অপ্রত্যাশিতভাবে এতগুলি বাঙালীর মুখ দেখে পরেশবাবু খুব খুশী হয়ে উঠলেন। তাঁর বাড়ী গিয়ে আমরা ফিরে এসেচি এতে খুব দুঃখিত হোলেন। বললেন—চলুন, একটু চা খেয়ে আসতে হবে। আমরা বললাম, আজ রাত হয়ে গিয়েচে অনেক। আর একদিন নিশ্চয়ই হবে।

সুবোধবাবু বললেন—আপনি কাল আসুন না চাঁইবাসায়।

—যাবো।

—আপনি এলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাবো।

আমরা বিদায় নিলাম পরেশবাবুর কাছ থেকে।

কি সুন্দর জ্যোৎস্না!

বার বার আমার মনে হচ্চে বনের সেই অদেখা ঝর্ণাটির কথা। যদি এত রাত্রে এমন জ্যোৎস্নার মধ্যে সেখানে যাওয়া যেত। কিন্তু কোন কথা বলতে ভরসা হোল না, রাত প্রায় দশটা বাজে। সুবোধবাবু বললেন—কাল সেরাইকেলা যাওয়া যাবে যদি পরেশবাবু আসেন—

মি: সিংহ বললেন—এবার কিন্তু আর নিক্‌পিক্‌ই নয়, পুরো পিক্‌নিক্ হোক—

—অসুবিধে আছে। ওসব হাঙ্গামা পোষাবে না। নেমন্তন্ন, মানে পার্টি আছে সেখানে।

—আমরা বিনা নিমন্ত্রণে পার্টিতে যাই কি করে?

—তাতে কিছু আটকাবে না! এ সব নিজেদের মধ্যের ব্যাপার।

পরদিন আমরা বেশ একটা বড় দল সেরাইকেলার পথে রওনা হলাম। ও পথে মাইল

পাঁচেক যাবার পরে মুক্ত প্রান্তরের এখানে ওখানে অসংখ্য গণ্ডশৈল আমাদের চোখে পড়লো। আরিজোনার 'পেইণ্টেড ডেজার্ট' ছবিতে যেমনটি দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। কি অদ্ভুত ছন্নছাড়া মুক্তরূপা প্রকৃতি! ধরণীর অরুণোদয় এখানে বাধাবন্ধহীন, নিজের মহিমাতে নিজে ভরপুর। ঘরদোরের পাঁচিল দেওয়াল এরা একমুহূর্ত্তে ভেঙে দিয়ে মনটাকে গৃহবিবাগী, উদাস বাউল করে তোলে। কোনো পাহাড়ের ওপর কোনো গাছ নেই—শুধু কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের স্তূপ, কোনো কোনোটাতে সামান্য একটু ঘাস। দূরে পশ্চিম দিগন্তে সুদীর্ঘ বরকেলা শৈলমালা, দূরত্বের কুয়াশাতে কিছু অস্পষ্ট। ওরই ওপরে কোথাও সেই চিটিমিটি-বাংলো। ওরই সানুদেশের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে সেদিন মোটরে চড়ে নেমে আসা!

একটা কি নদী পার হোল গাড়ী। নদীর জলে এখানে ওখানে ডুবে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই। সামনে একটা অপকৃষ্ট খোলার বস্তি নজরে পড়লো। নীচু খোলার বস্তির একপাশে একটা সাদা চুনকাম-করা অট্টালিকা।

আমি বললাম—ওটা কি?

সুবোধ বললে—ওই সেরাইকেলা।

সেরাইকেলা ক্ষুদ্র টাউন। ঢুকতেই কতকগুলি খোলার বস্তি, মাঝে মাঝে দু'চারটি চুনকাম করা সাদা একতলা দোতলা বাড়ী। বাজারে অনেক দালান পসার, তবে সবাই যেন খুব গরীব লোক, কাঠের কারিগরেরা বারকোশ খেলনা ইত্যাদি তৈরী করচে ছোট ছোট খোলার ঘরে বসে। বাজারের ভেতরটা বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলেও আমার মনে হোল না।

ঢুকেই যেখানে গেলাম, সেখানে সংবাদ পাওয়া গেল, টাউনে বেজায় কলেরা দেখা দিয়েচে। আমরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তবে এখানে আমাদের কিছু খাওয়া উচিত হবে না।

পি. ডবলিউ. ডি. আপিসে বসে আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্চিল। একটি বাঙালী যুবক-কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করলেন। তিনি সুলেখক মানিক ভট্টাচার্য্য মশায়ের কি আত্মীয় হন। আমি মানিকবাবুর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলাম তাঁকে; শুনলাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আওরঙ্গাবাদে (গয়া জেলার মহকুমা) শিক্ষকতা করেন এবং বর্ত্তমানে সেইখানেই আছেন।

একটু পরে চা লুচি ও সন্দেশ আসতে আমরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম।

—এসব—

—কোনো ভয় নেই, সব বাড়ীর তৈরী।

—কিন্তু জলটা—

—ও এই বাংলোর হাতার ইঁদারার। তাও ফুটিয়ে নেওয়া।

—তাই তো—

—কোনো ভয় নেই। দোকানের কোনো জিনিস নেই।

জলযোগ সেরে আমরা রাজবাড়ী দেখতে গেলাম। এমন খুব বড় বাড়ী নয়, বাংলাদেশের গ্রাম্য জমিদার-বাড়ীর মত সাদাসিদে, আড়ম্বরশূন্য। আমরা দরবার-হলে নীত হলাম। এই হলের চারিদিকে দেওয়ালে রাজপরিবারের ব্যক্তিগণের বড় ছোট তৈলচিত্র, একপ্রান্তে থিয়েটারের স্টেজ। এই সেরাইকেলার রাজপরিবার নৃত্যশিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, এঁরা অনেকে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। মহাত্মা গান্ধীর সামনে এম্পায়ার থিয়েটারে যে ছৌ-নৃত্য প্রদর্শিত হয়েছিল, তার একটা বড় ফটোগ্রাফ দেখলাম এখানে। পাতিয়ালার রাজবংশের সঙ্গে সেরাইকেলার রাজবংশ বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ বিখ্যাত ঘটনা যেদিন ঘটেছিল, সেদিন আমি, পরিমল গোস্বামী, 'বঙ্গশ্রী'র সহকারী সম্পাদক কিরণবাবু ও বন্ধুবর প্রমোদ দাশগুপ্ত যাচ্ছিলাম সম্বলপুর জেলার দুর্গম পর্ব্বতারণ্যের অভ্যন্তরে বিক্রমসোল নামক স্থানের অজানা শিলালিপির সন্ধানে। সিনি জংসনে আমরা এই বিয়ের জনসমাগম ও শোভাযাত্রা দেখি। সে হোল ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসের কথা।

রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা স্থানীয় মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। এটি বিশেষ করে এই রাজ্যে যে সব খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তারই মিউজিয়ম। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার বাবু হরিদাস মহান্তি আমাদের সে সব দ্রব্য বিশেষ করে দেখালেন। খনিজ এ্যাসবেস্টোস্ এখানে প্রথম দেখলুম একটা কাচের আলমারির মধ্যে।

বললুম—এটা কি জিনিস? কিসের সুতো?

কারণ একগোছা সরু রৌপ্যসূত্রের মত দেখতে জিনিসটা।

হরিদাসবাবু বললেন—ও হোল এ্যাসবেস্টোস্। খনি থেকে ওঠানো অবস্থায়।

আরও নানা ধাতু দেখলাম বিভিন্ন কাচের আলমারীতে।

বিকেলের দিকে আমরা সেরাইকেলা থেকে বার হই।

আমাদের গাড়ীতে এক হাঁড়ি খাবার তুলে দিলেন এঁরা।

আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলুম আসবার সময় পথের ধারে যে সব শৈলমালা দেখে এসেচি, ওদের মধ্যে কোনোটার ওপর বসে নিক্‌পিক্—কিংবা—

নিক্‌পিক্‌ই হয়ে গেল ঠিক।

আমাদের মধ্যে তর্ক বাধলো। কেউ বলে, "এই পাহাড়টা ভালো—" কেউ বলে "ওটা ভালো।"

অবশেষে বন্ধুবর পরেশ সান্ন্যাল একটি পাহাড় দেখিয়ে বললেন,—"দেখুন এটাই সব চেয়ে ভালো হবে।"

বড় সুন্দর পাহাড়টি, বড় চমৎকার সেই বিস্তৃত প্রান্তর—ঠিক যেন ফিল্মে দেখা আরিজোনার সেই 'পেইণ্টেড্ ডেজার্ট'।

তখন বেলা পড়ে এসেচে। আমরা অনুচ্চ পাহাড়টিতে উঠলাম, ওর সমতল শিখরদেশে আমরা শতরঞ্জি পেতে বসলাম। আমাদের চারিদিকে অনুচ্চ, রুক্ষ, অনুর্ব্বর অসংখ্য

পাহাড়—নানা আকৃতির, নানা ধরণের। কোনোটার আকার পিরামিডের মত, কোনোটার বা মন্দিরের মত, কোনোটা নর্মান ক্যাস্‌ল-এর মত, কোনোটা বিরাটকায় শিবলিঙ্গের মত, কোনোটা গম্বুজাকৃতি। কোনোটার রং কালো, কোনোটা মেটে সিঁদুরের মত রাঙা, কোনোটা ধূসর, কোনোটা ঝক্‌ঝকে মিছরির মত সাদা কোয়াৎর্জ্‌ পাথরের। প্রত্যাসন্ন শীতের অপরাহ্নের রাঙা রোদ কোনো কোনোটার মাথায়। হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে, খড়কাই নদীর দিক থেকে। পশ্চিমে বহুদূরে দিকচক্রবালের অনেকটা জুড়ে সুদীর্ঘ বরকেলা পাহাড়শ্রেণী, তারই পিছনে এখন টক্‌টকে রাঙা সূর্য্যটা অস্ত যাচ্চে। চারিপাশের সেই সব অদ্ভুত-দর্শন পাহাড় দেখে মনে হয় আমেরিকার কোনো ছন্নছাড়া মরুভূমির মধ্যে বসে যেন space-এর সমুদ্রে ডুবে আছি, থৈ থৈ space-এর সমুদ্র, কূলকিনারা দেখা যায় না।

মনে হয় কলকাতার সরু এঁদো গলির মধ্যে আলোবাতাসশূন্য একতলা ঘরে যারা বাস করে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যারা সূর্য্যাস্ত দেখবার সুযোগ পায় না, মুক্তরূপা ধরণীর সৌন্দর্য্য, প্রসারতা, অপরাহ্নের ছায়া-নেমে-আসা বিরাট প্রান্তরের ছবি যারা কখনো দেখে নি, নির্জ্জন পাহাড়ের সমতল শিলাসনে বসে দূরের গিরিমালার দিকে চেয়ে থাকে নি কখনো যারা, তাদের নিয়ে আসি, তাদের এ সব দেখাই। এমন অনেক গরীব গৃহস্থের কথা আমার মনে হয় এই সব মুক্ত স্থানে বসলেই। আমি জানি তাদের, কি ভাবে তারা থাকে।

ওদেরই মধ্যে একটি বধূ আমাকে বলেছিল—দাদা, তারকেশ্বর কোন্ দিকে ?

—কেন ?

—সেখানে একবার যেতে ইচ্ছে করে—

—গেলেই হয়। বেশি দূর তো নয়।

—তাই তো দাদা, পয়সায় যে কুলোয় না! উনি যা পান তাতে এই ঘরভাড়া দিয়ে খেয়ে দেয়ে কি থাকে বলুন। কতদিন থেকে ভাবচি—

—এই বাসায় কতদিন আছ তোমরা ?

—হয়ে গেল সাত বছর। আমার ঐ খুকির বয়েস, দাদা।

—কোথাও যাওনি এই সাত বছরের মধ্যে ?

—হ্যাঁ, যাচ্চি! কোথায় যাবো ? আপনি পাগল! পয়সা কোথায় ?

যখন কোথাও যাই, কোনো ভাল জিনিস দেখি, তখন আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সেই বধূটির কথা মনে পড়ে।

পরেশবাবু একটা গল্প জুড়ে দিলেন। আমরা খাবারের হাঁড়ি খুলে শালপাতায় খাবার ভাগ করে দিতে থাকি। তারপর সবাই খাই, আর চারিদিকে চাই।

এ ঠিক আরিজোনার মরুভূমি, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এখুনি দূরে কোথাও কোয়াট্ ডেকে উঠবে, যার ছন্নছাড়া চীৎকার শুনলে নির্জ্জন মরুপ্রান্তরে অতি বড় সাহসী পথিকেরও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

সেই পাহাড়টিতে আমরা বসে রইলুম সন্ধ্যার একপ্রহর পর পর্য্যন্ত। হাসি গল্পে সময় কাটলো।

মোটরে চাঁইবাসা ফিরবার পথে আমরা জল্পনা-কল্পনা করলাম, একটা জ্যোৎস্না রাত দেখে শীগ্‌গির আবার একদিন ঐ পাহাড়টাতে এসে পিক্‌নিক্ করতে হবে। বড় সুন্দর প্রান্তর, বড় সুন্দর পাহাড়টি। এ ধরণের জল্পনা অনেকক্ষেত্রে অনেক বার হয়, কিন্তু আর কার্য্যে পরিণত হয় না। কোনো ভাল জায়গায় বেড়িয়ে ফিরবার পথে মনে হয়—ও, এই তো। এখানে আবার কতবার আসবো, এই এত কাছে।

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। যাওয়া আর ঘটে না।

এখানেও তাই। সেরাইকেলা ভ্রমণের পরে দু-বছর কেটে গিয়েচে—অথচ সেই নির্জ্জন শৈল সন্দর্শনের সৌভাগ্য আর কখনো ঘটে নি আমাদের।

চক্রধরপুর থেকে রাঁচীর পথে বিখ্যাত হিড্‌নি জলপ্রপাত। অনেকদিন থেকে আমাদের দেখবার ইচ্চে ছিল। গত বৎসর ভাদ্র মাসে (১৩৫০ সালের ভাদ্র) আমি ঘাটশিলা থেকে সাহিত্যসভা উপলক্ষে চাঁইবাসা যাই। সভা শেষ হোল রাত দশটায়।

গুমট্ গরম। আমরা মিঃ সিন্‌হার বাড়ী আহারাদি সেরে অনেক রাত পর্য্যন্ত কোলহান পার্কের বেঞ্চিতে বসে গল্পগুজব করলাম। কোলহান পার্ক চাঁইবাসা টাউনের একটা সম্পদ বলে মনে করি। মস্ত বড় পুকুর, পুকুরের ধারে ফুলের বাগান, হু হু করচে জলের হাওয়া, ভুর ভুর করচে হাস্‌নুহানার সুবাস বাতাস, ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্না, নির্ম্মেঘ আকাশ। বন্ধুদের মধ্যে কেউ আবৃত্তি করচেন, কেউ গান করচেন, রাত যে কত হয়েচে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ বন্ধুবর সুবোধ ঘোষ বললেন—চলুন, শোওয়া যাক গে, রাত বোধ হয় বারোটা একটা হয়ে গেল—

বাস্তবিক সে একটা অদ্ভুত রাত্রি কাটিয়েচি কোলহান পার্কের জলের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে। পাঁচ ছ'জন বন্ধুবান্ধব, সবাই মিলে গানে গল্পে কোন্ দিক থেকে সময় কেটে গেল, ঘুমোবার ইচ্চে নেই কারো।

এই সময় মিঃ সিন্‌হা বাড়ী থেকে ঘড়ি দেখে এসে বললেন—রাত তিনটে—

আমরা সবাই চমকে উঠি।

তি-ন-টে ?

—খাঁটি তিনটে। এক মিনিট কম নয় !

—তাইত !

সুবোধ প্রস্তাব করলে—তবে আর শুয়ে কি হবে ?

আমিও এতে সায় দিলাম।

পরেশবাবু বললেন—আমারও তাই মত।

আমি বললাম—আমার একটা প্রস্তাব আছে।

সবাই বললে—কি ?

—এখুনি চলুন সবাই বেরুনো যাক একসঙ্গে। কাল সকালে হিড্‌নি ফল্‌সে নিক্‌পিক্‌ করা যাবে—

সবাই মিলে হৈ হৈ করে উঠলো বেশ ভালো প্রস্তাব। পরেশবাবু বললেন—আমারও অনেকদিন ওটা দেখার ইচ্ছে ছিল—তাই চলুন। সুবোধ মোটর বার করতে চলে গেল। আমরা মিঃ সিন্‌হার বাড়ী গিয়ে খাবার জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধে ছেঁদে নিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী ঘন অরণ্য মধ্যে অবস্থিত হিড্‌নি জলপ্রপাতের কাছে বনভোজন করবার সব আয়োজন ঠিক করে মোটর ছেড়ে দিলাম।

আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি কেবল বললেন—আমার আজ যাওয়া হবে না। ঘাটশিলায় ফিরতে হবে, আমাকে দয়া করে চক্রধরপুরে বম্বে-মেল ধরিয়ে দেবেন—

এখন রাত চারটে। চক্রধরপুর মাইল ষোলো আঠারো রাস্তা। আমরা জ্যোৎস্নালোকিত রাঁচি-রোড দিয়ে রোরো নদীর পুল পার হয়ে সবেগে মোটর ছুটিয়ে দিয়েচি। দুধারে ছোট বড় পাহাড়, বর্ষায় বনানী সবুজ হয়ে উঠেচে, জ্যোৎস্না পড়েচে পাহাড়ী নদীর জলে, মাঝে মাঝে দু-একটা হো-অধিবাসীদের বন্যগ্রাম। পরেশবাবু প্রকৃতিরসিক ব্যক্তি। বললেন—এদিকে কখনো আসি নি ভারী চমৎকার তো ? কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে।

সুবোধ বললে—আরও আগে চলুন, আরও ভাল দেখবেন—

একটু পরে সঞ্জয়-নদীর পুল পার হয়ে আমরা দূরে চক্রধরপুরের সাদা সাদা বাড়ী দেখতে পেলাম। ঘাটশিলার বন্ধুটি তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, পাঁচটা বাজবার দেরি নেই, বম্বে-মেল পাওয়া যাবে তো ?

চক্রধরপুর স্টেশনের বাইরে আমরা মোটর থামালুম, বন্ধুটি নেমে গেলেন।

মিঃ সিন্‌হা বললেন—একটু দুধের যোগাড় করলে হোত। সকাল হোলেই তো চা চাই। দুধ নেই সঙ্গে।

সুবোধ বললে—শেষ রাত্রে এখানে দুধ পাওয়া যাবে বলে মনে তো হয় না। চেষ্টা করতে পারেন।

কিন্তু সুবোধের কথাই ঠিক হোলো। কোথাও দুধ মিললো না চক্রধরপুর স্টেশনে।

আমরা মোটর ছাড়লাম। আরও আধঘণ্টা পরে আমরা কিছু দূরে টেবো পাহাড়শ্রেণী দেখতে পেলাম। কেউ কেউ এটাকে সেরাইকেলা পাহাড়শ্রেণীও বলে।

পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে র াঁচি-রোড উঠেচে ওপরে। পাহাড়ে উঠবার কিছু আগে রাস্তার ধারে ইংরিজিতে লেখা আছে 'এখান থেকে ঘাট আরম্ভ'— পাহাড়ী রাস্তাকে এদেশের ভাষায় "ঘাট" বলে।

অনেকদিন আগের কথা, তখন আমি এসব দিকে আসি নি। আমাদের এক গ্রামের বৃদ্ধ ভদ্রলোক চক্রধরপুরে কি কাজ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছিলাম চক্রধরপুরে র াঁচি-রোডের

দৃশ্য অপূর্ব্ব, বিশেষ করে রাস্তা যখন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর ওঠে। মনে আছে, আমি তাঁকে এ পথের দৃশ্যের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি তত বর্ণনা দিতে পারেন নি, মোটামুটি বলেছিলেন, 'ভালো'। কিন্তু শুধু 'ভালো' বা 'চমৎকার' শুনে আমার মন তৃপ্ত হয় নি, আমি চেয়েছিলাম যা, তিনি তা আমায় দিতে পারেন নি।

সে আজ অন্ততঃ সতেরো আঠারো বছর আগের কথা।

তখন জানতাম না একদিন শরৎকালের শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মোটরে সেই অরণ্য-পর্ব্বতের পথে প্রমোদ ভ্রমণ আমার অদৃষ্টে ঘটবে। – সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো এতদিন পরে। তিনিই প্রথম এ রাস্তার সৌন্দর্য্যের কথা আমায় বলেন, এ পথ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। যতদূর জানি, তিনি এখন আর ইহলোকে নেই, শেষ বয়েসে বিদেশে কোথায় কণ্ট্রাক্টারি করতেন, সেখানে মারা যান।

তিনি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেন নি দেখলুম। পথ ঘুরে ঘুরে যখন উঠতে লাগলাম টেবো পাহাড়ে, তখন মনে হলো, এ পথে সবারই একবার বেড়িয়ে যাওয়া উচিত। অপূর্ব্ব দৃশ্য। পথের দুধারে বড় বড় গাছপালা, বড় বড় পাথর, মায়াময় শিখরদেশ জ্যোৎস্নামাখা, বনের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে।

প্রকৃতিরসিক পরেশবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—চমৎকার!

আমরা সকলেই একবাক্যে তাঁর কথায় সায় দিলুম।

পাহাড়ের ওপরে রাস্তার দুধারে জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির কি অপূর্ব্ব শোভা! কেঁদ গাছের কালো কালো পাতায় জ্যোৎস্না পড়ে চক্‌চক্ করচে। ঘন, নির্জ্জন বনানীর নৈশ নিস্তব্ধতা মনে ভয়-মিশ্রিত রহস্যের উদ্রেক করে।

আমি বললাম—এখানে মোটর থামিয়ে একটু বনটা দেখা যাক—

সুবোধ আপত্তি করলো—এখানে বাঘের ভয়, বিশেষ করে এই রাতের বেলায়। মোটর থামিয়ে নামা উচিত হবে না।

মিঃ সিংহ বললেন—কিছু হবে না। নামা যাক।

পরেশবাবুও আমাদের মতেই মত দিলেন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত মোটর থামানো হোল—আমি, পরেশবাবু ও মিঃ সিংহ নেমে রাস্তার ধারে বনের প্রান্তে একখানা বড় পাথরের ওপর বসলাম। সুবোধ গাড়ীর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

সে নৈশপ্রকৃতির শোভা নিজের চোখে দেখবার জিনিস। লোকালয় থেকে বহুদূরে পাহাড়ের মাথায় ঘন বন, শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় আমরা ক'টি প্রাণী সেখানে চুপ করে বসে আছি, যে কোনো মুহূর্ত্তে বাঘ বা যে কোনো বন্যজন্তু বেরুতে পারে, বন্যহস্তীর তো কথাই নেই—এসব বনে হাতীর সংখ্যাই বেশি, ভালুকও যথেষ্ট। বিপদের মধ্যেই ভ্রমণের আসল আনন্দ, অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে, সে জায়গা যতই সুন্দর করে সাজানো হোক না কেন, বেড়িয়ে সে ভয়, সে উত্তেজনার সন্ধান মেলে না। অনুভূতির নতুনত্বই মানুষের জীবনের বড় সম্পদ। মিনিট পনেরো পরে আমরা মোটরের কাছে গিয়ে সুবোধকে ঘুম থেকে ওঠালুম। এতক্ষণ

সুবোধই চালাচ্চিল, মিঃ সিংহ বললেন—তোমার হাতে আর বিশ্বাস নেই এই পাহাড়ী রাস্তায়, ঘুমকাতুরে চোখে খাদের মধ্যে ফেলে দেবে। সরো, আমার হাতে ষ্টীয়ারিং দাও—

রাত শেষ হয়ে আসচে।

সেই গভীর গিরিবনে হেমন্ত রাত্রির কুয়াশা হঠাৎ ঘনিয়ে আসতেই কেউ আর কিছু দেখতে পায় না। মিঃ সিংহ ভরসা করে গাড়ী জোরে চালাতে পারলেন না। চক্ষের নিমেষে কুয়াশা নেমে চারিধার ঢেকে ফেলেচে, পাহাড় দেখা যায় না, জঙ্গলের গাছপালাও খুব স্পষ্ট নয়। সামনে পিছনে সব যেন ঘষা-পয়সার মত লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল। সন্তর্পণে গাড়ী চালাতে লাগলেন মিঃ সিংহ। একটু অসাবধানে গাড়ী চালালে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে মোটর চুরমার হয়ে যাবার ভয়। এমন সময় পরেশবাবু চেঁচিয়ে উঠে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—ঐ-ঐ—কি ওটা, দেখুন দেখুন—সকলে চেয়ে দেখলাম কি একটা জানোয়ার মোটরের হেড্‌লাইটের আলোয়.মোটরখানার সামনে ছুটে চলেচে।

সুবোধ বললে—হরিণ।

আমি বললাম—বাঘ!

পরেশবাবু বললেন—ভালুক!

সেটা যে জানোয়ারই হোক, রাস্তা ছেড়ে দিতে জানে না দেখা গেল। সামনে সেটা চলেচে গাড়ীর আগে আগে দৌড়ে—পাশ কাটিয়ে আমাদের পথ দেবার কোনো চেষ্টাই তার নেই। সমানে ছুটচে। আমি বললাম—স্পীড্ বাড়িয়ে ওটাকে চাপা দিলে কেমন হয়, মিঃ সিংহ?

মিঃ সিংহ বললেন—হয় ভালোই, কিন্তু গাড়ী জোরে চালাতে সাহস করি নে এই কুয়াশার মধ্যে।

প্রায় মাইল খানেক পথ গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটবার পরে জানোয়ারটা হঠাৎ লাফ দিয়ে বাঁ দিকের কুয়াশাবৃত বন-মধ্যে অন্তর্হিত হোল। এর আগেও সে অনায়াসেই যেতে পারতো, কেন যে যায় নি সে-ই বলতে পারে।

এই সময়ে সকলেরই ভীষণ ঘুম পেয়েচে! ভোর পাঁচটা ঘড়িতে দেখা গেল। ফুটফুট করচে জ্যোৎস্না, যেন রাত দুপুর। নির্জ্জন নিস্তব্ধ কুয়াশাচ্ছন্ন বনানী আমাদের চারিদিকে ঘিরে। মিঃ সিংহ একবার গাড়ী থামিয়ে রুমাল বের করে চোখ মুছে নিলেন। খুব ঘুম পেয়েচে তাঁরও।

আমি বললাম—গাড়ী একপাশে রেখে একটু ঘুমিয়ে নিন মিঃ সিংহ, এ অবস্থায় গাড়ী চালানোটা—

সুবোধ বললে—খুব বিপজ্জনক! কিন্তু এখানে গাড়ী রাখাটা আরও বিপজ্জনক—

—কেন?

—বাঘের ভয়।

শুনে পরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—তবে চলুন চলুন, যাওয়াই যাক—

আমি বললাম—হেসাডি ডাকবাংলো আর কতদূর ?

মিঃ সিংহ বললেন—বেশিদূর বোধ হয় না—কুয়াশার মধ্যে কিছু যে বুঝতেই পারচি নে—

আমি বললাম—তা হোক মশাই রাখুন এখানে গাড়ী। ঘুমন্ত অবস্থায় মোটর চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে—

স্থবোধ ও পরেশবাবু মহা আপত্তি তুললে। এখানে গাড়ী রাখা যায় না এই শ্বাপদসংকুল অরণ্যানীর মধ্যে, এগিয়ে যাওয়াই ভালো। আরও মিনিট পনেরো কুয়াশার মধ্য দিয়ে চালানোর পরে বাঁদিকে বনের মধ্যে হেসাডি ডাকবাংলো চোখে পড়লো। আমাদের গাড়ী ডাকবাংলোর হাতায় ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছনের সিটে শুয়ে আধমিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভেঙ্গেচে, তখন শুয়ে শুয়েই দেখচি সামনের পাহাড়ে রাঙা রোদ, গাছের মাথায় রাঙা রোদ। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি গাড়ীর মধ্যে কেউ নেই। চোখ মুছে উঠে দেখি পরেশবাবু ডাকবাংলোর বারান্দায় পায়চারি করচেন। বললাম—স্থপ্রভাত, এঁরা কোথায় ?

—সব ঘুমোচ্চে।

—ওঠান সব, বেলা হয়েচে অনেক।

একটু পরে আমরা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে চায়ের টেবিলে ভিড় করেচি, কিন্তু সেই পুরাতন সমস্যা, দুধ নেই। ডাকবাংলোর চৌকিদারদের বলা গেল। তম্বি গম্বি করা হোল—দুধ নেই। লেবু আছে তাই দিয়ে করা যেতে পারে না চা ?

মিঃ সিংহ বললেন—চমৎকার হবে। তাই হোক। ইটালিতে দেখেচি লেবুর চাকলা কেটে চায়ে ডুবিয়ে চামচে দিয়ে চেপে চেপে খায়। সে বেশ লাগে।

খাবারদাবারের মধ্যে দেখা গেল ছোলা—রাশীকৃত ছোলা ছাড়া আর কিছু খাবার নেই। অত ছোলা কি হবে ? কে খাবে অত ছোলা ?

স্থবোধ বললে—অত ছোলা খাবে কে ?

আমি বললাম—তাই তো। কি হবে অত ছোলা ?

মিঃ সিংহ বললেন—না হয় কিছু থাকবে এখন। হিড্‌নি ফল্‌স্‌ গভীর বনের মধ্যে, সেখানে গিয়ে আমরা খাবো। কিন্তু মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখা গেল একদানা ছোলাও অবশিষ্ট নেই, এমন কি টেবিল থেকে গড়িয়ে যেসব ছোলা মেজেতে পড়ে গিয়েছিল—শেষে দেখা গেল সবাই তাও কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্চি।

স্থবোধ বললে—আরও কিছু হোলে হোত দেখা যাচ্চে।

আমি বললাম—আমারও তাই মনে হচ্চে বটে।

আরও এক মাইল এগিয়ে গেলাম মোটরে। তারপর মোটর রেখে আমরা রাস্তার ডানদিকে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলুম। চারদিকে গভীর বন, উঁচু শৈলমালা, একটা পাহাড়ী নদী—পাহাড়ী রাস্তার নীচে দিয়ে বয়ে চলেচে। সামনের দিকে বন গভীরতম।

খানিকদূর গিয়ে আমরা একটু নীচু উপত্যকার মধ্যে নামলাম, আবার সেই পাহাড়ী নদীটা উপলবিছানো পথে পার হলাম। এইবার দূর থেকে জলপতনের গর্জ্জনশব্দ শোনা গেল—আরও একটু এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়লো পেঁজা তুলোর বস্তার মত জলরাশি পাহাড়ের ওপর থেকে, বনের মাথা থেকে উপচে পড়চে। আবার একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা নীচে নামতেই বাঁদিকের বনের আড়ালটা সরে গেল। জলপ্রপাতটা একেবারে চোখের সামনে আমাদের।

পরেশবাবু কবি লোক, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন—বাঃ, অতি চমৎকার!

আমরা সবাই সায় দিলাম। জায়গাটা যেন আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো—কোথাও এতটুকু মাটি বা বালি নেই। স্তরে স্তরে নেমে গিয়েচে পাথরের ধাপে ধাপে—যেন পুকুরের সান বাঁধানো ঘাট।

মিঃ সিংহ বললেন—আমরা সকলে স্নান করে নেবো চলুন ওই জলে।

পরেশবাবু বললেন—ম্যালেরিয়া হবে না তো নাইলে?

সুবোধ বললে—না, এখানে ম্যালেরিয়া কোথায়?

আমরা বসে বসে দেখলুম কতক্ষণ।

স্থানটির গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখবার জিনিস। শুধু বর্ণনায় পড়ে ঠিক বোঝা যাবে না। যে উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়চে, তার চারিপাশে ঘন বনানী, চুনাপাথরের প্রাচীর। যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে ল্যাণ্টানা ক্যামেরা ফুলের গাছ—ফুল ফুটে আছে।

তারপর আমরা জলপ্রপাতের তলায় স্নান করতে গেলাম।

সে এক চমৎকার ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা!

প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হবে অত জল আর অত জোরে যদি গায়ে এসে পড়ে, তবে পিঠ দুমড়ে বেঁকে যাবে। তা অবিশ্যি হয় না কিন্তু এটা মনে হয় যে খুব ভারি কি একটা জিনিস দুড়দাড় করে পিঠে পড়চে। মিঃ সিংহ আবার আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন প্রপাতের ধারার পেছনে, পতনশীল জলধারা আর পর্ব্বতের প্রাচীর—এ দুয়ের মাঝখানে।

বললাম—কেন?

—আসুন, আসুন, মজা হবে।

—আমার মজায় কাজ নেই মশায়, ওখানে যাবো না।

—একটুখানি এসে দেখে যান—

আমিও যাবো না, মিঃ সিংহ নছোড়বান্দা।

কিন্তু সেখানে যাওয়া সোজা কথা নয়। প্রপাতের সেই বিরাট জলের ভল্যুম এড়িয়ে পার হয়ে! মারা যাবো।

দৃঢ়ভাবে বললাম—আপনি যান। আমাকে মাপ করুন।

মিঃ সিংহ সত্যিই গেলেন সেখানে। পতনশীল সেই বিশাল জলধারার ধোঁয়ার আড়ালে

কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পুনরায় তিনি না বার হয়ে আসা পর্য্যন্ত সত্যই অস্বস্তিবোধ করা যাচ্ছিল।

স্নান সেরে আমরা রওনা হবো, কারণ সঙ্গে খাবার নেই, খেতে হবে সেই চাইবাসায় ফিরে। একজন বন্যলোক হঠাৎ সেখানে এসে পড়লো—হো-ভাষায় তাকে প্রশ্ন করলেন মিঃ সিংহ, সে যা বললে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

—কি করবি এখানে ?

—কেন ?

—বল না।

—মাছ।

—মাছ ধরবি ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি ?

সে নিরুত্তর।

—নাম কি ?

একপ্রকার অস্পষ্ট ঘড়্ঘড়্ শব্দ।

মিঃ সিংহের কথোপকথন শেষ।

লোকটার হাতে বন্য ডালপালার তৈরি একরকম ছোট খাচার মত ব্যাপার। তাই হোল সম্ভবতঃ তার মাছ ধরবার যন্ত্র। কিন্তু এ জল-প্রপাতের উচ্ছল জলধারার মধ্যে মাছ কোথা থেকে আসবে তা আমরা বুঝতে পারলাম না, কি মাছ এখানে পাওয়া যাবে তাও জানি না।

পরেশবাবু আমাদের পেছনে শিলাসনে বসে মনের আনন্দে গান ধরেচেন। সুবোধ মহা-ব্যস্ত সর্ব্বদাই, সে ইতিমধ্যে কখন মোটরে গিয়ে বসেচে, আমরা তা জানি নে, দেখি নি তার চলে যাওয়া, পরেশবাবুই প্রথমে বললেন—সুবোধবাবু কোথায় ?

আমি বললাম—তা কি জানি, এই তো এখানে বসেছিল।

আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে এদিক ওদিক চাইতে থাকি। এই ছিল, গেল কোথায় ! বাঘে নিয়ে গেল না কি ! জায়গাটা তো ভাল নয়।

মিঃ সিংহ বললেন—না না, সে মহা ব্যস্তবাগীশ, সে চলে গিয়েচে গাড়ীতে ফিরে। গাড়ীতে বসে আছে রাঁচি-রোডে।

তখন আমরা সবাই মিলে ফিরলাম।

আর দেরি করা উচিত নয়। লোকটাকেও দেখা উচিত, ক্ষিদেও পেয়েচে যথেষ্ট।

এবার অন্য একটা পথ ধরে রাঁচি-রোড ফিরি। আগে সুবোধ যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার চেয়ে এটা যে কত ভাল !

এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া সর্ব্বত্র। এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো,

একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। সারাপথ যেন ঋষিদের পবিত্র তপোবন। জনমানব-শূন্য। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। আমরা হাঁটতে হাঁটতে রাঁচি-রোডে এসে মোটরে চড়লাম। হু হু করে মোটর ছুটলো কাল রাত্রিকার দৃষ্ট সেই টেবো অরণ্যভূমি ভেদ করে। কাল দেখেছিলুম শেষ রাত্রের মায়াময়-জ্যোৎস্নায়, আজ দেখচি দুপুরের খর রোদে। রাস্তার পাশে ২০০০ ফুট উঁচু টেবো পাহাড়ের উপর টেবো বাংলো।

কেমন সুন্দর নির্জ্জন স্থানে বাংলোটি! দেখে বাস করবার লোভ হয়। চারিধারে বনশ্রেণী, উঁচু পাহাড়ের মাথায় বাংলো। শিউলি ফুল ফুটে আছে।

সুবোধকে বললাম—একটা প্রস্তাব করি—

—কি ?

—এই টেবো পাহাড়ের ওপর লেখকদের জন্যে একটা বাংলো করান—

—তারপর ?

—তারপর গবর্নমেণ্টকে লিখুন লেখকদের সেখানে ফ্রি থাকবার ব্যবস্থা করতে—

—তারপর ?

—তারপর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে, তার জন্যে নামমাত্র দাম নেবে গবর্নমেণ্ট। যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারে, তবে নিতান্ত বিনা কারণে নয়, বিশেষ কোন বই লেখবার বা চিন্তা করবার বা প্ল্যান করবার সময় যখন লোকালয় থেকে নির্জ্জনে থাকবার দরকার হবে—তবে গবর্নমেণ্টকে লিখলেই—

—তিনি যদি কাজ না করে ফাঁকি দিয়ে বাংলো দখল করেন ?

—কোন্ পাগল এই বাঘভালুক ভরা জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে বিনা কারণে আসতে যাবে ? যে আসবে সে কাজ ছাড়া আসবে না। জনমানব নেই, চায়ের দোকান নেই, খবরের কাগজ নেই, আড্ডা নেই, কে থাকবে মশাই ওখানে ?

পরেশবাবু বললেন—যে থাকবে সে সত্যিকার লেখক জানবেন—

মিঃ সিংহ বললেন—অথবা ভ্যাগাবণ্ড—

আমি বললাম—বেশ। সে কি কাজ করচে না করচে তা তদারক করবার ব্যবস্থা না হয় থাক—

সুবোধ বললে—কে সেটা তদারক করবে ? ডাকবাংলোর চৌকিদার অথবা রোড ওভারসিয়ার ?

—কেন ?

—তাও কালেভদ্রে ঐ চৌকিদারই ভরসা। লেখা হপ্তায় হপ্তায় সাবমিট করতে হবে ওর কাছে।

—রাজি। তবে একটা কথা—

—কি ?

—গবর্নমেণ্টকে এটাও লিখবেন, চাঁইবাসা থেকে টেবো পাহাড় পর্য্যন্ত আসার ব্যবস্থাটা

গবর্নমেণ্ট থেকে করা হবে। এত মাইল রাস্তা আসবে কিসে একজন দরিদ্র লেখক? সব সুবিধে করে দিতে হবে গবর্নমেণ্টকে। তার লেখা বা চিন্তার জন্যে যা কিছু দরকার।

—আর কিছু ?

আমি রাগ করে বললাম—এ ঠাট্টার কথা নয়। আজ যদি আমাদের নিজেদের গবর্নমেণ্ট হতো—

—কোন্ দেশের গবর্নমেণ্ট তাদের দেশের লেখকদের জন্যে এমন ব্যবস্থা করে রেখেচে আমি জানতে চাই—

—আমিও বলতে চাই যে যদি না করে থাকে, তাদের করা উচিত। গবর্নমেণ্ট যারা চালায় তাদের কল্পনাশক্তি কম, নিরেট বেশির ভাগ। কবি ও লেখকদের পরামর্শ এ সম্পর্কে তারা যেন নেয়। না নিলে তা সভ্যনামের উপযুক্তই নয়। দেশের লেখকদের এ সুযোগ দেওয়া, এসব সুবিধে করে দেওয়া যে কোনো গবর্নমেণ্টের উচিত। বেশিদিন নয়, দু-একমাস নির্জ্জনে থাকবার পরে আবার লেখক কাজ শেষ করে চলে যাবেন। দেশের দশের কাজই তো। কেন গবর্নমেণ্ট করবে না? করা নিশ্চয় উচিত।

বলাবাহুল্য আমার সে উপদেশ কোনো কাজে এল না। মূল্যবান উপদেশগুলো বৃথায় গেল। গাড়ী পাহাড় থেকে নামলো। জলতেষ্টা পেয়েছিল অনেকক্ষণ থেকেই। কিন্তু পাহাড়ের নীচে নাকটি ডাকবাংলোতে জলের সন্ধান পাওয়া গেল না। চক্রধরপুরে এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে জল আনিয়ে খাওয়া গেল। চাঁইবাসায় ফেরা গেল বেলা তিনটের মধ্যে।

এই ভ্রমণের কিছুদিন পরে আমি ঘাটশিলা ফিরে আসি। একদিন সন্ধ্যায় আমার ভীতি-প্রদ অভিজ্ঞতা হয়। সে কথাটা এখানে বলি।

এই অঞ্চলে শঙ্খচূড় বা King cobra-র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বনে-জঙ্গলে—এ কথা আমি পূর্ব্বেও শুনেচি। কিন্তু অত বনে বনে বেড়িয়েও কখনো আমার চোখে পড়ে নি।

একদিন আমি রাস্তা থেকে কিছুদূরের একটা পাহাড়ে বেড়াতে যাই; পাহাড়টার নাম উল্‌দাডুংরি। ওদিকের ওসব পাহাড়ে গরু চরে, লোকজন ওঠে নামে, কিন্তু দূর থেকে এ পাহাড়ের দৃশ্য দেখে আমার মনে হোল এ পাহাড়টাতে কেউ ওঠে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল।

ভাবলুম, পাহাড়টাতে উঠে কোনো শিলাখণ্ডে বসে সন্ধ্যার শোভা দেখা যাক। সামান্য খানিকটা উঠে লক্ষ্য করলাম পাহাড়টাতে বেজায় কাঁটাবন। ওপরে আর উঠবার উপায় নেই। অনেকগুলো ঝরা শুকনো পাতা সেই কাঁটাগাছগুলো থেকে ঝরে আমার আশেপাশে সর্ব্বত্র পড়ে স্তূপাকার হয়ে আছে পাথরের ওপরে। কাঁটাগাছ যে খুব বড় তা নয়, আমাদের দেশের ছোট ছোট বৈঁচি গাছের মত।

বড় চমৎকার শোভা হয়েচে পশ্চিম আকাশের, সেদিকে সুবর্ণরেখার ওপারে পাহাড়শ্রেণীর

পিছনে সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্চেন। শালবনের মাথায় রাঙা সূর্য্যাস্তের আভা। হু হু হাওয়া বইচে ওদিক থেকে। নির্জ্জন জায়গা, কেউ কোনোদিকে নেই।

একমনে দেখতে দেখতে বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েচি, এমন সময় ঝুপ করে কি একটা শব্দ হোল। শব্দটা একটু অদ্ভুত ধরণের। শুকনো লতাপাতার উপর ঝুপ করে যেন একটা ভারি জিনিস পড়লো। পিছন ফিরে দেখি শুকনো ঝরা পাতার রাশির ওপর একটা বড় মোটা মিশ-কালো সাপ। কিন্তু সাপটার মুখ আর লেজটার দিকে চোখে পড়চে না। আমি মাত্র তার মাঝখানটা দেখতে পাচ্চি। আমি যেখানে বসে, সাপটা সেখান থেকে হাত আষ্টেক দূরে। ও-ধরণের মোটা সাপ আমি আর কখনো দেখি নি।

হঠাৎ আমার বড় ভয় হলো। এই নির্জ্জন পাহাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এই ভীষণদর্শন সাপের হাতে পড়লে নিজেকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাড়া যদি করে পালাতে পারবো না এই কাঁটাগাছ ঠেলে।

আমার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে নামতে যাবো, এমন সময় সাপটা যেন পাশের দিকে অগ্রসর হয়ে আমার কাছে এসে পড়লো। এখনও ওর মুখ দেখা যাচ্চে না, সুতরাং ও আমাকে টের পায় নি।

নামতে গিয়ে মনে হোতে লাগল পাহাড়ের প্রত্যেক ফাটলে অসংখ্য ভীষণদর্শন সাপ বাসা বেঁধেচে। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেচে; ভালো কিছু দেখতেও পাচ্চি নে। কাঁটাগাছে হাত পা ছড়ে রক্তপাত হতে লাগলো! প্রাণভয়ে সব অগ্রাহ্য করে কোনো রকমে নামতে লাগলাম। পথও ফুরোয় না। ওঠবার সময়ে বেশ উঠেছিলাম। এখন সেই পথ দুর্গম ও কঠিন হয়ে পড়েচে।

অন্ধকারও এখন বেশ। যা হোক অতি কষ্টে এক রকম করে তো নামা গেল! ছুটতে ছুটতে শালবনের মধ্যে এসে পড়লাম। উলদাডুংরি আর চাঁইবাসার রাস্তার মধ্যে (জায়গাটা রাখা মাইনস ও চন্দ্ররেখা গ্রামের কাছাকাছি) এই চারা শালবন। অদূরে পথ। গালুডির হাট থেকে কয়েকজন বুনো লোক ফিরছিল! তারা আমাকে ওভাবে শালবনের মধ্যে হাঁটতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কি বাবু?

তখন তাদের খুলে বললাম।

ওরা বললে—সন্দেবেলা ও-পাহাড়ে কেউ যায়? দেখতে পান নি গরু চরে না ও-পাহাড়ে। যে পাহাড়ে গরু চরে না সে পাহাড়ে বিপদ আছে বুঝতে হবে।

—কি আছে ওখানে?

—ওটা শঙ্খচূড় সাপে ভরা। দিনমানেও কেউ যায় না।

—তোমরা দেখেচ?

—বাবু, এই চন্দ্ররেখা গ্রামের একজন নাপিত ওই পাহাড়ে পাকা কুল তুলে আনতে গিয়েছিল। তখন অনেক কুলগাছ ছিল ওখানে। দুপুর বেলা কুল পাড়তে গিয়ে ছ্যাখে মস্ত

বড় তিনটে শঙ্খচূড় গাছের গুঁড়ির গায়ে জোট পাকিয়ে রয়েচে। ওকে দেখে একটা তো তেড়ে এল, ও ছুট্ দিলে। কিন্তু ছুটবে কোথায়? দেখেচেন তো কেমন কাঁটা। কাঁটা পায়ে বিঁধে পাথরের ওপরে পড়ে গেল। ওর পড়ার শব্দে কি রকম ভয় পেয়ে সাপটা পালিয়ে গেল তাই রক্ষে, নয়তো নাপিতের পো তো সেদিন জন্মের মত কুল খেতো। ওসব পাহাড়ে আর কখনো এমন সময়ে উঠবেন না।

এদিন ছাড়া আর কোনোদিন সাপ দেখি নি।

তবে একবার সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড়ের নীচে একটা সাপের খোলস দেখেছিলাম মস্ত বড়। সে কি জাতীয় সাপের খোলস তা আমি বলতে পারবো না। তবে সে সাধারণ সাপ নয়, এটা ঠিক। সেদিন ছিল সরস্বতী পূজা। আমি, অমরবাবু, তিনু ও আমার ভাগ্নে শাস্ত আমরা সুবর্ণরেখা পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি পাহাড়ে যাই। আমাদের বাড়ী থেকে সে পাহাড় প্রায় সাত মাইল দূরে। পাহাড়ে উঠে সে পাহাড় পার হয়ে ওধারের বনাবৃত উপত্যকার ঠিক ওপরেই আমরা বসলুম, তখন বেলা তিনটে। রোদ বেড়ে চলেচে। আমাদের স্নান করার বড় ইচ্চে ছিল, কিন্তু জল কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের নীচে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় পাওয়া গেল। পাহাড় চুঁইয়ে সেখানে টুপ টুপ করে জল পড়চে, অনেকটা জল সেখানে। একটা মানুষ কোনো রকমে নেমে নাইতে পারে।

শাস্ত বললে — মামা, এই ঝর্ণার কি নাম?

—না, কোনো নাম নেই।

— আমার নামে এর নাম দেবেন?

—যাও, আজ থেকে এর নাম শাস্ত-ঝর্ণা।

এটা অনেকটা হোল সাঁওতালদের পাহাড় যৌতুক দেওয়ার মত। মেয়ের বিয়ের সময় ওরা জামাইকে যৌতুক দেয়—যাও, ওই পাহাড়টা তোমায় দিলাম।

সে পাহাড়ে হয়তো গবর্নমেন্টের রিজার্ভ ফরেস্ট। জামাতা বাবাজী সেখানে যদি একখানা শুক্‌নো ডালও ভাঙতে যান, তবে তখুনি বনের চৌকিদার তাকে চালান দেবে বেঁধে। কার পাহাড় কে দেয়!

সে যাই হোক আমি সে জলে নামতে গিয়েই চমকে উঠলাম। প্রকাণ্ড এক সাপের খোলস সেই গর্ত্তের গায়ের পাথরে জড়িয়ে। বিরাট খোলস। আমরা কাঠি দিয়ে সেটাকে তুলে দেখি আট দশ হাত কি তার চেয়েও লম্বা খোলসটা। মোটাও তেমনি। এমনি একটা বিরাট সাপের খোলস ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে সিংভূমের সারাণ্ডা অরণ্যে রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত আমায় দেখান। খোলসটা আমি কাগজে মুড়ে বাড়ী নিয়ে এসেছিলাম। বারো হাত লম্বা আর তেমনি মোটা সে খোলসটাও ছিল একটা গুহার মধ্যে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলেছিলেন—পাইথনের খোলস।

শাস্তকে অমর করে রাখার পরে সেই বনপথে আমরা অগ্রসর হয়ে চলি।

সামনেই যে ঝর্ণা তার নাম দেওয়া গেল তিনুঝর্ণা, সাঁওতালদের বিয়ের যৌতুকরূপে

পাহাড় দান করবার মত। তবে আজকাল ও দেশে ওর নাম তিনুঝর্ণাই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েচে। বন-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী, আমার বিশেষ বন্ধু, বলেচেন বন-বিভাগের ম্যাপ ও নক্সায় আমাদের দেওয়া এই নামটি তিনি ব্যবহার করেন। সেজন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

অতি চমৎকার বনভূমি। বসন্তের প্রারম্ভে গোলগোলি ফুল ফুটেচে বনে বনে।

সিংভূমের অরণ্যভূমির এ সুন্দর বনফুলের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বসন্তের প্রথমেই এই ফুল পাহাড়ী বনে ফুটতে আরম্ভ করে—দেখতে অনেকটা সূর্য্যমুখী ফুলের মত। তিনটি কারণে এ ফুল অতি সুন্দর দেখায়। প্রথম, নিষ্পত্র প্রকাণ্ড গাছে এ ফুল ফোটে; দ্বিতীয়, সাদা কোয়র্ৎজ্ পাথরের অথবা কালো কোয়াটজাইট পাথরের পটভূমিতে, সবুজ অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ ঠেলে ওঠে, এখানে ওখানে সাদা ডালপালাওয়ালা নিষ্পত্র গাছ; তৃতীয়, ফুলের রং ও গড়ন অতি সুন্দর। পুকারের বিখ্যাত বই হিমালয়ান জার্নালের মধ্যে এই ফুলের উল্লেখ আছে ও ছবি আঁকা আছে।

তিনু বললে—দাদা, চলুন আমরা পাহাড় ঘুরে যাই।

পাহাড় ঘুরে যেতে গিয়ে এক জায়গায় দেখি গোলগোলি গাছের মেলা। তার নীচেই ধাতুপ ফুলের বন রাঙা হয়ে আসচে নব মুকুলের আবির্ভাবে। এই আর একটি চমৎকার ফুল—মধু চুষে খাওয়া যায় বলে এ ফুল ছেলেপিলের বড় প্রিয়, আরও প্রিয়তর বন্য ভালুকের।

ভালুকের ব্যাপারও অনেকরকম শোনা গিয়েচে, এসব বনে।

আজ থেকে বছরখানেক আগে ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী এঁদেলবেড়া বনে একটি কাঠুরে লোককে ভালুকে জখম করে। লোকটা বনের মধ্যে কাঠ কাটছিল। হঠাৎ একটা ভালুক গাছের ডাল থেকে নেমে ওর দিকে তেড়ে আসে। ভালুক কেন গাছে উঠেছিল জানি না, বোধ হয় সেই গাছে মৌচাক ছিল। লোকটা হাতের কুড়াল নিয়ে ভালুকের সঙ্গে যুঝতে চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হয় নি। ভালুকটা ওকে জমিতে শুইয়ে ফেলে ওর বুকে নাকি চড়ে বসে। ওর মুখ ও নাক এক থাবার আঘাতে রক্তাক্ত করে দেয়।

স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে লোকটা সেরে গিয়েছিল বলেই শুনেছিলাম।

আর একটা মজার গল্প শুনি দুব্‌লাবেড়া ফরেস্টে।

গত ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে আমি দুব্‌লাবেড়া পাহাড় ও বনাঞ্চলে কয়েকদিন যাপন করি মিঃ সিংহের সঙ্গে। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে। বনাঞ্চল ভালবাসি বলেই ভগবান নানা সুযোগ ও সুবিধে আমায় ঘটিয়ে দিয়েচেন, অতি অদ্ভুত সব beauty spot দেখবার ও বেড়াবার। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমার বনভ্রমণের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই আমি মনে করি। কিন্তু এ ভ্রমণকাহিনীটি বিস্তৃতভাবে এখন বলচি নে, শুধু ভালুকের গল্পটি আমার কাছে বড় মজাদার মনে হয়েছিল বলেই এখানে উল্লেখ করি।

দুব্‌লাবেড়া অরণ্যের মাঝখানে একটা উপত্যকা, দুদিকে দুই পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে। এই পাহাড়-শ্রেণীর ওপরে বেশ জঙ্গল তবে তত ঘন নয়। বেশির-ভাগ শাল ও কেঁদগাছের বন,

তবে একটা পাহাড়ে অজস্র বন্যশেফালি-বৃক্ষ। শুধুই শেফালি নয়, শেফালির জঙ্গলও বলা যেতে পারে। এর নাম চড়াই পাহাড়, আর ওপরের পাহাড়ের নাম আটকুশি রেন্‌জ্‌। আটক্রোশ দীর্ঘ বলেই বোধ হয় এর এরকম নাম, তবে আমি সঠিক জানি নে ওটা আটক্রোশ লম্বা কি না।

এই উপত্যকায় ছিল আমাদের তাঁবু, চরাই পাহাড়ের ঠিক নীচের ঢালুতে।

রাত্রিকালে একদিন এখানে একজন লোক এল। সে এসে ওখানকার ভাষায় বললে—বড্ড বিপদে পড়েছিলাম ওই পাহাড়ের নীচেটাতে।

লোকটি হাঁপাচ্চে। আমরা বলি—কি হয়েছিল ?

—বাবু, ভালুক পথ আটকেছিল।

—কি রকম ?

সে আসছিল উপত্যকার মুখে যে বন্যগ্রাম আছে সেখান থেকে। সন্ধ্যা তখনও ভালো রকম হয় নি। জ্যোৎস্না রাত্রি। একটা ভালুক মহুয়াফুল খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তার ওপর মাতলামি করচে দেখতে পায়। আর কিছুতেই সে নড়তে পারে না। এদিকে ওদিকে কোনোদিকেই যাবার উপায় নেই। মাতাল হয়ে ভালুকে পথ আটকেচে।—এমন বিপদেও মানুষ পড়ে বাবু!

আমরা বললাম—কি রকম মাতলামি করছিল ?

—ঠিক যেমন মানুষে করে। হেল্‌ছিল, দুলছিল, টলছিল।

—আপন মনে ?

—একদম আপন মনে !

—তারপর ?

—তারপর আর কি। সেখানে দু ঘণ্টা বসে। রাত হয়ে গেল। তারপর ভালুকটার কি খেয়াল গেল পথ ছেড়ে টলতে টলতে বনের মধ্যে ঢুকলো। তাই এই আসচি।

—মাতাল ভালুকে কিছু অনিষ্ট করে ?

—বাবু, ও জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই। বাঘকে বিশ্বাস করা যায় তবু ও জানোয়ারকে না। ওর মাতলামি দেখলে না হেসে থাকা যায় না বটে, কিন্তু বাবু, সাহস করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। যদি ঘুরে দাঁড়ায়।

সে কথা ঠিক।

এই গেল সিংভূম অরণ্যের ভালুকের কথা। ওদিকে এমন অনেক লোক দেখেছি, যার হয়ত নাক নেই, কি একখানা হাত নেই। ভালুকের হাতে সেগুলো খোয়াতে হয়েচে। পাকা কুল ও মহুয়া ফুলের সময় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসের দিকে বনের পথে একা না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সাবধানের বিনাশ নেই।

সিংভূমের বাঘ সম্বন্ধে আরও দু-একটি গল্প এখানে করে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

সিংভূমের বনে লেপার্ড জাতীয় বাঘ এবং রয়েল বেঙ্গল জাতীয় উভয় প্রকারের বাঘই

আছে। উভয় জাতীয় বাঘই ভীষণ হিংস্র। রয়েল বেঙ্গল বরং ভাল, লেপার্ড জাতীয় বাঘ বেশী শয়তান। গত বৎসরে আমি সংবাদ পাই স্থানীয় থানায় একটা বাঘ ও একটা মানুষের মৃতদেহ আনা হয়েচে, পরস্পর পরস্পরকে মেরেচে। ব্যাপার শোনা গেল বাসাডেরা নামে একটি বন্য গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি গর্ত্ত খুঁড়ে সেই গর্ত্তের মধ্যে বর্শা পুঁতে বাঘ মারবার ফাঁদ তৈরী করে। একটা বড় বাঘ ঐ অঞ্চলে উপদ্রব করছিল। সন্ধ্যার দিকে বাঘটা গর্ত্তের মধ্যে পড়ে। বাঘের অবস্থা দেখতে যেমন গিয়েচে, অমনি বৃদ্ধ শিকারী পড়ে গেল বাঘের হাতে। দুইজনে জড়াজড়ি করে ঘোর যুদ্ধ। বাঘ প্রচণ্ড থাবাব ঘায়ে লোকটাকে ভীষণ জখম করলো, লোকটাও বর্শার ঘায়ে বাঘটাকে ততোধিক জখম করলো। তারপব লোকজন ছুটে এসে পড়ে, তখন বাঘটা মারা গিয়েচে কিন্তু মানুষটা বেঁচে আছে।

ঘাটশিলার হাসপাতালে আনবার পথে বৃদ্ধও মারা গেল।

একবার আমরা এক অদ্ভুত কথা শুনি। সৌরীনবাবু বলে আমাদের একজন পরিচিত ভদ্রলোক বললেন—সোরু ঝর্ণার নাম শুনেচেন? সেখানে আমরা পূর্ণিমার রাত্রে গিয়ে দেখেচি ময়ূরেরা এসে নাচে!

—কি রকম?

—একটা পরিষ্কার জায়গা আছে বনের মধ্যে! সেখানেই এসে ওরা গভীর রাত্রে নাচে। পূর্ণিমার রাত্রে কিন্তু। অন্য রাতের কথা আমি বলি নি!

—ময়ূরেরা যে এমন কবি তা জানা ছিল না। দেখাবেন আপনি?

—খুব। চলুন না।

সোরু ঝর্ণা কোথায় কতদূরে সে সন্ধান দিতে পারলেন না সৌরীনবাবু। তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁর কোন ধারণাই নেই। তবে সুবর্ণরেখা পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বনের মধ্যে এটা তিনি ঠিক জানেন। সে বড় দুর্গম জায়গা।

আমরা এক রবিবারে সুবর্ণরেখার ওপারে পিক্‌নিক্ করতে গেলাম। আমার ভাই নুটু তার বন্ধু সুরেশ, আরও দু-তিনজন। চৈত্রের প্রথম। মহুয়া গাছে ফুল ফুটে টুপ‌টুপ গাছের তলায় পড়চে, লতাপলাশের ফুল ফুটেচে। গাছের ডালে ডালে জড়িয়ে উঠেচে পলাশের লতা। গোলগোলি গাছে হলদে ফুল। দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কতদূর চলে গেলাম। এই সময়ে কেঁদফল পাকে, সিংভূমের বনের বড় সুমিষ্ট ফল! আমরা উঠিয়ে দিলাম একটা লোককে গাছে। সে উঠে গাছ ঝাড়া দিয়ে অনেক কেঁদফল পাড়লো। স্থানীয় হাটে পাকা কেঁদফল শালপাতার ঠোঙার বিক্রি হয়। আট দশটা ফল এক পয়সায়।

পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে আমরা একটা বনাবৃত উপত্যকা বেয়ে চলেচি কতদূর। চৈত্রের রোদ চড়চে যতই, ততই টুপটাপ করে মহুয়া ফুল ঝরে পড়চে গাছতলায়। ঝাটিফুলের মৃদু দুর্গন্ধ বাতাসে, এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ঝর্ণা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেচে। ঝর্ণার দুপাশে বন্য জামবৃক্ষের সারি। ছায়া পড়েচে জলে।

আমরা এই জায়গাটা পিকনিকের জন্যে ঠিক করে ফেললাম। গরুর গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামানো হোল। সবাই বললে, এখানে ছায়া আছে। এখানেই রান্নাবান্না হোক। সবাই মিলে লেগে গেলো কাজে।

আমি একটু পরে সামনের ক্ষীণ পথ-রেখা বেয়ে সামনের দিকে চললাম। দেখি না, ওদিকে কি আছে।

আপন মনে পথ চলেচি, বড় রোদ, পাথর তেতে উঠেচে রোদে, মহুয়া ফুল কুড়িয়ে খেতে খেতে চলেচি। পাহাড়শ্রেণী চলেচে এই ক্ষুদ্র পথটির সমান্তরাল ভাবে বামে ও দক্ষিণে।

অনেক দূরে এসে একটা গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা নয়, একটা বড় কুসুম গাছের তলায় ঘর পাঁচ ছয় লোক বাস করচে। গ্রামের একটা লোক গাছের তলায় ছায়ায় বসে পাহাড়ি চীহড়লতার ঝুড়ি বুনচে। আর শালপাতার পিকার ধূমপান করচে। পিকা অর্থাৎ কাঁচা শালপাতা জড়ানো খানিকটা তামাকপাতা। এক রকম বিড়ি বলা যেতে পারে। কাছে একটা মস্ত কুকুর। কুকুরটাকে দেখে মনে হোল, সেটা বাঘকেও ভয় করে না। করবার কথাও নয়।

বললাম—এটা কি গাঁ রে ?

—বালজুড়ি।

—ক' ঘর আছিস রে ?

সে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল—এই যে ক' ঘর দেখচিস্ রে।

—তোর নাম কি ?

—চুকলু।

—কি করচিস্ ?

—দেখতে তো পাচ্চিস্। ঝুড়ি বাঁধচি।

—এখানে তো চারিদিকে বন, থাকিস্ কি করে ?

—হোই। বেশ থাকি।

—হাতী আছে রে ?

—হাতী আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে।

বলেই চুকলু আমার চোখের সামনে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার করলে। অতিথি-সৎকারের জন্যে একটা কাঁচা শালপাতার পিকা জড়িয়ে সে দু খানা কাঠ ঘষে আমার সামনে আগুন জ্বালাল। বললে—ধরাও—

আমি অবাক! এই যুদ্ধের বাজারে দেশলাই কবে পাওয়া যায় না যায়। এ কৌশলটি শিখে রাখলে মন্দ কি? আমি কৌশল শিখতে চাইলাম। চুকলু হেসে সামনের পড়াশি গাছের ডাল একটা ভেঙে এনে তার মধ্যে দা দিয়ে ছোট্ট একটা বিঁধ করলে। আর একটা সরু ডাকের এক দিক ছুঁচলো মত করে, সেই বিঁধে বসিয়ে দুহাত দিয়ে ঘোরাতে লাগলো। বিঁধওয়ালা কাঠখানার তলায় রাখলে কয়েকটি শুকনো শালপাতা। দেখতে দেখতে শুকনো

পাতা দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। চুক্‌লু ফুঁ দিতেই দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠলো। বিড়ি ধরিয়ে নিলাম।

আমি ওখানে বসে পড়লুম। আমার উদ্দেশ্য হচ্চে সোরু ঝর্ণার সন্ধান নেওয়া। জায়গাটিও চমৎকার লাগচে। চৈত্র দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করচে চারিদিকে। দুদিকে পাহাড়-শ্রেণী, মধ্যে এই সংকীর্ণ বনাবৃত উপত্যকা। প্রথম বসন্তে পাহাড়ের বনে কোকিল ডাকচে। মহুয়া ফুলের মদির গন্ধ গরম বাতাসে। চুক্‌লুর দুখানা কাঠ ঘষে আগুন জ্বালা। কাঁচা শালপাতার পিকা জড়িয়ে খাওয়া। মুক্ত জীবনের ছন্দে মুখর দুর্লভ মধ্যাহ্নটি।

ওকে বলি—চুক্‌লু, ময়ূর দেখেচ বনে ?

—মজুর ? আছে, অনেক আছে। মজুর কত নিবি ?

—সোরু ঝর্ণার নাম শুনেচিস্ ?

—হঁ্যা, ক্যানে শুনবেক না।

—ওখানে ময়ূর আছে ?

—মজুর সব বনেই আছে। এই সব পাহাড়েও আছে। এখানে বোস, সাঁজের সময় কত মজুর দেখবি।

কিন্তু পূর্ণিমায় সোরু ঝর্ণার শিখী নৃত্য ? সেটা উপকথা না কিংবদন্তী ! তার মূলে কিছু আছে কি না, সে সন্ধান এখানেই আমার আজ নিতে হবে। সে সন্ধানেই বেরিয়েচি আজ।

থলকোবাদে একরাত্রি

['বনে-পাহাড়ে' রচনার পৃষ্ঠপট সারাণ্ডা অরণ্যে ভ্রমণের সময় বিভূতিভূষণ বনগ্রামবাসী মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্রাকারে তাঁহার এই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাটি লিখিয়া পাঠান। এই পত্রটি 'পল্লীবার্ত্তা' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়। বস্তুত ইহাই 'বনে-পাহাড়ে'র সৃষ্টিকেন্দ্র। তৎসত্ত্বেও এই রচনার একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে, সেই জন্যই এটি পৃথক রচনা হিসাবে এই গ্রন্থে মুদ্রিত করা হইল।—সম্পাদক : বিভূতি-রচনাবলী।]

শ্রীচরণেষু,

নিবিড় বনমধ্যস্থ এক বনবিভাগের বাংলো থেকে লিখচি এ চিঠি। গত ৯ই তারিখে ঘাটশিলা থেকে বেরিয়ে রেলে এসেচি চাঁইবাসা, তারপরে মিঃ সিংহের সঙ্গে মোটরে এসেচি ৬৭ মাইল কুমডি বাংলোতে। গুয়া ও নোয়ামুণ্ডি হয়ে। গুয়া ছাড়িয়ে এই ২৭ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই—সারাণ্ডা অরণ্য, ছোটনাগপুরের সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়তম অরণ্য। ১৬ দিন এই গভীর অরণ্যের মধ্যে বনবিভাগের বাংলোতে ও তাঁবুতে থেকে সারাণ্ডা অরণ্য সবটাই ঘুরবো। কোথাও ডাকঘর বা লোকালয় নেই—এই চিঠি বনবিভাগের পেয়াদা ২০ মাইল হেঁটে বনপথে জেরাইকেলা নিয়ে গিয়ে ডাকে দেবে। যেতে লাগবে ২ দিন ডাকঘরে। কবে চিঠি পান দেখবেন তো? ক'দিনে বনগাঁ যাবে এ বড় কৌতূহলজনক।

কাল গিয়েচে পূর্ণিমা। বাংলো একটা বনাবৃত ছোট পাহাড়ের চূড়ায়, মধ্যে একটা উপত্যকা। যেদিক থেকেই দেখি নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলচূড়া ঘিরে আছে চারিদিকে। গভীর রাত্রে কাল জ্যোৎস্নাস্নাত অরণ্যে যখন ময়ূর ও সম্বর হরিণের ডাক শুনলুম, তখন সত্যই মনে হোল কোথায় আছি? বন্য হস্তীর উপদ্রব সর্ব্বত্র। যেখানে সেখানে হাতীর নাদ পড়ে আছে।

কাল বড় মজা হয়েচে। চা খেয়ে আমি, মিঃ সিংহ, ও রেঞ্জ অফিসার মিঃ গুপ্ত তিনজনে বাংলো থেকে নেমে বনপথে বেড়াতে গেলুম হেঁটে। কি সুন্দর অপরাহ্ণের ছায়াবৃত সে অপূর্ব্ব বনকান্তার! ময়ূর-নিনাদিত বনভূমি বাল্মীকির রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল দেখে মিঃ গুপ্ত বল্লেন, চলুন, অন্ধকারে হাতী বেরুবে। যদিও পূর্ণিমা কিন্তু এ বনে চতুর্দ্দিকের শৈলমালা ভেদ করে চাঁদের আলো পড়তে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। এই এক ঘণ্টা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত বনের মধ্যে এক পাথরের ওপর বসে থাকা নিরাপদ নয়। এমন সময় মানুষের গলা শোনা গেল পায়ে চলা সরু পথটার ওপ্রান্তে। যারা আসচে তারা আমাদের দেখে ভয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েচে। আমরা ডাক দিলুম, দুজন হো জাতীয় লোক। তারা বল্লে বালজুড়ি থেকে চাল কিনে আসচি। হো ভাষায় বল্লে, মিঃ গুপ্ত জানেন এ ভাষা। বালজুড়ি কোথায়? ওরা বল্লে, বোনাইগড় স্টেট। কখন বেরিয়েচ? বল্লে, বেলা দশটায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে এই অরণ্যভূমির ওপারে উড়িষ্যায় বোনাইগড় করদরাজ্য। সেখানে চাল ছ' সের টাকায়। লোক দুটি সেখানকার

সীমান্তরক্ষীদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে বনে বনে পালিয়ে আসচে সস্তা চাল নিয়ে। আমাদের ভেবেচে সারাণ্ডা বনের সীমান্তরক্ষী। তাই এই ভয়।

কিন্তু কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হোল পূর্ণিমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল সে বনভূমির। গম্ভীর অরণ্যানী, চতুর্দ্দিকে পাহাড় আর বনাবৃত উপত্যকা। পদে পদে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রের ভয় সে সৌন্দর্য্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেচে। চলে-আসচি, গম্ভীর বনে কুকুর-ডাকার মত শব্দ। মিঃ গুপ্ত বল্লেন, ও কুকুর নয়, লোকালয় নেই, কুকুর কোথা থেকে আসবে? ও বার্কিং ডিয়ার, এক প্রকার হরিণ। কে বর্ণনা দিতে পারে এ জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমির? গভীর অরণ্যে দূরের কোন পার্ব্বত্য নদীর অবিশ্রান্ত জলপতনধ্বনি ও ঝিঁঝিঁ পোকা এবং নৈশ পাখীর কূজনদ্বারা বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর নৈঃশব্দ্য বর্ণনার জিনিস নয়, উপলব্ধি করার জিনিস। না দেখলে উপলব্ধি হবেই বা কেমন করে। বনের মধ্যে পাষাণময় তীরভূমির মধ্যে দিয়ে কোইনা নদী বয়ে যাচ্চে, জ্যোৎস্নালোকে আজ আমরা সেখানে রাত্রে পিক্‌নিক্ করতে যাবো ঠিক হয়েচে।

এ অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখর শশাংদাবুরু ৩০৩৮ ফুট উঁচু। সারা সকাল ধরে বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পরশু আমরা এই শিখরে উঠেছিলুম। অত্যন্ত দুরারোহ ও ঘন বনে আচ্ছন্ন সরু পথ দিয়ে উঠচি, উঠচি, তার যেন আর শেষ নেই। এক একটা শাল গাছ কলের চিমনির মত ঠেলে উঠেচে আকাশে, কোথাও বন্য দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা, আরও কত কি বনকুসুম ফুটে আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, কে তাদের নাম জানে? কোথাও ঝর ঝর করচে পাহাড়ী ঝরণা—শশাংদাবুরু শিখরদেশ থেকে খাড়া নীচে পড়চে, বনে বনে প্রতিধ্বনিত হচ্চে তার শব্দ। কোথাও বনের মধ্যে বুনো রামকলা গাছ, কে খায় সে কলা হাতী আর বাঁদর ছাড়া। এই সারাণ্ডা অরণ্য অবিচ্ছেদে ৪০০ বর্গ মাইল, জনহীন, শুধু বন বিভাগের বাংলো ছাড়া কোনো থাকবার জায়গা নেই, বনবিভাগের তৈরি মোটর রোড ছাড়া রাস্তা নেই। উঠতে উঠতে ঘন ঘন হাঁপাচ্চি, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা মারচে, পা সামান্য তুলতেও কষ্ট হচ্চে। আবার বনের মধ্যে এত বেলাতেও সূর্য্যের আলো পড়ে নি, সে নিবিড়তা ও গাম্ভীর্য্যের তুলনা কোথায়?

ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম, সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে ফরেস্ট গার্ড কুড়ুল দিয়ে একটা আমলকী গাছের ডাল কাটলে। তখন দেখি অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েচি, কত নীচে উপত্যকা—দূরে দূরে শুধুই বননীল শৈলশিখর! যেদিকে চাই, পাহাড় আর বন, বন! বড় বড় কেলিকদম্বের পাতা বিছিয়ে বসেচি খাড়া বাঁকা পথটার গায়ে, গড়গড়িয়ে যদি পড়ি, তবে ২০০০ ফুট নীচু উপত্যকার পাষাণময় ভূমিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবো। ওপরে উঠে গেলুম তখন বেলা দুটো। ওপরে উঠে দেখি, বা রে, যেন খয়রামারির মাঠ। অনেকখানি সমতল মাঠ, ২ মাইল লম্বা, প্রায় দেড় মাইল চওড়া। বা রে মজা! মাঠের মাঝে মাঝে কেলিকদম্ব, দেবকাঞ্চন ও শাল। একজায়গায় একটা জলাশয়। তার তীরে নরম কাদায় বহু গরু ও মহিষের পদচিহ্ন। আমি বল্লুম এখানে গরু

চরে কাদের ? রেঞ্জ অফিসার গুপ্ত হেসে বল্লেন, গরু কোথা থেকে আসবে এ জনহীন অরণ্যে ৩০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় ? ওগুলো বাইসন আর সম্বর হরিণের পায়ের দাগ। ফরেস্ট গার্ড হো-জাতীয় বন্য লোক, সে সব পায়ের দাগ দেখে বল্লে, বুনো শূওর, বাইসন আর সম্বরের পায়ের দাগ। হাতীও আছে। বাঘ ? বাঘ এখানে জল খায় না।

ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন। সঙ্গে খাবার নিয়ে উঠেচে দুজন ফরেস্ট গার্ড। এক পাথরে বসে পেট পুরে খেলুম। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে চা হোল। ওঁরা তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, চলুন, বড্ড বাইসন আর হাতীর ভয়। আবার নামি সেই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখর থেকে নিম্নের ঘন বনের মধ্যেকার সরু দুর্গম পথ দিয়ে। ওঠাও যেমনি, নামতেও তেমনি। বেলা ৫॥০টার সময় নীচে নামলুম বটে, কিন্তু নামলুম কোথায় ? বনের মধ্যেই। বনের ছায়া নিবিড়তর হয়ে সান্ধ্য অন্ধকারে মিশে যাওয়ার উপক্রম হয়েচে। ফরেস্ট গার্ড বলচে, হুজুর হাতী বেরুবে, জলদি চলুন। কিন্তু বল্লেই ত হয় না। আরও আড়াই মাইল হেঁটে তবে আমাদের মোটর পর্য্যন্ত পৌছবো।

মোটর পর্য্যন্ত পৌছতে সন্ধ্যা হোল। হঠাৎ গার্ড বল্লে, হাতী ! হাতী ! চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের গায়ের বনে রাঙাধুলোমাখা হাতী একটা গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে। তখন সন্ধ্যা, ভাল দেখা যায় না—কেউ বলে হাতী, কেউ বলে না। আমরা মোটরের ভেঁপু বাজাতেই দেখলুম, রাঙাধুলোমাখা জিনিসটি গাছতলা থেকে সরে গেল, সুতরাং নিশ্চয়ই হাতী।

শুক্লাচতুর্দ্দশীর অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না উঠলো তখন আমরা পার্ব্বত্য কোইনা নদীর উপলাস্তীর্ণ তীরে পৌচে গিয়েচি। দুধারের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে দিয়ে কলকল তানে কোইনা নদী বয়ে চলেচে। বল্লুম, চা খাওয়া যাক। চা আছে চিনি আছে, দুধ নেই। আগুন করা গেল হাতীর ভয়ে। বাংলো আরও ২ মাইল দূরে। ডালপালার আগুনে কেটলিতে জল চড়িয়ে দেওয়া হোল। যেদিকে চাই সেদিকেই ঝিল্লীরমুখর বনানী। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণী ধ্যানমগ্ন ঋষিদের মত শান্ত সমাহিত—জন্মমরণভীতিভ্রংশি কোন্ মহাদেবতার উপাসনায় বিভোর। জয় হোক সে দেবতার, যাঁর করুণায় আজ আমার মত দরিদ্রের এ অপরূপ বনস্থলী দর্শনের সুযোগ ঘটলো। তাঁরই শব্দহীন বাণী এই বনানীর নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রহরে প্রহরে মুখরিত হয়ে উঠেচে।

এই পর্য্যন্ত লিখে বেলা ৫॥০টার পরে সিংহ, আমি ও গুপ্ত বনের পথে বেড়িয়ে এলুম। আজ আবার প্রতিপদ, চাঁদ উঠতে দেড় ঘণ্টা দেরি। বনানীর চেহারা দেখে অন্ধকারে আমার বড় ভয় হোল ফিরবার পথে। আমি বলি, চলুন, হাতী বেরুবে। আর ঠিক সন্ধ্যায় ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে কি ময়ূরই ডাকচে বনে ! এদিকে একটা ডাকে, ওদিকে গভীর বনে একটা তার উত্তর দেয়—ওদিকে আর একটা ডাকে, অন্যদিক থেকে তার উত্তর আসে, যেন পাল্লা দিয়ে ডাকাডাকি চলেচে। বাংলোতে ফিরে এসে দেখি একদল হো নরনারী হো নাচ দেখাতে এসে বসে আছে। তারা রাত দশটা পর্য্যন্ত নাচলো, মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে বেশ

নাচলে। দু টাকা বকশিশ পেলে।

এইখানে কালও আসবো। পরশু যাবো ১৫ মাইল বনপথে তিরিশপোথী। সেখান থেকে ছোটনাগরা, তারপর সলাই, সেখান থেকে Ankua waterfalls দেখতে যাবো গভীর বনের মধ্যে ২২ মাইল। ১৬ দিনের টুর প্রোগ্রাম আছে। তবে বড্ড ভীষণ শীত পড়েচে! থলকোবাদ বাংলো যেখানে বসে লিখচি, এর উচ্চতা ১৮৩০ ফুট। তিরিশপোথী ১৯৭৫ ফুট, এত উচ্চ স্থান, বনে ঘেরা—৪০০ বর্গমাইল গভীর অরণ্যের মধ্যে সুতরাং শীত তো হবেই। Ankua waterfalls নাকি একটি চমৎকার দৃশ্য, মিঃ সিং বলছিলেন।

এদিকে চাল ৪ সের টাকায়—অবিশ্যি এ বনে নয়। এখানে লোকালয় নেই—গুয়া নামক স্থানের বাজারে দেখে এসেচি। বোনাইগড স্টেটে ৬ সের টাকায়, সেখান থেকে অনেকে বনপথে চাল লুকিয়ে আনতে যায়—কারণ স্টেট থেকে বার করে আনবার জো নেই। ওখানে কেমন ?

আপনি কেমন আছেন? মিতে কোথায়? আপনাদের কথা মনে হয় বড্ড। কালও সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্যপথে বেড়াবার সময় ভাবছিলুম এতক্ষণ দূর বনগ্রামের একটি ছোট্ট ঘরে আপনারা বসে গল্পগুজব করচেন। যতীনদা এসে সকলকে হাসাচ্চেন, আপনি ঘন ঘন তামাক সাজচেন, শিবেনদা চুপ করে বসে আছেন, বিনয়দা গল্প করচেন, সুবোধদা কত সস্তায় ওবেলা মাছ কিনেচেন সেই গল্প করচেন, জয়কৃষ্ণবাবু তামাক খাচ্চেন, হরিদা এত রাত্রে নেই, ঠাণ্ডার ভয়ে বিকেলেই বাড়ী চলে গিয়েচেন, মনোজবাবু বোধহয় আজকাল আসে না, মিতেও আসে না—কনট্রাকটারি নিয়ে ব্যস্ত। বেশ লাগে ভাবতে এত দূর থেকে—মনে হয় ওরাই সব আমার আপনার লোক, কতদিনের নিবিড় পরিচয়ের প্রিয় সাথীবৃন্দ, কত ভালবাসি সকলকেই। ওদের সকলকেই আমার সশ্রদ্ধ ভালবাসা জানাবেন, আপনি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ডুলিকে আশীর্ব্বাদ নেবেন, সে কি আমার কথা মনে করে? যতীনদাকে কতদিন দেখিনি, বড্ড মনে হয় যতীনদার কথা। ইচ্চে হয় আপনাকে ও যতীনদাকে নিয়ে এসে বিশ্বশিল্পীর এ সৌন্দর্য্যভূমি দেখাই, কিন্তু তা কোথায় হচ্চে! স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আশা করি যতীনদা কুশলে আছেন।

পুঃ—এই চিঠিখানা মনোজবাবুকে দেবেন 'পল্লীবার্ত্তা'য় ছাপাতে। চিঠির আকারেই দেবেন। প্রুফটা যেন মনোজবাবু* ভাল করে দেখে দেন। তাঁকে প্রীতি জানাবেন।

আপনাদের—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* মনোজকুমার রায়

গ্রন্থ পরিচয়

'আরণ্যক'

"আরণ্যক" বিভূতিভূষণের চতুর্থ উপন্যাস। 'আরণ্যক' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে "প্রবাসী" মাসিক পত্রিকায় কার্ত্তিক ১৩৪৪ হইতে ফাল্গুন ১৩৪৫ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ : কাত্যায়নী বুক স্টল, ২০৩, বিধান সরণী, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী সাইজ, পৃ. ৩৩৩, চৈত্র ১৩৪৫, ইং ১৯৩৯।

"পথের পাঁচালী" রচনার সময় অর্থাৎ ভাগলপুরে থাকিতে থাকিতেই "আরণ্যক" রচনা করিবার চিন্তা বিভূতিভূষণের মনে আসে। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি "আরণ্যক" রচনা করিবার পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ সময় বছর চারেক পাথুরিয়াঘাটা এস্টেটের য়্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার হিসাবে ইসমাইলপুর এবং আজমাবাদের অরণ্য-পরিবেশে অবস্থান করেন। ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলে আজন্ম প্রকৃতির পূজারী বিভূতিভূষণ ব্যাপক পরিভ্রমণ ও নানাবিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার ফলে তাঁহার প্রকৃতি-প্রেম আরও প্রগাঢ় হয়। এই সম্পর্কে বিভূতিভূষণ তাঁহার প্রথম দিনলিপি-গ্রন্থ "স্মৃতির রেখা"তে ইং ১৯২৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী লিখিতেছেন :

"এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জ্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো অন্ধকার—এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুপড়ি বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে, যেমন আজ গভীর বনের নির্জ্জনতা ভেদ ক'রে যে শুঁড়ি পথটা ভিটে-টোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েচে দেখা গেল, ঐ রকম শুঁড়ি-পথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্চে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই verile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি -এই সব।" (স্মৃতির রেখা, ২য় সংস্করণ : পৃ ১০৮)।

"আরণ্যক" বিভূতিভূষণের মধ্যবয়সে রচিত প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানিকে অনেক বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিক ও সমালোচক বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন। তাহার মধ্যে আচার্য্য সুনীতিকুমার অন্যতম। ভারতের সাহিত্য আকাদেমী "আরণ্যক"কে বঙ্গ ভাষায় রচিত দশটি শ্রেষ্ঠগ্রন্থের মধ্যে স্থান দিয়াছেন এবং ভারতের প্রতিটি আঞ্চলিক ও প্রধান ভাষায় অনুবাদের ও প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় "আরণ্যক" অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে ঘোষ-এস্টেটের য়্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে

তাহাদের গৃহে গৃহশিক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইং ১৯২২।২৩ সালে কিছুদিন কেশোরাম পোদ্দারের 'গোরক্ষা প্রচারিণী সভা'র ভ্রাম্যমান পরিদর্শক হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ১৯২৩ সালের শেষদিকে বিভূতিভূষণ ঘোষ এস্টেটের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসের এক শীতার্ত্ত অপরাহ্ণে বিভূতিভূষণ "আরণ্যক" উপন্যাসের পটভূমি ভাগলপুরের জঙ্গল মহালের কাছাকাছি একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে অবতরণ করেন।

এই ভাগলপুর গমন সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন সময়ে দিনলিপি "স্মৃতির রেখা" ও "উৎকর্ণে" স্মৃতিচারণ করিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক বোধে তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইল। ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি "স্মৃতির রেখা"য় লিখিতেছেন :

"ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিনটা। কত কথাই মনে হয়, দেখতে দেখতে হু হু করে অগ্রসর হচ্চে—এই সেদিন ১৯২৩ সালের এ সময় ওদের ওখানে পড়াতে গেলাম—দেখতে দেখতে সে আজ পাঁচ বছর।" ("স্মৃতির রেখা", পৃ. ৮২)

ঐ বৎসরের ৩১ জানুয়ারী দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখিতেছেন :

"অভিজ্ঞতায় একটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হ'তে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫ সালেও) সভ্য জগতের প্রান্তভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জ্জন উপনিবেশ -- আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্চে।" ("স্মৃতির রেখা," পৃ ১০৩)

"উৎকর্ণে" লিখিতেছেন :

"গৌরী তখন মারা গিয়েচে, আমার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী। তার কথাই তখন আমার সমস্ত মন-প্রাণ ভরে রেখেচে, সেই সময় গিয়েছিলুম জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরী করতে, ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। সে কতকালের কথা হয়ে গেল! তারপর ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগলপুরে চাকরী নিয়ে যাবার আগে একবার জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। ("উৎকর্ণ", পৃ. ৩৭)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক' উপন্যাসটি অকালে-লোকান্তরিতা প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীকেই উৎসর্গ করেন।

"আরণ্যক" উপন্যাসের প্রারম্ভেও আছে সত্যচরণ চাকুরী পাওয়ার পরে পৌষ-মাঘ মাসের এক শীতার্ত্ত সন্ধ্যায় বিহারের বি এন ডবলিউ রেলওয়ের একটি ছোট স্টেশনে নামিয়াছিল। প্রাসঙ্গিক বোধে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :

"শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণীর মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াসা জমিয়াছে। রেল লাইনের দু-ধারে মটর খেত, শীতল সান্ধ্য বাতাসে তাজা মটর শাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড়

নির্জ্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জ্জন, যেমন নির্জ্জন এই উদাস প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি। ("আরণ্যক", পৃ. ৭)

প্রথম প্রথম "স্মৃতির রেখা"র বিভূতিভূষণের মত "আরণ্যকে"র বনভূমিতে গিয়া সত্যচরণেরও ভালো লাগে নাই।

"জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধব সঙ্গ, লাইব্রেরী, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এ-সব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরীর কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জ্জন স্থানের কল্পনাও কোন দিন করি নাই।

"প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ-জীবন আমার জন্য নয়।"

"স্মৃতির রেখা"র উপরোক্ত উদ্ধৃতির সঙ্গে "আরণ্যকে"র এই উদ্ধৃতি মিলাইয়া পাঠ করিলে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাওয়া যায়। "স্মৃতির রেখা" দিনলিপির সহিত অনুরূপ মিল আরো অনেক পাওয়া যায়। "আরণ্যকে"র ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে ৫৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত একটি গ্রাম্য মেলা পরিদর্শনের কথা পাওয়া যায়। প্রায় অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় "স্মৃতির রেখা" দিনলিপির ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ পৃষ্ঠায় (৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮)। "আরণ্যক" উপন্যাস উল্লিখিত মেলার ইজারাদার ব্রহ্ম মাহাতো, দেহাতী মেয়েদের পরস্পর দেখা হইলে কান্নাকাটি করিবার বিবরণ এবং ঐ মেলায় একটি লোকের বিনম্র মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা এবং বনের মধ্যে মুক্ত প্রান্তর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া যাওয়া—সবই ১৯২৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারীর রোজনামচার সহিত মিলিয়া যায়।

"আরণ্যকে"র ৭৯ পৃষ্ঠার সঙ্গে "স্মৃতির রেখা" দিনলিপির ১৩ পৃষ্ঠার ভাবেরও সাদৃশ্য আছে। প্রাসঙ্গিক বোধে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :

"অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট্ পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিতাম।

"পুরা যত্র স্রোতঃপুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্।

"এই বালু প্রান্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ উর্দ্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদ্দের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরণের গাছপালাও ছিল না, যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে কোনো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায়।"

"স্মৃতির রেখা"য় :

"পুরা যত্র স্রোতঃপুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্"

"প্রাচীন যুগের অধুনাতন লুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত হ'ত, সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসে থাকতো। তাদের মাথার উপরকারের নীল আকাশে অহরহ পরিবর্ত্তনশীল মেঘস্তূপের মত চঞ্চল এই বিশ্ব তার প্রাচীন আদিম যুগের লতাপাতা, জীবজন্তু সহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত। এমনি প্রভাতে সূর্য্যের আলো প্রাচীন যুগের সাগর-বেলায় পড়তো। আর প্রভাতসূর্য্যের আলো এমনই শীকরসিক্ত প্রাচীর ধরণের ঝিনুক শাঁক কড়ি পলার ওপরে রামধনুর রং ফলাতো। সবসুদ্ধ নিয়ে প্রাচীন মহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকাল অন্ধকার খনি-গর্ভে চুনা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। মহাকালের গহন-গভীর রহস্যে নৃত্য-ক্ষুব্ধ চরণ চিহ্নের মত।"

এইরূপ চিন্তার সাদৃশ্য "আরণ্যক" ও "স্মৃতির রেখা"র বহু জায়গায় পাওয়া যায়। "স্মৃতির রেখা"র ৬৯, ৭০, ৭১, এবং ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ পৃষ্ঠার সঙ্গে "আরণ্যকে"র ৭৭, ৭৮, ৭৯ এবং ১৪৯, ১৫০, ১৫১ পৃষ্ঠার মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। বাহুল্য বোধে আর উদ্ধৃতি দেওয়া হইল না।

"আরণ্যকে" উল্লিখিত গোষ্ঠবাবু মুহুরী, রামচন্দ্র আমীন, আসরফি টিণ্ডেল, জয়পাল কুমার, পণ্ডিত মটুকনাথ এবং রাখাল ডাক্তারের স্ত্রীর কথা "স্মৃতির রেখা" দিনলিপিতেও পাওয়া যায়। "আরণ্যকে"র পাতায় তাঁহারা স্বনামেই হাজির আছেন। "আরণ্যকে" অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা আছে। তন্মধ্যে বোমাইবুরু জঙ্গলের রামচন্দ্র সিং আমীনের কাহিনীটি প্রধান। "আরণ্যক" রচনার অনুরূপ সময়েই বিভূতিভূষণ "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প" "তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প" নামক বিখ্যাত গল্প দুইটি রচনা করেন।

বিভূতিভূষণের ভাগলপুরে অবস্থানকালীন কর্ম্মজীবন সম্পর্কে একটি কথা বলিবার আছে। বিভূতিভূষণের সুহৃদ সজনীকান্ত দাস এবং আরও অনেকে তাঁহার জীবনী রচনার সময় বিভূতিভূষণকে ভাগলপুরে ঘোষ এস্টেটের নায়েব-তহশীলদার হিসাবে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর সার্কেলের য়্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার হিসাবে ভাগলপুরে নিযুক্ত ছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংলগ্ন পত্র-প্রতিলিপি হইতে পাওয়া যায়।

B. N MITTER
ADVOCATE, HIGH COURT.

PATNA
Dated the 22nd Dec. 19 26

No. 400.

Babu B.B. Banerji.
Asst. Manager, Ghosh Estate.
Bara Basha, Bhagulpur.

Dear Sir,
C.R. 437 of 1926

Babu Sidheswar Ghosh ... Petitioner
Versus
Madan Lal Marwari - Opposite Party

Please note that I have today paid from my own pocket the sum of Rs. 51/- (Rupees fifty one) to the Advocate for the opposite party as being the cost ordered to be paid by the Judge as a condition procedent to the restitution of the case. I have obtained a receipt from the said Advocate.

I have today sent my bills of fees and costs to the Manager at Calcutta. I also enclose a copy of the same to you.

Yours Sincerely,

B.N. Mitter

with enclosures.

বর্ত্তমান নিবন্ধকারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বলিয়াছিলেন, ভাগলপুরে থাকিতে তাঁহার কেবলই বারাকপুর গ্রামের কথা শৈশবের কথা মনে পড়িত। আবার যে কখনো বারাকপুর গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন ভাবিতেন না। সে সময়ে "আরণ্যক" লিখিবার কথা তাঁহার বিশেষ মনে আসে নাই। তখন তিনি "পথের পাচালী" রচনাতেই বিশেষরূপে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ২।১ বৎসর তাঁহার কলিকাতার জীবন ভালো লাগিয়াছিল। তারপর বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় অরণ্যে দীর্ঘকাল যাপিত মুক্ত ও উদ্দাম জীবনের কথা কেবলই মনে পড়িত। তখনই "আরণ্যক" রচনা শুরু করেন।

'আরণ্যকে'র তিনটি সংক্ষিপ্ত ও কিশোর-পাঠ্য সংস্করণ বিভিন্ন সময়ে বাহির হইয়াছিল।

১। ছেলেদের আরণ্যক ॥ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩, ইং ১৯৪৬। পৃ ২৪৯

প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বয়ং বিভূতিভূষণ ইহা সংক্ষেপিত করেন।

২। লবটুলিয়ার কাহিনী। ২০ আশ্বিন, ১৩৬২। পৃ. ১৭৬

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র ইহা সংক্ষেপিত করেন।

৩। আরণ্যক (সংক্ষেপিত কিশোর সংস্করণ পৃ. ১১৮)

প্রকাশক : ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যার, সিটি বুক কোং, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মূল বাংলা ছাড়াও "আরণ্যক" "সাহিত্য আকাদেমী"র প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। "সাহিত্য আকাদেমী"র পক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন।

ওড়িয়া বনচরী। অনুবাদক : লক্ষ্মীনারায়ণ মহান্তি। ১৯৬৩। পৃ. বারো আনা, ৩৩৩। **তেলেগু** বনবাসী। অনুবাদক : সুরমপুরী সীতারাম। ১৯৬১। পৃ. পনেরো আনা, ২৭৪। **গুজরাতী** আরণ্যক। অনুবাদক : চন্দ্রকান্ত মেহতা। ১৯৬১। পৃ ২৭৪। **মারাঠি** আরণ্যক। অনুবাদক : শংকর লালাজী শাস্ত্রী। ১৯৬৪। পৃ. এক টাকা ৩৭২। **মালয়ালাম** আরণ্যক। অনুবাদক : পি বাসুদেব কুরূপ। ১৯৫৮। পৃ. ৩৬৫। **পাঞ্জাবী** বনবাসী। অনুবাদক : অমরভারতী। ১৯৫৭। পৃ. ২৯৩। **হিন্দী** আরণ্যক। অনুবাদক : হংসকুমার তেওয়ারী। ১৯৫৭। পৃ দশ আনা, ২৮৭।

আচার্য্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "সাহিত্য আকাদেমী"র ইংরেজি মুখপত্র "ইণ্ডিয়ান লিটারেচার" দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৫৯) এবং "বিভূতি রচনাবলী"র প্রথম খণ্ডে "আরণ্যক" উপন্যাস ও বিভূতিভূষণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র "আরণ্যক" উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র-নাট্য কাহিনী লিখিয়াছিলেন। উহা শারদীয়া সংখ্যা "বিশ্ববার্ত্তা"য় প্রকাশিতও হইয়াছিল। এই কাহিনী বিভূতিভূষণ জীবিতকালে পড়িয়া গিয়াছেন। উহা পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

'অশনি সংকেত'

"অশনি সংকেত" বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একমাত্র উপন্যাস। উপন্যাসটির রচনাকাল: মাঘ ১৩৫০—মাঘ ১৩৫২, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যাহ্নকাল। "অশনি সংকেত" প্রথমে ধারাবাহিক উপন্যাস হিসাবে মাসিক "মাতৃভূমি" পত্রিকায় ঐ সময়েই প্রকাশিত হয় (জানুয়ারী ১৯৪৪ হইতে জানুয়ারী ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ)। "মাতৃভূমি" পত্রিকা উঠিয়া যাওয়ায় বিভূতিভূষণ "অশনি সংকেত" উপন্যাস আর শেষ করিতে পারেন নাই। অসমাপ্ত অবস্থাতেই "অশনি সংকেত" উপন্যাসটি "মাতৃভূমি" পত্রিকায় আবদ্ধ হইয়া ছিল। বর্ত্তমান নিবন্ধকারের উৎসাহে উহা ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৫৯। ভাদ্র ১৩৬৬ পৃ. ১৫৮+২। ডবল ডিমাই সাইজ প্রকাশক: বিভূতি প্রকাশন, ২২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ সঙ্কলন করেন শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত, তিনি একটি গ্রন্থ পবিচয়ও লিখিয়া দেন।

"অশনি সংকেত"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

"অশনি সংকেত" উপন্যাসে বিভূতিভূষণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় অবদান ১৩৫০ সনের (পঞ্চাশের মন্বন্তর) দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রাম-বাংলার দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস কিরূপে ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার করিতেছিল তাহার নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন বিভূতিভূষণ। "অশনি সংকেত" রচনার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বিভূতিভূষণ তাঁহার পল্লীভবন বারাকপুর গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময়ে জাপানী আক্রমণ, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মের পতন, ইভ্যাকুয়েশন প্রভৃতি যুদ্ধের কুফল—সরকারী আনুকূল্যে শস্যসঞ্চয়ের ফলে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং পরে জাপানী আক্রমণের আশংকায় "পোড়ামাটি"-নীতি অনুসরণের ফলে তথাকথিত মনুষ্য-সৃষ্ট মহা মন্বন্তরের চিত্র তিনি "অশনি-সংকেত"এ আঁকিয়াছেন। সে সময়ে বিভূতিভূষণ স্বগ্রাম হইতে দেড়মাইল দূরে গোপালনগর "হরিপদ ইনস্টিটিউশনে" শিক্ষকতা করিতেন। ১৯৪২ সাল হইতে স্বগ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করিবার ফলে "অশনিসংকেতে" গ্রাম-বাংলার চিত্র বাস্তবানুগ এবং জীবন্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বাঙ্গালী কৃষিজীবীরা কিরূপ আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছিল —তাহার আভাসও এই গ্রন্থে স্পষ্ট।

বিভূতিভূষণ স্বগ্রাম বারাকপুর এবং তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চল এবং বনগ্রাম মহকুমা শহরকে কেন্দ্র করিয়া "অশনি-সংকেতে"র পটভূমি রচনা করিয়াছেন। "অশনি-সংকেত"এ অঙ্কিত নরনারী চরিত্রের মধ্যে সবই প্রায় কাল্পনিক। তবে অনঙ্গ বৌয়ের চরিত্রের মধ্যে বোধহয় তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রের কিছুটা আদল আছে। তাঁহার তৎকালীন সংসারের কিছু কিছু চিত্রও ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। গঙ্গাচরণের পরিবারের আদল তিনি গ্রামেরই একটি পরিবারের মধ্যে পাইয়াছিলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে গঙ্গাচরণের সহিত "পথের পাঁচালী"র হরিহর চরিত্রের কিছু কিছু মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। "পথের পাচালী"র হরিহরের মতই গঙ্গাচরণও

মধ্যবয়সী এবং সংসারী মানুষ। পূজা অর্চনা এবং গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু গঙ্গাচরণ বৈষয়িক-এবং অতিরিক্ত ধূর্ত্ত। হরিহরের মত ভাবজগতের মানুষ সে নয়। কূট-কৌশল করিয়া অদৃষ্টের সহিত লড়িবার জন্য সে চেষ্টা করে।

বিভূতিভূষণ পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতায় গঙ্গাচরণকে ভাববাদী হিসাবে অঙ্কিত না করিয়া বাস্তববাদী করিয়া আঁকিয়াছেন। মতি মুচিনী, কাপালী বৌ প্রভৃতি চরিত্র সম্ভবত কাল্পনিক। ১৯৪২।৪৩।৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামে বাস কালে বিভূতিভূষণকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কুফল পদে পদে ভোগ করিতে হয়। গ্রামের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কণ্ট্রোল, কেরোসিন, চাউল ও চিনি প্রভৃতি জিনিসের অভাব পদে পদে অনুভব করেন। তাহারই ফলশ্রুতি স্বরূপ "অশনি-সংকেতে" গ্রামবাংলার একটি জীবন্ত ও বাস্তবানুগ চিত্র আমরা পাই। ১৯৫৯ সালে "অশনি-সংকেত" বাহির হইলে গ্রন্থটি দেশে বিদেশে উচ্চ প্রশংসা পায়। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে "অশনি-সংকেত" বহুবার উল্লিখিত হয়। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত All India Writer's Conferenceএ অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় "অশনি সংকেতে"র উচ্চ প্রশংসা করেন এবং বিভূতিভূষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্ত্তি বলিয়া অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ও "অশনি-সংকেতে"র উচ্চ প্রশংসা করিয়া পত্র দেন।

'জন্ম ও মৃত্যু'

"জন্ম ও মৃত্যু" বিভূতিভূষণের চতুর্থ গল্প-গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৪৪ (ইং ১৯৩৭) ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী সাইজ। পৃ. ১৮৮। প্রকাশক : ক্যাত্যায়নী বুক স্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিডেট, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭।

সূচী : যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ, জন্ম ও মৃত্যু, সই, রামশরণ দারোগার গল্প, খুড়ীমা, বায়ু রোগ, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, লেখক, বড়বাবুর বাহাদুরী, অন্নপ্রাশন, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ডাকগাড়ী, অকারণ।

গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে মাত্র "যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ" (বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪২) এবং "অন্নপ্রাশন" (বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪৩) গল্পের প্রথম প্রকাশকাল জানা যায়।

বিভূতিভূষণের "তৃণাঙ্কুর", "উর্ম্মিমুখর", "উৎকর্ণ" প্রভৃতি দিনলিপি পাঠ করিলে জানা যায় তাঁহার মধ্য জীবনে বহুকাল দূর প্রবাসে কালযাপনের পরে পুনরায় গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিতেছে এবং তিনি গভীর ভাবে গ্রাম্য জীবনের সুখ ও দুঃখ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ও নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করিতেছেন। তাহার ফলেই "জন্ম ও মৃত্যু"

গল্পগুলির মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাই। তিনি মূলতঃ গ্রাম-জীবনের বাস্তব পটভূমি হইতেই গল্পের কাঠামো আহরণ করিয়াছেন।

যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ, জন্ম ও মৃত্যু, রামশরণ দারোগার গল্প, খুড়ীমা, লেখক, অন্নপ্রাশন এবং ডাকগাড়ী গল্পের পটভূমি বিভূতিভূষণ স্বগ্রাম হইতেই পাইয়াছেন। "যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ" তাঁহার শৈশব অভিজ্ঞতালব্ধ একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া লেখা। "যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ" গল্পটি বিভূতিভূষণ প্রথমে পাটনার বি এন কলেজ আয়োজিত বৈকালিক এক চা-চক্রে পাঠ করেন। এ বিষয়ে তাঁহার দিনলিপি গ্রন্থ "উৎকর্ণে" উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্র, উৎকর্ণ, পৃ. ৩৩)। বিভূতিভূষণ পাটনাতে সাহিত্যিক বন্ধু নীরদচন্দ্র চৌধুরী সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। "জন্ম ও মৃত্যু" গল্প লিখিবার প্রেরণা পান পাশের গ্রাম চাল্‌কীর দুঃস্থা এক গ্রাম্য বৃদ্ধাকে দেখিয়া। "রামশরণ দারোগার গল্প" তিনি বনগ্রাম লিচুতলায় তাঁহার আইনজীবী বন্ধুদের নিকট শোনেন। "খুড়ীমা", "লেখক" ও "অরন্ধনের নিমন্ত্রণ" গল্পে কিছু কিছু বাস্তবতার স্পর্শ রহিয়াছে।

"খুড়ীমা" গল্পের অনুরূপ ঘটনা তাঁহার গ্রামেই ঘটিয়াছিল। "অরন্ধনের নিমন্ত্রণ" গল্পে তিনি কুমুদিনী চরিত্রে তাঁহার পরিচিতা এক মহিলার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "অরন্ধনের নিমন্ত্রণ" গল্পটি বিভূতিভূষণের "প্রেমের গল্পে"র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (প্রথম প্রকাশ : প্রেমের গল্প, ফাল্গুন ১৩৬৯। মার্চ্চ ১৯৬৩)।

"লেখক" গল্পের উৎসের সন্ধান মেলে তাঁহার দিনলিপি "ঊর্ম্মিমুখরে", উহাতে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। সেখান হইতে কিছুটা তুলিয়া দিতেছি :

"সাতবেড়ের একটি ছেলে গল্প ও কবিতা লিখে মাঝে মাঝে আমার হাতে দেয়! গত দু-তিন বছর থেকে দিচ্ছে। গরীবের ছেলে, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারেনি, কিন্তু লেখে মন্দ নয়। গল্পের হাত আছে, তার টেকনিকের ওপর তেমন দখল নেই, থাকবার কথাও নয়—টেক্‌নিক জিনিসটা কতকটা আসে এমনি, কতকটা আসে ভাল লেখকদের ভাল গল্পের রচনারীতি দেখে। তার জন্যে পড়াশুনোর দরকার হয়। এ ছেলেটির সেরূপ সেই পড়বার সুযোগ কোথায়?

"মুচিবাড়ির সামনে বটতলায় তার সঙ্গে দেখা। সে আমার সঙ্গে আলাপ করবে বলেই ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল, বললে। কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—আর বছরের সেই লেখাগুলো কি দেখেছিলেন?

"ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় বছরে একবার, এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে। সেই সময় ও আমার কাছে ওর লেখা দেয়, ইচ্ছেটা এই যে কলকাতার কোনও কাগজে ছাপিয়ে দেবো। কিন্তু কাগজে ছাপবার উপযুক্ত হয় না ওর লেখা। তবুও আমি প্রতি বৎসর উৎসাহ দিই, এবারও দিলাম। মিথ্যে করে বললুম, তোমার গল্প বেশ ভাল হয়েছিল, কলকাতার অনেকে পড়ে খুব সুখ্যাতি করেচে। ও আগ্রহের সঙ্গে বললে—কোন্ গল্পটা? আমার নাম মনে

নেই ওর কোনও গল্পেরই, কাগজগুলোও কোন্ কালে কোথায় হারিয়ে গিয়েচে। ভেবেচিন্তে বললুম—সেই যে একটা মেয়ে, বলতেই ও তাড়াতাড়ি বললে—ও বিয়ের কনে?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ বিয়ের কনে।

"একটা মিথ্যে কথা পাঁচটা মিথ্যে কথা এনে ফেলে। কাঁচি কাটার পুল পর্য্যন্ত বটতলার ছায়ায় ছায়ায় ও আমার সঙ্গে সঙ্গে অতীব আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে শুনতে এল, কলকাতার কোন্ কোন্ বড়লোক ওর গল্পের কি রকম সুখ্যাতি করেচে—কোন্ কাগজের সম্পাদক বলেচে যে, আর একটু ভাল লেখা হলেই তারা তাদের কাগজে ছাপাবে, তার কবিতা পড়ে কোন্ মেয়ের খুব ভালো লেগেছিল বলে হাতের লেখা কবিতাটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রেখে দিয়েচে কাছে। সন্ধ্যার দেরি নেই, আমি বললুম—তবে আজ যাই, আবার ফিরে নদীর ধারে মাঠে বেড়াতে যাবো। কি করো আজকাল! ও বললে—বাড়ী বসে তো আর চলে না, তাই ওই পথের ধারে ধান চালের আড়তে কাজ নিইচি। আজ এই তিনমাস কাজ করচি। সকালে আসি আর সন্ধ্যার সময় ছুটি পাই।

"তারপর একটু লজ্জা মিশ্রিত সঙ্কোচের সঙ্গে বললে—আসচে হাটে আপনাকে আর গোটা কয়েক গল্প ও কবিতা দেবো—পড়ে দেখবেন কেমন হয়েচে। কলকাতার ওই বাবুদেরও দেখাবেন। আমি উৎসাহের সঙ্গে বলি—নিশ্চয়ই। বাঃ, চমৎকার লেখা তোমার। পড়ে সেখানে সবাই কি খুশি! তা এনো। আসচে হাটবারেই এনো। তার আর কথা কি! ও বললে—ফিরবেন তো এমন সময়? আমি লেখা নিয়ে এই বটতলায় বসে থাকবো। আসবেন একটু সকাল-সকাল যদি পারেন—দু-একটা লেখা একটু পড়ে শোনাবার ইচ্ছে—আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম—শোনাবে নাকি? বাঃ তবে তো বেশ দিনটা কাটবে। নিশ্চয়ই আসবো। তোমার কথা কত হয় কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে।

"বেচারীকে সত্যিকথা বলে লাভ নেই। ওতেই ওর সুখ, আমরা সবাই জীবনে মিথ্যের স্বর্গ রচনা করে রেখেচি, উনিশ না হয় বিশ। মিথ্যে বলে যদি ওই দরিদ্র, অসহায় পল্লী যুবককে এতটুকু আনন্দ দিতে পারি ভালই। ওর মিথ্যে স্বপ্ন আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অক্ষয় হোক।"

"লেখক" গল্পটির সঙ্গে বিভূতিভূষণের "কবি কুণ্ডুমশায়" গল্পটি অতুলনীয়। "ঊর্ম্মিমুখরে"র পরবর্ত্তী দিনলিপি "উৎকর্ণে" "কবি কুণ্ডুমশায়ে"র উল্লেখ পাওয়া যায়। (উৎকর্ণ পৃ. ১৮০) "কবি কুণ্ডুমশায়" "বিধু মাস্টার" ও "গল্প পঞ্চাশৎ" সংকলন ভুক্ত। তৎপূর্ব্বে শারদীয়া সংখ্যা "দেশ"এ প্রকাশিত হয়।

বিভূতিভূষণের চিরকালই অলৌকিক বিষয় জানিবার আগ্রহ ছিল। ভাগলপুর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাসকালে তিনি নিয়মিত ভাবে, 'জাতীয় গ্রন্থাগারে' (পূর্ব্বতন Imperial Library) যাইতেন। সে সময় তাঁহার হাতে তন্ত্র-শাস্ত্রের গ্রন্থ আসিয়া পড়ে এবং তিনি গভীর ভাবে তন্ত্র-শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। তন্ত্র-শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতেই তিনি "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প" লিখিবার প্রেরণা পান। পরে "তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয়

গল্প"ও লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে আরো কয়েকটি লিখিয়া একটি সিরিজ পূর্ণ করিবেন। সম্ভবত এইরূপ ইচ্ছা ছিল। "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প" তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্পেও স্থান পাইয়াছে (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ; প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২)।

"ডাক গাড়ী" গল্পটি লিখিবার প্রেরণা বিভূতিভূষণ কিভাবে পাইয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁহার বন্ধু বিহার-সরকারের বনবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বন-সংরক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার স্মৃতিচারণমূলক রচনা "পথের পাঁচালীকে বিভূতিবাবু" নামক হিন্দী গ্রন্থ হইতে। সেখানে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা "ডাক গাড়ী" গল্পটি রচনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। "ডাক গাড়ী" গল্পের রাধা চরিত্রের আদল বিভূতিভূষণ তাঁর মাতা মৃণালিনী দেবীর সই কাদম্বিনী দেবীর দৌহিত্রী সেবার (পাঁচী ডাকনাম) আদলে লইয়াছেন।

'বনে পাহাড়ে'

'বনে পাহাড়ে' বিভূতিভূষণ রচিত দ্বিতীয় ভ্রমণ-কাহিনী। অনেকটা দিনলিপির আকারে লেখা। "বনে পাহাড়ে" পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে ধারাবাহিকরূপে "মৌচাক" মাসিক পত্রিকায় আষাঢ়, ১৩৫০—আষাঢ় ১৩৫২ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ আকারে প্রথম প্রকাশ : ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। পৃ. ৮৯ প্রকাশক : মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪২-৪৩ সালে বিভূতিভূষণ তাঁহার বন্ধু বর্ত্তমানে বিহার সরকারের অবসর-প্রাপ্ত মুখ্য বন-সংরক্ষক (Chief Conservator of Forests) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার সঙ্গে ছোটনাগপুরের সিংভূম ও রাঁচী জেলার সারাণ্ডা, কোলাহান ও সিংভূম বন-বিভাগের গভীর এবং বিস্তীর্ণ অরণ্য ভ্রমণ করেন। কখনো বিভূতিভূষণ সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার সঙ্গে দুর্গম অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত বন-বিভাগের বিভিন্ন বিশ্রাম-আবাসে (Forest Rest House) অবস্থান করেন , কখনো বা একাকীই শ্রীযুক্ত সিন্‌হার সঙ্গে তাঁহার বন পরিদর্শনের সঙ্গীরূপে দুর্গম বন ভ্রমণ করেন। শ্রীযুক্ত সিন্‌হা তখন ধলভূম বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ছিলেন। তাহারই বর্ণনা "বনে পাহাড়ে" ও "হে অরণ্য কথা কও" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

"বনে পাহাড়ে"র প্রথম দিকে ঝাড়গ্রামের উল্লেখ আছে। ১৯৪২।৪৩ সালে বিভূতিভূষণের শ্বশুর স্বর্গত ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সরকারী কর্ম্মসূত্রে ঝাড়গ্রামে অবস্থান করিতেন। সে সময়ে বিভূতিভূষণ একাধিকবার তাঁহার গৃহে আগমন করেন। সেই সূত্রে ঝাড়গ্রামের দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে সাবিত্রী মন্দির, রাজ বাড়ী, এবং ঝাড়গ্রামের বিখ্যাত শালবন ভ্রমণ করেন। সাবিত্রী মন্দির ঐ অঞ্চলে তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। ঐ মন্দিরের সঙ্গে অনেক কিম্বদন্তী জড়িত

আছে। রাজবাড়ী বিভূতিভূষণের বাসগৃহের নিকটেই ছিল। তিনি রাজবাড়ীর বিভিন্ন পুষ্করিণীতে স্নান করিতে ভালোবাসিতেন। ঝাড়গ্রামে থাকিলে অপরাহ্নে ঝাড়গ্রাম শহর হইতে কিছুদূরে শালবনে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সেখানেই জঙ্গলের মধ্যে এক সাধুর সঙ্গে আলাপ হয় এবং বিভূতিভূষণের সে জায়গাটি ভালো লাগে। তিনি সেখানে জমি কিনিয়া বসবাসের বাসনা প্রকাশ করেন।

"বনে পাহাড়ে" গ্রন্থে বিভূতিভূষণ প্রধানত ঝাড়গ্রাম, ধলভূম ও কোলাহান বনবিভাগের বনভূমি ভ্রমণের এবং হিড্‌নি জলপ্রপাত ও সেরাইকেলা ভ্রমণের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বিভিন্ন সময়ে ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত সিন্‌হা, শ্রীযুক্ত সিন্‌হার সহকর্মী কোলাহান ফরেস্ট ডিভিশনের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার হরদয়াল সিং। বিহার সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এবং মিঃ সিনহা ও বিভূতিভূষণের বন্ধু সুবোধ ঘোষ ও বনবিভাগের কর্ম্মী রাসবিহারী গুপ্তও বন-ভ্রমণে কখনো কখনো সঙ্গী হইতেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা ও ভ্রমণের বিবরণী শ্রীযুক্ত সিন্‌হা তাঁহার রচিত হিন্দী পুস্তক "পথের পাঁচালীকে বিভূতিবাবু" (প্রকাশক: পুস্তক ভবন, রাঁচী) নামক গ্রন্থে করিয়াছেন। "পথের পাঁচালীকে বিভূতিবাবু" গ্রন্থের সারাংশ সম্প্রতি "আলেখ্য" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক হিসাবে প্রকাশিত হইতেছে। (দ্রঃ "আলেখ্য", ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৭৭৭—৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ কলি-৩২ হইতে প্রকাশিত)।

"বনে পাহাড়ে" গ্রন্থের পরে বিভূতিভূষণের এই বনাঞ্চল ভ্রমণের বিবরণী সহ একটি সুদীর্ঘ চিঠি মুদ্রিত হইল। চিঠিটি "বনে পাহাড়ে" গ্রন্থের সমসাময়িক কালে লিখিত হয়। পত্রটি তিনি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু সাহিত্যরসিক এবং লিচুতলা ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন। মন্মথনাথের সহিত বিভূতিভূষণের পরিচয় ও বন্ধুত্ব শৈশবকাল হইতে। আইন ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মন্মথনাথ কিছুদিন বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং তিনি বিভূতিভূষণের শিক্ষকও ছিলেন। তিনি বহুভাবে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবনের প্রেরণা যোগান। তাঁহারই গৃহ-প্রাঙ্গণে বনগ্রাম লিচুতলা ক্লাবের সভা বসিত। পত্রটির সাহিত্য-মূল্য বিবেচনা করিয়া "বনে পাহাড়ে"র পরিশিষ্টরূপে "থলকোবাদে একরাত্রি" এই শিরোনামায় মুদ্রিত হইল। মূল পত্রটি প্রথমে বনগ্রাম হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "পল্লীবার্ত্তা"র ২১শ সংখ্যায় পত্রস্থ হয় (বনগ্রাম, ১৪ই অগ্রাহায়ণ মঙ্গলবার, ১৩৫০ সাল)। তারপরে "আমার লেখা" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে "পত্রাবলী"তে মুদ্রিত হয়।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

—পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত—